



রচনা বালী

সৈয়দ মুজতবা আলী



ହିନ୍ଦୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଚଳଣି ବିଚାରବଳୀ

ତୃତୀୟ ଅଂଶ



ସିଟି ଓ ସୋସ ପବ୍ଲିଶାର୍ସ
ପ୍ରା ଇ ଡେ ଟି ଲି ମି ଡେ ଟି

୧୦ ଷ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲିକାତା ୧୨

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্র নাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন
স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে অশোক কুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ।

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[ক]

টুনি মেম

টুনি মেম	...	৩
এক পদ্রুঘ	...	২২
কবিরাজ চৈতন্য	...	৬৬
॥ দুলালী ॥	...	৭২
(দুলালীর সমালোচনা)	...	৮৫
আন্তন চৈতন্যের “বিয়ের প্রস্তাব”	...	৯০
উল্টা রথ	...	১০৫
ওঘাটে যেও না বেউলো	...	১১২
সুখী হবার পন্থা	...	১১৭
বিষের বিষ	...	১২০
রাজহংসের মরণগীতি	...	১২৫
হিটলার	...	১৩৩
নব-হিটলার	...	১৩৭
শাসালো জর্মানি	...	১৪০
দেশের মদ্য খদ্দার তবল	...	১৪৪
হাসির অ-আ, ক-খ	...	১৪৭
হাসি-কান্না	...	১৫৪
রসিকতা	...	১৫৭
নানাপ্রশ্ন	...	১৬২
জাতীয় সংহতি	...	১৬৭
ভারতীয় সংহতি	...	১৭০
ভাষা	...	১৭৩
ভ্যাকিউয়াম	...	১৭৫
ধর্ম	...	১৭৯
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা	...	১৮২
ধর্ম ও কম্যুনিজম	...	১৮৫
এক ঝাণ্ডা	...	১৮৮
“রাধে মেয়ে কি চুল বাধে না ?”	...	১৯১
ওয়ার এম	...	১৯৪
দ্য গল্	...	১৯৮
তলস্তয়	...	২০৩
প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দাম্‌নুদ্‌জিয়ো	...	২০৬

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ	...	২১১
“ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁধার/সম্মুখে ঘন আঁধার”	...	২১৫
রাজা উজীর		
হিটলারের প্রেম	...	২২৩
পূর্ণপ্রেম	...	২৩৪
গেলীর প্রবেশ	...	২৩৯
গেলীর আত্মহত্যা হিটলারের শোক	...	২৫৯
লক্ষ মাকের বরমান	...	২৬৬
কনরাট আডেনাওয়ার	...	২৭২
বিদ্রোহী	...	২৮৬
প্রোটকল	...	২৯০
পপুলারের মগডালে	...	৩০১
হাতে কমন্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি	...	৩০৮
ভূতের মূখে রাম নাম	...	৩১২
শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়	...	৩১৭
‘অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়’	...	৩২২
“—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—”	...	৩২৬
ল্যাটে	...	৩৩০
আঁদ্রে জিঁদ	...	৩৩৩
আম্ভা	...	৩৩৬
পাসপরট্	...	৩৪১
আম্ভা-পাসপরট্	...	৩৪৫
‘ঈস্ট্ ইজ্ ঈস্ট্ অ্যান্ড্—’	...	৩৫১
বিশবৃক্ষ	...	৩৫৪
“দুঃখ তব যন্ত্রণায়”	...	৩৫৭
সাপ হয়েছে রণ—’	...	৩৬৩
জেরদুলম	...	৩৬৭
সত্য-দ্রোতা-দ্বাপর	...	৩৭১
রোদন প্রাচীন ঋগে মাতার	...	৩৭৫
অম্পে তুষ্ট	...	৩৭৯
ভঙ্গ বনাম কুলীন	...	৩৯১
অর্থমর্থম	...	৩৯৫
আবার আবার সেই কামান গজর্ন	...	৪০১
প্রেম	...	৪১৭
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৪২১

ভূমিকা

আমাদের ছেলেবেলা থেকেই এরকম ধারণা ছিল যে ভাষায় গুরু-চণ্ডালি মেশামিশি হলে সেটা একটা খুব দোষের ব্যাপার। ভাষাকে শুদ্ধ রাখার জন্য বস্কিমের আমল থেকেই এরকম একটা শমন জারি হয়েছিল।

আসলে কোনটা যে গুরু ভাষা আর কোনটা যে চণ্ডালি ভাষা সে সম্পর্কে স্পষ্ট আলাদা কোনো সীমারেখা কেউ টানতে পারেনি এ পর্যন্ত। এককালে সাধু ক্রিয়াপদ এবং চলিত ক্রিয়াপদের একটা ব্যবধান ছিল। এখন সাধু ক্রিয়াপদ প্রায় লুপ্তই বলা যায়—অন্তত সাহিত্যে। আবার, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অত্যন্ত পরিশীলিত নায়ক নায়িকার মুখে করিনে, পারিনে, যাইনে, কিংবা বললেম, করলেম, গেলেম—এইরকম ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, তখন আমরা খেয়াল করিনি, ওগুলি আসলে বীরভূমের গ্রাম্যভাষা থেকে নেওয়া।

এখন আমরা জেনেছি, ভাষা বহুতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে যেখান থেকে যাই-ই সংগ্রহ করুক, কিছুরেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই দিক থেকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাশিল্প সম্পর্কে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের ওপর সে ভার রইলো।

আলী সাহেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অসংখ্য ছোট ছোট লেখা লিখেছেন, সেগুলির সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে রম্যরচনা। আমার মতে, এই নামটি খুবই ভুল। তিনি যা লিখেছেন, সেগুলি আসলে প্রবন্ধ। যেহেতু সেগুলি আমাদের পড়তে ভাল লাগে, কিংবা মজা পাই, কখনো একলা একলা হেসে উঠি, তাই কি ওগুলো প্রবন্ধ হতে পারবে না?

এক সময় ঠাট্টা করে বলা হতো, যে লেখা পড়লে কিছুরই মানে বোঝা যায় না, তারই নাম আধুনিক কবিতা। সেই রকমই, এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যখন, যে-লেখা পড়তে ইচ্ছেই করে না, তারই নাম ছিল প্রবন্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলীই প্রবন্ধকে সেই অকাল মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি অন্তত একশোটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে, অন্তত সাতটি ভাষা সেকেঁতে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তাই বিতরণ করেছেন তাঁর রচনায়। এগুলি প্রবন্ধ ছাড়া আর কি? তাঁর অনেক বক্তব্য সম্পর্কে মতান্তর আছে, তাতে কি আসে যায়? কোন প্রাবন্ধিক অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করতে পারেন? তাঁর রচনার পর থেকেই, তথাকথিত প্রাবন্ধিকদের দুর্বোধ্য, কণ্টকলিপিত বাক্যের রচনা পাঠকরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। যথার্থ পণ্ডিতরাও এখন আন্তে আন্তে বুঝতে পারছেন, শুদ্ধ নিজের বিষয়ের ওপর দখল থাকাই বড় কথা নয়, সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করতে না জানলে লেখক হওয়া যায় না।

বিচারপতির মতন একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকবেন লেখক, আর সেখান থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে জ্ঞান কিংবা উপদেশ দান করবেন, সাহিত্যের এই ভূমিকা এখন আর নেই। সারা পৃথিবীতেই পাঠকরা এখন সাহিত্যিককে গুরু হিসেবে দেখতে চায় না, বন্ধু হিসেবে চায়। সেই দিক থেকে আলী সাহেব ছিলেন সমস্ত শ্রেণীর পাঠকদের বন্ধু। তাঁর ভাষা যেন অবিকল আঙুর ভাষা। আমরা কখনো কখনো তাঁর সাহচর্য বা সঙ্গ পেয়েছি। তিনি আমাদের চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, প্রতিষ্ঠায় এবং বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই তিনি যেই ‘এসো বাদার’ বলে ডাক দিতেন, অমনি আমরা তাঁর সমসাময়িক হয়ে যেতাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাদের মন্তমুণ্ড করে রাখতেন। এমন বহু বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোনো রকম দম বন্ধ করা আবহাওয়া ছিল না। মুহূর্তে মুহূর্তে হাসিতে ঘর ফেটে যেত, কখনো চোয়ালে বাথা হয়ে যেত আমাদের। তাঁর জানা প্রত্যেকটি বিষয়েই নিশ্চিত আরও অনেক বড় বড় পাণ্ডিত আছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, অগাধ পাণ্ডিত্যের চেয়ে এরকম খোলামেলা পাণ্ডিত হওয়া অনেক ভালো।

আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, কিন্তু এমন আরও হাজার হাজার পাঠক নিশ্চিত আছে, যারা সৈয়দ মুজতবা আলীকে কখনো চোখেও দেখেনি। সেই সব পাঠকরাও তাঁর লেখার মধ্যে পেয়েছে দরাজ বন্ধুত্বের আহ্বান। পত্র পত্রিকা খুলে প্রথমেই যার লেখা পড়তে ইচ্ছে করতো, তিনিই মুজতবা আলী। এবং এই আকর্ষণ তিনি প্রায় তাঁর মৃত্যু-বছর পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

যাঁরা হাস্যরসাত্মক রচনা লেখেন, তাঁদের একটি বিশেষ গুণ নিশ্চিত থাকা দরকার। আমাদের দেশে অনেকেই এটা জানেন না বলেই আমাদের সরস সাহিত্যের শাখাটি এত দুর্বল। সেই গুণটি হলো নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার ক্ষমতা। সামান্য একটু আত্মস্মিততা কিংবা স্বপ্রচারে হাস্যরস একেবারে চূপসে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনো লেখাতে এর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। একবার এক জার্মান পাণ্ডিত তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শেক্সপীরের কোন রচনাটি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। আলী সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যামলেট। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন, শেক্সপীরের ঐ একটাই বই আমি পড়েছি কি না! এই শেষের বাক্যটি বলার মতন বুদ্ধি কিংবা রসিকতা-বোধ যে-সে লোকের থাকে না।

এক জায়গায় তিনি নিজের চেহারা সম্পর্কে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন :

“আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেনস্ বাসটি করলো। আমার শ্যাটারিং সৌন্দর্য সইতে না পেরে।...”

“ফোটো হলো না। অইল পেন্টিং-ওলা বলেন, কালো হলো চলতো তা সে মিশই হোক না। কিন্তু এ যে বাবা খাজা রঙ। কালো কালির ওপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলে পারা, না-সবুজ, না-নীল, না-কিছ। আমার প্যালেট লাটে।”

এই বর্ণনা পড়ার পর পাঠক একবার সৈয়দ মজতবা আলীর যৌবন ব্যয়সের ছবি মিলিয়ে দেখুন।

আলী সাহেব সর্বাধিক পরিচিত তাঁর সরস প্রবন্ধগুলির জন্যই। উপন্যাস বা গল্প খুব বেশী লেখেননি। যে-কটি লিখেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়েছে, চরিত্র সৃষ্টি এবং কাহিনী নির্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এবং আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাঁর ছোট ছোট লেখাগুলিতে প্রচুর হাস্যরস থাকলেও, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস এবং গল্পে করুণ রসই বেশী। শবনম উপন্যাস পড়তে পড়তে যে অনবরত চোখের জল মোছে না, সে পাশ্চাত্য ছাড়া আর কিছুই না। কয়েকটি গল্পের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সেই যে গল্পে আছে পূর্ব-বঙ্গের এক ছোট স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইয়ের কথা। লাটসাহেবের পরিদর্শন উপলক্ষে যে পণ্ডিতমশাইকে জীবনে প্রথম জামা গায় দিতে হয়েছিল। লাটসাহেবের প্রিয় কুকুরটির ছিল একটি পা কাটা। সেই কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শূন্যে পণ্ডিতমশাই হিসেব করেছিলেন, তিন-চতুর্থে কুকুরের প্রতিটি পায়ের জন্য যা খরচ হয় তার থেকে কম খরচে তাঁকে আটজনের একটি সংসার কি করে চালাতে হয়। গল্পটির নাম মনে নেই, কিন্তু এইসব গল্পই সারা জীবন মনে রাখে। কিংবা সেই শিলেটি খালাসীটির কাহিনী, যে দেশের স্ত্রী এবং জাহাজের চাকরি পরিত্যাগ করে মেম বিবাহ করে আত্মগোপন করে আছে। লেখক গিয়েছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী এবং শিশুদের দেখে মুখ ফুটে বলতে পারলেন না সেকথা। আশ্চর্য করুণ মধুর সে কাহিনী।

আমাদের দৃষ্টি এই, টিলেটোলা স্বভাব বা আলস্যের জন্য তিনি দীর্ঘ কাহিনী বেশী লিখে যেতে পারেননি। তাতে ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যেরই। আমার সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি লাগে, বিশেষ একটি রচনার কথা ভেবে। এটির নাম ‘এক পুরুষ’। এটির মধ্যে একটি মহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। সিপাহী যুদ্ধের শেষে একজন দিল্লীবাসী মুসলমান সুবেদার আত্মগোপন করে রইলেন বীরভূমের এক গ্রামে, বেষবেরছন্মবেশে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে আমাদের দেশে প্রচুর অখ্যাত লেখা হয়েছে। আলী সাহেবের কাছ থেকে আমরা একটি সার্থক লেখা পেতে পারতাম। তা ছাড়া, আর একটি বিরাট সম্ভাবনাও ছিল। সাধারণত হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান চরিত্র থাকে না, মুসলমান লেখকদের লেখায় থাকে না হিন্দু চরিত্র—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই। আলী সাহেব দুই সমাজকেই জানতেন খুব ভালো ভাবে, দু’দিকের শাস্ত্র-ধর্ম গ্রন্থই পড়েছেন খুব মন দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজের সার্থক রূপায়ণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিন্তু “এক পুরুষ” নামের কাহিনীটি তিনি হঠাৎ দ্রুত করে থামিয়ে দিলেন। এটা অন্যায় ছাড়া আর কিছুই না। নিজের সাফাই গাইলেন এইভাবে; এখানেই ‘এক পুরুষ’ শেষ।

“বইখানা তিন-পুরুষে সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুদ্বৈ যখন ‘তিন পুরুষ’ লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে ‘যোগাযোগ’

নাম দিলেন, তখন যার কৃপায় ‘মুক বাচাল হয়’ তাঁরই কৃপায় এখানে বাচাল মুক হল।” এটা কি প্রেফ অলস লোকের কু-যুক্তি নয় ?

যাই হোক, স্ফোভ বা অভিমান করে আর কি হবে ! তাঁর রচনা যতখানি পেয়েছি, তাও তো অমূল্য। এমন রচনা পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই দুর্লভ। আমাদের বাংলা ভাষাতেই তিনি লিখে গেছেন, এজন্য আমরা গর্ব করতে পারি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি যেম

শ্রীমতী ভাস্করী শ্রীলা ঘোষের

কব্ধকমলে—

টুনি মেম

বেশী দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমাড়ি হয়ে শেয়ালদায় আসাম লিঙে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বল মান-মুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আশ্মো।

একসঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম, ‘খান না রে?’

সে হাঁকলে, ‘মিতু না রে?’

যুগপৎ উল্লস্কন, ঘন ঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, ‘তুই এ রকম বদখদ দাড়ি-দাড়া রেখেছিস কেন?’

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুন্যেলে ইহুদিদের মত পাশ্চাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শূন্যে, ‘দাড়া কারে কয়?’

‘হাড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উদ্‌তে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।’

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঠার রক্ত। শূন্যে, ‘তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক দেশে এসেছিস কি করতে?’

‘আজমীরের খাজা মুঈন-উদ্-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্‌পিতে প্রোমোশন করেন তবে বাবার দরগা দর্শনে যাবো, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে শীর্ষ চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপাড়ি।’

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, ‘ও! তুই বুদ্ধি পুঁলিসে ঢুকেছিলি?’

বললে, ‘হ্যাঁ, সাব-ইন্স্পেকটর হয়ে।’

আশ্চর্য হয়ে শূন্যে, ‘বলিস কি রে? আর এরই মধ্যে এস্‌পি!’

প্রসাদীর পাপাড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে, ‘খোজা মুঈন-উদ্-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কুপায়!’

‘হিন্দুদের কুপায়!’

‘হ্যাঁ ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পূর্ব বাঙলার পুঁলিসের ডাঙর ডাঙর নোকারি ছেড়ে বেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গন্ডায় গন্ডায় প্রোমোশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু’একটা না-হক প্রোমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবি নে—তুই চিরকালই সম্বন্ধহীণচাশ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গন্ডায় গন্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমোশন পেয়েছে। জানিস, মন্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?’

আমি ভিরমি যাই আর কি । গাড়ল ফোড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না । খান বললে, ‘সব তো শুনলি । তোর বইও আমি দু’চারখানা পড়েছি । আচ্ছা বল তো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছ্, কিছ্ দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু ?’

‘কিছ্‌টা বানিয়ে, কিছ্‌টা অভিজ্ঞতা থেকে ।’

‘তাজ্জব ! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাবী দেখলুম । এক-একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয় । কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায় । কি করে যে তুই লিখিস ।’

আমি বললুম, ‘আমাকেও যদি সন্ধ্যামাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তাহলে আমার রিপোর্টটা হত তোর চেয়েও ওঁচা । কম্পনা এসে উৎপাত করতো । তা সে কথা যাক্ গে । আমার দিনকাল বড়ই খারাপ যাচ্ছে—প্রটের অপৰ্যাপ্ত অনটন । সম্পাদক মিঞা আবার গল্পই চান, ‘ইলসট্রেট’ করবেন । বল না একটা ।’

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, ‘কোনটা বলি, কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করেছে । আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে নি ।’

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো । খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘এরা কি জাত রে ?’

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল । শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাস্কে চোলিফোলি কিছ্ নেই, নিটোল দেহ, সুড়োল ইত্যাদি ইত্যাদি । শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু ফরে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে । হলদে পলাশ । এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম । কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশী ।

বললুম, ‘সাঁওতাল । হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পৌঁছয়নি । কিংবা হয়তো ছিল এককালে । কাল যে-রকম হিন্দু পূর্ব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু ।’

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না । আপন মনে কি যেন ভাবছে । ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুনু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান । তখন বিরক্ত করতে নেই ।

গাড়ি ছাড়লো । একটু কাছে এসে বললে, ‘ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল । তার রঙ ছিল এর চেয়েও কালো । কিন্তু সে কী কালো ! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয় ! হ্যাঁ তাই ; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি । আমি তাকে দেখেছিলাম তার শারীরিক মানসিক চরম দূরবস্থায় । তবু চোখ ফেরাতে পারিনি । হিন্দুরা কেন যে “কালী” “কালী” করে তখন বুদ্ধিতে পেরেছিলুম ।’

গাড়ি বধ'মানে এসে থামলো। বধ'মানে আমি গত সাত বছর ধরে অভ'র দিয়ে কখনো কেলনারের কাছ থেকে চা-আন্ডা পাইনি। কাজেই ফর সের্ফটিস সেক প্রথমই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিরের যোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুরা পাক্সা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোসাই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

গাড়ি ছাড়তে খান বললে, 'আমি তখন আরুগড়ে। এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দ্দস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পৌঁছব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আখলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ, তবে সে অন্য ধরনের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।

আরুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকেটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ, তার উপর এল গোলমো'রের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সায়েব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়ীতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আরুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানি নে।

বড়কর্তা বর্লোছিলেন, কিছু একটা জ্বরদস্ত নতুন না করতে পারলে কুইক প্রোমোশন হয় না। জ্বরদস্ত নতুন করবোটা'ই বা কি? এখানে খুন-খারাবী হয় অতঃপর। উঠোনই নেই তো আমি নাচি কি করে?

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেই-টেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রী আমায় রাস্তায় ধাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোস্তাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুচাঁ' খানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কংকালই বলা যেতে পারে—পচা ছেঁড়া কবল জড়ানো।

রক্তের সম্ভান পেয়ে বললুম, "তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।"

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায়নি।

জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবুচাঁ'খানার নিচে কবলে জড়ানো পোঁতা কংকাল! এখানে কিস্মিনকালেও কোনো গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে, ওখানে মানুষ গোরস্তান

বানাতে যাবে। তাহলে এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শব্দ খারাবী নয়, খুন-খারাবী।’

আমি বললুম, ‘সাক্ষাৎ শার্লক হোমস।’

শুধোলে, ‘সে আবার কে?’

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, ‘তুমি এগোও; আমি আর রসভঙ্গ করবো না।’

বললে, ‘প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কতরকম নর-হত্যার ছবি, যেন স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেশ্রকুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লাগে লাগ।’

আমি বললুম, ‘রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোমস্ হল বিলিতি অরিশদম।’

খান বললে, ‘তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিস নে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দোঁখনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে দৃশ্য আর কারো দেখবার দরকার নেই।’

কি বলছিলুম? হ্যাঁ। ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মুখের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায়; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়!

আজ হাসি পায়। রাতদুপুরে এখন যদি জমাদ্দার এসে খবর দেয়, পশ্চার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালাশ জাবড়ে ধরে বলি, “যা-যা, দিক্ করিসনি!”

রাজমিস্ত্রী হেলে দুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে আষ্ট ঘণ্টা দখানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফাস্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি “কন্সবল” সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।’

আমি বললুম, ‘ঐ ম’লো। অকুস্থান হয়েছে আরবী “ওয়াকেনা”, অর্থাৎ “ঘটনা” আর “স্থান” নিয়ে।’

খান বললে, ‘থাক্ থাক্ আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।’

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুচাঁখানার ঘোর-জানালা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নতুন সাহেব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কস্কাল, পচা কস্কালে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তুর্ণণে এগোলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে

একটা ঐ সাইজের গর্ত'।

আব্দুগড়ে গন্ডায় গন্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমার তন্দ্রাডেই বাথলে দেবে, ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কক্ষাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পৌঁতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন আমাদেই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শৃঙ্খালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কক্ষাল উপেক্ষা করে, কবলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙালোর থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সাহেব। সে এখন কোথায়? জেলে। কেন? সে-কথা জেনে কি পদূলি-পিঠের নেজ গজাবে?

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বশ্ব ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন মতিছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-জানালায় ধাক্কা দেয়—কোনো একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হল তাই। কোনো একটা রু পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারি নে।

এখন জ্ঞানগম্য হয়েছে টের। এখন বৃদ্ধ হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বৃদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি:

- (১) লোকটা কে?
- (২) এটা খুন তো?
- (৩) কে খুন করলে?
- (৪) কার বন্দুকের গুলি?

কক্ষাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তখন তখন বয়েও আঙুটি-টাঙুটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনো প্রকারের কেরদানী কিছুই পাওয়া গেল না। ব্রাঙ্কা।

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পূরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তথ্যটি বিলক্ষণ জানে যে, পদূলিসের খামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্রাঙ্কা।

ইতিমধ্যে রিপোর্ট পৌঁছল, খুল্লির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুল্লির ফুটোটার জন্য দায়ী।

আমি বাকি হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার! এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোমার কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সওভালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ‘নাঃ, টুনি মেমের পারের নখের কণাও এরা হতে পারে না।’

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমাদের প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, ‘বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, সে তো তুই বুদ্ধিস, আমিও বুদ্ধি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঁঃ, আদালত তো আদালত! অডিটের বেলা জানো না কি হয়? পেনশন নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, “কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? না হলে যে মার্চ মাসের পেনশনটা পাবেন না।”’

আমি বললুম, ‘সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, “ইটি শংকরা-চাষের খুলি।” ভিজিটর অবাক হয়ে শুধালে, “তার খুলি এত ছোট ছিল?” মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “এটা তার শিশু বয়সের খুলি। দুটো কিংবা ছ’টা খুলি যখন হতে পারে, তখন দুটো কিংবা ছ’টা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক; তারপর কি হল বল।’

‘তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও’হারা সাহেব এই বাঙালোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুতে গেছে?’

ও’হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

খানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র বেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সাহেব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি! আরুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর থেকে ও’হারা পাঠিয়েছিল ছ’টি রেজিস্ট্রি পারশেল ছ’জন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।

এঁদের দুজন থাকতো আরুগড়ে, বাকিরা কাছে-পিঠের চা-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মর-মর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-স্বাস্থ্য রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছ’টা কেন, একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর। ও’হারা আলিপরে।’

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, ‘এমের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনো মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুদ্ধ শব্দ একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, হ্যাঁ, কি যেন

বলছিলাম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নতুন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ছিল। আমি জানতুম কারো দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে ?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুয্যে একবার জনর্গলিঙ্গম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনো জ্ঞান যে-কোনো খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনো না কোনো দিন জনর্গলিঙ্গমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাস্টমিশ ঘাটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একথানা খাতাতেলেখা থাকে কেববে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'ক'পূর' হয়ে যায়, কে বা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কংকালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কবলে, এ ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার !

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জের অনুসন্ধান চালানো। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশ কথা পাশ কথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শূদ্রধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল ?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরো কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস :—

“রামভজনের বউ টুনি মেম—”

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললাম, ‘বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে ?’

খান বললে, ‘সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সাহেবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় ‘টুনি মেম।’

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে ; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারো বাড়ি আরেকটা কারণ ছিল। সামান্যসামান্য না হোক আড়ালে-আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্করি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে রাম-ভজনকে বাধ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম আর তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও'হারার বাঙলোয় গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শূধালদুম 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্রাঙ্কা। মাস তিনেক পর যখন রাম-ভজনের পরিচিত নতুন মজ্জররা আরুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পৌঁছয়নি। আরুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে সম্রাস নিয়েছে, কেউ বললে দার্জিলিং না কোথায় যেন চা-বাগানে কাজ নিয়েছে।''

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু "রক্ষিতা" বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনাই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রাণীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনুনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।'

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাঙলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনো কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুচাঁ'খানার ভিতর ভিতর পুতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারের খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারীরূপে চায়ের দোকানে যে সব চেয়ে বেশী ওকীবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে-বললে কসম খেয়ে কোন কিছুর তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোন্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায়?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দূরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সাহেবের বাবুচাঁ'র সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবার সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পিঁচিল খাড়া হল। বহু অনু-সন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সাহেবদের এই যে বাবুচাঁ' ক্লাসের লোক এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং-পাউডিং রোস্টো-মোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রান্ধে, শূয়ার গোরুর ঘ্যাট এরা বেশব-

বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন বঙ্গ সন্তানের সার্থী ! অতএব এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুচাঁ' নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে ।

তাকে পূর্বেই বলেছি, আরুণ্ডের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে । আমি প্রতি উইক-এন্ডে আজ এটা কাল সেটায় তদন্ত করতে লাগলুম । পরনে খানসামা বাবুচাঁ'র পোশাক । সবাইকে শূদ্রোই, বাবুচাঁ'র চাকরি কোথাও খালি আছে কিনা । আরো শূদ্রোই, আমার এক ভাই নাম ভাড়িয়ে এক কুলী রমনীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বহু কাম্বাকাটি করছে—তার খবর কেউ জানে কি না ?

বাগানের পর বাগান রাঙকা ছ করেই ঘাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে ।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মূর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল ।

এক চা-বাগিচার কম্পাউন্ডার শূদ্র যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'ও ! টুনি মেম ! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সূত্রেই না আছেন !'

আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে । সেখানে গিয়ে শূনি, বাবুচাঁ' পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য ।

পাড়ি পাড়ি এই পাড়ি, গ্লিভস মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর । ঝাঁপের তৈরী দরজাখানা পাশের মাটিতে পচছে ।

ভিতরের দৃশ্য আরো মারাত্মক । স'য়াতসে'তে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত । হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত । আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ই'দুর আছে । এক কোণে একটা ভাঙা উনুন । কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না । তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে । দু'একটা ভাত শূদ্রকয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে । তারই পাশে মলমূত্র । নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে ।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাষিভসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধাঁকছে । ছেলেটিকে কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি । কেউনা বললেও আমি চট করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান । শূনোঁছ স্বর্গের দেবশিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো ।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একবারের ভয়ে চোখও খুলল

না। সে শান্তিটুকুও তার গেছে।’

অপেক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, ‘বহু বৎসর পদূলিসে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষণ হৃদয়। তখন সব পদূলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।’

সে আরো নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরে আর কক্ করে গোঙরানো বৃথ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরো বীভৎস।

চ্যাটাইয়েল উপরে শূয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতছিন্ন, বুক ঢেকে একথানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বৃকের উপর রেখে চোখ বৃথ করে—কি জানি জীবন-মরণ অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পদূলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কঠরোধ করে পদূলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পদূলিস। ও’হারার বিরুদ্ধে সাক্ষাৎপ্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম “কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে?”

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরেও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমরা সিলেটিরা যদি কুলী-রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানিক-নটীর বেলেক্সাপনা, কুলী রমণীকে শ্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরেও বিবাহিত শ্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।’

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, “কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই? আচ্ছা আমার খবর নিস নে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কে’দে কে’দে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না! এদিকে আবার বউ-বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে!”

আমার চেঁচামেচি শূনে কুঁড়েঘরের সামনে একপাল কুলী মেয়েমন্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে বললুম তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুংরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে? এতখুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরো দু’টাকা হাঁড়িকুড়ি চাল-ডালের জন্য।’

সবাই চেঁচিয়ে বললে, “মুন্সি, মুন্সি!”

মুন্সি এগিয়ে এল। পদ্রনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরীব বিধবা একমাত্র মুন্সিই যতখানি পারে টুনি মেমের দেখ-ভালু করেছে। সেও নিঃসম্বল, কীই বা করতে পেরেছে! কিন্তু জানিস মিতু, দুর্ভাগ্যে দুটি দরবের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস, সেই মুন্সি আমাকে মৃদু কণ্ঠে কি বললে? বললে, ‘আমাকে মাইনে দিতে হবে না সাহেব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দুমুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।’

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্সিকে বললুম, “এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মৃড়ি-মৃড়কি যা পাও নিয়ে এসো।”

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটিমাত্র জিনিস চা-বাগানে স্বী। বিস্তর কুলী বিন্ দুধ-চিনি সন্ধ্যায় চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বৃদ্ধকে হিম্মত বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বললুম, “আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। বেচবে?”

চারপাই বলতে-না-বলতে এসে গেল। ভিজ়ে ভিত থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মূখের ভাব বদলালো না।

তাকে বলোছি—হার্ড-বয়েল্ড পুন্সিসম্যান আমি তখনো হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্ট-বয়েল্ডও না, তাই এই পুন্সিসের ভন্ডামি করতে আমার বাধো বাধো—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘এইবারে ভুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভন্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে “গফট” ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালাবের ওপরে “রাজার ইস্কুলে” ট্রেনস-ফার নিলি?’

খান যেন আদৌ শুনতে পারনি। বললে, ‘আসন্নপ্রসব রমণী পদ্রুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তাকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সন্দ্বরণী মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি।’

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে স্থান করে দিয়েছে সত্যি কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে! একে দু-দিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাপেক্ষে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো অখুদিনি যখন মৃড়ি এল আর ছেলোট এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো, তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ান কালো পাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে সন্দ্বরণ

সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনো সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুকলুম, মরা কালো পাথর জ্যাস্ট টুনির রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে!

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমিই মজৌছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গোরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণ-লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুকতে পারলুম। তা সে যাক গে, তোকে আর কি বোঝাব? দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতিমধ্যে মূর্তি খিচুড়ি চাড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মসলমান। তাকে সার্টিফিকেট দেখাবার ছল করে আমার পদলিসের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুচাঁর সঙ্গে, পাছে কোনো সম্বন্ধের উদ্বেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মূর্তি তাকে আরো চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, “ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সাহেব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কী করে! তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দু'টি খেতে।”

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মূর্তি বললে, “আট আনা পয়সা দিয়ে মূর্তির দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।”

আমি বললুম, “খুব ভালো করেছে।”

মূর্তি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শূয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শূয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনো প্রকারের ভূমিকা না নিয়ে বললে, ‘আপনি সব কিছু জানতে চান—না?’

আমি হকচাকয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, “কি করে এ অবস্থায় পেঁছিলুম!”

খান বললে, ‘উত্তেজনা ওৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। “না,না,না, তোমার এখন শরীর দুর্বল, তুমি—” ঐ ধরনের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।’

টুনি বললে, “আমি আপনাদের ভাষায় কুলী। আপনারা আমাদের মানুস বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়ে-ছিলুম।”

খান বললে, ‘বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাঁক।’

আমি বললুম, ‘আম্মো!’

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।'

বললে, "অনেক অপমান নির্বাতন হয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমার সহিতে হয়নি—মুখ বুজে। নতুন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বৃষ্টি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মন্সির নাক অল্প অল্প ডাকছে। টিমোটো বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, "ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ দেশের হাতী-গন্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ও বাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মদ্রুবদী, আপনাকে সব কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার গ্রাণ-কর্তা, আমার বংশধররূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বৃকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

"আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমার দেবেন তার জন্য আমি ঠৈরি।

"কিন্তু ভাবো দিকিনি ভাই সাহেব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চূষক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায়, সেটা আমি আরো ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

"তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরেজী পড়াতে শুরুর করলে, বললে, 'তোমাকে আমি আমার মনের মতো করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মন্ডবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলাম বলে এ জন্মে তারই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফটার অল, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই ভাবেই।

1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044

আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজ্জুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছি নে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নতুন ভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।”

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপন মনে যেন কথা বলছে। আবার কখনো বা সংঘাতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

“সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুশের মতো। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি যে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?”

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—”

খান বললে, ‘আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এইবারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেতখামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও’হারা ডবল ক্রসিং করছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানি নে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম, টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সাস্কনা দিলুম এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাখুদা (বিধিবস্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেতে কন্ডেঘরে এসে পৌঁছেছে যে এখন সে নির্ভর—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশ দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দাব্বালা পাতলা মেয়ে, পদলিসের এক ফুঁয়ে সে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এত স্ফটোও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ়্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, “কিন্তু সাহেব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলাছি, সাহেব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামি কত বিকট রূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।”

তারই স্বরণে টুনি মেম যেন আজকে উঠলো। বললো, “বেশ ভালমানুষের

মতো দ্বিবি্য দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটালো ক্যাটালগ দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজ কর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুব্যবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, ‘দুটি মুখে দাও,’ তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, ‘নেশা কেটে যাবে,’ নয় বলতো ‘মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না।’ ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাতভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহুদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

“আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায় থাকলে সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার ঐ মদের বান কর্মটির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সহিবে কেন?”

খান দম নিয়ে বলল, ‘দেখ্ মিতু, এর পর বহুকাল চা অঙ্কে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে,—এসব ওদের ডালভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।’

আমি বললুম, ‘সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপদর আর বেশী দূর নয়।’

খান বললে, ‘টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন। টুনি বললে, “আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসিখুশির মান্দুষ সায়েব। হঠাৎ কোনো আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বন্ধতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আমার নিজের কোনো ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকরবাকরকে নিয়ে হত মর্শাকল। আমার স্বামীকে—”’

খান থামলো। আমি ভেড়ে বললুম, ‘ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল না কি?’

খান বললে, ‘ভাই এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২

যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরাল। আমি নাচার। আবার মনকে সাধনা দিলুম, এই নিয়ে দ্দ'বার হল; তিনবারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, “ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।” তারপর আমাকে শৃংখলে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না, ভাইয়ের সম্মানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, “তাহলে, জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

“সায়ের ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বন্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শৃংখল চেঁচাচ্ছে, ‘আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি।’ আমি চেষ্টা করেছিলাম সায়েরকে ঠান্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

“ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনো দ্বন্দ্ব করিনি। আমার সায়েরকে পেয়েই আমি খুশি ছিলাম, আমি সুখী ছিলাম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়ের ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এর পূর্বে সায়ের আমাকে কখনো একা ফেলে যায়নি। একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাতে কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাতিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

“পর দিন সায়ের সম্মুখের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলাম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে হাত হাতে শূন্য তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নিচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমার দিকে। সায়ের এভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি?

“ভাই সাহেব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

“ঠিক তার চারদিন পর পদলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

“কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েরের রক্ষিতা, আমার তো কোনো হুকুম নেই। পদলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলভল্লার এসে বসে রইলাম। সেখানে সায়ের আমার জন্য একটা সিমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

“যে চাকর নফর সোঁদীন সকাল বেলা পর্ষন্ত আমার পা চেটেছে, তারাই এখন আমাকে লাথিবাঁটা মারলো। চাকরি গেছে যাক কিন্তু ঐ ‘কুলী মেম’টাকে যতখানি পারি অভ্যচার-অপমান করে তার দ্বন্দ্ব তুলে নিয়ে বাই।

“আমি একটি কথাও বলিনি।

“মোকদ্দমাতে সব কথা বেরুল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মদ্রুবনী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা-বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেংকারির ব্যাপার।

“আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা-বাগিচার সায়েবদের ঘোষা করতো। কতবার তাকে বলতে শুনছি যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডান্ডা মেরে বেড়ায়, তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনো সদ্ব্যোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজদুর, আর ঐ সায়েবরা আপন দেশে সব সদ্ব্যোগ পেয়েও নিভাস্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজদুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকুও এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

“তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলছে, ‘আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই। আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।’ এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আরুগড়ের পাদ্রী সাহেব আমাদের বিয়ের মশ্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।”

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, ‘তিনবারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শ্রদ্ধালু, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনো খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেন ওটা অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন। আজও বদ্বতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কি না। টুনি শ্রদ্ধা বললে, সায়েব নাকি তাকে বলিছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে তবে সেটা নাকি খুব পরিস্কার নয়। চুলোয় যাক্ গে সে-সব কথা, আমার হচ্ছে শ্রদ্ধা জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ওঁহারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দি়েছিল, এবারে সেটুকুও না।’

আমি বললুম, ‘ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।’

খান বললে, ‘টুনি জল খেয়ে নিয়ে থেই তুলে বললে, “সায়েরকে ক্লাব বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলিছিল—তারপর মোকদ্দমায় বেরুল, সায়েব পণ্ডাশ-ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআপিসে গিয়ে যেহঁজন সায়েব তার

গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ-মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসাবে পাঠায়। আচ্ছা, বল তো ভাইয়া, আমি যে বলেছিলাম সাহেবের মাথার ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সাহেবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি তার মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুঁলি এসেছিল তার খেই ধরে পদলিস দু'দিনের ভিতর ধরে ফেলল যে সেই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।”

খান মস্তব্য করে বললে, ‘টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে, “মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দ্বিকনি ঐ সব পরিবারের ছোট ছোট কাছাকাছাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘৃণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বৃত্তির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দা দিতুম।

“আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।

“শুধু শহরময় ছাড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার ‘স্ট্রী’র ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানি নে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

“সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

“আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দেশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করলেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—”

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, “কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?”

খান বললে, ‘এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নামের রান্না কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছেছিল তার বর্ণনা করেনি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।’

আমি বললাম, ‘আমি স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাই নে। তারপর কি হল তুই বলে যা।’

খান বললে, ‘টুনি সে রাতে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাকে রিসিভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পদলিসের ঘরনিষ্ম পরে। আমি অবাধ হয়ে বললুম, “স্যার, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পদলিসকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।”

খেলদুম উৎকট ধমক। বললেন, “রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষাল-বান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির ‘কির্মি’ বের করেছে একশ’ সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।” আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলদুম গম্ভা তিনেক ধাতানি। কীই না করি আমি? তিনি দৃঢ়ে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে “বেইমান” বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন, বলে। আমি চূপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বৃটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়েঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল দৃঢ়ে পদলিসের ষত রকম কায়দা-কেতা ফান্দ-ফাঁকির সান্ধ-সড়ক তার নির্মম প্রয়োগ। দূনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পদলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পদলিস দেখে টুনি মেম মূখ বন্ধ করেছিল সে মূখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ’টি ঘণ্টা পদলিস সাহেব তাঁর শেষ চেষ্টা দিয়ে যেমে নেয়ে বেরলেন সেই কুঁড়েঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বললেন।

আমার লজ্জাটুকু পর্যন্ত পদলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি তার সম্ভান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পদলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সেকথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার ভরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘণা তাজিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শব্দ মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।

খান বললে, ‘তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।’

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাধ হয়ে বললুম, ‘সে কি?’

‘হুঁ।’

আমি শূধালুম, ‘তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্যো হল না?’

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে থাক্ গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনো টুনি মেমের শেষ চার্টিনের কথা ভাবি। সে চার্টিনতে কি ছিল ?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম, টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল—তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দুতরুপে, তাঁরই ফিরিশতারুপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দর্শনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাস্তিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার "স্বামীকে" ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনো কথা হয়নি। গাড়ি বোলপদুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোসাঁই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালাম, 'ওদের কি হল ?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

এক পুরুষ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক।

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের যুদ্ধে যাকে ইংরাজিতে বলে 'মিপিং অপ', যেন স্পঞ্জ দিয়ে মেঝের এখান ওখান থেকে জল শুষে নেওয়া—তাই চলেছে। আজ এখানে ধরা পড়ল জন দশেক সেপাই, কাল ওখানে জন বিশেক। কাছাকাছি কামান থাকলে পত্ন-পাঠ বিদ্রোহীগুলোকে তাদের মৃত্যুর সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিম্বা ফাঁসি। গাছে গাছে লাশ ঝুলছে, যেন বাবুই পাখীর বাসা।

পাঁচ শ' দু-আসুপা (দ্বি-অসুপা) অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মনসবদার গুলে বাহাদুর খান বর্ধমানের কাছে এসে মনস্কির করলেন, এখন আর সোজা শাহী সরকারী রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়। তিনি অবশ্য আপদ কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেননি। তিনি ততক্ষণে বুদ্ধে গিয়েছেন গবর (মিউটিনি) শেষ হয়ে গিয়েছে—তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তিনি কেন, তাঁর সেপাইরা আশা ছেড়ে দিয়েছিল, তিনি নিজে নিরাশ হওয়ার বহু পূর্বেই। সলাহ-পরামর্শ করার জন্য তিন রাতি পূর্বে যে জলসা বসেছিল তাতে তারা অনুর্তি চায়, অশ্রুশ্রুত ত্যাগ করে গরীব-গুরুবো,

ফকীর-ফুকরো সেজে যুদ্ধভঙ্গ হয়ে যে যার আপন শহরের দিকে রওজনা হবে । এলাহাবাদ, কনৌজ, ফররুখাবাদ, লক্‌নো, মলীহাবাদ, মীরট—যার যেখানে যর ।

গুল বাহাদুর খান বলেছিলেন, সেটা আত্মহত্যার শামিল । পথে ধরা পড়বে, আর না পড়লেও বাড়িতে পেঁছানোর পর নিশ্চয়ই । তাঁর মনের কোণে, হয়তো তাঁর অজ্ঞানতে, অবশ্য গোপন আশা ছিল বেঁচে থাকবার । সুস্থ মাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নয়,—তাঁর বয়স বেশী হয়নি, হয়তো আবার নতুন গধর করার সুযোগ তিনি এ জীবনে পাবেন । কিন্তু যখন দেখলেন, সেপাইদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে—আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে ‘মরাল’ টুটে গিয়েছে—তখন তিনি তাদের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানানলেন । শেষ রাত্রি আধোঘুমের অন্তর্ভব করলেন, সেপাইরা একে একে পায়ে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে—তিনি আগের দিন মগরিবের নামাজের পর অনুরোধ করেছিলেন, বিদায় নেওয়া-নেওয়ার থেকে তাঁকে যেন রেহাই দেওয়া হয় ।

শুনলেন, সেপাইরা চাপা গলায় একে অন্যকে শূদ্রোচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হল, বাড়ি পেঁছানোর আশা কতখানি, সেখানে পেঁছেই বা কিম্মতে আছে কি, এ রকম সর তাজ্ (মাথার মুকুট) সর্দার পাবো কোথায় ?

গুল বাহাদুর খানের কিন্তু কোনো চিন্তাবৈকল্য হয়নি । তাঁর কাছে এরা সব নিমিস্ত মাত্র । তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর প্রাণের একমাত্র গভীর ক্ষুধা—জাহাঙ্গীর শয়তান ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে শাহানশাহ বাদশা সরকার-ই-আলা বাহাদুর শাহের প্রাচীন মূলবংশগত শানশৌক্য, তখৎদোলৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা । আজ যদি এই সেপাইদের দিল্-দেউলে হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে । এরা তো আর কিছু কাপুরুষ নয় । কিন্তু এরা কাকের মত একবারই বাচ্চা দিতে জানে । একবার তারা চেষ্টা দিয়েছিল । সফল হতে পারেনি । দ্বিবার চেষ্টা দেওয়া তো এদের কর্ম নয় । তাই নিয়ে আফসোস করে কি ফায়দা ! খুদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লার যদি মেহেরবানী হয় তবে আবার নয়া সেপাই জুটবে, নয়া দামামা পিটিয়ে জেগে উঠবে—তার আশা তিনিই করতে পারেন, এরা করবে কি করে ?

গধর আরম্ভ হয়েছিল এলোপাতাড়ি কিন্তু পরে দিল্লীতে লালকেল্লার তসবী খানাতে যে মন্ত্রণাসভা বসেছিল সেখানে স্থির হয়, গুল বাহাদুরকে পাঠানো হবে বাঙলা দেশে । সেখানকার বাঙ্গালীরা এককালে ছিল বাদশাহের সেপাই । ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করতো না বলে ইংরেজ ফোজে তাদের স্থান হয়নি । শূদ্র তাই নয়, ইংরেজ তাদের অন্য কোনো রকম কাজ তো দিলই না, উল্টে হুকুম করলে তারা যদি আপন জমি নিজের চাষ না করে তবে সে জমি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করবে । বাঙ্গালীদের আত্মসম্মানে লাগে জোর ঘা । যে তলোয়ার দিয়ে সে দশমনের কলিজা দুটুকরো করে দেয়, তাই দিয়ে সে খুঁড়বে মাটি ! তার চেয়ে সে তলোয়ার আপন গলায় বসিয়ে দিলেই হয়, কিম্বা মোকা পেলে

দশমনের গলায়—

গুল বাহাদুরকে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়, এই বান্দী ডোমঘের জমায়েৎ করে এক বাণ্ডার নিচে খাড়া করবার জন্য ।

আফসোস্, আফসোস্ ! হাজার আফসোস্ ! একটু, আর একটু আগে আরম্ভ করলেই তো—গুল মহম্মদ নিজের মনেই বললেন, ‘থাক্ সে আফসোস্ । এখন বর্তমানের চিন্তা করা থাক্ ।’

বান্দীদের সাহায্যেই তিনি যোগাড় করলেন ধূতি নামাবলী । তিনি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব । বাঙলা জানেন না, জানেন হিন্দী । আসলে সেটাও ঠিক জানেন না । তিনি ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে বলেছেন দিল্লীর উর্দু, মকসুবে শিখেছেন ফার্সী, আর বলতে পারেন দিল্লীর আশপাশের হিন্দীর অপভ্রংশ হরিয়ানা । কিন্তু তাই নিয়ে অত্যধিক শিরঃপীড়ায় কাতর হবার কোনো প্রয়োজন নেই । এই রাত দেশে কে ফারাক করতে যাবে, দিল্লীর হরিয়ানা থেকে বৃন্দাবনের ব্রজভাষা ।

দাড়িগোঁফ কামাতে গিয়ে একটুখানি খটকা বেধেছিল, এক লহমার তরে । তারপর মনে মনে কান্নার হাসি হেসে বলেছিলেন, ‘তা কামাবো বইকি, নিশ্চয়ই কামাবো । লড়াই হেরেছি, তলওয়ার ফেলে দিয়েছি, পালাচ্ছি মেয়েছেলের মত—এখন তো আমাকে মেয়েমানুষ সাজেই মানায় ভালো ।’

শেষটায় হঠাৎ অটকঠে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, ‘ইয়াল্লা, আমি কি গদুনা করে ছিলাম যে এ সাজা দিলে ?’

কুশবিশ্ব যীশুখৃষ্টও মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন, ‘হে প্রভু, তুমি আমাকে বর্জন করলে কেন ?’

বান্দীরা তাঁর হাহাকার স্বর দিয়ে অনুভব করেছিল । তেঁতুলতলার শৃঙ্খলে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সাস্তুনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল ।

দুপুর রাতে চাঁদের আলো মূখে পড়াতে ঘুম ভাঙলো । দেখলেন, ঘুমিয়েও ঘুমোনি । ঘুমন্ত মগজও তাঁর জাগ্রত অবস্থার শেষ হাহাকারের খেই ধরে মাথা চাপড়েছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সাস্তুনাও খুঁজে পেয়েছে । কি সাস্তুনা ? গুল বাহাদুর, এ কি তোমার ফাটাকিস্মৎ, না তোমার বাপ-ঠাকুরদার ভাঙা কপাল ? মনে নেই, বেওয়ান-ই খাসের যেখানে লেখা,

“অগর ফিরদৌস বররয়ে জমীন অস্ত
ওয়া হমীন অস্ত, হমীন অস্ত, হমীন অস্ত”
“ভূস্বর্গ যেখানে খুশী বেলো, মোর মন জানে
এখানে, এখানে দেখো তারে, এই তো এখানে ।”

তারই সামনে নাদির কর্তৃক হতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, পদদলিত বাদশা মদুহম্মদ শাহ কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠেছিলেন,

‘শামাতে আমাল ই-মা সুরতে নাদির গিরিফৎ ।’
‘কপাল ভেঙেছে, আমারই কর্মফল
নাদির মূর্তিতে দেখা দিল ।’

তখন কি তোমার পিতামহ তাঁর নদন-নিমকের মালিক শাহিনশার সে দুর্ভেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেননি ? বাদশার খাস আমীর সর-বুলন্দখান, হাজার দ-আস-পা মনসবের মালিক তোমার পিতামহ তখন কি করতে পেরেছিলেন ? আলবস্তা, হাঁ, হাবেলীতে ফিরে এলে তাঁর জননী তাকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘দাঁড়িগোফ কামিয়ে ফেল, আর তলওয়ারখানা শাহিনশাহকে ফেরত দিয়ে এসো।’

তারপর দীন-দুনিয়ার মালিক আকবর-ই-সানী (দ্বিতীয় আকবর) যখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাতের বাদশার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁর তনখাহ-বাড়িয়ে দেবার জন্য—মেথর যে-রকম জমাদারের কাছে তনখা বাড়াবার জন্য আজ্ঞা পেশ করে—তখন সে বেইশজতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তোমার বাপ। শোলোনি যে বাঙালীন্ বাব্দ’ সে দরখাস্ত নিয়ে বিলায়েত গিয়েছিলেন তিনি পর্যন্ত নাকি তার জবান, ঢং আর শৈলী দেখে শরম বোধ করেছিলেন।

তাই বলি তুমি এত বুক চাপড়াছো কেন ?

তাঁদের তুলনায় তোমার মনসবই (পদমর্যাদা) বা কি, বাদশাহ তোমাকে চেনেনই বা কতটুকু ? নানাসায়েব, লছমীবাদি এঁরা সব গায়েব হয়েছেন, আর তুমি তাঁতী এখন ফাসী পড়বে ! হয়েছে, হয়েছে, বেহদ হয়েছে। গিদড়ের গর্দানে লোম গজালেই সে শের-বাবর হয় না।

আল্লা জানেন, এসব তত্ত্বকথা চিন্তা করে গুল বাহাদুর খান কতখানি সান্ত্বনা পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে অনুমান করা যেত না, তিনি তাঁর কপালের গর্দিশ কতখানি বরদাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে মোড় নিয়ে, ফের বাঁ দিকে পুরো পাক খেয়ে তিনি পেরলেন অজয় নদ। উঁচু পাড়ি বেয়ে উঠেই দেখলেন, সমুখে দিকদিগন্ত প্রসারিত খরদাহে দম্ব সবিতার অমিষ্টিতে অভিশপ্ত চিতা-নল—ভস্মীভূত প্রাস্তর।

অবাঙালী তো কথাই নাই, এ দেশের আপন সন্তানও এই তেপান্তরী মাঠের সামনে ইন্স্টেবতাকে স্মরণ করে। এর নাম ‘বাঙলা’ রেখেছে কোন্ কাক্ষরসিক !

কিন্তু গুল বাহাদুর শিউরে ওঠেননি ; তাঁর জীবনে কেটেছে দ্বিল্লী আগার চারদিকের খাকছার দেশ দেখে দেখে। সেরেফ উনিশ-বিশের ফ্যারাক।

তাবৎ তেপান্তরের ওপারেও লোকালয় থাকে। সাহারার মত মরুভূমি পেরিয়েও বেদুয়িন যখন ওপারে ডেরা পাকতে পারে তখন এই তেপান্তরের পরেও নিশ্চয়ই বসতি আছে। কিন্তু সেখানে থাকে কী সবহারা লক্ষ্মী-ছাড়ারাই। যাদের প্রাণ ছাড়া আর কিছ্ছ দেবার নেই শব্দ তারা ই তো পারে এ রকম ডাক-ডাকিনীর মাঠে পা ফেলতে !

ভালোই। ভালোই হল। এই তেপান্তরই তাঁর ও ইংরেজের মাঝখানে

দাড়িয়ে রইবে অচল অভেদ্য দর্গবৎ । সেই হতভাগাদের সঙ্গেও তাঁর বনবে ভালো, hail fellow well-met, 'এক বাথানের গরু' ।

গুল বাহাদুর বললেন, 'শুকুর, অলহমদুলিল্লা' ।

মাঠে ফেললেন পা ।

॥ দুই ॥

সংসারের অধিকাংশ লোক না গোলাম না বাদশাহ । বাদবাকীর কেউ সর্দার কেউ চেলা । ওদের কেউ কেউ জন্মায় হুকুম দেবার জন্য, আর কেউ কেউ সে হুকুম তামিল করার জন্য । ভাগ্যচক্রে অবশ্য কখনো হুকুম-দেনেওলাও জন্মায় হুকুম-লেনেওলা হয়ে । তখনো কিন্তু তার গোর বদ্বতে অসুবিধা হয় না । সে তখন বাদশা হয়ে জন্মালে উজীরের হুকুমমত ওঠ-বস করে, উজীর হলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে কোটালের দিকে—তার আদেশ কি । আবার উল্টোটাও হয় ঠিক ঐ রকমই । সে পাইক হয়ে জন্ম নিয়েও ফৌজদারকে হামেহাল বাংলা দেয় তার কর্তব্য কোন পথে ।

দুই জমিদারের জেল হলে সে তিন দিনের মধ্যেই চোর-ডাকাত নিয়ে কয়েদীখানায় দল খাড়া করে, সপ্তাহের মধ্যেই জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তার কথায় হাঁচে, তার হুকুমে কাশে । মোকা পাওয়া মাত্রই উপরওলাকে জানায়, 'অমুক কয়েদীর কন্ডাকট ভেরি ভেরি গুড ; অ্যামেন্টিস্টর সময় একে অনারাসে খালাস দেওয়া যেতে পারে ।' জমিদার বেরিয়ে গেলেই সে তখন খালাসী পায় ।

গুল বাহাদুরের জন্ম হয়েছিল হুকুম দেবার জন্য । নামাবলী গায়ে দিয়েই আসদুন আর রাইডিং বট পরেই আসদুন, ডোমের দল তাকে টট করে চিনে ফেলল । পিঠে খাবড়া খেয়েই ঘোড়া চিনতে পারে ভালো সোওয়ার কে ?

তেপান্তরের মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে, গ্রাম যেখানে শুর, সেখানে এক পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন গুল বাহাদুর । চালের ভিতর দিয়ে আসমান দেখা যায় । রাতে আকাশের তারা তাঁর দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়, দিনে কাঠ-বেরালী । ঘরের কোণের গর্ত থেকে একটা সাপ মাথা তুলে তার দিকে জুল জুল করে তাকিয়েছিল । গুল বাহাদুর বলেছিলেন, 'ভশরীফ নিকালিয়ে', 'আত্মপ্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক ।' গদরের সময় তিনি নিমকহারামী দেখেছেন প্রচুর । সাপতো তাঁর নূননিমক খায়নি যে তাঁকে কামড়াতে বাবে ।

ডোমরা তাঁর ঘর মেরামত না করে দিলে গুল বাহাদুর কদাচ এই গর্ত বন্ধ করতেন না ।

চিকনকাল গ্রামে আসার পরদিন গুল বাহাদুর গিয়েছিলেন গ্রামের ভিতর একটা রৌদ মারতে—দিল্লীর চাঁদনীচৌকে যাওয়ার মত । এক জায়গায় দেখেন ভিড় । তিনি ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ডোমরা তড়িৎপাতি পথ করে দিলে । একটা ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা মচকিয়েছে । তার মা হাঁউমাউ করে

আসমান ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে জমিনের উপর ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বরিশাল গান্ ফাটিয়ে বললেন, ‘চোপ !’

মা’র কথা ধরে থাক স্বে ডোমিহান সে হুংকারে কে কার ঘাড়ে পড়বে ঠিক নেই। এই যে খুদাতালার এত বড় দুনিয়া, তার আধেকখানাই তো ঐ তেপান্তরী মাঠ, সেখানেও যেন তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। হুংকার তারা বিস্তর শুনছে, নামাবলীও বিস্তর দেখেছে, কিন্তু নামাবলীর তলা থেকে এ রকম অটুরব ! নিরীহ গোপীযন্ত্র থেকে গদরের কামান ফাটে নাকি !

‘চোপ’ বলে গুল বাহাদুরের হাত গোপের দিকে উঠেছিল। তখন মনে পড়ল তিনি গোপ কামিয়ে ফেলেছেন।

গুল বাহাদুর ছেলেটার পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কে এক ওলন্দাজ না অন্য জাতের আর্টিস্ট বলেছেন, ‘যারা এঁচিং কিংবা অন্য কোনো প্রিন্টিঙের কাজ করে তাদের হাতের তেলো হবে রাজকুমারীর মত কোমল, পেশী হবে কামারের মত কটুর। প্লেট থেকে ফালতো রঙ তোলার সময় রাজকুমারীর মখমলী তেলো দিয়ে আলতো আলতো করে তুলবে রঙ, আর প্রিন্ট করার সময় দেবে কামারে পেশীর জোরে মোক্ষম দাবাওট্ !’

গুল বাহাদুর তাঁর মোলায়েম তেলো দিয়ে ছোঁড়াটার গোড়ালি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পা’টা পাকড়ে ধরে কামারের পেশী দিয়ে দিলেন হুঁচককা কানুনী। ছেলেটা অঁকে উঠে রব ছাড়লে, ‘কক্ !’

তিনি বললেন, ‘ঠীক্ হৈ, বেটা, আরাম হো জায়েগা। ফির বন্দর জৈসা কুদেগা।’

এতক্ষণ ছেলেটার পা’টা উরু থেকে কাঠের মত শক্ত হয়ে উপর-নিচ করছিল না ; এবারে গুল বাহাদুর সেটাকে কজনা-ওলা বাক্সের ডালার মত উপর-নিচ করলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তীন্ দন সোলাকে রাখবে।’

‘রাখবে’ শব্দটা বধমান অণ্ডে তাঁর বাঙলা শেখার প্রচেষ্টার ফল। ডোমরা বুঝলে। ‘সোলাকে’ও বুঝলে—‘শুইয়ে’, ‘তীন’ তো সোজা ‘তিন’ কিন্তু ‘দন্’-টা কি চীজ্ ?

গুল বাহাদুরকে গদরের সময় জাত-বেজাতের সেপাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হয়েছিল। তিনি তাই শিখে গিয়েছিলেন, বিদেশী কোনো শব্দ না বুঝতে পারলে তাকে শোনাতে হয় ঐ শব্দের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রতিশব্দ। যেমন ‘ইনসান’ বললে যদি না বোঝে তবে বলতে হবে ‘আদমী’, তারপর ‘মানস’ ‘লোগ’ ‘বেটা’ ‘বাজা’ ইত্যাদি। একটা না একটা বুঝে যাবে।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘তীন্ দন্, তীন্ শাম, তীন্ রোজ।’

এক ডোম চিৎকার করে বললে, ‘বুঝেছি গো, বুঝেছি। তিন দিন, তে রাস্তির।’

জীবনের দীর্ঘতর অংশ চিকনকালা গ্রামে কাটিয়ে গুল বাহাদুর বীরভূমী ডোমী ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হৃদয় স্বর

থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। তাঁর ‘দিন’ শোনাতে ‘দন’, ‘কিতাব’ ‘কতাব’, ‘হিন্দু’ ‘হিন্দ’, ‘বিলকুল’ ‘বলকল’—বান্ধীদের কানে।

অজ্ঞারথার দামন (চাপকানের নিল্লাগুল) ওঠাতে গিয়ে গোপে তা দিতে যাবার মত তাঁর খেয়াল হল, তিনি ধূতি উত্তরীয়ধারী !

সোদিন সম্মুখ্য তিনি আঙ্গিনায় পলাশতলায় চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। আসমানে দেখেছেন মীজান (দাড়িপাল্লা, মধ্যখানে তিনটে তারা কাঁটার মত, দু’দিকে ভার—আমাদের কালপদ্রুখ)। তখন খেয়াল গেল, অম্বিনী, ভরণী, কৃন্তিকা, রোহিণী, সবই আগের থেকে উদয় হয়েছেন। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মীজান, অকরব, কওস, সম্বুলা জমী, দলো, হুং—!

দিল্লীতেও তিনি ছাতের উপরই থাকতেন বেশীর ভাগ।

ঠাকুরদা শখ করে বানিয়েছিলেন যমুনার উপর একখানি চক-মেলানো বাড়ি। বাড়িখানি ছোট কিন্তু উচ্চতায় সে বাড়ি ও-পাড়ার সব বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের ভাষায় একেই বলে বাড়ি হাঁকানো। বৃথ বয়সেও ঠাকুরদার চোখের জ্যোতি স্ফীণ হয়ে যায় নি। নাটিকে কোলে বসিয়ে বলতেন, ঐ দেখো, ঐ দেখো, ঐ দূরে, যমুনার ওপারে শাহদারা, গাজীয়াবাদ, নাতি দেখতো ওপারে শূকনো মাঠ খাঁ খাঁ করছে, আর তার মাঝে মাঝে ঘোপ-ঝাড়। কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে আরম্ভ করে বাবুর, হুমায়ুন, রফীউদ্দৌলা মুহম্মদ শাহ সবাই গিয়েছেন ওপারে হরিণ শিকার করতে। বড়ো বাদশাহের হরিণ-শিকারের বয়স গেছে—তিনি এখন লাল কেল্লার ছাতের উপর থেকে ওড়ান ঘুড়ি। শাহজাহাদারা এখনো যান, তিনিও বহুবার গিয়েছেন।

বাহাদুর শাহ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। অবশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জওক ও গালিবের তুলনায় তাঁর রচনা নিম্নাঙ্গের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন একটা সরল সস্বদয়তার গুঞ্জন থাকতো যেটা কারো কান এড়িয়ে যেত না। এবং তাঁর মধ্যে ছিল এমন একটা সদগুণ যেটা জওক কিংবা গালিব কারোরই ছিল না। জওক গালিবের মধ্যে হামেশাই হ’ত লড়াই। তৎসত্ত্বেও একে অন্যের প্রশংসা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। শোনা যায় শ্রেষ্ঠতর কবি গালিব নাকি এক মুশায়েরাতে (কবি সম্মেলনে) জওকের কোন কবিতার দু’ছত্র শুনে তাঁকে সর্বসমক্ষে বার বার কুণ্ঠিত করতে করতে বলেছিলেন, ‘আপনার এ দু’টি ছত্র আমাকে বকশিশ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেবো।’ কিন্তু এঁদের কাব্যের চিকন কাজ বাহাদুর শাহ যতখানি অনুভব করতে পারতেন এঁরা একে অন্যের ততখানি পারতেন না। বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের—সে যুগের কেন তাবৎ উদ্‌যুগের—সবসে বড়িয়া সমজদার।

গদর আমলের ইংরেজরা তাঁর কাব্যপ্রেমকে নিয়ে কত যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-মশ্কারা করেছে তার অন্ত নেই। তাদের রাজদরবারেও পোইট লরিয়েট নামক একটি প্রাণী পোষা হয়। তাদের কুরান-পু্রানে আছে, গ্রেট ন্যাশনাল অকেশনে তিনি টপা-ফপাতী লিখতে পারেন, ঐ সব অকেশনে দজরী-ওস্তাদরা যে রকম

রাজা রাণীর পাভলুন-ব্লুসার্জ বানায়, কিংবা বলতে পারেন হটেন্‌টট্‌দের রাজদরবারে পালপরেবে যে রকম পোষা বাদির দৃষ্টির 'নাচভী লেচে ল্যার'।

আসলে তাদের রাজারা দেবসেনাপতি, অসুরমর্দন, রুদ্রাঙ্কজ কার্তিকের বংশ-অবতংস। তারা তীরতম চিৎকারে আকাশ বাতাস সসাগরা পৃথিবী (যে রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হন না) প্রকাশিত করে শিকার করেন খ্যাক্ষ্যালী। দি লর্ড বি থ্যান্‌ক্ট—তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

তাবৎ ইংরেজই অগা, ও-কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে। কারণ পরবর্তী যুগের এক ইংরেজই দৃষ্টি করে বলেছেন, 'যে সব গাড়লরা গদরের সময় ভারত-বর্ষ শাসন করতো তাদের সামনে শেলি কিংবা কীটস এলে যে সম্মান বা অসম্মান পেতেন কবি বাহাদুর শাহ সেই সব গবেটদের কাছে সেই মূল্যই পেয়েছেন। এবং সে সব সম্বন্ধীরা এই মামুলী খবরটুকুও জানতো না যে, তাদের দুই নম্বরের মাথার মণি ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজ লেখক জোর গলায় বলেছেন সে কবিতা বাহাদুর শাহের কাব্যের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ওঁচা।

গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, গদর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে নওরোজের রাতে যে মৃশায়েরা বসেছিল তাতে সভাপতির আসন নিয়োছিলেন বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহ। সেই শেষ মৃশায়েরা!

থাক্ থাক্ কি হবে ভেবে?

ভাববোই না কেন? আমার অতীতকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো না, আর ভবিষ্যৎকেও আমি আলিঙ্গন করতে ভয় পাবো না।

রাজত্ব বধুরে যেই করে আলিঙ্গন

তাক্ষুধার অসি'পরে সে দেয় চুম্বন।

কি ভয় তাতে? আমার রথ চলবে এগিয়ে, রথের পতাকা পিছন দিকে মৃথ ফিরিয়ে কাঁপবে অতীতের স্মরণে। তাই বলে কি আমার এগিয়ে চলা বন্ধ হবে? বরং বলবো নবজন্ম লাভ, অবশ্য আমি জাতিস্মর।

এই তো সেই আকাশ। এ-আকাশ আর দিল্লীর আকাশে তো কণামাত্র তফাৎ নেই। এ-আকাশ তো আমার। হেসে মনে পড়লো ফিরদৌসীর একটি দোঁহা। সম্প্রতির ভাগাভাগির সময় একজন অন্য বখরাদারকে বললে,

আজ্ ফর্শ'-ই-খানা তা ব্ লব্-ই বাম্ আজ্ আন্-ই-মন্

আজ্ বাম্-ই খানা তা ব্ সুব্-ইয়া আজ্ আন্-ই-তো।

মেঝের থেকে ছাতটুকু তাই নিলেম কুঞ্জে আমি

ছাতের থেকে আকাশ তোমার সেইটে তো ভাই দামী।

প্রথম যখন দোঁহাটি পড়েছিলেন তখন তার মনে হয়েছিল এ কি কান্ট-রসিকতা। আজ হৃদয়ঙ্গম হল, এ শ্লেষ নয়, বিদ্রূপ নয়—ছাত থেকে আকাশই মূল্যবান—সেখানেই মন্জি, সেখানেই নিবারণ।

এ তো আকাশের তারা। তাঁর পেয়ারা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু দিকটা ঠিক এই রকমই পেতলের শ্টাড দিয়ে তারার মত সাজান ছিল। এ তো

কিছু অজানা সম্পদ নয়। দার্শনিক গম্ভীরতাও তাঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (কিমিয়া সাব্ব) গ্রন্থে বলেছেন, 'আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো, আর আপন অন্তরের দিকে তাকাও—বৃকতে পারবে সৃষ্টির মহাভাষ্য।'

দুইই অলম্ব্য নিয়ম অনুসারে চলে। শব্দ হৃদয়ের আইন বোঝা কঠিন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ভাবি, স্বেচ্ছায় করছি—তারারাও হয়তো তাই ভাবে।

তরল অশ্বকার। এ অশ্বকার বৃকের উপর দৃঃস্বপ্নের মত চেপে বসে না। এর চেয়ে অনেক বেশী মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে পলাশের ডালগুলো। তারা আঁকা-বাঁকা শাখা দিয়ে অশ্বকারের গায়ে এঁকেছে বিচিত্র আলিঙ্গন। গাছের শক্ত ডাল, অশরীরী অশ্বকার, দূরদূরান্তের তারার দেয়ালি—সবাই একসঙ্গে মিলে গিয়ে পেলব মধুর স্পর্শ দিয়ে শান্তি এনে দিচ্ছে গুল বাহাদুরের দশ ভালে। এইটুকু তাঁর চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে সে সন্ধ্যার অনন্ত আকাশ থেকে পলাশের ডগাটুকু পর্ষন্ত। যমুনার পারে প্রাসাদের উপরে এরা তাঁকে যেমন করে সোহাগ জানাতো ঠিক তেমনি তারা এসে ধরা দিল ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শায়িত ফকীর গুল বাহাদুরের কাছে।

কৃতজ্ঞ গুল বাহাদুর তাঁর দীর্ঘ দুই হাত তাদের দীর্ঘতম প্রসারণে উচ্চ বিস্তার করে আসমানের দিকে তুলে মোনাজাত করলেন,

তোমার আমার মাঝখানে, বিভূ, নাই কোনো বাধা আর

তোমার আশিস বহিরা আনিল তরল অশ্বকার।

॥ তিন ॥

আরব্য রজনীর গল্পে আছে, কোথায় যেন দমস্কাস্ না বাগদাদ শহরে, এক ঝুড়ি আশ্‌ডা সামনে নিয়ে বসে অন-নশ্ শার স্বপ্ন দেখছিল। হুবহু স্বপ্ন না, দিবা-স্বপ্ন। ঐ ডিমগুলোই তার সাকুল্য সম্পত্তি। এক ডিম বিক্রি করে মুনাকা দিয়ে সে কিনবে আরো ডিম। তারই লাভে পুষবে মদগী। তারই লাভে সে যাবে হিন্দুস্থান, সদাগরী করতে। তারই লাভে সে হয়ে যাবে শেষটায় শহরের সবচেয়ে মাতস্বর আমীর। তখন প্রধানমন্ত্রী—ওজীর-ই-আলা—যেচে-সেধে তাঁর মেয়েকে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে। তারপর আরো অনেক কিছু হবে। হয়ে হয়ে একদিন এই এমনি খামোখা তার রাগ হয়েছে বেগম সায়েবার উপরে। তিনি অনেক সাধাসাধি করেছেন তার মান ভাঙবার জন্য। অন-নশ্ শার মানিনী প্রীতধার মত অচল অটল। বরঞ্চ হঠাৎ আরো বেশী স্কেপে গিয়ে মারলেন বেগম সায়েবাকে এক লাথ। হায়রে, হায়! এতক্ষণ ছিল শব্দমাত্র খেলার পোলাও খাওয়া,—দিবা-স্বপ্ন—এখন অন-নশ্ শার মেয়ে দিয়েছে সত্যিকার লাথি। সেটা পড়ল সামনে-রাখা ডিমের ঝুড়ির উপর। কুলে আশ্‌ডা ভেঙে ঠাণ্ডা।

এ-গল্প কখনো ব্রুক্ পরে ইংলন্ডে কখনো দাড়ি রেখে আফগানিস্থানে সর্বগ্রহী প্রচলিত আছে। এবং সর্বধূগের সর্বদেশের প্র্যাকটিকেল পাণ্ডারা

বেচারী অননন্দের শারকে নিজে কতই না ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। সেও লজ্জায় রা'টি কাড়ে না।

কিন্তু এ-কথাটা কেউ ভেবে দেখে না যে এ-সংসারে অহরহই প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ গা'ড়ী ছাড়িয়ে বারো বৃহত্তর ভুবনে চলে যেতে জানে তাঁদের সবাই অন-নন্দের শার—এ শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। যারা আপন নাকের ডগার বাইরে তাকাতে জানে না তারাই দৈনন্দিন দৈন্যে শেষদিন পর্যন্ত নাকানি-চুবানি খায়। দিবা-স্বপ্ন আলবৎ দেখতে হয়—কিন্তু শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। গুল বাহাদুর ঠেকে শিখেছেন। গদরের আ'ডা বিক্রী হওয়ার পূর্বেই তাঁরা স্বাধীনতার উজীরকুমারীকে লাথি মেরে বসিয়েছিলেন। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এখন আর ক'ড়ের বসে বালাখানা-রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন নয়, গদরের খেলালী পোলাও নয়। এখন দেখতে হবে নাকের ডগা ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরের স্বপ্ন মাত্র—সাংসারিক সচ্ছলতার স্বপ্ন।

তার প্রথম আ'ডা এল অস্বাচিত, অপ্ৰত্যাশিতভাবে।

ডোমেরা এসে সভয়ে তাঁকে নিবেদন জানালে, শিবু মোড়ল যায় যায়। মরার আগে বাবাজীর চরণ-ধূলি চায়।

গুল বাহাদুর পড়লেন বিপদে। ওপারে ষাওয়ার সময় মুসলমান যে সব তওবা-তিজ্জা করে থাকে—অনেক হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা জৈনদের পষদ'সনের মত—সেগুলো তিনি কোনো মতে সামলে নিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের তিনি জানেনই বা কতটুকু? তাঁর আমলে দিল্লীর হিন্দুরা তো শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিসভ্যতায় পুরো-পাক্ষা মুসলমান বনে গিয়েছে। তারা পরে চো'সে চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, মাথায় দুকল্লী কিস্তি টুপী আর মশাইরায় হা'টু গেড়ে বসে বয়েং আওড়ায়—‘মক্কা-মদীনার মালিক, ইয়া আল্লা, আমাকে ডেকে নাও নবীর নূর হজরত মুহম্মদের পদপ্রান্তে।’

বরদ্বাবন (ব'দ্বাবন)-কে কুন্জ গলিয়ামে (কুজ গলিতে) কিসন'জী (গ্রীক্স) ক'ভ ক'ভ বান'সরী (বা'শরী) বজাওং (বাজান), এই তো হিন্দুধর্ম বাবদে তাঁর এলেম! ঐটুকু জ্ঞানের ন্যাজ তিনি শিবু মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বৈতরণীতে নামতে ভরসা দেবেন কি প্রকারে?

ধরা পড়ার ভয় আছে, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, ‘চুলোয় যাক্ গে। এ রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবো আর কতদিন!’ মৃত্যু যে অহরহ মান'ষের চুলের ঝু'টি পাকড়ে ধরে আছে সেটা স্মরণ করে কটা লোক? কিংবা বলা যায়, গুল বাহাদুর ভাবলেন, গায়ে গু মেখে বসে থাকলেই কি আর ধম ছেড়ে দেবে?

শিবু মোড়লের ইচ্ছিতে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—মায় তার ছ'বচ্ছরের ছেলেটাও। অবাক ইশারায় গুল বাহাদুরকে শুকপোশের একদম কাছে ডেকে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ‘আমার ছেলেটাকে তুমি মান'ষ করো। সব তোমা'কেই দিল্লুম।’

গুল বাহাদুর ব্যাপারটা বুঝে নিলেছেন। ছেলেটার ভার কাঁধে তুলতে

তাঁর কণামাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে আসলে মসলমান।

মোড়ল বললে, ‘আমার অনেক শত্রু ; ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।’

দৃষ্টিস্তর ভিতরও গুল বাহাদুরের মনে পড়লো, হজরৎ মহম্মদের পূর্বেও আরবরা ছিল বর্বর। তারাও নিভঁয়ে অনাথকে মেরে ফেলে তার টাকাকড়ি উঠে তাম্বু কেড়ে নিত। তাই হজরতের নবধর্ম স্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল অনাথের রক্ষা। মনে পড়ল, স্বয়ং আল্লা হজরতকে ‘মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, ওরে’ বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিও অনাথরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন,—

‘অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আছিল যা সব মুছিয়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলাম, তিনিই সুপথ দেখিয়ে দেছেন তোরে
সে-কুপার কথা স্মরণ রাখিস্। অসহায় শিশু, ওরে,
দাঁলসনে কভু। ভিখারী-আতুর বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা যেন রে ঘোষিস জগৎময়।’

এ তো আল্লার হুকুম, রসুলের আদেশ। মানা-না-মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঘাড় মানবে।

কিন্তু তিনি যে মসলমান। ডোম হোক আর মেথরই হোক, মোড়লের ছাবালের মূখে তিনি জল তুলে দেবেন কি প্রকারে? গুল বাহাদুর চুপ।

শিবু তার লাল ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ‘গোসাই, তুমি গোসাই নও, সে-কথা আমি জানি। তুমি কি, তাও আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই।’

‘কি করে জানলে?’ এ প্রশ্ন গুল বাহাদুর শূন্যে নিক্ষেপ করেন না। তিনি পল্টনের লোক ; বললেন, ‘আমি মসলমান, জানো?’

শিবুর শব্দকেন্দ্র মূখ খুশীতে তামাটে হয়ে উঠলো। গুল বাহাদুরের হাত-খানা আপন হাঙি-সার দৃষ্টান্ত তুলে নিয়ে বললে, ‘বাঁচালে, গোসাই, তরালে আমাকে।’ তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ‘মসলমানেরই এক দর্গায় মানত করে মা পেয়েছিল আমাকে। আমি পেয়েছি আনন্দীকে। পীর সৈয়দ মরতুজার ভৈরবীর নাম ছিল আনন্দী।’

মসলমান পীরের দরগায় যে হিন্দু বন্দ্য সন্তানের আশায় যায়, এ দৃশ্য গুল বাহাদুর বহুবার দেখেছেন দিল্লীতে নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার দরগায় কিন্তু পীরের আবার ভৈরবী হয় কি করে, আর ভৈরবীই বা কি চাঁজ, আনন্দী শব্দটাও হিন্দু হিন্দু শোনায়, এ সব গুল বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে জানে মসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে এসে কি রূপ নিয়েছে।

‘বাচ্চাকা ভালো বোলনা-চোলনা, বহুড়ীকা ভালো চুপ’—বাচ্চার ভালো বকবকানো, কনের ভালো চুপ—ভালো সেপাইও বহুড়ীর মত চুপ করে শব্দে যায়, গুল বাহাদুর চুপ করে শব্দে যেতে লাগলেন।

মোড়লের দম ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তাই আশকথা-পাশকথা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু তার ইচ্ছাগুলো বলে যাচ্ছিল, ‘বিষয়-আশয় বোঝবার ব্যস হলেই তাকে আমার বাড়ি বিষ্টুপদুরে পাঠিয়ে দিযো। সেখানে তার জমিজমা এখানকার চেয়ে ঢের বেশী।’

গুল বাহাদুর পদুরনো কথায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, ‘তোমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকলে মসলমান হয়ে যাবে না?’

মোড়ল বললে, ‘না। আমরা জাতে ডোম। মসলমানের হাতে খেলেও আমাদের জাত যায় না, আমরা মসলমানও হই নে। থাক্ অতশত কথা। তুমি নিজেই জেনে যাবে। শোনো, আর যা করতে হয় করো, ছেলেটাকে কিস্তু লেখাপড়া শিখিয়ে না, ওকে ভদ্রলোক বানিয়ে না।’

‘সে কি!’

‘না, ভদ্রলোক বানিয়ে না। আর শোনো, জলের কলসীর-তলায় মাটির নিচে কিছু টাকা আছে। তোমাকে দিলুম।’

গুল বাহাদুরের আবার মনে পড়ল, হজরত তাঁর ঘোঁবন আরম্ভ করেছিলেন, এক বিধবার ব্যবসায়ের কর্মচারীরূপে। বললেন, ‘টাকা ব্যবসাতে খাটাবো। তোমার ছেলে পাবে মুনাবার আট আনা।’

মোড়ল বললে, ‘যা খুশী করো, কিস্তু লগ্নীর ব্যবসা করো না।’

গুল বাহাদুরের মন্থ লাল হয়ে উঠল। ভদ্র মসলমান স্দের ব্যবসা করে না।

মোড়ল বললে, ‘আর শোনো, খুশ বিরামপুরের ঘোষালদের মেজো বাবুর সঙ্গে আলাপ ক’রো। তোমারই মত। কিস্তু সাবধানে। আর শোনো, তোমারই মত আরেকজন আগ্রয় নিয়েছে বধমানের কাছে, দামোদরের ওপার—’

এবারে গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, ‘কোন গ্রামে?’

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে, যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই, শহরও নেই।

গুল বাহাদুর দৃহাত দিয়ে ধীরে ধীরে মোড়লের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে আৰ্ত্তি করলেন,

‘ইম্মা লিল্লাহি ও ইম্মা ইলাইহি রাজিউন।’

‘আল্লার কাছ থেকে এসেছি, আর তাঁর কাছে ফিরে যাবো।’

কাফেরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কট-মোল্লারা উল্লাসভরে এ-মন্ত উচ্চারণ না করে বলে ওঠে ভিন্ন মন্ত—

ফী নারি জাহান্নামা।

একমাত্র ইংরেজের মৃত্যু সংবাদ শুনলে গুল বাহাদুর মন্তটি একশবার আৰ্ত্তি করতেন। আল্লার একশ নাম—মানুষ তার নিরনন্দই জানে—সেই নিরনন্দই নামের উদ্দেশ্যে নিরনন্দই বার আর শয়তানের উদ্দেশ্যে একবার।

সৈয়দ মজুতবা আলী রচনাবলী (৩)-

দাহ-কর্ম শ্রাস্থ, তাও আবার ডোমের, এসব কোন-কিছুই গুল বাহাদুর জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখলেন। তবে তাঁর গম্ভীর আঁট-সাঁট মূর্তি আনন্দীর হাত ধরে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হতে পারতো। মোড়লের মরে যাওয়ার পর বাড়ির সামনে যে ভিড় জমেছিল তার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি বৃদ্ধিতে পারলেন, শাহ-ইন-শাহ বাহাদুর শাহ'র দরবারে যদি দৈবপাকে চিকনকাল গ্রামের মাতঙ্গবরদের কুনিশ জানাবার অনুমতি লাভ হত তবে তাতে দুই নম্বর হত কে? পয়লা নম্বর তো চলে গিয়েছেন, দুই নম্বর হতেন ঝিঙে সর্দার। ভিড়ের মধ্যে ঝিঙের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ভারী গলায় হুকুম দিলেন, 'ইধর আও।'

ঝিঙে ভয়ে ভয়ে, লোকলজ্জায় কিছুটা বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে এল—ভিড় রাস্তা করে দিলে। ঝিঙের সঙ্গে শিবুর সম্ভাব ছিল না।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব-কিছু চালাও।'

- ঝিঙে গলে গেল। তার মনে কোনো সন্দ ছিল না, শিবু গত হলেই সে হবে গাঁয়ের মোড়ল। মধ্যখানে বাদ সাধলে এই লক্ষ্মীছাড়া বাবাজী। শিবু নিশ্চয়ই মরার সময় এ-ব্যটাকে বিধিয়ে গেছে। তা হলে এটা হল কি করে? থাক্ এখন, পরে জানা যাবে।

ঝিঙে ডবল উৎসাহে সব-কিছু সামলালে। বেশীর ভাগ ব্যবস্থা শিবু মরার আগেই করে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে ঝিঙে সর্দার শিবু মোড়লের দাওয়ায় গুল বাহাদুরের কাছে এসে বসলো। গাঁয়ের দু'চারজন তাদের কথাবার্তা শোনবার জন্য এগিয়ে এলে ঝিঙে দিলে তাদের জোর ধমক। তারা গুল বাহাদুরের দিকে আঁপল-নয়নে তাকালে কিন্তু তাঁর কোনো ভাব-পরিবর্তন না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তখন তিনি অতি শাস্তকণ্ঠে, ধীরে ধীরে বললেন, 'মোড়ল, ধমক না দিয়েই যেখানে কাজ চলে সেখানে ধমকের কি দরকার! কিন্তু সে তুমি বোঝো। আমি বলবার কে? আমি তো এদের চিনি নে। এদের কি করে সামলাতে হয় তার খবর রাখো তুমি।'

'মোড়ল' সম্বোধনে ঝিঙে একেবারে পানি হয়ে গেল—জল তো হয়ে গিয়েছিল আগেই। হাত জোড় করে বললে, 'দেবতা, অপরাধ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাকতে বললে না কেন?'

গুল বাহাদুর প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঝিঙে তোতলা। তোতলাকে মোড়ল বানানো কি ঠিক? তখন মনে পড়লো, একাধিক পেগম্বরও ছিলেন তোতলা।

ঝিঙের কথার উত্তরে বললেন, 'তুমি মরুদ্রবী, একটা হুকুম দিয়েছ। আমি উল্টো কথা বললে তোমার মুখ থাকতো কি?'

ঝিঙে কিন্তু শিবুর মতো বিচক্ষণ লোক নয়। ভাবাচাকা খেয়ে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধালে, 'শিবু তোমাকে বলে যাঁয়নি আমাকে মোড়ল না করতে?'

গদুল বাহাদুর বললেন, 'না ।'

শিবুর মত বিচক্ষণ নয় ঝিঙে, কিন্তু সে শিবুর চেয়ে অনেক বেশী ঘড়েল । ভাবখানা করলে, 'ওঃ ! শিবু যদি বলতো তবে তুমি আমায় ডাকতে না ।'

গদুল বাহাদুর বললেন, 'শোনো সম্পদার, শিবু সব-কথা বলে যাবার ফুর্সৎ পায়নি । পেলেও যে তোমার কথা বলতো, তাও তো জানি নে । আর ওর বলাতে না-বলাতে কিছু আসে যায় না । সে গেছে, এখন গাঁ চালাবো আমরা । ওর ইচ্ছে বড়, না গাঁ-চালানো বড় ? ও যদি বলে যেত, আনন্দী গাঁ চালাবে, তাহলে তোমরা কি সেটা মানতে ?'

গদুল বাহাদুরের মনে পড়লো হজরত মুহম্মদও ইহলোক ত্যাগ করার সময় মুসলমানদের জন্য কোন খলীফা নিয়োগ করে যাননি । গদুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, তবে কি অনুমত সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থাই বেশী কার্যকরী ? তবে কি বংশগত রাজ্যাধিকার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি ? তারপর মনে পড়লো, ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে এই নিয়ে কি যেন এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । ভাবলেন, দেখতে হবে । তারপর মনে পড়লো, এখানে তো বই-পত্র কিছুই নেই । যাক্ গে এ-সব কথা ।

ঝিঙেকে বললেন, 'কানাবুড়ী বাতাসীকে বলো সে এ-ভিটেয় থাকবে ।'

ঝিঙে অবাক । বাতাসীর মত অথর্ব-অচল ঝগড়াটে সাড়ে ষোল আনা অশ্ব এ তল্লাটে দাঁটি নেই । তাঁর গলাবাজির চোটে দৃঁদে মোড়ল শিবুও তার তল্লাট মাড়াতো না ।

ঝিঙে গদুল বাহাদুরের মতলব আদপেই বুঝতে পারেনি । তিনি জানতেন, শিবুর যে কিছু লুকনো টাকা আছে সেটা সকলের অজানা নাও হতে পারে । রাগে ভিটে খোঁড়ার জন্য চোর আসতে পারে । বাড়ির গ্রিসীমানায় আসতে না আসতে বুড়ী চিৎকার করে করে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জড়ো করে ফেলবে । অশ্বের শ্রবণ-শক্তি চক্ষুস্বানের চেয়ে বেশী । দিল্লীর জামি মসজিদের দেউড়িতে এক অশ্ব শুধু গলা শুনে হাজার লোকের জুতো সামলায় । মাদ্রাসার ছোঁড়াদের কেউ মজা দেখবার জন্য অন্যের গলা নকল করলে অশ্ব দৃ'জাড়া জুতো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার জোড়া, আর এই নাও যার নকল করছিলে ।' লোকে বলতো, আগ্রাতে শুকনো পাতা ঝরে পড়লে এ অশ্ব দিল্লীর চাঁদনি চোঁকে বসে শুনতে পায় । বাতাসী অতখানি কেরদানী হয়তো দেখাতে পারবে না, কিন্তু দৃ'টি বেগুন বাঁচাবার জন্য যে বোঁটি সমস্ত রাত দাওয়ায় বসে কাটায় তার চেয়ে ভালো পাহারাওলা পাওয়া যাবে কোথায় ? এখন কয়েক রাত তো পাড়া-প্রতিবেশীরা কান খাড়া রেখে ঘুমুবে—শিবুর ভিটেতে খোঁড়াখড়ির শব্দ হচ্ছে কি না শোনবার জন্যে । কয়েকটা রাত যাক, তারপর তিনি সুবিধে-মত তার ব্যবস্থা করবেন ।

কিছুক্ষণের ভিতরই শোনা গেল পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে বাতাসীর চিৎকার । চিকনকালী গ্রামটাকে সে বেতারকেন্দ্র বানিয়ে বিশ্বভুবনকে জানাচ্ছে, শিবু গেছে বেশ হয়েছে, আগে গেলেও কেউ মানা করতো না, বাতাসী তো নয়ই,

কিন্তু এ কি গেরো, সে কেন সামলাতে যাবে শিবদর গোয়াল খামার, ঐ দিক-ধিড়িঙে মিনসে বাবাজীটা আছে কি করতে, তাকেই তো শিবদর ঘটিবাটি চুলো-হাড়ি সব-কিছুর দিয়ে দিয়েছে, মরে যাই, আর লোক পেল না, কোথাকার হাড়-হাভাতে শতেক খোয়ারী—আরো কত কি !

গলার শব্দ কিন্তু এগিয়ে আসছে শিবদর বাড়ীর দিকেই ।

মোগল শাসনেও চার্জ দেওয়া-নেওয়া নামক মস্করাটা চলতো । গদুল বাহাদুর সে-মস্করাটা বাতাসীর সঙ্গে করার প্রয়োজন বোধ করলেন না । তাঁর ঘাড়েও তো মাথা মাত্র একটা । সেটা তো চায় ইংরেজ । বড়ীকে দিয়ে চলবে কেন ?

আনন্দীকে হাতে ধরে নিয়ে বললেন, ‘চলো ।’

যেতে যেতে আনন্দী বললে, ‘দাদু, বাবা আমাকে বলিছিল, বাতাসী পিসিকে বাড়ি নিয়ে আসতে । সে তো বলছে, আসবে না ।’

গদুল বাহাদুর ভারি খুশি হলেন । প্রথমত শিবদর যে আহাম্মদ ছিল না, তার শেষ প্রমাণও পাওয়া গেল বলে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছ’বছরের আনন্দীর বন্ধ-সম্বন্ধ আছে দেখে । বাপকা ব্যাটা না হলেও তার ঘোড়া তো নিশ্চয়ই । জোর গলায় হেসে বললেন, ‘কুছ পরোয়া নহী, দাদু, ও বোটি সব-কুছ সম্হালেগী’, তারপর বললেন, ‘সম্হালেগা ।’ মনে মনে বললেন, ‘দুচ্ছাই ভাষা, শ্রীলিঙ্গ, পদলিঙ্গ ফারাক নেই ।’ তারপর বললেন ‘সেই তো ভালো । এরা তো আর দিল্লী দরবারে মদশায়েরা করতে যাবে না যে ভাষাতে প’ল্লবটি রকমের বয়নাকার প্রয়োজন । ঐ করেই তো আমাদের সব গেল ।’ তারপর মনে পড়লো, কই, তাই বা কেন ? মাহমুদ বাদশা তো তাঁর সভাপাণ্ডিত ফির-দৌসীর সঙ্গে ব্যেং-বাজী করতেন । তাঁর রাজস্ব তো যায়নি । বাহাদুর শা গালিবের সঙ্গে করলেই বা কি দোষ ! ফাসীর কথাতে তখন মনে পড়লো, সে ভাষাতেও তো পদলিঙ্গ শ্রীলিঙ্গের তফাৎ নেই । বিরক্ত হয়ে তখন বললেন, ‘কী আশ্চর্য ! চলছি ডোম বস্ত্রের মধ্যস্থান দিয়ে, আর স্বপ্ন দেখছি গজনীর । অননশ্ শারও এর চেয়ে ভালো । আমাকে এখন দেখতে হবে, ছেলেটার পেটে ক্রিমি ।’

গদুল বাহাদুর পড়েছেন এ বাবদে বিপদে । ক্রিমির নদুস্থা (প্রেসক্রিপসন) তিনি দু’মিনিটেই লিখে দিতে পারেন । কিন্তু সেটা লিখতে পারেন উদ্দ’ কিংবা ফাসীতে । এবং তার জন্য যেতে হবে ইউনানী দাওয়াখানায় হেঁকিমের কাছে । এ তল্লাটে তো এসব জিনিস থাকার কথা নয় । আর বোষ্টম বাবাজী লিখবেন, ফাসী নদুস্থা ! যদিও গদুল বাহাদুর জানতেন, বদ্যাবন অঞ্চলের বাবাজীরা ফাসীতে ইউনানী নদুস্থা বিলক্ষণ লিখতে জানেন ।

গদুল বাহাদুরের ভুল নয় । চৈতন্যদেব ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন । তিনি একাধিকবার ইসলামী শাস্ত্র দিয়েই মোল্লাদের কাছে প্রমাণ করেন যে তাঁর প্রচলিত ধর্ম ইসলামের মৌলিক सिদ্ধান্তের সম্মতি পায় ।

আনন্দী বললে, ‘দাদু, ঐ দেখো হলদে পলাশ ।’

ততক্ষণে তাঁরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন। আর একটু দূরেই গুল বাহাদুরের ‘রাজপ্রাসাদ’।

দূরদূরান্তে চলে গেছে লাল খোয়াই। বাঁ দিকের উঁচু ডাঙা ভেঙে ভেঙে চলেছে খোয়াইয়ের অগ্রগতি। গুলবাহাদুরের আপন দেশ দোয়াবে প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ অহরহ অনুর্বর জমি সওগাত পাচ্ছে চাষের জন্য, আর এখানে খোয়াইয়ের খাঁই আধা-বাজা আধা-ফসলের জমির উপর। খোয়াইটা চলে গিয়েছে কতদূরে প্রকাশ্যে একটা লাল সাপের মত এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে ডাঙার ফালিটুকরো এসে যেন সাপের খানিকটে গতিরোধ করছে। ফের যেন অজগরের গ্রাসটা আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও যেন এ খোয়াই শূন্যে নিতে জানে। খোয়াইয়ের শূন্য থেকে সূর্যাস্তের মোকাম পর্যন্ত গাছপালার কোনো বালাই নেই। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের আলোটুকু এখানে এসে কোনো কালো কেশে পড়ে না। সাঁওতালিনীরাও সম্ভ্যার পরে ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

কিন্তু মাধুর্ষ আছে—সে মাধুর্ষ রুদ্রের।

কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) যে বর্ণনা কুরান শরীফে আছে সেটিও রুদ্রমধুর, আশ্চর্য! আল্লাতালার মানুষের মনে ভয় জাগাবার জন্য কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন কুরানে, কিন্তু তার প্রকাশ দিয়েছেন কাব্যরসের মারফতে। কেন? সোজা কথা। ঐতিহাসিক যখন লড়াইয়ের খবর লিপিবদ্ধ করে কত হাজার লোক মরলো তার বর্ণনা দেয়, তাতে তো মানুষ ভয় পায় না। কারণ তাতে কাব্যরস নেই। ভয় অনুভূতিবিশেষ। সেটা জাগাতে হলে কাব্যরসের প্রয়োজন। ঐতিহাসের শূন্য কোনো ফিরিস্তি থেকে মন করে জ্ঞান সম্ভব, তাতে ভয় সম্ভার হয় না।

এই রুদ্র-রসই এখন গুল বাহাদুরের জন্য প্রশস্ত।

ভাগ্যিস, তাঁকে পূর্ব-বাংলার ঘনশ্যাম, কচিসবুজ, শিউলিভরা, শিশির-ভেজা, পানাতাকা বেতেসাজা পূর্ব-বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়নি!

গাঁয়ের শেষ গাছ পেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল গেল আনন্দী যেন কি একটা বলেছে। শূন্যলেন, ‘কি বললে, দাদু?’

পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ‘ঐ যে, হলদে পলাশ!’

পলাশ হলদে হতে পারে, বেগুনী হতে পারে, সবুজও হতে পারে, এই হল গুল বাহাদুরের ধারণা। কিন্তু তাঁর মনে তবু ধোঁকা লাগলো। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দু’চারটে ফুল গাছ তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আনন্দী কিছু বলেনি। এখনই বা বলছে কেন? এ-গাছটার তেমন তো কিছু জৌলুসও নয়। মাত্র গোটা পাঁচ গুচ্ছে ফুল ফুটেছে। গাছটাও বেঁটে। যেন খাবড়া মেরে চেপটে দেওয়া। এর তুলনায় গাঁয়ের ভিতরকার শিমুলে তো ডালে ডালে ফুল ছিল অনেক বেশী। বললেন, ‘পলাশ—উয়ো তো ফুল। হলদে—পিলা। তো ক্যা হল?’

• আনন্দী কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললো, ‘সব পলাশ লাল, এটা হলদে!’

বলে সে আঙুল দিয়ে গায়ের ভিতরকার উঁচু উঁচু গাছের লাল পলাশ দেখিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরভূমের বৃক্ষ-বৃক্ষান্তবাবদে আকাট অগা গুল বাহাদুরের খেয়াল হল, 'তাই তো, আর সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

উদ্ভিদজ্ঞ এই তাঁর প্রথম পাঠ। আনন্দীর কাছে। বললেন, 'চলো দুটি ফুল পেড়েই নি।'

ছ'বছরের ছেলে আনন্দীর উল্লাসের অন্ত নেই। বাপ যদিও বলেছিল, 'বাবাজীকে ডরাসনি' তবু তার মন থেকে ও'র সম্বন্ধে ভয় কাটেনি। একে তো গম্ভীর লোক, তার উপর ঐ যে দৃশ্যমনের মত বদমেজাজী ঝিঙেও যার পায়ের কাছে বসে ভয়ে কাঁচুমাচু—তার সঙ্গে সাহস করে কথা কওয়া যায় কি প্রকারে। তবে তার শিশুবুদ্ধি শিশুবুদ্ধিতে একটা ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। সেটা কি? বাবাজীও বাতাসী বড়ীকে ডরায়। দ্বিতীয় ভরসা পেল এখন। যখন বললে, 'চলো দুটো ফুল পাড়ি।' তার বাপ তাকে ভালোবাসত। তার সম্বন্ধে আনন্দীর কোনো ভয় ছিল না, কিন্তু তাকেও ফুল কুড়োতে বললে ঘাড় বাকিয়ে বলতো, 'যা যা, থেলা করগে যা।'

ফুল পাড়তে পাড়তে গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, 'গুল' অর্থাৎ 'ফুল' আর প্রাচীন ফার্সীতে 'অপ্' অর্থ 'জল'। 'গোলাপী' আর 'জোলাব' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' আর 'প' নেই বলে আরবীতে 'গোলাপ' লেখা হয় 'জোলাব'। বিরোচক অর্থে। ছেলেটাকে তাই খাওয়ালেই হবে। কিন্তু এই অজ জায়গায় গোলাপ পাওয়া যাবে কি?

আনন্দীকে শূন্যে বহুদূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝালে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে ইশারা করলে তাতে সে দূরের গ্রাম হতে পারে, বেহেশতের গুল-ই-স্তান, ফুলের বাগানও হতে পারে।

॥ চার ॥

এতক্ষণে গুল বাহাদুর আসলে ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার ফুর্সৎ পেলেন। ছেলেটা নিশ্চিন্ত চেহারায় ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি ফিরে গেলেন সকালবেলাকার ঠেলে-রাখা সমস্যাগুলোতে।

শিবু মোড়ল বুদ্ধিতে পেরেছে তিনি বৈরাগী নন, তিনি যে মুসলমান সেটা জানতো না। কিন্তু আর কেউ বুদ্ধিতে পেরেছে কি? আর ঐ ঘোষালই বা কে? সেই বর্ধমানের ওপারের লোকটাই বা ওখানে এল কোথা থেকে? তাকেই বা খুঁজে পাওয়া যায় কি করে?

অনেক চিন্তা করেও তিনি কোনো হৃদিস পেলেন না। এমন কি ঘোষাল পদবী যে ডোমের হয় না, ওটা ব্রাহ্মণের পদবী এবং অতএব কাছে-পিঠে ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতার পত্তনও আছে, এইটুকু পর্যন্ত গুল বাহাদুর বিচার করে ধরতে পারলেন না।

তবে শিবু যখন বলেছে সাবধান, তখন তার অর্থ তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা। আর এখন তো বর্ধমান যাওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। এ দেশের আচার-বাবহার এ ক'মাসে শিখেছেন কতটুকুই বা? ডোমেদের ভাল করে চিনে নিতে পারলে পরে ডোম সেজে চলাফেরা করা যাবে। তার আগে শিখতে হবে ওদের ভাষা। এযাবৎ তাতেও তো খুব বেশী উন্নতি হয়নি।

আর এই ডোমেদের নিয়ে তিনি করবেন নতুন গদর! দেশ কি, রাজা কারে কম, ইংরেজ যে শয়তান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণী নয়—এ-সব খবর তো এরা কিছুই রাখে না। পেটের ধান্দ্য এদের কাটে সুবো-শাম। খুব যে তারা শান্ত এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু জীবন-মরণ পণ করে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যাবার মত ধাতু কি এদের শরীরে আছে?

কিন্তু থাকবেই না কেন? গজনীর মাহমুদ, ঘোরের মুহম্মদের আমলে গ্রামাণ্ডলের পাঠানরা কি এদের চেয়ে বেশী সঙ্গীন জঙ্গীলাট ছিল? কিংবা বাবুদের আমলে ফরগনা বদখশানের আশপাশের গামড়িয়ারা? কিংবা হাতের কাছের মারাঠারা? একবার কি একটা সামান্য গুজোব রটাতে এই দিল্লীবজরী বীরের দল দিল্লী থেকে যেন পালাবার পথ পায়নি। ঐতিহাসিক খাফী খান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন তখন দিল্লীর এক বড়ী নাকি একাই তিনজন মারাঠাকে নিরস্ত করছিলেন। ঐতিহাসিক খুশ-হাল চন্দ্রও বলেছেন, তারা নাকি তখন হাতিয়ার তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছোট বাচ্চার মত ‘মাগো, ওমা’ বলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এসব কাহিনীর বিশ্বাস করা যায় কতটুকু? দিল্লী একদিন এদের হাতে থেয়েছিল মার। সেই বেইশ্জতী ঢাকবার জন্য পরবর্তী যুগে হয়তো তিলকে তাল বানিয়েছে।

তা বানাক, আর নাই বানাক, এরাই তো একদিন সাহস করে আবদালীর মূকাবেলা করেছিল। অবশ্য লড়াইয়ের আগে রাতে মারাঠা সেনাপতি ভাব-সাহেব আপন রোজ-নামচায় লিখেছিলেন, ‘আমাদের পেগালা পূর্ণ’ হয়েছে। কাল অবশ্য-মৃত্যুর মূখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমরা মারাঠারা তো কখনো সম্মুখ যুদ্ধ লড়িনি; আমাদের রণকৌশল, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তার যথা-সম্ভব ক্ষতি করে পালিয়ে যাওয়া—বার বার। সবশেষে তার সর্বস্ব লুণ্ঠ করা।’

এ সব-কিছু ভাবসাহেব সত্যি লিখেছিলেন কিনা, সে-কথা গুল বাহাদুর জানতেন না। তবে এ কথা জানতেন, মারাঠারা সম্মুখ সংগ্রাম সব-সময়ই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একথাও অতি অবশ্য ঠিক, ভাবসাহেব অবশ্য-মৃত্যু জেনেও আবদালীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধই লড়েছিলেন। কেন লড়েছিলেন? পেশওয়ার হুকুমে। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশ্যতার দরুন। তাঁর নুন-নেমক থেয়েছি। সে নুনের শেষ কাড়ি শোধ না করে দেশের লোকের সামনে মুখ বের করবো কি করে? কিন্তু দিল্লীর বাদশার প্রতি বাঙালী ডোমের কি আনুগত্য, কি বশ্যতা?

তবে কি এদের তাতাতে হবে বাবদুর কিংবা মাহমুদের মত লুঠতরাজের লোভ দেখিয়ে ? তার সরল অর্থ, দিল্লীর বাদশাহ খেদমৎ করতে গিয়ে তারা করবে দিল্লী লুঠ ! এতো চমৎকার ব্যবস্থা !

তখন বড় দৃষ্টে তাঁর মনে পড়লো, গব্বরের সিপাহীরাও বেপরোয়া ভাবে যন্ত্রতন্ত্র লুঠতরাজ করেছে। যাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়েছে, লুঠ করেছে তাদেরই। কি মূল্য সে স্বাধীনতার !

গুল বাহাদুরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সুরাহীর জল তেলে মাখা ঠান্ডা করে ভাবলেন, 'যারা গদর ইনকিলাব করে তারা অতশত ভাবনা-চিন্তা করে না। তিমুরে নাদির বিজয় অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে বৃন্দ আলী সিনা কিংবা আব্দুরশদের দর্শন আর তর্ক শাস্ত্রের কেতাব-পুঁথি নিয়ে বিনীত যামিনী যাপন করেন না।'

ইংরেজ এ-দেশের দৃশ্যমন, এ-দেশের বাদশার দৃশ্যমন। তাকে খেদাতে হবে। কি ভাবে তাড়াতে হবে তার জন্য মোল্লা-মোলবীর কাছ থেকে ফতোয়া আনবার প্রয়োজন নেই। তাহলে পাড়ার পদী পিসির কাছেও যেতে হয়। তিনি ইতু ঘেঁচুর পুজো-পাটা করে দিন-ক্কাণ বাংলা দেবেন—তবে হবে অভিযান শুরুর ! তওবা, তওবা !! শয়তানের খুন পিনেওলা তলোয়ারকে পয়মন্ত করতে হবে চড়ুই পাখীর ন্যাজের পালক দিয়ে !

কিন্তু একটা জিনিস সর্বক্ষণ গুল বাহাদুরের মনে পীড়া দিচ্ছিল। এই যে ছদ্মবেশ পরে আত্মগোপন করে থাকাকাটা, এভাবে কাপুরুষের মত কতদিন প্রাণ বাঁচিয়ে থাকতে হবে ? দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা বড় আদর্শ সামনে ধরেছি বলে এই নীচ আচরণ সর্বক্ষণ হজম করে করে চলতে হবে ? ডোমকে তাতানোর জন্য লুঠতরাজের লোভ কেউ দেখালে সেটা না হয় বরদাস্ত করে নিলুম কিন্তু নিজে একটা নীচ আচরণ করবো—এ-টুকি ঢেকি গিলে হজম করি কি করে ? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়—কত বছর ধরে কে জানে ?

চুলোয় যাক্ গে অত ভয়। চুলোয় যাক্ গে শিবুর হুঁশিয়ারীর পরামর্শ। আমি বেরবো ঘোবালের সম্মানে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজে ডুব না মারলে চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাবো যে।

কাজও এসে হুড়মুড়িয়ে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

শিবুর খেতখামার ছিল সামান্যই কিন্তু গুল বাহাদুরের পক্ষে ঐতুকুই যথেষ্ট। সে সব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এক নতুন ভুবনে। এটা ধরলে গুটা হাতছাড়া হয়ে যায়, ছাগল দুটোকে সামলাতে গাইটা না-পাস্তা হয়ে যায়। মরাইয়ের ইঁদুর মারতে হলে বেরাল পুষতে হয়, বেরালকে পেট ভরে খেতে দিলে সে আবার ইঁদুর মারার প্রয়োজন বোধ করে না। পচা গোবরের গন্ধে মাথা তাম্বিজম তাম্বিজম করে, অথচ সে গোবরের বরবাদ হবে তাও প্রাণ সইতে পারে না।

ইতিমধ্যে ঝিঙে এসে খবর দিলে একপাল সাঁওতাল কোশখানেক দূর নদী-

পারে আস্তানা গেড়েছে। ওদের দিয়ে একটা নতুন আবাদ করানো যায় কি না।

গুল বাহাদুর লক্ষ দিয়ে উঠলেন। এ একটা কাজের মত কাজ বটে। এ-বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। ভাওলপদুর না পাটিয়ালা কোথা থেকে একপাল মেয়ো এসে আশ্রয় নিয়েছিল পালমে যেখানে বাবুর শাহের পাথরের তৈরী সরাঈ—তারই পিছনে। তাঁরই চাচা দানিশ্‌মদ খান তাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটা সুন্দর আবাদ। চাচার সঙ্গে থেকে থেকে তিনি তখন শিখেছিলেন অনেক কিছুর। আজ দেখা যাবে চাচাকা ভাতিজা সে এলেমের কিছুরা স্মরণ রেখেছে কি না।

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। শিবুর কলসীর তলায় পাওয়া গিয়েছে, শ' আড়াই টাকা। এত টাকা শিবু পেলে কোথায়? তবে কি গুপ্তী ডাকারিত করতো? তা আসুক সে টাকা জাহান্নাম থেকে। ঐ দিয়ে আবাদ আরম্ভ করা যাবে অক্লেশে। তারপর বরাং। আল্লা ভরোসা।

প্রথম দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গুল বাহাদুর আনন্দীকে সেলাম করে বললেন, 'হুজুর, আজ থেকে আপনি জমিদার। আপনাকে সমঝে চলতে হবে।'

জমিদার হওয়ার রৌদ্রস আনন্দী জানে না কিন্তু সে চালাক ছেলে। গুল বাহাদুরের মেজাজ আজ খুশ দেখে সে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'দাদা, আমাকে কেঁদুলীর মেলায় নিয়ে যাবে?'

গুল বাহাদুরের প্রাণ-ষমুনায় তখন আনন্দের উজান তরঙ্গ লেগেছে। আনন্দী তখন শয়তানের জন্মভূমি বিলেত যেতে চাইলেও তিনি তখন ঘিনপিত বাদ দিয়ে সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন। শুধালেন, 'সে কোথায়?'

বললে, 'অম্বেক দুরে। ঐ হোথা অজয় দিয়ে।'

শীতের শেষে অজয়ের পারে কেঁদুলীর মেলা। বাঙলাদেশের হাজার হাজার বাউল সেখানে জমায়েৎ হয়ে তিন রাত ধরে আউল-বাউল-কেন্দন গান গায়। কেনা-কাটাও হয় প্রচুর।

সেখানে গুল বাহাদুরের আরেক অভিজ্ঞতা।

এই যে হাজার হাজার ষাডামাক' লোক দিনরাতের খেই খেই করে নৃত্য করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে কোনো কিছুর করছে কাম্বাচ্ছেন না, সমাজের তোয়াক্কা করে না, ধর্মের নামে অকাতরে গরীব-দুঃখীর অম্বে ভাগ বসচ্ছে, দরকারে অদরকারে এক অন্য কামড়াকামড়ি পর্যন্ত করছে—এ তামাশা তৈরী করলো কোন মহাজন? কার আদেশে এরা এসব করে, কার হুকুমে গৃহী এদের সব-কিছুর যোগায়? এর কি অর্থ, কি মূল্য?

অথচ গুল বাহাদুরের চট করে মনে পড়া উচিত ছিল যে মদসমলান পীর দরবেশরাও ঠিক এই কমই করে থাকে, তাঁরই হীরের টুকরো দিল্লী শহরে—নিজামউদ্দীনের দরগায়, মেহেরোলীর কুৎবুসাহেব, নাসিরউদ্দীন চিরাগদিল্লীর

আস্তানায়। সেখানেও তো বাউন্ডুলে খোদার খাসীরা ঠিক এদেরই মত ধেই ধেই করে নৃত্য করে। যীশুখৃষ্টের ভাষায় 'তারাও সদুতো কাটে না, মেহমতও করে না।' এবং তাই শৃঙ্খল, নয়, এখানকার এই বাউলদের ভিতর আছে মসলমানও।

ছেলেবেলা থেকে আপন ধর্মে যে সব জিনিস গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলো একটু ভিন্ন বেশে দেখা দিলেই মানুষ চমকে ওঠে। তারপর হৃদয় হয়, দুটোই হৃদয় এক বস্তু। এ-ও যা, ও-ও তা। কালীঘাটের পাঁঠা কাটাতে আর ইদগার পাশে গোরু জ্বায়ে তফাৎ কী? গরুরূপে মাথায় তুলে তাকে অবতার বলা, আর পীরের পায়ে চুমো খেয়ে তাকে আল্লার নর বলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া একই, একই, সম্পূর্ণ একই জিনিস।

গুল বাহাদুরের মনে যখন এ চৈতন্যের উদয় হল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাজব মুরজুক হিন্দুস্তান।' এই এদের আমরা যুগ যুগ ধরে শিরতাজ, মাথার মুরুট করে পরে আসছি আর এদের মনের কোণে কণামাত্র উবেগ নেই এদেশের লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এদের কাছে আমরা সব মায়াবন্ধ জীব (ফানী দুনিয়ার ক্রিমি), আমরা মরলেই কি, বাঁচলেই কি! ইয়া আল্লা মেহেরবান! তোমার কেরামতি বৃদ্ধি ওঠা ভার। এ-সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয় তবে এ-সংসারে তুমি তাকে পাঠালে কেন?'

হঠাৎ খেয়াল গেল, আনন্দী বাউলদের অনুকরণে ধূতিটাকে লুঙ্গির মত কোমরে বেঁধে এক হাত উপরের দিকে তুলে অদ্ভুত এক-তারা ধরে নাচছে। দিলেন এক ধমক। শিবুর কথা মতো একে 'ভদ্রলোক' না হয় নাই বানালুম, কিন্তু—একে কখনো বৈরাগী হতে দেব না।

'কি রে আনন্দী, কি রকম আছিস?'

গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখেন—বাঙালী বাবু। লম্বা লিকলিকে চেহারা, গোরবর্ণ, সরু বাঁকা নাক, বাদ্যমণী—প্রায় নীলরঙের দুটি হাসি-হাসি চোখ, উপরের ঠোঁটটি চাপা—নিচেরটি উপকী ছাঁড়িদের মত একটু পুরুষুটু এবং রস-ভর-ভর, পানের লাল না এমনিতেই লাল ঠিক বোঝা গেল না, এক মাথা কোঁকড়া বাবরী চুল কিন্তু একেবারে রক্তশুদ্ধ, পরনে কটকি জুতো, ধূতি মেরজাই আর কাঁধের উপর বীরভূমি কেটের চাদর।

বললেন, 'এই যে বাবাজী, ঝিঙের মূখে তোমার কথা শুনলুম।'

গুল বাহাদুর অচেনার আগমনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'বসুন।' মনে মনে ভাবলেন, 'ঝিঙের মূখে? তবে কি শিবু কিছু বলিনি!'

গদরের সেপাইদের মধ্যে একে অন্যকে পরিচয় দেবার জন্য গোপন সংকত ছিল হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে শরীরের কোন এক জায়গায় কেমন যেন আনমনে আস্তে আস্তে চক্কর কেটে যাওয়া—তারা যে গোল চাপাটি দিয়ে খবর পাঠাতো তারই অনুকরণে। গুল বাহাদুর মাটিতে বসে তাঁর আপন হাঁটুর উপর যেন বেখেয়ালে চক্কর আঁকতে লাগলেন।

বাবুটি চমকে উঠে আপনি হাঁটুতে একটা চক্কর এঁকেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘চল।’

দুজনী নদীপাড়ের বটগাছ-তলায় বসলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। সামনে, উঁচু পাড়ির অনেক নিচে অজয়ের ক্ষীণধারা। তার গতিবেগ প্রায় নেই। যেন মরা অজগর সাপ শূন্যে আছে। চাঁদের আলোতে তার আঁশ যেন চিক্‌চিক্‌ করছে। দু’একটি মেয়েছেলে সেই আঁশ যেন আঁজলা আঁজলা করে মাথায় মাখছে। তাদের কালো চুল থেকে ছোট ছোট ঝরণা চিক্‌চিক্‌ করে পড়ছে। জলের ওপারে বিরাট বালুচরের আরম্ভ। তারপর কাশের ঝোপ, নিচু পাড়, বাস্তীদের আস্তানা সব-কিছু চাঁদের আলোতে শ্লান কুয়াশার হিমিকার গ্লানিতে মিশে গিয়েছে। মেলার কোলাহলকে শাস্ত নদীর নৈস্তুধ্য এখানে গ্রাস করে ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ!’

‘জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ! জিন্দাবাদ কুমার সিং!’

কুমার সিং?

॥ পাঁচ ॥

অনেকক্ষণ ধরে দুজনাই চুপ। একে অন্যের সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু বাহাদুর শাহ আর কুমার সিং যেন তাদের হাতে হাত, বৃকে বৃক মিলিয়ে দিলেন, যেন কত দিনকার পরিচয়। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হলে মানুষ যেমন একে অন্যের নিঃশব্দ সঙ্গসুখ প্রথমটায় শূন্যে নেয়, এদের বেলা তাই হল।

একবার কথা আরম্ভ হলে সে-সুখ যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘সব খতম!’

‘সব খতম। কিন্তু আবার সব শুরুর।’

দুজনায় আবার চুপ।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমার নাম—’

‘থাক! নামের প্রয়োজন হলে পরে শূন্যে নেব। আমি ঘোষাল।’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘বুঝেছি।’

আশ্চর্য হয়ে ঘোষাল শূন্যে, ‘কি করে?’

‘শিবু বলেছিল। আমার কথা আপনাকে বলিনি?’

‘না। বোধ হয় সময় পায়নি।’

গুল বাহাদুর আফসোস করে মনে মনে ভাবলেন, ‘এরকম একটা বিচক্ষণ লোক চলে গেল। বেঁচে থাকে শূন্য গাধা-খচ্চরগুলো।’

ঘোষাল বললেন, ‘শোনো আমার কথা সব বলি।’

এবার ঘোষাল অতি বিশুদ্ধ উদ্ভূতে আপন বস্তু আরম্ভ করলেন।

‘আমি ছেলেবেলায় ঘাই বেহারে। সেখানে অনেক জায়গায় কাজকর্ম

করি—এমন কি ইংরেজের সঙ্গেও। শিউরে উঠে না। পরে বন্ধবে। ওদের সঙ্গে কাজ না করলে আমি কখনো এরকম গভীরভাবে বন্ধুতে পারতুম না, এরা কি বস্কাং, কি খিড়বাজ। কিন্তু সেকথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার এখন নেই। তুমি ফার্সীতে যে-সব বই পড়েছ, আমিও পড়েছি সেগুলোই। আমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু আমাদের বংশে বহুকাল ধরে চলে আসছে ফার্সীর চর্চা। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম ইতিহাস চর্চার ফলে নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পাঠানদের হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন পূর্ব-বাঙলায়। হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন, বীরভূমে। জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব—বাস্—মাষ্ট এই তিন বাদশার আমলে বাঙলা পরাধীন ছিল, অর্থাৎ দিল্লীর হুকুম মারফক চলেছে। তারপর আমরা আবার সরকারী কাজ করেছি। তারপর এল ইংরেজ। পলাশী থেকে এই এক’শ বছর আবার আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি।’

গুল বাহাদুর অনেক কিছুই জানতেন না। এই ন’মাস ধরে তিনি চিনেছেন শব্দ ডোম আর সাঁওতালদের। এদেশেও ব্রাহ্মণ আছে, এ কথা তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু তারা যে গদরে লড়ে এ খবর তাঁর জানা ছিল না। দিল্লীর ব্রাহ্মণেরা পরে চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, আর মাথায় কিস্টুটিপ। তারা করে পূরুরতের কাজ। বিয়ে-শাদীতে এসে মস্তফস্ত পড়ায়—তাও সে-মস্ত কাগজে লিখে আনে ফার্সী হরফে। তারা আবার লড়াই করে কি করে? লড়াই তো করে রাজপুতরা, মারাঠারা, ক্ষত্রিয়রা। তা সে শাক গে। তাঁর মনে তখন লেগেছে আর এক ধোঁকা। শূধালেন, ‘তোমরা কি শব্দ বাঙলার স্বাধীনতা চাও? বাহাদুর শাহকে শাহ-ইন-শাহ বলে মানো না?’

ঘোষাল বললেন, ‘ঐ তো আরম্ভ হয়ে গেল, হিন্দুস্থানবাসীদের ঝগড়া-কাজিয়া। এ-সব কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের ভিতরে মিল বেশী, অমিল কম। যদি খুশী হও, তবে না হয় মেনেই নিলুম তোমার বাহাদুর শাহকে। কুমার সিংকে তো মেনেছিলুম। তোমাকেও মানছি। সবাইকে মেনে নেব—দরকার হলে এবং হবেও। তুমি কি মনে করো, আমরা জিতলে সেই পূরনো মোগলাই রাজত্ব আসবে—বাহাদুর শাহকে বাদশা করতে পারলেও? না বাবাজী, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে। বাবুর বাদশার মত রাজত্ব বাহাদুর কখনো করেননি, আর কখনো কেউ পারবে না।’

গুল বাহাদুর শোধালেন, ‘আপনারা হেরে গেলেন কেন?’

ঘোষাল হাতজোড় করে বললেন, ‘ঐ একটি প্রশ্ন শূধিয়ে না। এর উত্তর দিতে গেলে আবার নতুন করে সেই মম’শুদ পীড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যা ভুলতে পারা একটা জীবনের কর্ম নয়। কোন্ কোন্ ভুল না করলে আমরা জিতে জেতুম সে প্রশ্নও তুলো না। আমি নিশ্চয়ই জানি, সে ভুলগুলো না করলে পরে অন্য ভুল করতুম। না বাবাজী, গলদের মূল উৎস কোথায় ছিল তখনো বন্ধুতে পারিনি, এখনো পারিনি। আমরা এখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো ওঁদিক দিয়ে জল বৌরিয়েছে, সেখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো অন্য দিক

দিয়ে বেরিয়েছে। সব'ঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথায় ?'

‘এখন তবে কত'ব্য কি ?’

ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ‘বিলকুল কোনো ধারণা নেই। এখনো মনে মনে জমা-থরচ মিলোচ্ছি। তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। দিল্লী ফিরে যাচ্ছ না তো ?’

প্রশ্নটা যেন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করা হোল। ঘোষালই জানতেন এর উত্তর কি ? গুল বাহাদুরও কোনো কিছুর বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঘোষাল বললেন, ‘ছদ্মবেশটা মন্দ ধরনি। বাঙলাটাও খুব যে মন্দ শিখছে। তাও নয় কিন্তু ডায়া ডোম-ডুমে। এই বেলা ওটাতে লেখা-পড়াও আরম্ভ করে দাও। নিজেই করে নিতে পারবে। কোন ভাবনা নেই। ওতে সাহিত্য বলে কোনো বালাই নেই। আশ্চর্য, সাতশ’ না আটশ’ বছর ধরে বাঙলাতে বই লেখা আরম্ভ হয়েছে অথচ এক গন্ডা কবি বেরোয়নি যাদের ইরানী কবিদের সামনে দাঁড় করানো যায়। ফার্সীতে তিনশ’ বছর যেতে-না-যেতেই ফিরদাসী, হাফিজ, সাদী, রুমী, আন্তার, নিজামী, আরো কত কে ?’

গুল বাহাদুর মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, ‘বাঙালীরা হয়তো মনে করে, তাদের কবি হাফিজ সাদীর চেয়ে বড়।’

ঘোষাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ‘তা করতে পারে। সাঁওতালরা হয়তো মনে করে, তাদের তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক কামানের সঙ্গে লড়া যায়।’

তুলনাটার ঢপ দেখে গুল বাহাদুর একটু হাসলেন।

ঘোষাল বললে, ‘হাসলে ? তা হাসো। আমারও বলার বিশেষ হস্ত নেই। আমিও তেমন কোনো চর্চাও করিনি। কিন্তু জানো, সাতশ’ বছর বাঙলা চর্চা করার পর তারা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে এই মাত্র সেদিন। পঞ্চাশ বছরও হয়নি। ঐ যে রাজা রামমোহন রায়—’

গুল বাহাদুর চমকে উঠে বললেন, ‘কে ?’

‘রাজা রামমোহন রায়। চেন না কি ?’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার পিতার কাছে শুনোঁছি, বাদশা দ্বুসরা আকবরের চিঠি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। আমি তো শুনোঁছি, উনি জানতেন অতি উত্তম ফার্সী এবং আরবী।’

ঘোষাল বললেন, ‘তা তিনি জানতেন। এদেশের মুসলমান পাণ্ডিতরা তাঁকে নাম দিয়েছেন “জবরদস্ত মোলবী”।’ তারপর একটু অবজ্ঞার সুরে বললেন, ‘লোকটা মোলবীই বটে। ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখে। ফার্সীতে একটা লিখেছে। আমার কাছে বোধ হয় এখনো আছে। কিন্তু ধর্ম আমার রুচি নেই। তাতে কিছুর এসে যায় না। কিন্তু তাম্জব কী বাৎ, লোকটা দেশের সবাইকে ইংরিজি শেখাতে চায়।’

‘সে কি ?’

‘আশ্চর্য ! আরবী ফার্সীর রস চেখেছে, শুনোঁছি ইব্রানী স্ক্রলানী ইত্যেক-

(হিব্রু, সিরিয়াক্) জানে—তার পর এই রুচি ! ইংরেজ ব্যাটারা তো পায়খানা ফিরে জল পর্যন্ত—থাক্ গে। জানো, বাবাজী, এক ব্যাটা ইংরেজের সঙ্গে আমাকে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত-নাড়ানাড়ি করতে হয়েছিল। হাতে যেন এখনো গন্ধ লেগে আছে। বেসন দিয়ে কত মেজেছি, বামা দিয়ে তার চেয়েও বেশী ঘষেছি।’

বলে ডান হাতখানা অতি সন্তুর্পণে নাকের ইঞ্চি তিনেক সামনে ধরে দু’বার শব্দকে বলে উঠলেন, ‘তৌবা তৌবা ! এখনো গন্ধ বেরুচ্ছে !’

গদুল বাহাদুর সহানুভূতির সুরে বললেন, ‘আমিও পাচ্ছি। তা ঐ অপকর্ম করতে গেলেন কেন ?’

‘সাধে ? ঐ করে তো সম্বন্ধীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আর পাঁচজনের চোখের আড়াল করলুম।’ ঘোষাল চুপ করে গেলেন।

গদুল বাহাদুর শোখালেন, ‘তারপর ?’

ঘোষাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, ‘তারপর কে কোথায় যায় সে তো আল্লাই জানেন। কেউ যায় বেহেশ্তে, কেউ যায় দোজখে, কেউ যায় বৈকুণ্ঠে, কেউ যায় কৈলাসে !’

‘সে আবার কোথায় ?’

‘বাবাজী, ধরা পড়ে যাবে। বৈকুণ্ঠটা কোথায় সেটা অন্তত তোমার জানা উচিত। বাবাজীরা মরে গেলে বৈকুণ্ঠ যায়—নামাবলীর কাপেট পেতে তারি উপরে বসে। আরব্য রজনীতে যেরকম আছে। কিন্তু থাক ওসব। ধর্ম আমার রুচি নাই—তোমাকে তো বলছি।’

অনেকক্ষণ পর গদুল বাহাদুর শোখালেন, ‘ইংরেজ মেরেছেন ; ইংরেজ আপনাকে তালাশ করছে না ?’

‘তা করছে, কিন্তু আমি ইংরেজ মারলুম কখন ?’

গদুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘এই যে বললেন।’

‘তাজব বাৎ শোনালে ! আমি বেটাকে নিয়ে গেলুম যেখানে তার বরাতে লেখা ছিল যাবার। তারপর আমাদের সেপাইরা তাদের কাজ করলে। আমি কি জ্ঞানদ ?’

‘আপনি তবে কি করতেন ?’

‘আমি ? আমার কাজ ছিল তাপ্পা, রিপদকর্ম। আজ বন্দুক নেই, যোগাড় করা। কাল বারুদ নেই, ঠালা সামলাও। পরশু খোরাক নেই, আমার নাভিঃশ্বাস। আরো কত কি ? লুণ্ঠের মাল বখরা করা, গাঁয়ের লোককে মিথ্যে দিবি-দিলাশা দিয়ে তাতানো, চিঠি জাল করা—’

‘সে আবার কি ?’

ইংরেজের গদুগদুর আমাদের সেপাইদের ভিতর জাল চিঠি পাচার করালে, যেন সে-চিঠি কুমার সিং ইংরেজকে লিখেছেন আত্মসমর্পণ করে, অবশ্য তাঁর ধনপ্রাণ যেন রক্ষা হয় এই শর্তে। আমি তখন পাঁচটা চিঠি জাল করাতুম, ইংরেজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে সেটা চালিয়ে দিলাম আমাদের সেপাইদের

ভিতর। কিন্তু ইংরেজ সেপাইদের ভিতর ভিতর এককম জালিয়াতি আমরা করতে পারিনি অতখানি বাঢ়িয়া ইংরাজ লেখা জাল করনেওলা আমাদের ভিতর কেউ ছিল না।’

গদুল বাহাদুর বললেন, ‘তাই বোধহয় রাজা রামমোহন আমাদের ইংরাজি শেখাতে চান।’

ঘোষাল গোস্‌সাভরে বললেন, ‘কচু হবে ইংরাজি শিখে। যেন ইংরাজি চিঠি জাল করতে পারলেই আমরা গদর জিতে যেতুম। যেন কাঠবেরালির খুলো না হলে—থাক্ গে—ওসব কেছা তুমি জানো না।’

চাঁদ অনেকখানি ঢলে পড়েছে। বাউলদের গীতও কিমিয়ে এসেছে। নদীর জলের রূপোলি কিকিমিকি লোপ পেয়েছে, কিংবা সরে গিয়েছে। ওপার থেকে পাড়ি দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দুজনার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়তো গদরেরই দীর্ঘনিঃশ্বাস, হায় হায় আফসোস্‌।

গদুল বাহাদুর বললেন, ‘যাক্। তবু ভালো। আমি তো শুনছিলাম, কুমার সিং সত্যি আত্মসমর্পণ করে ইংরাজকে চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো তাহলে জাল।’

ঘোষাল হেসে বললেন, ‘সব-কটা জাল হতে যাবে কেন? কিছু সত্যিও ছিল।’

গদুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘সে কি?’

‘নিশ্চয়। যখন দেখলাম, ইংরেজ চিঠি চালাচ্ছেই তখন আমরাও ইংরেজকে দু-চারখানা লিখে পাঠালুম। নানারকম ভুল খবর দিয়ে। নিছক ধাপ্পা মারার জন্য। বাঁসীও তাই করেছিলেন।’

‘কিন্তু এতে করে যে পরে দেশের লোকের মনে ভুল ধারণা হল, কুমার সিং সত্যি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে ভুল ধারণা সরাবে কে?’

‘দেখ বাবাজী, গদর জিতলে এ ভুল ধারণা থাকতো না। আর হারলে তো গাল খাবই। তখন কাজ ছিল লড়াই জেতা। তার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছি। হেরে গিয়েছি সেইটে হল সবচেয়ে বড় গাল। তার উপর এ-বদনাম তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, “পকড়ে তলওয়ার দামনকো সম্‌হালে কোঙ্গি”? তলোয়ার নিয়ে হামলা করার সময় রক্তের ছিটে পড়ার ভয়ে কেউ তো কুস্তার অঞ্চল সামলায় না—অর্থাৎ একবার মনস্কর করার পর ছোটোখাটো চিন্তা করতে নেই।’

গদুল বাহাদুর বললেন, ‘সে তো বিলকুল ঠিক। কিন্তু, ইংরেজ আপনার সম্‌ধান পাবে কি না সেও কি ঐ পর্যায়ে?’

ঘোষাল বললেন, ‘প্রায় তাই। কিন্তু আসলে কি জানো, বাবাজী, বেঁচে থাকার উপর আমি খুব বেশী দাম দিই নে। এই গদরে চলে গেল মানুষগুলো, আর বেঁচে রইল যারা, তাদের আমি দোষ দিই নে, কিন্তু তাদের নিয়ে আমি করবো কি? ঝড়ে মোটা আমগুলো ঝরে পড়ে সে তো জানা কথা। আমি নিজে অত্যন্ত সামান্য প্রাণী কিন্তু ঐ মহাজনদের সম্পর্কে এসে আমি কয়েক

দিনের জন্য কি যে হয়ে গিয়েছিলুম তোমাকে বোঝাই কি প্রকারে ? আমি যেন রোগা-পটকা হাতিভসার গঙ্গাযাত্রায় জ্যাস্ত মড়া হয়ে যাচ্ছিলুম উদ্ধারণপূর্বের ঘাটে । আমরা ঘাড়ের এসে করলে ভর এক উড়োনচন্দী দানো । আমি উঠলুম লক্ষ্য দিয়ে, মড়ার খাটিল ছেড়ে, আর তারপর সে কি তিড়িং বিড়িং ভুতের নৃত্য করলুম ক’দিন । তখন আমি সব জানি, সব পারি । ঐ আনন্দী ছোঁড়াটা তখন যদি আমাকে আশ্বাস করতো, “দাদু বেহেশত থেকে এনে দাও না আমাকে খুদাতালার কুসী-খানা”, আমি তা হলে একগাল হেসে বলতুম, “রঃ ! ডাড়া ! এনে দিচ্ছি, এ আর এমন কি চাইলি ?” তারপর দিভুম এক আকাশ-ছোঁয়া লক্ষ্য ঃ স্বপ্নে যে-রকম মানদুশ মিন-পাখনায় পায়ের কড়ে আঙ্গুলে অল্প একটু ভর দিলেই হুদা কড়ে উড়ে গিয়ে ঠুকে যায় তার মাথা চাদের বড়ীর চরকাতে ।

‘জানো বাবাজী, এ যেন স্বপ্নের মাঝে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে আল্লার পায়ের কাছে ফেরেশতা বনে যাওয়া । আর আমার চতুর্দিকে কুমার সিং আর তার সঙ্গী-সাথী । কী সব বাঘ, কী সব সিংহ ! আমরা যেন সবাই, অশ্ব-প্রদীপ আপন আপন সেজে পলতের মতো পড়ে য়ুমুচ্ছিলুম । এল কুমার সিংয়ের দীপ্ত দীক্ষা । তাঁর আলো আমাদের এক-একজনকে স্পর্শ করে, আর আমরা প্রদীপ-শিখার মত জ্বলে উঠি । আবার আমাদের শিখা জ্বালিয়ে দেয় অন্য প্রদীপ । তাই বলছিলুম, এ তো দীপ্ত-দীক্ষা—এ তো স্পর্শ-দীক্ষা নয়, সে তো সামান্য জ্বিনিস । পরশ পাথরের স্পর্শ লেগে লোহা হয় সোনা, কিন্তু সে সোনা তার পরশ দিয়ে অন্য লোহাকে সোনা করতে পারে না,—তাই তার নাম স্পর্শ-দীক্ষা, তার মূল্য আর কি ?

‘সে কী দেয়ালি জ্বালিয়েছিলুম আমরা !

‘আর আজ, অশ্বকার অশ্বকার—সব অশ্বকার !’

হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঘোষাল দ্দ’হাত দিয়ে মদুখ ঢেকে হাটুতে মাথা গুঁজে যেন ফর্দপিয়ে ফর্দপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন ।

গুল বাহাদুর স্থম্ভিত । বয়স্ক লোক, বিশেষ করে ঘোষালের মত কটর গদর-প্রাণ লোক যে এরকম বে-এক্কেয়ার হয়ে যেতে পারে, তিনি তার জন্য তৈরী ছিলেন না । গুল বাহাদুর তখনো জানতেন না, বাঙালী কতখানি দরদী, ভাবালু, অনুভূতিপ্রবণ ।

তিনি হুপ ।

ঠিক যে রকম হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন সেই রকমই হঠাৎ মাথা তুলে হেসে বললেন, ‘কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দেবে সেই ইংরেজরই ভূত ।’ বলে ডান হাতখানা নাকের কাছে এনে বার দুই শর্কে বললেন, ‘তোঁবা, তোঁবা, এখনও গন্ধ বেরুচ্ছ ।’

পূর্বের মত গুল বাহাদুর মমতামাথা সুরে বললেন, ‘আমিও পাচ্ছি ।’

ঘোষাল উৎসাহিত হয়ে বললেন, ‘তবেই বোঝো ঠালা । ঐ ইংরেজ ব্যাটার ভূত এসে ভর করেছে আমার পাঁচ আঙুলে । তারই বোটকা গন্ধ ডেকে আনবে আর পাঁচটা ইংরেজকে, ধরিয়ে দেবে আমাকে । না হলে কে জানবে বীরভূমের

ঘোষাল আরা জেলার মহম্মৎ খান ! ভূতই শব্দ সব-কিছু জানতে পারে ।’

গদুল বাহাদুর বললেন, ‘ইংরেজ মাগ্নই জ্যাস্ত ভূত । মরে গিয়ে তার আর হের-ফের হয় না ।’

ঘোষাল একেবারে ছেলেমানুষের মত আরো যেন উৎসাহ পেয়ে বললেন, ‘যা বলেছ, গোসাই । হিন্দু মরে গিয়ে হয় ভূত, মুসলমান মরে গিয়ে হয় মামদো । কথায় কয়, “ভূতের উপর মামদোবাজী” । অর্থাৎ হিন্দুর উপর মুসলমানের কেরদানী । কিন্তু মামদোর উপর অন্য ভূত কই ? সে রকম কোন প্রবাদ তো এখনো হল না । তাহলে বাহাদুর শাহ’র উপর শেষ পর্যন্ত উপর-চাল মারতে পারবে না তো ইংরেজ । বাবাজী, তোমারই জিৎ । জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ্ !’

গদুল বাহাদুর বললেন, ‘তুমি যে বলেছিলে বাঙলাতে কিছুই নেই । কিন্তু “ভূতের উপর মামদোবাজী” তো খাসা প্রবাদ ।’

ঘোষাল গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘একেবারে কিছু নেই সে-কথা বলবে কে ? একটা জিনিস আছে সেটি মহা মোক্ষম । বাঙলার কেকতন । “হরিবোল, হরিবোল” বলে নাচন-কুদন নয় । পদকীর্তন । ওর মত জিনিস হয় না । ঝাড়া পাঁচশ’ বছর ধরে হাজার হাজার বাঙালী তার প্রেমের গীত আপন গলায় গায়নি—গেয়েছে রাধার গলা দিয়ে, কিংবা কৃষ্ণের বাঁশীর ভিতর দিয়ে । ফার্সীতে প্রেমের গান গাওয়া হয়েছে লায়লী মজনু, শীরীন ফরহাদ, ইউসুফ জোলেখার ভিতর দিয়ে—দেখতেই পাচ্ছে, বিস্তর বখরাদার, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, প্রেমটা তেন্ন জমজমাট ভরভরাট হয়নি । তাই কীর্তনে পাবে ঠাসবুনোট । তার গোড়াপত্তন হয় এইখানেই, এই কে’দুলীতেই—তবে সংস্কৃতে । জয়দেবের গীতগোবিন্দ । আমি শুনছি । বিশেষ ভালো লেগেছে, বলতে পারবো না । বড় কথার বলমলানি । আমি সংস্কৃত বদ্বিও না । কিন্তু বাঙলায় পেয়েছে ঐ বস্তুই তার আসল খোলতাই । হ্যাঁ মনে পড়লো, মুসলমান কীর্তনীয়াও বিস্তর আছে । তারই একজন আমাদেরই পাশের সৈয়দ মরতুজা ।’

গদুল বাহাদুর এ নামটি ভালো করে মনে রেখেছিলেন, শিবু মরার সময় তাঁকে বলে গিয়েছিল বলে । বললেন, ‘এ’র নাম শুনছি শিবুর কাছে । তাঁরই কে যেন কি—আনন্দী তাঁর নাম, তাঁর মেহেরবানীতে পেয়েছিল বলে শিবুর ছেলের নাম আনন্দী ।’

ঘোষাল বললেন, ‘তাই বলো । আনন্দ নাম হয়, কিন্তু ডোমপাড়াতে আনন্দী নামের হাদিস আমি এতক্ষণ পাইনি । তা সে কথা পরে হবে । এখন শোনো, এই কেকতন গান বোষ্টমদের জান-প্রাণ । আমাদের চণ্ডীমন্ডপে প্রায়ই হয় । তুমি এলে কেউ কিছু ভাববেই তো না, উল্টে তোমার গোসাইগিরি আরো ফলাও হয়ে ফুটে উঠবে ।’

গদুল বাহাদুর একটু কিছু-কিছু করে বললেন, ‘আমি তো ওসবের কিছুই জানি নে ।’

‘জানবে আবার কি ? বসে বসে মাথা নাড়বে, আর মাঝে মাঝে আহা-হা সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩)—৪

করে উঠবে। তোমাকে তো আর গাইতে হবে না। মূসলমানদের কাওলালীতে যখন হিন্দু হম্দ্ ও নাং (আল্লা রসুলের প্রশস্তি) শুনতে যায়, তখন তারা সে গীতে পৌঁধে নাকি? বেশাবনের বাবাজী বসে আছেন, ঐ তো ব্যাস্। আর হজরৎ মুহম্মদই তো বলেছেন, “মুখের উপাসনা অপেক্ষা গুণীর নিদ্রা প্রিয়ঃ।” কেস্তন চলে অনেক রাত অবধি। ভালো কেস্তনীয়া হলে তো কথাই নেই—ভোর অবধি। কথাবার্তা তখন হবে।’

কিছুরুপ চুপ করে থাকার পর ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আর কই বা আছে কথা-বার্তা বলার।’

এ-রকম নৈরাশ্য গুল বাহাদুরের সন্ধ্যা না। বললেন, ‘অতো কাতর হলো না বাবাজী। আল্লার উপর একটু বিশ্বাস রাখতে শেখো।’

ঘোষাল হেসে বললেন, ‘আমি তো বিশ্বাস রাখি গোসাই, কিন্তু আল্লা যে আমাকে বিশ্বাস করলেন না। গদরের মেওয়া তো আমার কোঁচড়ে ফেললেন না। আচ্ছা এখন তবে আসি।’

গুল বাহাদুর ফাসীতে চাপান বললেন,

‘দুঃখ করো না, হারানো ইসদুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে।’

ঘোষাল ওত্তর হাঁকলেন,

‘দলিত শূদ্র এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে ॥’

কেদুলী থেকে ডুবসাঁতারে চিকনকাল গায়ে পেঁছানো যায়। সন্ধ্যার সময় গোরুর গাড়িতে উঠে দোলানি-ঝাঁকুনির ভিতর নিদ্রা—সকালবেলা চিকনকাল। সন্ধ্যার সময় চাঁদ থাকবে পায়ের দিকে, ঘুম ভাঙলে দেখবে, তিনিও ডুবসাঁতার মেরে চিকনকাল গাঁপেরিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবডুব।

গুল বাহাদুর ভেবেছিলেন, সন্ধ্যার সময় রওয়ানা দেবেন, কিন্তু ঘোষালের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে যখন রওয়ানা হলেন তখন রাত প্রায় কাবার। দিনের বেলা গরমে গোরু দুটোর কষ্ট হবে, কিন্তু গাড়োয়ান গণি মিয়া বললে, বরঞ্চ দুপুরে গরমটা গাছতলায় কাটানো যাবে, কিন্তু এখানে খাকা নয়, ওলা বীবীর দয়া হয়েছে, অর্থাৎ কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

ওলা বীবী! সে আবার কি! গণি মিয়া পণ্ডিত নয়, তাই ঘোষালের মত এর কথায় সব-কিছু বলে দিতে পারলো না। অনেক সওয়াল করার পর বেরল, শেতলা মনসার মতো ইনি ওলাওঠার দেবী কিংবা বীবী। কিন্তু আর সব দেবী যখন হিন্দুর মোরশী পাট্টা, তখন ইনিই বা মূসলমানী হয়ে বীবী খেতাব নিলেন কেন?

গুল বাহাদুর জানতেন না, বাঙলাদেশ তাজব দেশ। ভাগ্যিস তিনি তখনো দখিন বাঙলার মাননি। সেখানে তাহলে আলাপ পরিচয় হত জলের দেবতা বদর পীরের সঙ্গে, বড়মেঞা ওরফে বাঘের দেবতা গাজী পীরের সঙ্গে।

এই ঘোষালের সঙ্গেই আলাপ করে তিনি যত না শিখলেন তথ্য, তার চেয়েও বেশী প্রশ্ন। যথা ;—

এ দেশের খানদানীরাও কিছ্‌ কিছ্‌ তাহলে গদ্বরে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন, সে কি শুধু বাঙলাদেশের বাইরে? দেশের ভিতর অন্য খানদানীদের মতিগতি তা হলে কি? তারা যদি ইংরেজকে এ-দেশ থেকে খেদাতে না চায় তবে তো কোনো কিছ্‌ করা অসম্ভব, কারণ তারা যদি নেতৃত্ব না নেয় তবে ডোম-চাঁড়ালেরা কি আপন হিম্মতে নয়া গদ্বরের তাজা বাঁসা উঁচু করতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন, এই খানদানী অর্থাৎ বামুন এবং চাঁড়ালদের ভিতর কি অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই? দিল্লীতে যে রকম ব্রাহ্মণ আর বেনের মাঝখানে আছে ক্ষত্রিয়রা? আর দিল্লীর ব্রাহ্মণ আর এখানকার ঘোষাল ব্রাহ্মণই বা মিল কোথায়? দিল্লীর বামুনরা তো করে স্রেফ পুরুতর্গারি, এ বামুন তো একদম ‘আগখুদর’ অর্থাৎ আগুনগিলনেওলা। কিন্তু মারাঠী ব্রাহ্মণ পেশওয়ারাও তো পুরুতর্গারি করে না। তবে কি তারা হাতিয়ার নেয়, না শুধু আড়ালে বসে কল-কাঠি নাড়ে?

আনন্দীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুল বাহাদুর ভাবলেন, এসব জাত-বেজাত আর তাদের ফ্যাচাও-ফেউ শিখতেই তো যাবে একটা আশু জীবন। তা আর কি করা যায়, অন্য কোনো পন্থা যখন আর নেই। আরব্য উপন্যাসের জিনও তো বোতলের ভিতর বন্ধ হয়ে কাটিয়েছিল তিনশ’ না চারশ’ বছর। পরমাঙ্গার কৃপায় তবু তো তিনি মৃত্ত—অন্তত বোতলের জিমির তুলনায়।

দূরের শালবনের ফাঁকে কে যেন ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়েছে। না, সূর্য্যঠাকুর ঘুম ভেঙে চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলেছেন? আকাশে চাঁদের আলো কখন মিললো, সূর্যের আলো দেখা দিল তিনি লক্ষ্যই করেননি। পূর্ব থেকে একটুখানি ঠান্ডা বাতাস এগিয়ে চলেছে পশ্চিমপানে দেবতার পায়ে পেল্লাম করতে। কিন্তু এ দেবতা বড়ই জাগ্রত বদমেজাজী পীর! ভক্তকে অভ্যর্থনা জানান ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে। পূর্ব-বাঙলা থেকে বেরিয়ে-আসা এই তীর্থযাত্রী পূর্ববিয়া-হাওয়াকে তিনি আদর করে গায়ে মাখেন না, উল্টে ছেড়ে দেন পচ্ছিমিয়া গরম বাতাস। আল্লাওয়াদ্দী খানের আমলে মারাঠা দস্যুর মত তারা পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসে বড়ের মত হু হু করে, ঘোড়ার খুঁরে বালি পাথর শুকনো পাতার হাজারো দ’ জাগিয়ে দিয়ে। একেবারে আকাশজোড়া নিরস্ত্র, তমসাঘন, সূর্য্যচ্ছাদিত একচ্ছত্রাধিপত্য।

দানিশপূর গাঁ ভাইনে রেখে চিকনকালো যেতে হয়। সে গাঁয়ের বাইরে আসতে-না-আসতেই গাড়ির উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল চৌবাট পবন মারাঠাদের চৌবাট হাজার হস-পাওয়ার নিয়ে।

সামাল সামাল বলতে-না-বলতেই, গোরু গাড়োয়ান, গুল বাহাদুর খান কারো কোনো খবরদারী হাঁশিয়ারীর তোয়াক্কা না করে গাড়ি ঢুকলো দানিশপূর গাঁয়ের ভিতর। তারপর বাঁ দিকে চক্কর খেয়ে শিমূল পলাশ মহরয়ার আড়ালের

এক আঙ্গিনায় গিয়ে ছিটকে ফেলে দিলে আনন্দী, গুল বাহাদুর, গণি মিয়া মায় দুটো গোরুকে একে অন্যের ঘাড়ে। মায়ের সুপুত্র যে রকম বস্তা বস্তা চাল ডাল নুন চিনি আঙ্গিনায় আছাড় মেরে হুংকার দিয়ে কর, 'দেখো, মা, তোমার জন্যে কি এনেছি।' কোথায় লাগে এর কাছে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বাড়ি এনে মাতা কুন্তীকে আনন্দ সংবাদ জানানো!

চতুর্দিকে, আকাশ বাতাসে তখন লাল ধুলো-বালির ভূতের নৃত্য। ঝড়টা এমনি অসময়ে এবং অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছে যে ধূর্ত বায়সকুল পর্যন্ত আগ্রহ নেবার ফুসত পায়নি। সেই ঝড়ের তীর সিটির শব্দের ভিতরও ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে উঠছে তাদের তীক্ষ্ণ মরণাহত আতঁরব।

গুল বাহাদুর সব-কিছু ভুল উল্লসিত বদেহ বলে উঠলেন, 'শাবাশ, শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ; একেই বলে হামলা। বিলকুল বে-খবর এসে বে-এজ্জয়ার করে দিল দৃশমনকে।'।

গোর দুটো গাড়ি থেকে খালাস করে আনন্দীকে কোলে করে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তরে কর্ণধেরের দাওয়াতে উঠতেই গুল বাহাদুরের চোখ পড়ল আরেক ঝড়। ঝড়েরই বেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনায় এল এক রমণী। শাড়ির এক অংশ কোমরে বাঁধা, দীর্ঘতর অংশ সোজা উঠে গেছে আকাশের শূন্যে, মাথার চুলও উঠেছে আকাশের দিকে তালগাছের সঙ্কলের উঁচু পাতাটার মতো ঢপ নিয়ে। তার বগলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা। এই লালচে অশ্বকারের ভিতরও গুল বাহাদুরের নজরে পড়লো ছাগল-বাচ্চাটার দুটো ভয়াতঁ চোখ। আর, আর তার পাশে, একে অন্য থেকে বেশ দূরে আরও দুটি লাল-কালো চোখ। মেয়েটি আসমান থেকে শাড়ি নামিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা না করে সোজা উঠলো ঘরের দাওয়ায়। ঝটাৎ করে শিকলি খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে এক লহমার তরে দরজা ফাঁক করে ধরলো। এহেন প্রলয় নৃত্যের ওস্তে 'আপ যাইয়ে,' 'আপ বৈঠিয়ে' বলে কে? পেছন থেকে গণির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে গুল বাহাদুর পড়লেন মেয়েটার উপর। সে চোট না সামলাতে পেরে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জাবড়ে ধরলেন দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মেয়েটা 'আ মর মিনষে' ঐ ধরনের কি যেন একটা বললে। ইতিমধ্যে গণি মিয়া কোনো গতিকে দরজাতে হুড়কো দিয়ে ফেলেছে।

ভিতরে ঘোরঘুটি অশ্বকার। শুধু চালের সঙ্গে যেখানে মাটির দেয়াল লেগেছে তারই ফাঁক দিয়ে কেমন যেন একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ে আগুন লাগলে রাতের বেলা অশ্বকার ঘরে যে-রকম বাইরের আগুনের আভাস পাওয়া যায়, বিদ্যুৎ ঝলমল করে উঠলে সঙ্কলের মূখের উপর সোনালী আবীর মাখিয়ে দেয়।

একটা মোড়া ঠেলে দিয়ে রমণী বললে, 'বসো গোঁসাই।' গণি এক কোণে চ্যাটাইয়ের উপর বসেছে। আনন্দী গুল বাহাদুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভীত নয়নে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে।

গুল বাহাদুর দিল্লী শহরে বিস্তর খাপসুরে রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কী

মেয়ের ড্যাভডেবে চোখ, খানদানী পাঠান মেয়ের ধনুকের মত জোড়া ভুরু, নিকষি কুলীন ইরাণী তস্বঙ্গীর দোলায়িত দেহসৌন্দর্য, এমন কি প্রায় অমিশ্র আর্থকন্যা ব্রাহ্মণকুমারী সরল বদ্বন্দীপ্তশাস্ত্রসৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আজ যে রমণী তাঁর সামনে আধা আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাভণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছ'শ বছরের মিশ্রণের সত্ত্বগাত। এর গায়ের রঙ এদেশের কচি বাঁশপাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গিয়েছে পাঠান-মোগলের কিঞ্চিৎ তাঁবা-হলুদের রঙ। চুল ইরাণীদের মত কালো হয়ে গিয়ে যেন নীলের ঝিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আটসাঁট গড়নে—সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয় এর দেহ তৈরী হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে কোনো জায়গায় এক চিমটি ফালতো চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ির আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে দিল্লীর তস্বঙ্গী তার ইজের-বস্ত্র কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।

প্রথম তারুণ বয়সে গুল বাহাদুর যখন সবে বৃদ্ধিতে আরম্ভ করেছেন যুবতীর দেহে কি রহস্য লঙ্ঘায়িত রয়েছে, তখন তাঁর এক ইয়ার তাঁকে একখানা চিত্রিত ইউসুফ-জোলেখার বই দিয়েছিল। পাতার পর পাতা উঠে সে বইয়ে তিনি দেখেছিলেন শিপ্পী কি ভাবে প্রতি পাতায় জোলেখার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উন্মাতন করেছেন। প্রতি ছত্র, প্রতি রঙ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে তখন কি অপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল। রোমাঞ্চ কলেবরে কাটিয়েছিলেন অধেক যামিনী।

আজ ঠিক সেই রকম বিদ্যুতের প্রতি ঝলক যেন মেয়েটির সৌন্দর্য পাতার পর পাতা খুলে তাঁর মৃদু আঁখির সামনে তুলে ধরছিল। আর চতুর্দিকে তখন ঝঞ্জা-বাত্যার প্রলয় নর্তন। তারই মাঝখানে এই কমলিনীর ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-বিকাশের মন্দমধুর প্রস্ফুরণ।

কিন্তু আজ আর প্রথম তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চ শিহরণ গুল বাহাদুরের দেহে মনে হিম্মোলিত হল না। আজ এই সৌন্দর্যের পট পরিবর্তন তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন—শান্ত মনে, সমাহিত চিত্তে।

বিদ্যুতালোকে গুল বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে রমণী শূদ্রালো, ‘কি দেখছ গোসাই?’

অতিশয় অনাবশ্যক প্রশ্ন। কণ্ঠে লজ্জা দেবার কিংবা পাওয়ারও কোন রেশ নেই। এমন সময় আকাশ থেকে ককড় করে নামলো শূকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি। গুল বাহাদুরকে কোনো উত্তর দিতে হল না।

মেয়েটি মাটিতে বসে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মূখের দিকে আবার তাকালো। চিবুক যে জোড় হাঁটুর উপর রাখবে তার যেন উপায় নেই। মাঝখানে সূর্যবপুল মন্ময় মর্ম-বিগ্রহ যুগল।

হঠাৎ রমণী দু'বাহু তুলে থোঁপা বাঁধতে বাঁধতে গুল বাহাদুরকে শূদ্রালো, ‘গোসাই, তোমার বয়স কত?’

যেন প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পাণ্টে শূদ্রালেন, ‘কোন বয়স?’

রমণী হেসে উঠলো। বললো, ‘সে আবার কি? বয়স আবার কত রকমের হয়?’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘অনেক রকমের হয়। আমার বয়স তেইশ।’ গদরের নৈরাশ্য এই নাতিদীঘ ‘তেইশকে যেন কত দীঘ’ তেইশে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

এবারে রমণী খল খল করে হেসে উঠলো। ‘ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, তোমার বয়স তেইশ। আমার-ই তো এক কুড়ি হয়!’

গুল বাহাদুর চমকে উঠলেন। এ মেয়ে কি মুসলমান? শুধালেন, ‘তোমার নাম কি?’

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, ‘তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম! লোকে বলে “মিছার মা”।’

‘সে আবার কি?’

‘বুঝলে না? আমি সাদ্চা মা নই, তাই আমি মিছার মা!’

বৃষ্টি নেমেছে দেখে গণি মিয়া গাড়ি-গোরুর খবর নিতে বাইরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ সে কোন কিছুতে কান দেয়নি। এবারে একটুখানি দাঁড়িয়ে গুল বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তোমাকে যা তা বলছে, বাবাজী। ওর নাম আসলে মিঠার মা।’

মিঠার মা গণির দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে বললে, ‘হ্যাঁরে গণ্যা, আমি যা তা বলি? আমি মিছার মা না তো কি? আল্লার কীরে কেটে ক’ তো?’

গণি বাইরে যেতে যেতে বললে, ‘তা তুই নিকে করে বাচ্চা বিয়ালেই পারিস।’ গুল বাহাদুরকে বললে, ‘আসলে ওর নাম মোতী।’

গুল বাহাদুর ভাবলেন, ‘এ-নাম যে দিয়েছেন সে আর যাই হোক মিছার বাপ নয়— সত্যি নামই দিয়েছে। কিন্তু এর জাত কি তার হাদিস গুল বাহাদুর তখনো পেলেন না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই পাওয়া গেল। তাও অনায়াসে।

আনন্দী বললে, ‘দাদু, জল খাবো।’

মোতী শুনতে পেয়েছে। ভাবখানা যেন শুনতে পারনি।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘মোতীর মা, একে একটু পানি খেতে দাও।’

মোতীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, ‘আমি যে মুসলমান।’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘তুমি পানি দাও।’

মোতী চীনে মাটির বাটিতে করে আনন্দীকে জল দিলে। সঙ্গে দুটি বাতাস। গুল বাহাদুরের কাছে এসে বললে, ‘এ তো তোমার ছেলে নয়, ঠাকুর। কার ছেলের জাত মারছো?’

এই জাত মারামারিতে গুল বাহাদুর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, ‘শিবু মোড়লের ছেলে। ও জাত—’

আনন্দের চোটে আনন্দীকে জড়িয়ে ধরে মোতী বললে, ‘কোম্ভাব মা, তুই

শিবুর ব্যাটা। তাই ক। কি খাবি বল।’

মোতীর মা ভারী খুশি। অচেনাজন চেনা লোককে যখন চেনে তখন আর সে অচেনা নয়। আসলে তাও নয়—চেনা-অচেনার পার্থক্য মোতীর মা কখনো করেনি। মোতী খুশী হয়েছে, কথা কইবার মতো দুজন্যাই একজন চেনা লোক পাওয়া গেল বলে। গুল বাহাদুরকে বললে, ‘ওর কথা আর তুলো না, গোসাই, ওর মত হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে এ মল্লকে দু’টো ছিল না। ক’ বছরের কথা? আমার সোয়ামী রেখেছে রোজা, জন্ঠি মাসের গরমে। ইফতারের জন্য আমি করেছি শরবৎ। র র, থাম্ থাম্ বলতে না বলতে শিবু মেরে দিল বেবাক ঘটি। ওর আবার জ্ঞাত। ওর জ্ঞাত মারে কে?’

তারপর গুল বাহাদুর প্রায় গা ঘেঁষে বসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলো, যেন কতই না লুকনো কথা, ‘ওর জ্ঞাত ছিল সোনা বাঁধানো। এক ঘটি তে’তুলের শরবৎ ঢাললে তার জেল্লাই বাড়ে বই কমে না। আর আসলে ছিল, আমারই মত বন্ধ পাগল। জানো আমার বিয়ের দিনে এক জালা তাড়ি খেয়ে এসে জুড়ে দিল কান্না। আমার বাবা নাকি তাকে বর্লোছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। সবাই হেসে গড়াগড়ি। শেষটায় আমার মামা বললে, “তা মোড়ল, বিয়ে করবে তো তোমার পাটরাণীকে খবর দাও তিনি এসে বাঁদী বরণ করে নিয়ে যাবেন।” যেই না শোনা অমনি শিবু জল। নেশা কেটে পানি হয়ে গেল। শিবুর বউ ছিল এ তল্লাটের খান্ডার। মারমুখী বসুঁটদা। তারপর শিবু গলায় ঢোল ঝুলিয়ে শূরু করল নাচতে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে সেদিন যা হাসিয়েছিল। বিয়ের পর আকছারই আসতো আমাদের বাড়িতে। “কই গো নাগর” বলে আমার সোয়ামীর হাত থেকে হুকো কেড়ে নিয়ে একদমে দিত ছিলিম ফাটিয়ে। আসলে ও খেত বড়তামাক।’

গুল বাহাদুরের দুঃখ আরো বেড়ে গেল। এরকম একটা গুণরাজ খান চলে গেল। আর কেউ যেতে পারলো না?

মোতী আরো গলা নামিয়ে বললে, ‘কিন্তু জানো ঠাকুর আমার সোয়ামী চলে যাওয়ার পর একদিনও এ বাড়িতে আসেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেল। তখন আমায় মনের কথা বললে। ওরা দুজনে নাকি কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে যাবার মতলব করেছিল। তারপর শিবু কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে বেশী দিন বাঁচলো না। কিন্তু ওসব কথা আর কেউ জানে না।’

বাইরে আস্‌মান-ফাটা বরসাৎ নেমেছে, হাওয়ার মাতামাতি বন্ধ হয়ে গিয়ে চাল দিয়ে জলের ধারা ঝালরের মত ঝুলে পড়ছে। গণি মিয়া হাওয়ায় বসে আছে গালে-হাত দিয়ে। বাইরে জলের ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিঠার মা তার বড় বড় ডাগর চোখে—শুকনো চোখে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ‘লোকে যে আমায় পাগলী বলে, ভুল বলে না। তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছ এ বাড়িতে, আর আমি একবার জিজ্ঞেসবাদও করছি, তোমার সেবার কি হবে?’

গদুল বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, ‘তার জন্যে তুমি চিন্তে করো না, মিঠের মা। গাড়িতে চিড়ে মর্দি আছে। না হয় তুমিই কিছু দেবে।’

অবাক হয়ে মোতী শূধালে, ‘তুমি জ্ঞাত মানো না?’

একটুখানি ভেবে নিয়ে গদুল বাহাদুর বললেন, ‘আমার ধর্মে জ্ঞাত মানামানি বারণ।’

মোতী প্রথম একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বললো, ‘বুঝেছি। খুচব যারা উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না। আমার বাপের বাড়ির পাশের গায়ে বামুনরা থাকতো। ভয়ঙ্কর-জাত-বামুন। আমার বাবা বলতো, তাদের কেউ কেউ নাকি জ্ঞাত মানতো না। বাবার হাতে তামাক খেত।’

গদুল বাহাদুরের জানবার ইচ্ছে হল, এই ছোঁয়াছড়ায়ির ব্যাপারটা মোতী কোন্ চোখে দেখে। শূধালেন, ‘এ জিনিসটে কি ভালো?’

মোতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ‘কি জানি—ভালো, না, মন্দ। যার যেমন খুশি। আমাদের পীর সাহেবও তাঁর বীবীর হাতে ছাড়া খান না। ভালোই করেন নিশ্চয়। তিনি যা জায়গা-বেজায়গায় নিতিনিতি আড়াই কুড়ি ষাওয়াত পান, ওসবের সিকিটাক খেলেও দেখতে হত না। ঐ হোথায় বাসা বাঁধতে হত। সেখানে আবার বাবুচী’খানা নেই।’ বলে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল।

গদুল বাহাদুর বুঝতে না পেরে বললেন, ‘কোথায়?’

ডান হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে, বাঁ হাতে থোলা দরজা দিয়ে কোথায় যেন দোঁখিয়ে দিলে। গদুল বাহাদুর তবু বুঝলেন না।

‘গোরস্তান, গো, গোরস্তান। ঐ যেখানে মিছার বাপও ঘুমুচ্ছে।’

গদুল বাহাদুর মরমী, দরদী লোক নন—অস্তুত এই তাঁর বিশ্বাস। তবু শূকনো মুখে বললেন, ‘কেন তুমি এ ধুংখের কথা বার বার তুলছো মিঠার মা?’

মোতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। দু’হাত জুড়ে বললে, ‘মাপ করো, গোসাই, কিন্তু ধুংখের কথা বললো কে? ও তো ওখানে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। আর যাবার সময় ও তো ভারী হাসি মুখে গিয়েছে। চোখ বুজলো, কিন্তু ধুংখের হাসিটুকু মিলালো না। জিজ্ঞেস করো না, এই গায়ের পাঁচজনকে, যারা তাকে গোসল করালে কাফন পরালে।’

‘থাক।’

‘হ্যাঁ, থাক। দাঁড়াও, আনন্দীর গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে আসি।’

তারপর ধুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

গদুল বাহাদুর মাঝে মাঝে থোলা দরজা দিয়ে দেখছিলেন, জল ধরার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। মোতী লক্ষ্য করে বললে, ‘সে আশা ছেড়ে দাও আজ। জল ধরলেও বেরতে পারবে না। এ গাঁও গাঁর মাঝখানে যে খোয়াই তার ভিতর বিষ্ঠি থেমে ষাওয়ার পরও জল যা তোড়ে বয় তাতে হাতী ভাঁসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কত শ “দু”। একবার একটাতে মজে গেলে বিনা

মেহমতে বোরিয়ে যাবে এক ঝটকায় ঐ দূরের অজয়ে, তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। না, থাক্। ওসব কথা তুমি ভালোবাসো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। সামলে-সুন্দলে কথা বলতে হয়।

গুল বাহাদুর বললেন, ‘তুমি তো কিছ্ খেলে না।’

‘আমি তো দিনের বেলা খাই নে।’

‘সে কি? তামাম বৎসর রোজা রাখো নাকি?’

‘ঐ দুই ঈদের ছটা দিন বাদ দিয়ে। তবু দেখো তো গতরখানা।’

ছাড়-পত্র পাওয়ার পূর্বেও গুল বাহাদুর অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তবু নতুন করে ‘গতরখানা’ দেখে খুশীই হলেন। কোনো প্রকারের সহানুভূতি জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, ‘কার ওজন কতখানি তাই মাপবার জন্য ভগবান দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে স্বর্গে বসে থাকেন না।’

মোতী বললে, ‘হক্ কথা। কিন্তু আমাদের একটা মদুশী-দীয়া গীত আছে, ঐ নিয়ে। শুনবে?’ বলেই গুন গুন করে ধরলে—মিষ্টি গলায় কিন্তু কেমন যেন কান্না ভর-ভর সুরে—

দীপ নাই শলিতা নাই,

জ্বলে শখের বাতি

কইয়ো গিয়া মদুশীদের ঠাই।

জ্বলে দিবা জ্বলে রাতি

কইয়ো গিয়া ও ভাই—

ঘরে ফিরে, এখানে ধরে, ওখানে ছেড়ে, আবার নতুন করে ধরে মোতী অনেকক্ষণ ধরে গানটি গাইল। সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ঝরঝর বারিধারা যে রকম সহজ পথে আকাশ থেকে নেমে আসে, এর গানও হৃদয়ের উৎস থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রসকবছরী গণি-মিয়া পর্যন্ত সুরে এসে চোকাঠের কাছে বসেছে।

গুল বাহাদুর গানের পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু রস পেতে খুব যে অসুবিধে হল তা নয়। বাচ্চারা যে রকম গল্প শোনার সময় ভাষার দৈন্য কল্পনা দিয়ে পুঁষিয়ে নিয়ে পুরো রসই পায়, নতুন ভাষা শেখার সময় বয়স্ক লোকও তাই করতে পারে, যদি সে ইতিমধ্যে কল্পনা-শক্তি হারিয়ে না ফেলে থাকে। ‘জ্বলে শখের বাতি’ বলার সময় মোতীর দেহ যেন আরো সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর ‘দীপ নাই শলিতা নাই’ গাইবার সময় মোতীর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, গুল বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন।

তবু বললেন, ‘বুঝিয়ে বলো।’

‘এতে আবার বোঝাবার কি আছে! গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহেশ্বর দরদের তেল শলতে নেই ভিতরে, তবু দেহের বাতি জ্বলছে। তা আবার খামোখা দিনের বেলাও জ্বলে। তাই তো তোমাকে বলছিলাম, “গতরটার পানে চেয়ে দেখো।”

গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, ‘দেশের প্রতি ভালোবাসা, অত্যাশংসর্গ

করার তেল শলতে তৈরী করেই আমরা জ্বালিয়েছিলুম গদরের প্রদীপ। সে মিথ্যা, মায়া ফানী।’

কিন্তু মোতীর এই সুন্দর দেহ। এর ভিতরে সুন্দর হিম্মার প্রদীপ নেই—
অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বললেন, ‘মোতী, সবই ভগবানের দান। তাক্ষিলা করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও বাড়াবাড়ি করতে নেই। মীরাবাদীরে ভজন তুমি শুনছে,

‘নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল-জস্তু আছে ঢের
কামিনী ত্যজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।’

মোতী গদগদ কণ্ঠ বললে, ‘এ তো ভারী মধুর, গোসাই। আমি কখনো শুনিনি।’

যমুনার পারে রাজপুতানার এক বৈরাগী মীরার ভজন গাইত। গুল বাহাদুর আনমনে তার গান শুনছেন, মাঝে-মাঝে, কিন্তু সে গান যে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। ভক্তিরস, ভাবালুতা গুল বাহাদুর কখনো খুব নেকনজরে দেখেননি। বাড়াবাড়ির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আজ তবে চলি, মিঠের মা। খোয়াইয়ের জলটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে। গণি আর আনন্দী রইল। কাল সকালে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিযো।’

মোতী বাধা দিল না। গোয়ারদের নিয়ে তার জীবনের কেটেছে অনেকখানি—তার বাপ-ভাইরা ছিল এক একটি দুর্দে গোয়ার।

শিমুলতলায় এসে শুধু গম্ভীর কণ্ঠ বললো, ‘আচ্ছা গোসাই, একটা কথার উত্তর দেবে? এই গণির স্বভাব-চরিত্র কি তা তুমি জানো না। সে আমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনো আপত্তি নেই। সে আমাকে নিয়ে যা-খুশি করুক। কিন্তু তুমি থাকলেই আসমান মাথার উপর ভেঙে পড়ে। কেন বলো তো। ছোটজাতে ছোটজাতে যা-খুশি করুক—নয় কি?’

সত্যি বলতে কি, গুল বাহাদুর পরিস্থিতিটা এভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। কিন্তু মোতীর কথাগুলো এমন সোজাসুজি তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মগজের উপর ঠনাঠন হাতুড়ী পিটিয়ে দিল যে তাঁকে চিন্তা করে কথাগুলো বুঝতে হল না। প্রথমটায় থমে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ‘তোমায় সত্যি বলাছি, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অতখানি চিন্তা করে এ-ব্যবস্থা করিনি। বোধ হয়, এ ব্যবস্থা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি যে কারণটা দেখালে সেটাও হয়তো ঠিক, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তবে বলবো, আমি ভুল্লোক সাধারণ লোক সকলের সঙ্গেই মিশেছি এবং এ-ব্যবধে আমি গণি মিয়াদের ঢের-ঢের বেশী বিশ্বাস করি। এদের হ্যাংলামো অনেক কম। গরীবের সুন্দরী মেয়েকে মোকায় পেলে “ভুল্লোক”—

এর মাথায় বধ-খেয়াল চাপবেই। ভদ্রলোকের মেয়ে হলেও তাই—তবে সেখানে একটু লাইসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তাই দেখো, ভদ্রলোকের মেয়েকেও আমরা চাকর-বাকরের হেপাজতিতে রাখা পছন্দ করি।—আর—’

‘থামলে কেন? বলো।’ কঠিন গলা একটু মোলায়েম হয়েছে বলে মনে হল।

‘আর গণি ভালো-মন্দ কিছু একটা করতে গেলে তাকে যে রকম ঠাস করে তুমি চড় মারতে পারবে, আমাকে কি—’

ধমক দিয়ে বললে, ‘থাক থাক। কে কাকে চড় মারতো কে জানে!’ বিকেল বেলার বৃষ্টিশেষের কনে-দেখার আলো সবটুকু মুখে মেখে এতক্ষণ-গোপন-রাখা তার সবচেয়ে মিষ্টি গলায় বললে, ‘তবে এসে ঠাকুর।’

*

*

*

জলের তোড় গুল বাহাদুর অতি উত্তমরূপেই দেখলেন। বাদশা মুহম্মদ তুগলক যে রকম দিল্লীর জাহানপানা শহরে সাততলা মণ্ডের উপর বসে তাঁর হাজার হাজার সৈন্যস্রোত বয়ে যেতে দেখতেন অর্থাৎ এর্থাৎ একটা উঁচু ঢিপি়র উপর বসে জলের তোড়, স্রোতের দ্দ’, উঁচু উঁচু ঢিপি়র উপর রাগী ডেউয়ের ছোবল তাবৎ বশতুই দেখলেন, এবং তার চেয়েও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন, মোতীর—মিছার মা’র কথা গম্প নয়। এর যেখানে হাঁটুজল সেখানেও দাঁড়ায় কার সাধ্য?

সম্ভার সময় আবার বৃষ্টি নামলো। ষোড়শীর রাত কিন্তু মেঘে মেঘে সব অন্ধকার। সমস্ত রাতটা কাটাতে হল ঢিপি়র উপর।

অভিসম্পাত দিতে দিতে বললেন, ‘মহাজনগণ বলেছেন, মেয়েদের বৃষ্টিতে চলো না। হক্ কথা। কিন্তু না চললে কি হয় তাও বেশ টেরাট পেলুম। ওদের কথা শুনলে বিপদ, না শুনলে আরো বিপদ। এ জাতটাই বজ্রাৎ।’

॥ ছয় ॥

কোঁতুল চেপে না রাখতে পেরে পান্ডোরা খুলে ফেললে কোটোটি, আর অর্মানি তার থেকে পিল পিল করে বেরোতে লাগলো দ্বংখ, দৈন্য, দর্ভিক্ষ, মহামারী, আরো কত কী—আর তারই চোখের সামনে ছাড়িয়ে পড়লো ভুবনময়। পান্ডোরা ভয়ে ভয়ে যখন ভিরমি যাবো-যাবো করছে তখন সর্বশেষ বেরলো—আশা। তারই জোরে মানুষ সব দ্বংখদৈন্য নয়। আত্মহত্যার দৃঢ় দাঁড়িতে নিজেকে না ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে সেই আশার ক্ষীণ সুতোটিতে।

সুদলেমন যখন তাঁর স্বাধিকার-প্রমত্ত জিন্কে শাস্তি দিয়ে বোতলে পুরে সমুদ্রে ফেলে দেন তখন তাকে পান্ডোরার শেষ দৌলতটি নিতে বাধা দেননি। সেই তাঁর চরম করুণা। জিনি যদি বোতলের ভিতর বন্দীদশার প্রথম প্রহরেই জানতে পেত তাকে ক’শ বছর ধুর বোতলের ভিতর প্রহর নয়—শতাব্দী গুণতে হবে, সে নিশ্চয়ই থ্রম্বসিসে মারা যেত।

গুল বাহাদুর যদি চিকনকালাতে আশ্রয় নেবার দিন জানতে পেতেন, তাঁকে ক'ব্দগ ওখানে কাটাতে হবে, তাহলে তিনি নামাবলীতে ফাঁস লাগিয়ে খুলে পড়তেন। পাণ্ডারার যে ক্ষীণ অংশটি নিয়ে তিনি নামাবলী গায়ে দিয়েছিলেন, সেটি গুরুই মত এত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে ওটিকে আর পরা চলে না।

কিন্তু

কেশের আড়ালে জেছে

পর্বত লুকাইয়া রৈছে

ঠিক তেমনি তাঁর দিন-আনি-দিন খাই-য়ের আড়ালে আশা-নিরাশা সবকিছুই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সেটা দিব্য যেন ক্লোরফর্ম কিংবা আফিওর কাজ করে যাচ্ছিল। পরম ধার্মিকজনও যখন দিনযামিনী এটা-সেটার চিন্তায় মশগুল থেকে শেষের দিনের কথা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যেতে পারে, তখন সামান্য প্রাণী গুল বাহাদুর যে পলাশতলায় খাটিয়ার উপর শুয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবেন তার আর বিচিগ্র কি?

কালটাও ছিল ধীরমুহুর। কারো সঙ্গে দেখা করতে হলে তোড়জোড় করতেই লেগে যেত তিন মাস। বিয়ের আলাপ পাকাপাকি করতে নিদেন তিন বছর। এমন কি মরার সময় গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে সেখানে দিনসাতেক না কাটালে মরুদ্বীপীরা রীতিমত বেজার হতেন। অত তাড়া কিসের রে বাপু? দু-পাঁচ দিন হরিনাম শুনবি, চন্দন বেটে ধীরেসুস্থে সর্বাস্থে হরিনাম ছাপা হবে, ইষ্টকুটুম খবর পেয়ে ঘরসংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখা করতে আসবে, শুনতে পারবি কবে যাবি, ক'দিন আর আছিস তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে, বাজী ধরা হচ্ছে;—তা না, চললি হুট করে যেন ডাক পড়ার পূর্বেই হাড়-হাবাতে আপন হাতে আসন পেতে বসে গেল যজ্ঞের দাওয়াতে। কিংবা যেন বাসর ঘরে পাঁচজনের সামনে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ফেললি কনে বউয়ের ঘোমটাখানি। কিংবা তারো বেশী।

হিসেব করো দিকনি গুল বাহাদুর, শাস্ত মনে—শুদ্ধ-বুদ্ধ চিন্তে। ক'বছর হল? দশ, বিশ, ত্রিশ? পিছনের দিকে না সামনের দিকে? তুমি বসে, আর তারা সামনে দিয়ে চলে গেল, না তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছ, না পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছ? না তুমি কাজের মাঝখানে এমনি যোগসাদনায় তুরায় ভাব অবলম্বন করেছিলে যে কাল, না কাল কেন, হেন স্বয়ং মহাকালই ধূজাটির জটোর ভিতর প্রথম উর্বশীর মত বেশ খানিকটা নেচে কুঁদে, তারপর গঙ্গার মতন এদিক ওদিক পথ না পেয়ে বিষ্ণুর মতন উদ্ভম ডানলোপিলোর বিছানাতে অনন্ত শয়নে নোতিয়ে পড়েছেন?

কে জানে কি হয়? যেখানে বছরে একদিনও স্মরণ করতে হয় না আজ কোন তারিখ, সেখানে একটা বৎসরই একদিন। আর যেখানে দিনে বারিশবার স্মরণ করতে হয় আজ অমুখ তারিখ, সেখানে একটা দিনই এক বৎসর। কে জানে সময় কোন দিক দিয়ে যায়? দশ, বিশ, ত্রিশ বৎসর।

এই মোতীর সঙ্গেই আবার দেখা হতে লেগে গেল দেড় মাস।

সকাল থেকেই পূর্বের আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—সাঁওতাল দেশের সাঁওতালী মেয়ের গায়ের রঙ মেখে। মেঘের পর মেঘ জমেই উঠেছে। যেন আকাশের ভরা গেলাসে পর্জা না এক এক ফোঁটা করে জল ঢালছেন আর দেখছেন, এইবার উছলে পড়ল কি না। ক্ষণে ক্ষণে কালো মেঘের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যাতের ঝলমলানি। যেন ঐ সাঁওতালনীরই শ্যামবদনে টগর-ফুলের সফেদ হাসি। কিংবা যদি ইন্দুপদুরীতেই ফিরে যাই তবে মনে হবে, মেঘের কালো টানার উপর উর্বশী বিদ্যাতের রূপোর পোড়েন টানছেন, বাসররাতের কাঁচুলির কিংখাপ বুনতে। নাঃ! এ সব তুলনাই অতি কাঁচা। মোক্ষম তুলনাটির চড় বিশ্বসাহিত্যের গালের উপর মেরে দিয়ে গিয়েছেন রাজা শূদ্রক। বিদ্যাৎ যেন শ্যামাব্দ নীলকন্ঠের গলা জড়িয়ে গোরীর শূভ্রধবল বাহুলতা।

গোরী ভূজলতা যত বিদ্যাবল্লভেব রাজতে

হায় রে শূদ্রক! একটু টেনে সামলে উপমাগুলো ছাড়লে না কেন হে পৃথ্বীরাজ, কাব্যসম্রাট? এ যুগের মধ্যমজনকেও যে একদিন রসসৃষ্টি করে নিন্দক সঞ্জয় করতে হবে সেটা কি তিনি খেয়ালই করলেন না? রাজা হলেই কি এ রণম দান করতে হয়? তাই দেশের রাজা হাতিমতাই অন্নদান করে হয়েছিলেন অন্নরাজ, কিন্তু তিনিও তো বাঁচির ধান খাইয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিরন্ন করে যাননি। উপমার বেলা শূদ্রক শেষে নবান্নের বাঁচিও যে খতম করে গেলেন।

তা যাক্। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রেম, বিশেষ করে আসঙ্গলিঙ্গসা—এ জগৎ থেকে এখনো লোপ পায়নি।

গদুল বাহাদুর দেখলেন, তেপান্তরী মাঠ যেখানে ফালি হয়ে বাঁ দিকে ঢুকেছে, তারই অপর প্রান্তে, মেঘের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে একটা উঁচু ঢিবি়র উপর ক্ষণিকের তরে দাঁড়ালে। মাঠ-ঘাট জনহীন। বৃষ্টি নামি-নামিছ, নামি-নামিছ করছে। এ অবেলায় লোকটার আহম্মুখী দেখে গদুল বাহাদুর ভূরু কোঁচকালেন।

আধা আলো-অন্ধকারে বেলা কতখানি গাড়িয়েছে ঠাহর হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে গদুল বাহাদুর আনন্দীকে শূধালেন, ‘কি খাবে আনন্দী?’ দিগ্বীতে ‘তুই’ ‘তু’ শব্দটা প্রায় উঠে গিয়েছে।

আনন্দীর আটপোরে পাশাকী একই মেন্দু। বললে, ‘খিচুড়ি আর আলুর দম।’ ঐ একটি মাত্র রান্না যার সঙ্গে দিগ্বীর রান্নার কিঞ্চিৎ ঐক্যসখ্য আছে—গরম মশলার কপাতে—অবশ্য আনন্দীর অজান্তে। গদুল বাহাদুর সাজ-সরঞ্জামের চতুরঙ্গ বাঁহনী তোড়জোড় করে যোগাড় করতে লাগলেন। আনন্দী কখনো মায়ের আদর পায়নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে বাপের ধাতানি। সেও এটা সেটা যোগান দিতে লাগলে।

বৃষ্টি নামবার আগে আরো কিছুটা জল এনে রাখলে ভালো হয় ভেবে গদুল বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। দাওয়ার এক প্রান্তে খঁটিতে

হেলান দিয়ে মোতী বসে।

‘তুমি!’

নিরন্তর।

‘কখন এসেছে? ডাকলে না কেন?’

দেওয়ালের থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, ‘তুমি আমাকে টিপি উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেলে কেন?’

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, ‘তাজ্জব কী बात! অতদূর থেকে আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আমি ভাবলুম—’

‘দিত্য, দানো, মামদো! তোমাদের কাছে সব মুসলমানই মামদো, না?’

গুল বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, ‘এ কী জ্বালা! হিন্দু নই, তবু হিন্দু অপরাধের হিস্যে আমাতেও অর্সায়?’

গম্ভীর মুখে বললেন, ‘তোমাকে আমি বলিনি, আমার ধর্মে জাত মানা-মানি বারণ। চলো ভিতরে, ঐ দেখ বৃষ্টি আসছে।’

এবারে মারাঠা সৈন্যের অতর্কিতে আক্রমণ নয়। দূরদৃষ্টি থেকে হেল-দুলে বিলম্বিত তালে এগিয়ে আসছে আকাশ-জোড়া পাতাল-ছোয়া শ্যামসুন্দর মেঘ-বৃষ্টি। এই রকম অগণিত করীয় সমাবৃত গাঙ্গেয় চন্দ্র অগ্রসর হচ্ছে শূন্যেই আলেক্সান্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমীচীন গণনা করেছিলেন।

এবারে মোতী খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিছুতেই থামতে চায় না। যেন পেটের ভিতর হামানদিস্তে দিয়ে কেউ পাথর কুটছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাস্থে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে কাঁপন। গায়ের বসন যেন সে কাঁপন সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কার যেন বিরহ-বেদনায় কনকবলয়লগ্ন, অর্থাৎ বাজু-বন্দ খোল খোল যাউত হয়েছিল, আজ হাসির হররায় এ রমনীর বসনাঙ্গলপ্রাস্ত বিস্রম্ভ। এবং স্মরণ রাখা কর্তব্য, গ্রামাঙ্গলে অঙ্গল প্রায়শ উপকর্ষিত থাকে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, ‘ঠাকুর, তুমি মস্করা-ফিস্করি একেবারে বুঝতে পারো না। ওদিকে কথা কও পাকা পাকা। তুমি একটি আস্ত মেড়া।’ তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, ‘আল্লা করুন, তুমি ঐ রকম মেড়াই থাকো।’ আল্লার স্মরণে ডান-বাহু উঁচুতে তুলে আঁচল দিয়ে ঘোমটা টানলে। আজান শুনলে বাঙালী মুসলমান মেয়ে যে রকম করে থাকে।

ওদিকে তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গুল বাহাদুরের ধুলো-ভরা আঙ্গিনায় হিরন্মূটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

গুল বাহাদুর নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য গলা একটু শক্ত করে বললেন, ‘ভিতরে চলো।’

মিঠার মা মিঠির মিঠা। শক্ত। বললে, ‘জোর করে টেনে নিয়ে যাবে নাকি?’ সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানি এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘নাও।’ এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে উঠি-উঠি ভাব। টান দিলেই সড়সড় করে ভিতরে চলে যাবে।

গুল বাহাদুর বিধায় পড়লেন। কি আর করেন? সূর্যটি যতদূর পারেন মমতাময় করে বললেন, ‘মেহেরবানি করো।’ ‘মেহেরবানি’ কথাটার আমেজ

উদ্‌-এবং বাঙলাতে এক নয়। সে-কথা না জেনেও আশা করলেন, মদসলমানের মেয়ে সদরটি ধরতে পারবে।

মোতী গুনগুন করে গান ধরে ভিতরে গেল। বদ্বলো গুল বাহাদুরের হার হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা নিজেকে যখন বদ্বলোতে পারেনি যে তার হার হয়েছে, তখন সে জেতাতে কি আনন্দ? আর হেরে যাওয়ার দ্বংধের ছাপ যদি তার মদ্বের উপর পড়তো তাহলেই কি মোতী আনন্দ পেত?

এবারে গুল বাহাদুরকে শুনিয়ে একটু উঁচু গলায় গাইলো,

ও মদ্বশীদ তোমার লগে নাই তো অভিমান
আইলে আও, যাইলে যাও, ঠেলে মারো টান
ও মদ্বশীদ নাই তো অভিমান।

বাচ্চারে যে ঠালা মারলে কান্দ্যা পড়ে মায়ের কোলে
যতো মারো বাঁচ্যা উঠে তত পরাণখান।

ও গদ্বর নাই তো অভিমান।
তুলাধুনা কর্যা, মৌলা, ফেলাও না ফের জান।
করো না খান্ খান্।

জানুক না জাহান্।
মস্তান ফাঁকরে কয় হেন আমার মনে লয়
গদ্বর মনে হৈল ভয়, পায়ে দিল স্থান।
ও মদ্বশীদ গেল অভিমান।

এবারে গুল বাহাদুরের গীতটি বদ্বলোতে কোন অসদ্বিধা হল না। কিন্তু খটকা লাগলো ‘অভিমান’ শব্দটি নিয়ে।

মোতী বললে, ‘এতে আবার মদ্বশীকিল কোথায়? এই মনে করো আনন্দী যদি তোমার উপর রাগ করে খিচুড়ি আলদুরদম না খেয়ে শদ্বতে যায় তবে সে তোমার উপর অভিমান করল।’

গুলবাহাদুর বললেন, ‘সে তো হল রাগ।’

মোতী বললে, ‘তা নয়। যদি সে তখন তোমার ভাতে ছাই মিশিয়ে দেয় তবে হবে রাগ।’

এবারে গুল বাহাদুর অনেকখানি বদ্বলোতে পেরে বললেন, ‘ওঃ, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করে বাইরে বসে ছিলে?’

মোতী উত্তর দিলে না।

গুল বাহাদুর শোখালেন, ‘এ গীত তুমি কাকে শোনালে?’

মোতী নিভঁয়ে উত্তর দিলে, ‘তোমাকে, মদ্বশীদকে, আর কাকে?’

‘তোমার মদ্বশীদ কে?’

মোতী হেসে উঠলো। বললো, ‘আজ দেখি, তুমি অনেক কথাই শদ্বদ্বছো। কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, আছে একজন। কিন্তু সে বড় বদ্বড়ো। সব রসকম্ব শদ্বকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘ছিঃ, গদ্বরকে নিয়ে কি এ ধরনের মশ্‌করা করতে

আছে ?’

মোতী বললে, ‘মশ্কারা কিসের ? এই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহশ্বৎ দিয়ে সে তো সব গীতেই আছে। আর আমার শরীরটা ? সে বদ্বি কিছু নয় ? গদ্বর আমার সব আশা পূর্ণ করবে না ?’

গদ্বল বাহাদুর নিরাশ হয়ে বললেন, ‘তুমি সব সময় কেমন যেন হেঁয়ালিতে কথা কও। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয় তবে সেটাও গদ্বর পূর্ণ করবেন নাকি ?’

মোতী চিন্তা না করেই বললে, ‘নিজেই জানি নে কি চাই। কখনো ইচ্ছে করে মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে, কখনো বা স্বামী পেতে ইচ্ছে করে, আর কখনো মনে হয় দুচ্ছাই, এসব দিখে কি হবে ? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা ঠাকুরাণী কেস্ট-মদুরারিকে পেয়েছিলেন। রসের সাগরে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর ওর শরীরে মিশে যাবে।’

গদ্বল বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, ‘যাক, বাঁচালে। মনের কেস্টকে দিলের হরি বানিয়ে পড়ে থাকো। কোন বদনাম হবে না।’

অত্যন্ত তাক্ষিলের সঙ্গে মোতী বললে, ‘ছোঃ ! বদনাম ! উপকী রাঁড়ী। নিকে করি নে। একলা পড়ে আছি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে তার আর বাড়বে কি ? মড়ার গোরের উপর এক মণও মাটি শ’ মণও মটি। আমি তাকে সাজ-সকাল কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসবো—হাটে যাবার পথের পাশে।’

গদ্বল বাহাদুর ভাবলেন, মেয়েটা বন্ধ পাগল। তারপর ভাবলেন, কিস্তু এরকম সাদা যার দিল তার আর ভাবনা কি ? এর ভিতর বাহির দুইই সাফ। বললেন, ‘এসব খেলালী পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও, না ? কিস্তু যন্ত্র-তন্ত্র বলে বেড়িয়ে না।’

মোতীর মা সেদিকে খেলাল না দিয়ে শুধালে, ‘তোমার সম্বন্ধে বেবাক বাৎ আমার শুনতে ইচ্ছে করে, কিস্তু বাবাজীদের তো ঘর-গেরস্তীর কথা শোধানো বারণ। তবে যদি অভয় দাও তয় একটি কথা শুধাই।’

গদ্বল বাহাদুর হেসে বললেন, ‘নিভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিছুটি লুকোবার নেই।’ তার ইচ্ছে হচ্ছিল গোফে চাড়া দেবার। কিস্তু গোফ তো আর নেই।

‘তোমার বিয়ে-শাদী হয়নি ?’

‘না।’

‘কারোতে মজেনি ?’

‘না। তবে লক্ষেনা থেকে একবার একটি বাঙ্গী এসেছিল। যেমন নাচতে পারতো, তেমন গান জানতো, তেমন ছিল চেহারাটি। তাকে বড় ভালো লেগেছিল।’

‘তারপর কি হল ?’

‘কিছুই হল না। আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লাম। তারপর এখানে চলে এলাম।’

‘ও। কোনো কেলেকারি করে ভেক নাওনি?’

বোষ্টমদের প্রতি গুল বাহাদুরের কোনো অহেতুক প্রেম ছিল না, কিন্তু তারা ‘কেলেকারি’ করলেই শৃঙ্খল ভেঙে নেয়, এ ইঙ্গিতটা তাঁর ভালো লাগল না। বললেন ‘কুপ্তে বোষ্টমরা পাষাণ?’

‘অতো রাগো কেন? আমাদের মুসলমান পীরসায়েরদের দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন?’

‘সে আবার কি?’

‘ঐ, আমার মতো গোটা দশেক খাপসদরং ডপকী ছুঁড়ির মাধ্যমানে বসে ভাবখানা করেন, “হেরো, হেরো আগুন আমারে ছোঁয় না”।’

‘তারপর?’

‘তারপর—আর কি, তারপর বিস্তর ঘি গলে যায়।’

গুল বাহাদুর খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ‘আচ্ছা, তুমি অতশত বলছো—কইছো, শুনছো—গোনাছো কেন বলো তো? আসলে তোমার মতলবটা কি খুলে বলো তো?’

মোতী গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল। বললে, ‘মতলব কিছুই নয় গোঁসাই। আমি ভেবোঁছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হব। এই আমার শরীর, এই আমার দিল। ওগুলো যখন কোনো কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙ্গেই দেখি, কি হয়। তা আর হলো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।’

গুল বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, ‘ওটা মিথ্যে কথা! তোমার সবই ভালো। আমি অনেক দেখেছি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে বনলো কিনা সে অন্য কথা।’

মোতী আপত্তি জানিয়ে বললে, ‘আমার যদি সবই ভালো তবে তাই হোক ঠাকুর। এবারে তোমাকে শেষ প্রশ্ন শুধাই। তোমার সংসারে মন বসলো কেন, সেইটে আমায় বলো।’

গুল বাহাদুর বললেন, ‘সংসারে আমার রস্তিভর অরুচি হয়নি, মোতী। আসলে আমি শিবর মতো গদরের সেপাই। তোমার স্বামীর যা হওয়ার কথা ছিল। লড়াইয়ে হেরে গা-ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি যাতে করে দশমন চিনতে না পারে—আমি মুসলমান।’

*

*

*

লেখকের নিবেদন :

এখানেই ‘এক পুরুষ’ শেষ।

বইখানা ‘তিন পুরুষ’-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল; কিন্তু আমার গুরুই যখন ‘তিন পুরুষ’ লিখতে গিয়ে এক পুরুষ সমাপ্ত করে সেটিকে ‘যোগাযোগ’ সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়) — ৫

নাম দিলেন তখন যার কৃপায় 'মুক বাচাল হয়' তাঁরই কৃপায় এম্বলে 'বাচাল মুক হল।'

কবিরাজ চেখফ

উত্তম গুরুদ্বয় সদ্ব্যপদেশ পেলেই যদি সার্থক লেখক সৃষ্টি হতেন তবে ইহসংসারে আমাদের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। কারণ আমার বিশ্বাস, এতাবৎ বহুতর গুরুদ্ব্যপচার পুস্তকে নানাবিধ সদ্ব্যপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সদ্ব্যপদেশীত্বাযী তরুণ সাহিত্যশাভিলাষীরও অনটন এই বঙ্গদেশে নেই।

আমি সার্থক সাহিত্যিক নই, তবে কিছুটা লোকায়ত ('জনপ্রিয়' বললে বহু বেশি দম্ভভাষণ হয়ে যায়) বটি। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সোম্মাসে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পড়লেই পাঁচকাড়ি দে'র কথা আমার মনে আসে।'

আমি সাতিশয় শ্লাঘা অনুভব করেছিলাম। আমি জানি আপনারা পাঁচজন পাঁচকাড়িকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। যদিও শুধুই, বৃকে হাত দিয়ে উত্তর দিন তো, পনেরো বছর বয়সে পাঁচকাড়ি পড়ে আপনার পশ্চিমদ্রুয়ন্তন হয়নি? আপনার চৈতন্যকে এরকম সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ একাগ্রমনা করতে পেরেছেন ক'জন লেখক? এবং স্বয়ং গীতা বলেন, চৈতন্যকে সর্বপ্রথম নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় একাগ্র করে তবে ধ্যানলোকে প্রবেশ করবে। স্বয়ং পতঞ্জলিও বলেন, 'ধ্যানের বিষয়বস্তু অবাস্তব।' তা সে যাক্। আসল কথা সে বয়সে পাঁচকাড়ি আপনাকে এমনি একাগ্রমনা করে দিয়েছিলেন যে আপনি তখন দেশকালপাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এটা যে আটের অন্যতম লক্ষণ সেটি সর্বজনবিদিত। তা হলে আজ আপনি পাঁচকাড়ির নামে নাক সেটকান কেন? পাঁচকাড়ি পড়ার পূর্বে সাত বছর বয়সে আপনি রূপকথা পড়েছিলেন, আজ পড়েন না, কিন্তু তাই বলে তো আপনি ওর পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসেন না, কেন?

টলস্টয় বলেন, যে বই সর্বযুগে সর্ববয়সের লোক পড়ে আনন্দ পায় সেই বইই উত্তম বই। সে রকম বই ইহসংসারে অতিশয় বিরল। টলস্টয় মহাভারতের নাম করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ একমত। (তিনি তাঁর নিজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নিশ্চয় করেছেন। আমরা একমত নই।)

অতি অল্প লেখককেই টলস্টয় আর্টিস্ট বা সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। চেখফ তাঁদেরই একজন।^১ তাঁকে তিনি বলেছেন, রিয়েল আর্টিস্ট ;—

১ টলস্টয় চেখফকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন যে একদিন টলস্টয়ের বাড়ি ইয়াসানা পলিয়ানাতে যখন তিনি আর গর্ক বসে গল্প করতেন তখন চেখফ বাগানের অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে টলস্টয় গর্ককে বলেন, জানো গর্ক, চেখফ যদি মেয়েহলে হত তবে আমি ওকে বিয়ে না করে থাকতে

পাঠক সেটি পরে সবিস্তর শুনতে পাবেন।

চেখফের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

প্রথম ছবি দেখি, রুশের এক গণ্ডগ্রামে ঘরের ছেলে চেখফ গাঁয়ের পাঁচজন মাতাম্বরের চালচলন কথাবার্তার ভঙ্গির অনুকরণ করে বাড়ির পাঁচজনকে হাসাচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্লাসের সর্দার পড়ুয়াও বটে।

তার পরের ছবি দেখি মস্কোতে। গরীব পরিবারে। একটা ছোট ঘরে মা কচুঘেঁচু রাখছেন, বাবা অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনে গজ্ গজ্ করছেন, ভাইবোনেরা কিচিরমিচির করছে, আর মেডিকেল কলেজের ফাস্ট ইয়ালের ছাত্র চেখফ—বয়স উনিশ—তারই এককোণে, হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা ফার্স লিখে যাচ্ছেন। তিনি জানেন, খুব ভালো করেই জানেন, রসিকতাগুলো কাঁচা, কিন্তু তার চেয়েও ভালো করেই জানেন, খবরের কাগজের গ্রাহক রামাশামা এ ধরনের রসিকতাই পছন্দ করে, সম্পাদক মশাইও সেই মালই চান। লেখা শেষ হল। রান্না তখনো শেষ হয়নি। চেখফ ছোট ভাইকে বললেন, ‘লেখাটা নিয়ে যা তো অমুখ পত্রিকার আপিসে। দু’পাঁচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু কাবাব-টাবাব কিনে আনিস। কচুঘেঁচু গেলার সুবিধে হবে।’

এর পাঁচ বছর পর চেখফ মেডিকেল কলেজ পাস করলেন।

কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করা চেখফের আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যে রুশদেশে জেনে গিয়েছে, চেখফের সার্জিকাল ছাত্রের চেয়ে তাঁর কলমের ধার বেশী। তবু সরকার তাঁকে পাঠালেন সাখেলিন দ্বীপের কয়েদীদের সম্বন্ধে মেডিকেল তদন্ত করতে। সে রিপোর্ট তিনি এমনই বুকফাটানো জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে তারই ফলে সরকার কয়েদীদের জন্য বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এ রিপোর্টখানা আমি কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার বড় বাসনা ছিল দেখবার, সাহিত্যিক যখন মেডিকেল রিপোর্ট লেখে তখন তার কলম কি ভাবে চালায়? সংযত করে? যাতে করে লোকে না ভাবে সাহিত্যিক তার হৃদয়-উচ্ছ্বাস দিয়ে তথ্যের দীনতা ঢাকতে চেয়েছে—কেসে পয়েন্ট না থাকলে উকীল যে রকম গরম লেকচার ঝাড়ে আর টেবিল খাড়াইয়। কিংবা তাঁর জোরদার কলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে? কিংবা উভয়ের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে? রবীন্দ্রনাথ যখন সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন তখন তাঁর লেখনে কতখানি রাষ্ট্রদর্শন আর কতখানি কবির তীব্র হৃদয়-বেদনার পরিপূর্ণ প্রকাশ!

তারপর একবার লেগে যায় রুশ দেশে জোর কলেরা। সেই এক বছর চেখফ ডাক্তারি করেন প্রাণপণ। বাস।

‘পারভুম না।’ যারা বর্তমান লেখকের অত্যাধিক বাগাড়ম্বর অপছন্দ করেন, তাঁরা বাকী প্রবন্ধ না পড়ে সোজা চেখফের দলালী গল্পের অনুবাদে চলে যাবেন।

খাস পশ্চিমের লোক বয়েস হওয়ার পর বিয়ে-শাদী করে কস্মিনকালেও বাপ-মায়ের সঙ্গে বসবাস করে না। ভিন্ন সংসার পাতে। রুশদের বোধ হয় কিছুটা প্রাচ্যের আমেজ ধরে।

কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেখফ গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিৎ জমিজমা ও ছোট্ট একটি বসতবাড়ি কিনলেন। বাপ-মায়ের সঙ্গে সেখানে ছ'টি বৎসর চেখফ বড় আনন্দে কাটালেন। চেখফের সমগোত্রীয় আরেকজন আত্মীয় দরদী লেখক, আলফ'ন দোদেও ঠিক ঐরকমই মোটামুটি ঐ সময়েই অসুস্থের মত খেটে পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মাকে গ্রাম থেকে এনে প্যারিসে আরামে রেখেছিলেন। জীবনের এই ছ'টি বৎসর চেখফের বড় শান্তি আর আনন্দের মধ্যে কাটে। এর পরই দেখা দিল তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগের চিহ্ন এবং বাকি জীবনের অধিকাংশ তাঁকে কাটাতে হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে, সমুদ্র পারে। চেখফের বয়স তখন একচল্লিশ। তাঁর ক্ষয়রোগের কথা জেনেশুনেও তাঁরই নাটোর অসাধারণ সুন্দরী এক অভিনেত্রী তাঁকে বিয়ে করেন। তিন বৎসর পর খ্যাতির মধ্যগগনে চেখফ-ভাস্কর অন্ত গেল। দাম্পত্য জীবনে সুখ বলতে তাঁর স্ত্রী পেরেছিলেন স্বানীকে সেবা করার আনন্দ। অভিনেত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। তাই বলে নেওয়া ভালো, চেখফের স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন নির্জনে অতিবাহিত করেন। মর্ডান গল্প-উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় তাৎজব মা বেন। চেখফের বিধবা তখন যুবতী। রাশে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয় তো নয়ই, যুবতী বিধবা পুনরায় বিবাহ না করলে তাকে 'আহাম্মুখ' অখ্যা দেওয়া হয়। মা হওয়ার গোরব থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তিনি ত্যাগ ও প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। এ কথাটা বলতে হল চেখফ-চরিত্র বোঝাবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই এমনই গভীর প্রেম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবন উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিলেন যে সেই দীপ্ত দীক্ষায় প্রজ্বলিত তাঁর প্রেম-প্রদীপ চেখফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল না। তারই অনিবার্ণ বহিতে তাঁর ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়ে রইল।

চেখফের জীবন সর্গক্ষপ্ত ও আদৌ ঘটনাবহুল নহে। যে কটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে সেগুলিই মধুর। শুধু শেষের চিত্রটি বড় করুণ। রঙ্গমণ্ড থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আজীবন বিলাসে লালিতা এই যে অসাধারণ গুণবতী রমণী তাঁর স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কণ্টিনেণ্টের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে স্বাস্থ্যনিবাস, এক ধ্বংস্তুরী থেকে অন্য ধ্বংস্তুরীর পদপ্রান্তে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করলে, আপন হৃদয়াবেগ শাস্ত মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কত না বিনীত যামিনী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কাটালে, অসীম ধৈর্যে মিশ্রিত অক্ষয় সেবার ক্ষয়রোগীর প্রতিটি পীড়িত মূহুর্তের যন্ত্রণাভার লাঘব করলে - এ ছবিটি একাধিক রুশ লেখক এঁকেছেন।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সে চেখফের তিরোধান তাঁর বৃদ্ধে বড় বেজেছিল— চেখফকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গর্ক

তখন লেখেন চেখফ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইয়াসানা পলিয়ানাতে এই ত্রিমূর্তির আলোচনা, স্বাধীনতার আদান-প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোহর একাধিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। চেখফ স্বয়ং তাঁর 'নোটবুকে' কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। টেলস্টয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। অবশ্য সে-শ্রদ্ধা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি টেলস্টয়ের 'নীতি-মূলক' (শুটির উইথ এ মরাল) গল্পের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়েল আর্টিস্ট (টেলস্টয়ের ভাষায়) তো বেশীদিন অন্যের পথে চলতে পারে না—তা সে পথ যতই শান বাঁধানো প্রশস্ত হক না কেন।

গর্কি তাঁর নাট্যরচনায় চেখফের অনুকরণ করেছেন। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার স্মরণার্থে উল্লেখ করি,

টেলস্টয় : জন্ম ১৮২৮ মৃত্যু ১৯১০

চেখফ : " ১৮৬০ " ১৯০৪

গর্কি : " ১৮৬৮ " ১৯৩৬

চেখফ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমি এক যুগ ধরে লিখে যেতে পারি। তাঁর প্রতিটি গল্পে টীকা লিখতে লিখতেই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লিখছি সেটি ভুললেও চলবে না।

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গসাহিত্যে আমি যশস্বী লেখক নই, কিন্তু পপুলার বটি। সেই কারণেই বোধ হয়, আমি কিছু অনুরোধ পেয়েছি, পত্র-লেখকদের জানাতে, কোন্ কোন্ লেখক পড়লে তাঁরা লাভবান হবেন। বিদ্যার নেবার প্রাক্কালে নিবেদন, ছোট গল্প দিয়েই সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করা প্রশস্ত এবং সম্মুখে চেখফের ফোটোগ্রাফ টাঙিয়ে নিয়ে। এমন কি যারা পরবর্তীকালে উপন্যাস লিখবেন তাঁরাও চেখফ চেখে, শব্দকে, সর্বাসঙ্গে মেখে উপকৃত হবেন। এ প্রবন্ধটি তাঁদেরই উদ্দেশ্যে লেখা।

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, রুশ সাহিত্যে চেখফের অনুকরণ করেছেন অনেকেই, কিন্তু 'টেলস্টয়-ঘরানা', 'ডস্টয়েফস্কি ঘরানা'র মত 'চেখফ-ঘরানা' কখনো নির্মিত হয়নি। তার কারণ চেখফকে অনুকরণ করা অসম্ভব।

তবে সে উপদেশ দিচ্ছি কেন ?

কারণ অসম্ভবের চেষ্টা করলেই সম্ভবতা হাতে আসে, সম্ভব হয়।

*

*

*

চেখফের আছে কি ?

অদ্ভুত সহানুভূতি। সমবেদনা। সহানুভূতি সমবেদনা বললে কমই বলা হয়। মপাসার 'বুল্ দ্য সুইফ্'। 'চরিত্র গোলা', 'এ বল অব ফ্যাট' যখন ঘোড়া-গাড়িতে ফিরে অঝোরে কাঁদছে তখন মপাসাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন, কিন্তু চেখফ যখন তাঁর কোচম্যানের দৃষ্ণের কাহিনী বলেন তখন মনে হয় তিনি স্বয়ংই যেন সেই কোচম্যান।

গল্পটির প্লট এতই সরল যে কয়েক ছত্রে বলা যায়। এক ছ্যাকড়া গাড়ির

কোচম্যান শহরে গাড়ি খাটায়, একমাত্র ছেলে থাকে গ্রামে। হঠাৎ খবর পেলে তার সে জোয়ান ছেলে মারা গিয়েছে। বড়োর তিন কুলে কেউ নেই যাকে সে তার দৃঃখের কাহিনী বলে। পেটের ধান্দ্বায় বেরোতে হয়েছে গাড়ি নিয়ে। উঠেছে এক সোয়ারি। বড়ো কোচম্যান আস্তে আস্তে আলাপচারী জমিয়ে যখন তার পুত্রশোকের কাহিনী বলতে যাবে, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সোয়ারি ঘুমিয়ে পড়েছে। থামতে হল। তারপর উঠলেন এক জেনারেল। ‘জলদি চলো, জলদি চলো’ আর ধমকের চোটে সে তার কাহিনী আরম্ভ করেও শেষ করতে পারলো না। তারপর উঠল জনাতিনেক ছাত্র। তাদের হৈ-হুল্লার মাঝখানে বড়ো কোন পাত্তাই পেল না। তার উপর উঠলেন আর এক ভদ্রলোক—ভারী দরদী। তাকে যখন দৃঃখের কাহিনী বলতে বলতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদটা দেবে ঠিক তখনই তিনি বলে উঠলেন, ‘খ্যাংক গড়’। ঐ আমার বাড়ি। পেঁাছে গিয়েছি।’ বলা হল না। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে। বড়ো বাড়ি ফিরল। ঘোড়াটাকে দানা দিয়ে ডলাই-মলাই করতে করতে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, ‘তোকে কি আর আমি ভালো করে ডলাই-মলাই করতে পারি, বাছা। বড়ো হাড়ে আর কি আমার তাগৎ আছে? থাকতো আমার ছেলে! তাকে তো তুই চিনিস নে। হ্যাঁ, তার ছিল গায়ে জোর। হ্যাঁ, সতি্য বলছি। সে যদি থাকতো আজ, তবে বুদ্ধিয়ে দিত ডলাই-মলাই করে কয়। ঘোড়াটা আপন খেয়ালে গর-গর করে নাক দিয়ে শব্দ ছাড়লো। কেমন যেন দরদ ভরা—অন্তত বড়োর তাই মনে হল।

তখন—তখন—? বড়ো ঘোড়াটাকে তার শোকের কাহিনী বলে দিল।^২

যতবার গল্পটি পড়ি চোখে জল ভরে আসে—এখন আরো বেশী, কারণ আমার বয়েস ঐ কোচম্যানেরই কাছাকাছি...আর মনে হয়, কে বলে চেখফ ডাক্তার ছিলেন, কে বলে তিনি রূপসী অভিনেত্রী বিয়ে করেছিলেন, কে বলে তিনি টলস্টয়ের বন্ধু? তিনি নিশ্চয় ছিলেন ঐ কোচম্যান।

অনুকরণ করুন এই গল্পটির। কিংবা আরম্ভ করুন অন্যভাবে।

যেমন মনে করুন আপনার প্রিয়া সর্বাত্মে আপনার চেয়ে গুণবান একটি ‘লভার’ পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন তার সঙ্গে। আপনি ঘন ঘন ‘উদ্ভ্রান্ত প্রেমে’ পড়ে হৃদয়বেদনায় মালিশ করছেন, কিন্তু কোনো ফায়দা ওৎরাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনার এক্স-বান্ধবীর এক বান্ধবী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত আরেক ভদ্রলোকও আপনার বন্ধু। আপনি ভাবলেন, ‘তাঁদের কাছে গিয়ে আমার দৃঃখের কাহিনী কই।’ দুজনেই বড় দরদী। দুজনাই আপনার আপসাপাসি সাতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু হায়, শেষটায় দেখলেন, ওদের দুজনাই পাকা রায়, আপনাকে কলার খোসাটির মত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনার প্রিয়া অতিশয় বিচক্ষণার কর্ম করেছেন!

২ গল্পটির প্লট আমার ঠিক ঠিক মনে নেই; তবে হরদরে ঐ

এটা আপনি ব্যঙ্গ করে লিখতে পারেন, হাস্যরসে ভর্তি করে লিখতে পারেন, দু'ঘটি চোখের জল ফেলে করুণ রসে ঢেলে বানিয়ে লিখতে পারেন, যৌন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়েও লিখতে পারেন—কিন্তু আপনি চেতক্ষ হবেন তখনই যখন পাঠক পড়ে মনে করবে এটি একান্ত আপনারই অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আদপেই হয়নি, আমার কাছে প্রুটিটি শুনেন, এবং চেতক্ষের কোচম্যানের গল্পটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন মাত্র।

এবারে টেকনিকাল দিক।

এখানে এসে সর্ব আলংকারিকের গুয়াটারলু।

রস কি, এস্থলে কথাসাহিত্যে কি সে-বস্তু যা আমার মনে কলারসের সঞ্চার করে—সেখানে যদি বা কোনো গাতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ বর্ণনা করা যায়, তবু করা যায় না রসসৃষ্টি হয় কোন্ উপাদানে, কোন্ প্রক্রিয়ায়!

কাজেই আমি সামান্য দু'টি নির্দেশ দেব।

প্রথম বাকসংযম। 'সে বলে বিস্তর মিছা যে বলে বিস্তর'—বলেছেন ভারতচন্দ্র। এ-স্থলে 'সে রচে নিরস রস যে বলে বিস্তর।'

এখানে চীনা চিত্রকরদের কথা স্মরণে আনবেন। পাঁচটি আঁচড়ে আঁকা বাঁশের মগডালে একটি পাতা—আপনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাতাটি ফর ফর করছে। তিনটে আঁচড়ে আঁকা একটি উড়ন্ত হাঁস। আপনি দেখতে পেলেন যেন নীলাকাশে শরতের সাদা মেঘ—ভালো করে তাকানোই যায় না, চোখ ঝলসে দেয়।

তার অর্থ উড়ন্ত হাঁস আঁকার সময় চিত্রকর সম্পূর্ণ হাঁস আঁকেন না। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় বিন্দু ও বক্ররেখা (পইন্ট কাভ') দিলে পাঠকের মন নিজেই বাকিটা এঁকে নেবে, পাঠকের চোখ নিজেই বাকিটা দেখে নেবে ঠিক সেই সেই জায়গায় চিত্রকর তুলি ছুঁইয়েছেন।

চেতক্ষও ঠিক তাই করতেন। কয়েকটি পইন্ট ও কাভ'—শব্দের মারফতে—এমনই ভাবে এঁকে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। শূন্য তাই নয়, এমনই সূক্ষ্ম দানাওয়া ফিলমে তোলা ফটোগ্রাফ যে যার যেমন কম্পনার লেন্স সে তেমনি বিরাট আকারে সেটিকে এনলার্জ করতে পারে। কোচম্যান চেষ্টা করেছিল তিন না চার টাইপের সোয়ারির কাছে তার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করার; আপনি দেখতে পাবেন সে তাবৎ মস্কা শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দুয়ারে শির হেনে হেনে হতাশ হচ্ছে। আর সেই দরদী ঘোড়ার গরুর শব্দ যে শূন্য জানতে পাবেন তাই নয়, শুনতে পাবেন সে যেন বহু আবেগ থেকেই কোচম্যানকে বলছে, 'কেন তুমি আজো বাজে লোকের কাছে এসব দুঃখের কথা বলতে যাও? কে বুঝবে তোমার হৃদয়-বেদনা? সবাই আপন স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। বলো আমাকে। হাস্কা হবে।' তারপর হয়তো আপন মনে বলছে, 'জানি তো সবই। কিন্তু হায় করি কি? এ যে ভগবানের মার।'

গুণীয়া বলেন সর্বনিম্নে জড়জগৎ, তারপর তৃণজগৎ, তারপর পশুজগৎ—

সর্বোচ্চে মানুষ। চেখফের গল্পটি পড়ার পর মত পালটাতে হয়।

এস্থলেই ক্রান্ত হোক আমার অক্ষম লেখনীর ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এইবার পড়ুন চেখফের একটি গল্পের বাঙলা অনূবাদ। অনূবাদটি করেছেন আমারই অনুরোধে, আমার সখা মোলানা খাফী খান। ‘বন্দুস্ত’ এবং ‘প্রিয়াঙ্গু’র লেখক।

॥ দুলালী ॥

ওলংকা অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসেসর প্রেম-ইয়ামিকভের মেয়ে। সে ভাবনায় ডুবে বসেছিল উঠানের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে।

গরম, মাছিগুলো আঠার মত লেগে আছে, বিরক্ত করছে। একটু বাদেই যে সন্ধ্য হবে সে কথা ভাবতে ভালোই লাগছে। পূর্ব দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে জমা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে ভিজে হাওয়ার আমেজ আসছে।

উঠানের মাধ্যমানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কুকিন। লোকটি থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এক বাগানে একটি আনন্দমেলার আসর জমায়—নাম ‘তিভলি প্রমোদ উদ্যান’। থাকে ওলংকাদের বাড়ির একপাশে ভাড়া নিয়ে।

কুকিন হতাশ হয়ে বলল, “আবার! আবার এল বৃষ্টি! রোজ বৃষ্টি, রোজ, যেন আমাকে নাকাল করার জন্যেই নামে! গলায় দড়ি দিই না কেন? সর্বস্ব গেল। দিন দিন লোকসান আর লোকসান!”

দু হাত জুড়ে ওলংকার দিকে ফিরে কুকিন আবার বলতে লাগল, “এই তো জীবন আমাদের, ওলংকা সেম-ইয়নভ’না। দু চোখ ফেটে জল আসে। খেটে মরি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি, সারারাত জেগে ভাবি কী করে জিনিসটাকে উদ্ধারের করে তোলা যায়। হয় কী? এদিকে দেখ, লোকগুলোকে—আহাম্মদুখ, বব’র।

“আমি ওদের দেখাই সেরার সেরা ছোট ছোট অপেরা, কথা-ছাড়া শব্দ ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো নাটক, অপূর্ব অপূর্ব ভ্যারাইটি আর্টিস্ট। কিন্তু ওরা কি ও জিনিস চায়? বোঝে তার মর্ম? ওরা শব্দ চায় হৈ-হুন্সোড়! ওদের দেখাতে হয় রসিদ চাঁজ।

“আবার ইদিকে দেখ আবহাওয়াখানা! প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃষ্টি। ১০ই মে থেকে শব্দ হল, চলছে রোজ, গোটা মে-জুন মাসটাই! দর্শকের দেখা নেই, অথচ বাগান-ভাড়াটা? সেটি ঠিক ধ’রে দিতে হয়। আর গাইয়ে-বাজিয়েদের মাইনেটা?”

পরদিন সন্ধ্যার দিকে আবার দেখা দিল মেঘ। হি হি করে হেসে উঠল কুকিন। বললে, “এসো, এসো বৃষ্টি! দাও ভাসিয়ে আমার প্রমোদ উদ্যান। সব ডোবাও, তারপর আমাকেও ডোবাও। আমার ইহলোক পরলোক দুইই মজদুক! মামলা করুক আমার আর্টিস্টরা আমার নামে, পাঠাক জেলে—সাই-

বীরিয়ার নিবাসনে—ফাঁসিকাঠে ! হা হা হা হাঃ !”

তার পর দিন আবার ঐ ।

ওলেংকা চিন্তিত মুখে, নীরবে কুকিনের কথাগুলি শুনত । মাঝে মাঝে তার চোখে জল এসে পড়ত । এত উতলা হয়ে উঠত তার মন কুকিনের দুর্ভাগ্যে যে শেষ অবধি সে ওর প্রেমের পড়ে গেল ।

কুকিন্ মানুষ্যটি বেঁটে, রোগা । মুখখানা ফ্যাকাশে । চুল আঁচড়ে রগের ওপর টেনে নামানো । সরু গলায় কথা কয়, মুখ একপাশে বেশিকিয়ে । চেহারায় চিরকালে নৈরাশোর ছাপ । তবু সে ওলেংকার মনে গভীর এবং অকৃত্রিম একটি ভাব জাগিয়ে তুলল ।

ওলেংকা সর্বদাই কারো না কারো প্রেমে অভিভূত হয়ে থাকত । প্রথমে ছিল বাবা । এখন তিনি রুগুণ ; অশ্বকার একখানা ঘরে সারাদিন আরাম-কেন্দরায় বসে তাঁর দিন কাটে । শ্বাসকষ্টে কাতর ।

তারপর সে ভালোবাসলো তার এক খুড়িমাকে । তিনি থাকতেন ব্রিগ্যান্স্কে, দু বছরে একবার করে আসতেন । তার আগে, যখন সে ইংস্কুলে পড়ত, তখন তার প্রেমপাত্রী ছিল তার ফরাসী শিক্ষিকা ।

ওলেংকা মেয়েটি শাস্ত, স্নেহময়—বড় ভালো স্বভাবের । চোখ দুটি ভীর্দু নিরীহ । নিটোল শ্বাস্ত । তার টলটলে, লালচে গাল দুখানি, ধপধপে সাদা নরম তুলতুলে ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো তিলাটি, আর সরল স্নিগ্ধ যে হাসিটি ফুটে উঠত তার মুখে খুশীর কোনো কথা শুনলেই, তা দেখে ছেলেরা ভাবত “মন্দ নয় তো মেয়েটি” । বেশ হাসতও । আর মেয়েরা তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার হাতখানি ধরে বলে উঠত, কথার মাঝখানে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে “ও দুলালী !”

জন্ম থেকে যে বাড়িতে ওলেংকার বাস, তার বাবার উইল অনুযায়ী সেটি তারই প্রাপ্য । বাড়িখানা ছিল শহরের একটু বাইরের দিকে । জিপ্সোনী রোডের উপর । প্রমোদ উদ্যান “তিভালি” থেকে বেশী দূরে নয় । সেখানে যখন সম্ভোবেলায় বা রাত্রে বাজনা বাজত, বাজি ফুটত, ওলেংকার মনে হত যেন যুদ্ধ বেধেছে কুকিনের সঙ্গে তার নিয়তির । কুকিন্ লড়ছে, তার প্রধান শত্রু নিঃসাড় দর্শকগুলোর সঙ্গে । অমনি ওলেংকার মন গলে যেত । ঘুমোতে ইচ্ছে করত না । ভোররাতে কুকিন্ যখন বাড়ি ফিরত, তখন ওলেংকা তার গোবার ঘরের জানালায় আস্তে আস্তে টোকা দিত, আর পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু তার মুখখানা আর কাঁধের একটুখানি দেখিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসত, নরম হাসি ।

কুকিন্ বিষের প্রস্তাব করল, বিয়ে হয়ে গেল । তারপর দেখল, বেশ ভালো করে, ওলেংকার ঘাড়খানি আর তার সুন্দর মোটা-সোটা কাঁধ দুটি । দেখে বলে উঠল “দুলালী !”

কুকিন্ খুশী হল, তবে তার বিষের দিন এবং রাত্রেও বৃষ্টি হল, তাই মুখের নিরাশ ভাবটা বদলালো না ।

দুজনের বনে গেল বেশ । ওলেংকা টিকিট বিক্রির দিকটা দেখত, হিসেব

রাখত, মাইনে-পস্তর দিত। তার ছলাকলাবর্জিত হাসিটিতে কখনো টিকিট-ঘর, কখনো খাবার দোকানটি, কখনো রঙ্গমঞ্চের দুটি পাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বন্ধুদের সে বলতে আরম্ভ করল, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বস্তু হল নাট্যশালা—প্রকৃত আমোদ একমাত্র এরই মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারাই মানদ্ব হয়ে উঠতে পারে ভদ্র এবং মানবতাবোধসম্পন্ন।

“কিন্তু লোকে কি তা বোঝে?” বলত ওলেকা। ওরা চায় “হৈ-হুজ্জোড়। কাল আমরা দেখালাম ‘উটোপাস্টা ফাউন্ট’—বন্ধুগুলোর প্রায় সব কটিই খালি রইল। কিন্তু যদি ভানিচুকা আর আমি দেখাতাম ওঁ’চা একটা কিছু, দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত রঙ্গালয়। কাল ভানিচুকা আর আমি দেখাচ্ছি ‘নরকে অফে’উস্’—নিশ্চয়ই এসো কিন্তু।’

কুর্কিন্ থিয়েটার সম্বন্ধে অভিনেতাদের সম্বন্ধে যাই বলত ওলেকা তারই পুনরাবৃত্তি করত। কুর্কিনের মতোই সেও দর্শকদের অজ্ঞতা এবং রসবোধের অভাবকে ঘৃণা করত। মহড়ায় আসত ওলেকা, অভিনেতাদের ভুল শোধরাত, বাজিয়েদের গতিবিধির দিকে চোখ রাখত। খবরের কাগজে যদি খারাপ কিছু মন্তব্য করা হত তবে সে কেঁদে ফেলত, যেত সম্পাদকের কাছে, কৈফিয়ৎ চাইত।

অভিনেতার তাকে ভালোবাসত, ডাকত “ভানিচুকা” আর আমি, “দুলালী” বলে। ওলেকার ওদের জন্য কষ্ট হত, মাঝে মাঝে টাকা ধার দিত অল্প-স্বল্প, ঠিকালে গোপনে চোখ মুছত, স্বামীর কাছে নালিশ করত না।

শীতের মরসুমেও ওদের গেল ভালোই। মিউনিসিপ্যালিটির থিয়েটারখানা ওরা ভাড়া নিল, নিয়ে অর্পাদিনের মেয়াদে ভাড়া দিল উক্রাইন-দেশী একটা দলকে, এক জাদুকরকে, স্থানীয় একটি নাটুকে সংঘকে।

ওলেকা হয়ে উঠল আরো গোলগাল, মুখে ফুটল কায়েম একটা খুশীর জৌলুস, কুর্কিন্ হয়ে গেল আরো রোগা, মুখ হল আরো হলদে। ভয়ানক লোকসানের বদলি তার মুখে লেগেই রইল, যদিও শীতের বাজারে ব্যবসা তার মোটেই খারাপ চলেনি।

কুর্কিন্ রাত্রে কাশে। ওলেকা ফলের রসের সঙ্গে ফুল মেড়ে তাকে খাওয়ায়, বকে তেল মালিশ করে, নিজের নরম নরম শালগুলো দিয়ে তার গা ঢাকে।

বলে, “কী মিষ্টি তুমি মণি।” চুলে হাত বদলিয়ে দেয়। বলে, অন্তর থেকেই, “আমার সুন্দর, আমার বৃকের ধন।”

শীতের শেষে কুর্কিন্ গেল মস্কে, নতুন একটা দল নিয়ে আসতে। ওলেকা কুর্কিন্ বিহনে ঘুমোতে পারে না। সারারাত জানালার ধারে বসে তারার দিকে চেয়ে থাকে। ঘরে মোরগ না থাকলে মুরগী যেমন সারারাত অস্বস্তিতে কাটায়, জেগে থাকে, ওলেকারও তেমনি হয়।

মস্কোয় কুর্কিন্ আটকা পড়ে গেল। চিঠি দিল ওমাসে ইস্টারের আগেই সে ফিরবে। তিভলির কাজকর্ম বদলিয়ে লিখল।

যে সময় কুকিনের ফেরার কথা সেই সময়েই একদিন, দিনটা সোমবার, সম্মা ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দরজায় অলুস্কণে রকমের একথানা ঘা পড়ল। সে কী আওয়াজ। যেন কেউ ঢাক পিটছে। দড়াম দড়াম দমাদম। রাধুনী মেয়েটা ঘুম-চোখে খালি পায়ে থৈ থৈ জল ভেঙে ছুটল খেড়ার দরজা খুলতে।

দরজার ওধার থেকে হেঁড়েগলায় কে বলল, “দরজাটা খোলো তো, তোমার নামে তার এসেছে।”

ওলেকা আগেও পেয়েছে টেলিগ্রাম তার স্বামীর কাছ থেকে, কিন্তু এবারে কেমন যেন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। থর-থর কাঁপা হাতে টেলিগ্রাম খুলে সে পড়ল :

“ইভান্ প্যেট্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেল আগ্রা নির্দেশ সাপেক্ষ মঙ্গলবার শেষকৃত্য।”

ঠিক এই ছিল টেলিগ্রামে, “শেষকৃত্য” আর অবোধ্য কথাটা “আগ্রা”। টেলিগ্রামে সেই নাটুকে দলের বড়কর্তার।

ওলেকা ফর্দপিয়ে ফর্দপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, “আমার মণি, ভানিচকা, মনি আমার, প্রিয়তম। কেন দেখা হলো আমাদের? কেন তোমায় জানলাম, ভালবাসলাম? তুমি তো ছেড়ে গেলে আমাকে, এখন তোমার দুর্গাখনি ওলেকা কার পানে চাইবে?”

মঙ্গলবার কুকিনকে ভাগান্‌কোভো গোরোস্থানে কবর দেওয়া হল। ওলেকা বাড়ি ফিরে এলো বৃদ্ধবার, এসেই বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, এমন চেঁচিয়ে যে রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ির উঠান থেকে সে কান্না শোনা গেল।

পাড়াপড়শীরা ক্রুসের চিহ্ন একে বৃদ্ধে মাথায় কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল আর বলল, “বেচারী দুলালী, ওল্‌গা সেম্‌ইয়ানভ্‌না। আহা, দুঃখে বৃদ্ধটা ফেটে যাচ্ছে বাছার।”

তিন মাস বাদে একদিন গিজ্‌জা থেকে ফিরছে ওলেকা। শোকে দুঃখে জ্বর জর। ঘটনাচক্রে বাবাকায়োভ্‌ কাঠগোলার গোমস্তা ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্‌ পুস্তভালভ্‌, সেও ফিরাছিল গিজ্‌জা থেকে, তারই সঙ্গে হেঁটে এল। পুস্তভালভের মাথায় কেতাদুরস্ত শাদা টুপী, পরনে শাদা ওয়েস্টকেট—তার ওপর ঝুলছে সোনার ঘড়ি চেন। লোকটিকে দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ী, দেখায় জমিদারের মতো।

সে বললে গম্ভীর সুরে “যা কিছু ঘটে ওল্‌গা সেম্‌ইয়ানভ্‌না, সে সব ঘটে তারই আদেশে।” স্বরে সমাবেদনার রেশ। “প্রিয়জনদের কেউ যদি চলে যায়, তবে তার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। বৃদ্ধ বেঁধে মাথা নত করে তা আমাদের মেনে নিতে হবে।”

ওলেকাকে বাড়ির দরজা অবধি পেঁছে দিয়ে পুস্তভালভ বিদায় নিল। ওলেকা সারাদিন ধরে শুনল তার গম্ভীর গলার আওয়াজ। চোখ যখন জুড়ে এল, স্বপ্নে দেখল তার কালো দাড়ি। বড় ভালো লাগলো তাকে ওলেকার।

পদ্মস্তভালভের মনে বোধ হয় ওলেংকা একটা ঝাগ ধরিয়ে দিল, কারণ দু'দিন না যেতেই একটি আধবয়সী মহিলা, যাকে ওলেংকা প্রায় চেনেই না এল তার সঙ্গে কফি খেতে, আর খেতে বসেই পদ্মস্তভালভের গল্প জুড়ে দিল। বলল, অতি চমৎকার শস্তপোস্ত লোকটি, বিয়ের বয়সী যে কোনো মেয়ে ওকে বিয়ে করে সুখী হবে। তিন দিন বাদে পদ্মস্তভালভ নিজেই এল। রইল বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে, কথা বলল অল্পই, কিন্তু ওলেংকা তার প্রেমে পড়ে গেল— এতদূর যে সারারাত তার ঘুম হল না, জ্বরের মত জ্বালায় জ্বলল, এবং সকাল হতে সেই আধবয়সী মহিলাটিকে তেকে পাঠাল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গেল।

বিয়ের পর দুজনের বনিবনা খুব ভালো হল। নিয়মিত পদ্মস্তভালভ কাঠ-গোলায় বসত দুপুরের খাওয়া অবধি, তারপর যেত কাজে বেরিয়ে, ওলেংকা এসে বসত তার জায়গায়, আপিসে বসে সম্বোধ্য অবধি বিল তৈরী করত, আর অর্ডার মাফিক মাল চালান দিত।

খন্দেরদের এবং পরিচিত লোকদের ওলেংকা শোনাতে “কাঠের দর ফী বছর শতকরা কুড়ি টাকা হিসেবে বাড়ে। আগে আমরা কাঠ নিতাম এখন থেকেই, কিন্তু এখন ভাসিচকাকে প্রতি বৎসর যেতে হয় মগলেভ্ অঞ্চলে, কাঠের বন্দোবস্ত করতে। আর ভাড়া কী!” তাজব হয়ে গালে হাত দিয়ে ওলেংকা বলতো “কী খরচা গাড়িভাড়ার!”

তার মনে হত সে কাঠের ব্যবসায় আছে যুগ যুগ ধরে; কাঠ জীবনের সর্বপ্রধান এবং সার বস্তু। গাড়ার, কড়ি, বরগা, তন্তা, বাটাম, বাস্তের বাঠ, ল্যাথ, পীস্, স্ল্যাব কথাগুলো তার কাছে বড় আদরের মনে হত, শূনে মন-কমেন করত। রাতে সে স্বপ্ন দেখত পাহাড়প্রমাণ বোর্ড আর তন্তা, অসংখ্য গাড়ি-ভর্তি কাঠের গাড়ি সার বেঁধে কোন্ দূর দেশে যাত্রা করেছে, ৮ ইঞ্চি চওড়া ২৮ ফুট লম্বা কড়িকাঠের একটা দল খাড়া দাঁড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কাঠ-গোলার দিকে, কড়িতে কড়িতে, গাড়ারে স্ল্যাবে ঠোকাঠুকি হচ্ছে শূকনো কাঠে কাঠে খটাখটিং বোদা আওয়াজ হচ্ছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এর ওর ঘাড়ে চেপে স্তুপের মতো জমা হচ্ছে ..

ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে ওলেংকা। পদ্মস্তভালভ আদর করে বলে, “ওলেংকা, কী হল দুলালী? মাথায় কাঁধে বুকে ক্রুসচিচ্ছ ছোঁয়াও!”

যে ধারণাই তার স্বামীর হত ওলেংকারও তাই হত। পদ্মস্তভালভ যেই বলত ঘরে বড় গরম, অথবা ব্যবসায় মন্দা পড়েছে, ওলেংকারও মনে হত তাই। আমোদ-প্রমোদ পদ্মস্তভালভের ভালো লাগত না, ছুটি দিন কাটাত বাড়ি বসে। ওলেংকাও তাই করত।

বন্ধু বাম্ববেরা বলত, “তুমি সবটা সময় কাটাও বাড়িতে বা আপিসে। থীয়েটরে সার্কাসে যাওয়াও তো উচিত।”

মরুদ্বিষ্যানার সুরে ওলেংকা বলে, “ভাসিচকা আর আমি থীয়েটরের ধার মাড়াই না। আমরা খাটিয়ে লোক, ওসব ছ্যাবলামির দিকে আমাদের মন নেই।

কী হয় ওসব খীয়েটর দিয়ে ?”

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আর ছুটির দিনে সকাল সকাল তারা গিজর্জায় যেত, পাশাপাশি হেঁটে ফিরত, দুজনেরই মখে ফুটে থাকত উপাসনার আবেগ। দুজনেরই সঙ্গে লেগে থাকত মনোরম সুরবাস। ওলংকার রেশমী পোশাক থেকে বেরোত একটা খুশী-খুশী খস্‌খস্‌ শব্দ।

বাড়িতে তাদের খাদ্য ছিল চা, মিষ্টি রুটি, আর রকম রকম জ্যাম। তারপর কিম্বার ‘পাই’। রোজ দুপুরবেলা তাদের বাড়ির সামনের উঠোনে, গেটের বাইরে, রাস্তায়, সুরুরার ভুরভুরে গন্ধ ছড়াতো, ভেড়ার বা হাঁসের ঝলসানো মাংসের কিংবা উপবাসের দিনে মাছের। যে-ই যেত ওবাড়ির পাশ দিয়ে, তারই খিদে পেয়ে যেত।

আপিসে, সামোভারে চায়ের জল সব্দাই চড়ানো থাকত—খন্দের এলে দেওয়া হত চায়ের সঙ্গে কড়াপাকের পিঠে।

সপ্তাহে একদিন করে তারা যেত স্নানাগারে, ফিরত এক সঙ্গে টকটকে রাঙা-বরণ হয়ে।

ওলংকা বলত বন্ধুদের, “সত্যি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সব দিক থেকে বেশ ভালোই আছি। যেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি ভাসিচ্কা আর আমি, তেমনি যদি সবাই থাকত তো বেশ হত।”

পদুস্তভালভ যখন কাঠ কিনতে মগিলেভে যেত, ওলংকার ভীষণ মন-কেমন করত। সারারাত সে জেগে কাটাত, কাঁদত।

মাঝে মাঝে স্মিরনিন্ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্মিরনিন্ ছিল সৈন্যদলের পশু-চিকিৎসক। সে ওলংকাদেরই বাড়ির একপাশটা ভাড়া নিয়ে থাকত। তার অঙ্গ বয়স। সে এসে গল্প-সংগল্প করত, তাস খেলত, ওলংকার মনটা ভুলে থাকত।

স্মিরনিনের নানা কথার মধ্যে ওলংকার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগত তার ঘরের খবর। স্মিরনিন্ বিবাহিত, আর একাটি ছেলে আছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেছে, কারণ পরপদ্রবুর সঙ্গে প্রেম। বোকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবু মাস মাস টাকা পাঠায় চল্লিশ রুবল, তার ছেলের খোরপোশ বাবদ। এসব শুনলে ওলংকা মাথা নাড়ে আর দীর্ঘস্বাস ফেলে। ওর জন্য বড় দুঃখ হয় তার মনে।

যাবার সময় ওলংকা স্মিরনিন্কে মোমবাতি হাতে করে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দেয়। বলে, “ভগবান করুন, তোমার যেন কোনো বিপদ-আপদ না হয়। তুমি ঘে রইলে এতটা সময় আমার সঙ্গে, তার জন্য ধন্যবাদ। স্বর্গের রাণী মেরী তোমাকে অটুট স্বাস্থ্যে রাখুন।”

তার স্বামীর যেমন চারিদিকে বিবেচনা করে গম্ভীরভাবে কথা কইবার ধরন, ওলে কা তারই অনুকরণ করে। ডাক্তার সিঁড়ির নিচেকার দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন ওলংকা তাকে ডেকে ফেরায়, আর বলে, “দেখ ভল্‌দিমির প্রাতোনিচ্, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মিটমাট করে ফেলাই উচিত; তাকে ক্ষমা করো, ছেলের

মুখ চেয়ে। ছেলোট্টি হয়তো সবই বোঝে।”

পুস্তভালভ যখন ফিরে এল, ওলেন্কা তাকে ঘোড়ার ডাক্তারের দুঃখময় জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনাল—গলা খাটো করে! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মাথা নাড়ল। দুজনেই বলাবলি করতে লাগল ছেলোট্টির বিষয়ে। বলল, নিশ্চয়ই ছেলোট্টির বাবার জন্য মন-কেমন করে। তারপর দুজনেরই মনে যেন কেমন করে এলো একই কথা, তারা দাঁড়ালো এসে গৃহ-বিগ্রহের সামনে। প্রার্থনা করলো মাটি অবধি নুয়ে, ভগবান যেন তাদের সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভালভ পরিবার ছটি বছর কাটাল, পরম শাস্তিতে, বিনা আড়ম্বরে, ভালোবেসে, পরস্পরের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তারপর একদিন, শীতকালে, ভার্সিলি আশ্বেয়িচ্ আপিসে বসে গরম চা-খাওয়ার পর মাথায় টুপি না এঁটে বেরিয়ে গেল কিছু কাঠ চালান দিতে। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল, অসুখ করল। সব চেয়ে বড় বড় ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারল না। চার মাস ভোগের পর পুস্তভালভ মারা গেল। ওলেন্কা আবার বিধবা হল।

স্বামীর গোর দিয়ে ওলেন্কা ফর্দিয়ে কান্না শূন্য করল, “কার কাছে যাব আমি, ওগো তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি অভাগী দুঃখিনী? ওগো তোমরা সবাই আমাকে দেখ’সে।”

কালো শোকবস্ত্র পরে ওলেন্কা চলাফেরা করে। মাথায় টুপি নেই, হাতে দস্তানা পরে না। চোখের জলের ধারার নকশায় তৈরি শাদা ঝালর অঙ্গে ধরে। বাইরে বেরোয় কদাচিৎ; যদিও বা যায় কোথাও তো সে গিজায় কিংবা স্বামীর কবর দেখতে। বাড়িতে বাস করে যেন সন্ন্যাসিনী।

ছটি মাস কেটে যাবার পর সে বিধবার বেশ ছাড়ল। তার ঘরের জানলার খড়খড়ি উঠতে আরম্ভ করল। কখনো-সখনো তাকে বাজারের পথেও দেখা যেতে লাগল, সকালের দিকে রাধুনীর সঙ্গে। কি যে সে করে, বাড়িতে কি করে তার দিন কাটে তা নিশ্চয় করে কেউ জানল না, তবে আন্দাজ একটা করা গেল। দেখা যেত, ওলেন্কা বাগানে বসে চা খাচ্ছে ঘোড়ার ডাক্তারটির সঙ্গে, ডাক্তার ওলেন্কাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এসব দেখে লোকে অনুমান একটা করে নিত।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। ডাকঘরে ওলেন্কার একটি চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে সে বললে, “আমাদের এই শহরে গোর-ঘোড়ার কি হয় না হয় দেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই এত ব্যামো। প্রায়ই শোনা যায় দুধ খেয়ে মানুষের অসুখ করে, গোর-ঘোড়ার ছোঁয়াচ লেগে এটা হয়, সেটা হয়। গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, যেমন মানুষের জন্য, ঠিক তেমন নজর রাখা উচিত।”

পশুর ডাক্তারটির মনে যা ধারণা ওলেন্কার বক্তব্যও তাই। সকল বিষয়েই ডাক্তারের যা মত তারও আজকাল সেই মত। পশুই দেখা গেল,

কোন একটা আকর্ষণ বিনা ওলেংকার একটি বৎসরও কাটে না। আর, এবারে সে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে আনন্দ একেবারে তার নিজের বাড়িরই একপাশে।

মেয়েটি আর কেউ হলে তার নিশ্চয় হত, কিন্তু ওলেংকার সম্বন্ধে কেউ কুকথা ভাবতে পারত না—সবটাই তার এত সহজ স্বাভাবিক। কি ডাক্তার কি সে—কেউই খুলে বলেনি যে আগে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা বদলেছে। বরং ওটা ওরা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না, কারণ ওলেংকার কথা গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল না।

যখন ডাক্তারের সহকর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ওলেংকা তাদের চা ঢেলে দিতে দিতে বা যাবার সময় তুলত জীবজন্তুর মড়কের কথা। কিংব, বলত পশুদের কোন ব্যায়রাম অথবা সরকারী কসাইখানার বিষয়। ডাক্তার বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বন্ধুরা চলে যেতেই সে ওলেংকার হাত চেপে ধরে ফেস করে উঠত, “বার বার তোমাকে মানা করেছি যা তুমি বোঝ না তা নিয়ে কথা না বলতে। আমরা পশু-চিকিৎসকেরা যখন আলাপ-আলোচনা করি, দয়া করে তুমি তার মধ্যে এসে পড়ো না। সত্যি ভারি রাগ হয়।”

ওলেংকা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাত, চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করত, “তা হলে কী বিষয়ে কথা বলব, ভলদচ্কা?” তারপর জলভরা চোখে সে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরত, ডাক্তারকে দিবা দিত রাগ না করতে। তারপর দুজনেরই খোশমেজাজ ফিরে আসত।

এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। ডাক্তার তার সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় গেল, একেবারে মতো। গোটা দলটাই বদলি হয়ে গেল দূর দেশে—হয়তো বা সাইবীরিয়াতেই। ওলেংকা একা পড়ে গেল।

এবারে সে একেবারেই একলা পড়ে গেল। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তাঁর সেই আরামকেদারাটা পড়ে আছে চিলকোঠার গুদামে, ধুলোয় ভর্তি, একটা পায়ী ভাঙা। ওলেংকা রোগা হয়ে গেল, তার চেহারাও আর সে গ্রী রইল না। রাস্তায় দেখা হলে আর তার দিকে কেউ আগের মত চাইত না, হাসত না। বোঝা গেল তার জীবনের সব চেয়ে ভালো দিনগুলো চলে গেল। সে দিন রইল পিছনে পড়ে, এখন যে জীবন শুরু হল তা আলাদা, অনিশ্চিত, তার কথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যাবেলায় বারাসাদায় বসে ওলেংকা শুনত ‘তিভোলি’তে বাজনা বাজছে, বাজি ফুটেছে, কিন্তু তা শুনে তার কোনো কথাই মনে হত না। ফাঁকা উঠানটার দিকে সে নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, কোন কথা ভাবত না, চাইত না কিছুই। দিন ফুরিয়ে গেলে ওলেংকা শূন্যে পড়ত, স্বপ্নে দেখত ফাঁকা উঠানটা। খাওয়া-দাওয়া করত, যেন অনিচ্ছায়।

সব চেয়ে বড় আর বিগ्री ব্যাপার হল যে তার আর কোন রকম মতামত রইল না। চোখে পড়ত নানা জিনিস, বুঝত কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু

সম্বন্ধেই একটা মতামত তার মনে গড়ে উঠত না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তাও সে বুঝত না।

কী ভয়ংকর ব্যাপার—মতামত না থাকা! ধরো, দেখছ একটি বোতল অথবা বৃষ্টি, কিংবা দেখছ চাষী চলেছে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, কিন্তু বোতল, বৃষ্টি বা চাষী কি নিমিত্ত, কী তাদের তাৎপর্য—কিছুই বলতে পারছ না, হাজার রূপিয়া কবুল করলেও নয়!

যখন তার কুকিন্ ছিল অথবা পদুস্তভালত কিংবা পরে তার কাছে থাকত পশুর ডাক্তারটি—তখন ওলংকা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারত, যা চাও তারই সম্বন্ধে একটা মত দিতে পারত। কিন্তু এখন তার মনটা ফাঁকা উঠোনটার মতো। বড় কষ্টমাখা, বড় বিস্বাদ এ জীবন।

শহরটা একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোলামেলা রাস্তা জিপসী রোড হয়ে উঠল শহরে সড়ক। যেখানে ছিল তিভোলির বাগানগুলো আর কাঠের গোলা, সেখানে বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে গলিঘুঁজি গজিয়ে উঠল। কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়!

ওলংকার বাড়িটা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। ছাতে মরচে ধরল, কুঁড়েঘর এক পাশে ঝুলে পড়ল, সারা উঠোনটা ভরে গেল লম্বা ঘাস আর বিছুটির ঝোপে। ওলংকার নিজেরও বয়স হল, চেহারায় সে লাভণ্য আর রইল না।

গ্রীষ্মকালে সে বসত বারান্দাটায়, মন শূন্য, নিরানন্দ, বিরস। শীতে সে বসত জানলার ধারে, তাকিয়ে থাকত বরফের দিকে। কখনও বসন্তের বাতাসে অথবা হাওয়ার ভেসে আসা গিজার ঘণ্টাধ্বনিতে স্মৃতির বন্যা জেগে উঠত, তখন তার মন গেলে যেত, চোখে জল ভরে আসত—কিন্তু তাও মূহূর্ত-স্থায়ী, সেটা চলে গেলেই আবার ফিরে আসত সেই শূন্যতা, জীবনের উদ্দেশ্যের সেই অনিশ্চয়তা।

কালো বেড়ালের বাচ্চা রিস্কা তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াত, ঘড়ির ঘড়ির শব্দ করত, কিন্তু ওসব বেড়ালী আদরে ওলংকার মন সাড়া দিত না। ওর কি ঐটুকুরই দরকার? সে চাইত এমন ভালোবাসা যা তার সমস্ত আত্মা, তার মনকে দখল করবে, মনে জন্ম দেবে ধারণার, জীবনে আনবে গতিমুখ, পড়ন্ত বয়সের রক্তে এনে দেবে উষ্ণতা।

কালো বেড়ালবাচ্চাটাকে ওলংকা তার কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলত, “যা এখান থেকে, যাঃ! এখানে কী তোর? এখানে কিছুর নেই।”

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোনো মত নেই, অমত নেই, আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই। রাধুনী মাভ্রা যা বলত, ওলংকা তাই মেনে নিত।

একদিন—জুলাই মাস, গরম পড়েছে, সন্ধ্যার দিকে, গরুগুলো যখন ঘরে ফিরছে সারা উঠোনে ধুলো উড়িয়ে—সেই সময় কে যেন আচম্কা দরজায় ঘা দিল। ওলংকা নিজেই গেল ফটক খুলতে, খুলে যা দেখল তাতে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে পশুর ডাক্তার শ্মিরনিন্। তার চুলে পাক

থরেছে, পরনে বেসামরিক পোশাক।

এক মন্থহুতে ওলংকার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল। একটি কথাও না বলে সে স্মিরনিনের বকে তার মাথা রাখল। এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার মন যে, কখন যে স্মিরনিনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে চা খেতে লাগল তা সে বদ্বতেই পারল না।

আনন্দে সে কেঁপে উঠল, মূখে কথা ফুটল, “ওগো ভ্লাদিমির প্রাতনিচ, কী জন্যে এলে এখানে?”

স্মিরনিন বলল, “আমি এসেছি এখানে থাকব বলে। সৈনিকের চাকরি আমার শেষ হয়েছে। এবারে এখানেই বসবাস করে নিজে রোজগার করবার চেষ্টা দেখব; তা ছাড়া ছেলোটও বড় হল, তাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। আর জানো, স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলেছি।”

ওলংকা বললে, “কোথায় সে?”

“হোটোলে, আমার ছেলের সঙ্গে। আমি বেরিয়েছি একটা আন্তানা খুঁজতে। ভাড়া নেব।”

“সে কি কথা গো! আমার বাড়িটা নাও। ভাড়া! একটি পয়সা ভাড়া নেব না।” ওলংকার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কাঁদতে শুরু করলে। বলল, “তোমরা এখানে থাকো। আমার পক্ষে বাড়ির একটা ধারই যথেষ্ট। ওঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার!”

পরদিনই তারা ছাতে দু-এক পোঁচ রঙ আর দেয়ালে চুনকাম করতে লেগে গেল। ওলংকা কোমরে হাত দিয়ে উঠোনটার চারদিক ঘুরে কাজের খবরদারী করতে লাগল। সেই পূরনো দিনের হাসি আবার তার মূখে ফুটে উঠল। মনে হল যেন লম্বা একটানা ঘুমের পর তার শরীর তাজা হয়ে প্রাণ ফুটে উঠেছে।

পশুর ডাক্তারের স্ত্রী এল। রোগা মেয়েটি, সাদাসিধে ছোট করে ছাটা চুল, মূখে একটা খামখেয়ালী ভাব। সঙ্গে তার ছোট ছেলোট, সাদা, বয়স প্রায় দশ, কিন্তু সে আশ্চর্য্যে মাথায় খাটো। ফুলো ফুলো গালে টোল, উজ্জ্বল নীল চোখ। উঠোনে ঢুকেই সে বিড়ালটার পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খিল খিল হাসি—খুশী মনের ফুর্তির।

ছেলোট জিজ্ঞেস করল, “মাসি, এটা কি তোমার বেড়াল? ওর যখন বাচ্চা হবে, আমাকে দিও। মা ইন্দুর দেখে ভয়ানক ভয় পায়।”

ছেলোটের সঙ্গে ওলংকার গল্প শুরু হল। চা খাওয়াল সে ছেলোটিকে। হঠাৎ তার বুকটা ভরে উঠল। মধুর একটা ভাবে তার বুক কনকন করতে লাগল—ছোট ছেলোট যেন তার নিজের।

সন্ধ্যাবেলায় সে যখন খাবার ঘরে তার পড়া তৈরি করতে বসল, ওলংকা তার দিকে চেয়ে রইল। মন মূখ তার স্নেহমমতায় ভরে উঠল। সে বলতে লাগল, নিচু গলায়, “আমার দুলাল, আমার মানিক, কত বৃদ্ধি তোমার—কী

সৈয়দ মদুজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—৬

সুন্দর দেখতে তুমি !”

ছেলেটি জোরে জোরে পড়তে লাগল, বই দেখে, “দ্বীপ একটি ভূখণ্ড, সম্পর্করূপে জলবেষ্টিত।”

ওলেকা পদনরাবৃত্তি করল, “দ্বীপ একটি ভূখণ্ড।”

বহুদিনের ফাঁকা মন থেকে একটি কথা না ব’লে সে আজ এই প্রথম একটি মত প্রকাশ করল যাতে তার বিশ্বাস আছে।

এইবারে তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাত্রে খাবার সময় সে সাশার বাবা-মাকে শোনাতে লাগল যে, হাইস্কুলে ছেলেপিলেদের যা পড়ানো হয় তা কী রকম শক্ত। অবশ্য শূদ্ধ কারিগরীর কাজ শেখানোর চেয়ে উচ্চশিক্ষা ভালো, কারণ তার দ্বারা সমস্ত পথই খুলে যায়—চাও তুমি ডাক্তার হতে পারো...এঞ্জিনিয়ার হতে পারো...

সাশা হাইস্কুলেই যেতে শুরুর করল। তার মা খারকভে তার বোনের বাড়ি গেল, গিয়ে আর ফিরল না। বাবা তার পশুর পাল দেখতে বেরোত, কখনো কখনো এক নাগাড়ে বাইরে থাকত। ওলেকার মনে হত সবাই সাশাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ তাকে চায় না, না খেয়ে ছেলেটি মরে যাচ্ছে। ওকে সে সরিয়ে আনল নিজের পাশটিতে ছোট একটি কামরায়। সেখানেই তার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

ছ মাস হয়ে গেল। সাশা থাকে তার পাশেই। রোজ সকালে ওলেকা যায় সাশার ঘরে। সাশা তখনও শূয়ে, গালের তলায়, হাতটি রেখে গভীর ঘুম্নে অচেতন, নিঃশব্দে উঠছে পড়ছে। ওলেকার মনে কষ্ট হয় সাশার ঘুম্ন ভাঙাতে। তবু বলে, আস্তে আস্তে, “সাশেনকা, উঠে পড়ো সোনা। ইস্কুলে যাবার সময় হল।”

সাশা ওঠে, পোশাক পরে প্রার্থনা সেরে খেতে বসে। খায় তিন গ্লাস চা, দুটো বড় কড়া কেক, মাখন-মাখানো আখখানা ছোট রুটি। ঘুম্ন তখনও তার পুরোপুরি কার্টেনি, তাই মেজাজটি তখনও ধাতস্থ হয়নি।

ওলেকা বলে, “সাশেনকা, গম্পটা তোমার কিন্তু ভালো তৈরী হয়নি।”

এমন ভাবে চেয়ে থাকে সে তার দিকে, যেন ছেলেকে সে বিদায় দিচ্ছে দূর যাত্রার পথে।

“তোমার জন্য আমি ভেবে মরি। প্রাণপণ চেষ্টা করো সোনামণি, ভালো করে পড়াশুনো করো। মন দিয়ে মাস্টারদের কথা শুনো।”

সাশা বলে, “আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও দিকি।”

তারপর হেঁটে রওনা হয় স্কুলে।

ছোট মূর্তিটি পথে চলেছে, মাথায় মস্ত একটা টুপি, কাঁধে একটা ঝুলি। ওলেকা নিঃশব্দে পিছদ পিছদ যায়। ডাকে, “সাশেনকা—আ।”

সাশা যেই পিছন ফিরে তাকায় ওলেকা ওর হাতে গর্জ্জে ধ্যে একটি খেজুর বা কারামেলের একটি টুকরো।

স্কুলের গলি এসে পড়ে। সাশেনকার বিদ্রী লাগে, লম্বা মোটা-মোটো একটি

মহিলা তার পিছদ পিছদ আসছেন, দেখে তার লজ্জা করে। পিছন ফিরে সে বলে, “মাসি, বাড়ি ফিরে যাও। এখন আমি একা যেতে পারব।”

ওলৎকা থামে, কিন্তু তার চোখ সরে না। স্কুলে ঢোকার পথটিতে ছেলে পেঁচছে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। আঃ, কী ভালোই বাসে সে ছেলেটিকে। মায়ার ফাঁদে সে আগেও পড়েছে, কিন্তু কেউই তাকে এমন করে বাঁধতে পারেনি। আজ তার মায়ের মন জেগে ওঠে যত আনন্দে, যেমন করে তার আত্মটাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমন কখনো হয়নি আগে। এই ছোট্ট ছেলেটি তার নিজের নয়, তবু তার গালের টোলটি, মাথার টুপিটার জন্য সে তার জীবন দিতে পারে, আনন্দে, মমতায়, জলভরা চোখে। কেন? কেন তা কে বলতে পারে?

সাশাকে স্কুলে পেঁচছে দিয়ে ওলৎকা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। মনভরা তার তৃপ্তি, প্রশান্তি, ভালোবাসা। গেল ছ মাসে বয়স যেন তার কমে গেছে, মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। লোকে তাকে দেখে খুশী হয়, বলে, “সুপ্রভাত গো ওলৎকা সেম্‌ইয়নভানা, দুলালী, কেমন আছ দুলালী?”

সে বলে, “ইস্কুলে আজকাল এত শস্ত পড়া দেয়!” বাজারে ঘুরে কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে সে বলতে থাকে, “ঠাট্টা নয়। কাল প্রথম ঘণ্টায় ওকে পড়া দিয়েছে একটা গল্প মূখস্থ, লাতিন থেকে একটা তত্ত্বজ্ঞান আর একটি সমস্যাপ্রদর্শন। ঐটুকু একটা ছেলের পক্ষে এটা বড় বাড়াবাড়ি, বাস্তবিকই।”

তারপর সে আরম্ভ করে মাস্টারদের কথা, পড়ার কথা, পাঠ্য বইগুলোর কথা—সাশা যা বলে ঠিক তাই বলে।

তিনটের সময় ওরা একসঙ্গে খায়। সন্ধ্যাবেলায়, মাস্টাররা যে বাড়ির পড়া দেন তা ওরা পড়ে একসঙ্গে, একই সঙ্গে কাদে। সাশাকে বিছানায় শুইয়ে ওলৎকা প্রার্থনায় আর ক্রুসচিহ্ন আঁকায় অনেকক্ষণ লাগিয়ে দেয়। তারপর সে নিজে শুতে যায় আর স্বপ্ন দেখে সেই দূর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতে, যখন সাশার পড়া শেষ হয়েছে, সে ডাক্তার বা এঞ্জিনীয়ার—তার মস্ত একটা বাড়ি, বোড়াগাড়ি। বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে... এই কথাই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশে কালো বেড়ালটা শূন্যে আওয়াজ করে...ঘড়ন...ঘড়ন।

হঠাৎ দরজায় জোরে ঘা পড়ে। ওলৎকার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আধ মিনিট বাদে আবার ঘা।

ওলৎকার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, “খারকভ থেকে এসেছে তার। সাশার মা তাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। হা ভগবান!”

সমস্ত আশাভরসা তার উবে যায়, মাথা হাত পা ঠান্ডা হয়ে পড়ে, মনে হয়, তার মত অভাগিনী জগতে আর কেউ নেই।

কিন্তু আরও এক মূহূর্ত কেটে যাবার পর সে কার যেন গলা শুনতে পায়; কিছন্ন নয়, পশুর ডাক্তার ঝাব থেকে ঘরে ফিরল।

ওলেকা মনে মনে বলে, “যাক। ধন্য ভগবান!” ক্রমে ক্রমে তার বুদ্ধের ওপর থেকে ভারটা সরে যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে যায় বিছানায়, আর সাশার কথা ভাবে। পাশের ঘরে ঘুমোয় সাশা আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, “দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এই, ওকি, মারামারি নয়!”

*

*

*

গল্পটি চেফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। কেউ কেউ বলেন, দি বেস্ট শর্ট স্টোরি অব চেফ। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কেন?

তারই টীকা করেছেন স্বয়ং টলস্টয়। এরকম একটা ঘটনা এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল। প্রভাত মুখুয্যে একটা ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার মূলে বক্তব্য ছিল, হিন্দুর ‘নীচ’ জাতির একটি ছেলে অপমানিত বোধ করে খৃষ্টান হবে বলে মনঃস্থির করলে। তখন দেখে, খৃষ্টানদের ভিতরও জাতিভেদ রয়েছে। নেটিভ খৃষ্টানদের জন্য আলাদা ক্লাব, এমন কি ধর্ম মন্দির—চার্চ সেও আলাদা, এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মৃত্যুর পরও জাতিভেদ যায় না : গোরার জন্য ভিন্ন গোরস্থান, নেটিভের ভিন্ন গোরস্থান। গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, সে যুগের ঋষিপ্রধান স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি সমালোচনা লেখেন—‘ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর’। হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমস্যা নিয়ে এরকম প্রামাণিক প্রবন্ধ এর পূর্বে বা পরে কখনো লিখিত হয়নি। ‘হরিজন’ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু বহু পূর্বে।

টলস্টয়ের টীকা পড়ে পাঠক বুঝবেন, আমরা, সাধারণ-পাঠক, কত সহজেই গল্পটির মূল বক্তব্য মিস করে যেতে পারি। অনবদ্য এই টীকাটি।

টীকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চেফ সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানান তাঁর গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন টীকাটি পড়েন এবং প্রকাশকদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সবসময়ই গল্পটির সঙ্গে টীকাটিও ছাপেন। ইটিও অনুবাদ করেছেন সখা খাফী খান।

হুলালী (“হুশেচকা”)র সমালোচনা

ভলস্তুয়

বাইবলের গণনাপুস্তকে একটি গল্প আছে, তার অর্থ অতি গভীর। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ইস্রাএলীরা যখন মোআবের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হল, মোআবীয়দের রাজা বালাক্ তখন নবী বালআমকে ডেকে পাঠালেন ইস্রাএলীদের অভিসম্পাত দেবার জন্য ; কাজটি সেরে দিলে বালাক্ বালআমকে বহু পুরস্কার দেবেন। তার লোভে বালআম বালাকের কাছে গেলেন এবং তাকে নিয়ে উঠলেন পর্বতে। সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হল, গোবৎস ও মেষ উৎসর্গ করা হল অভিশাপের উদ্যোগে। বালাক্ রইল অভিশাপের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বালআম ইস্রাএলের লোকদের অভিসম্পাত না দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

২৩ পরিচ্ছেদ ১১ চরণ : “বালাক্ বালআমকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা ? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিলা।”

তাহাতে সে উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমার মুখে যা কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে ?

“১৩। পরে বালাক্ কহিল, আমি মিনতি করি, অন্যস্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্ত তাহাদিগকে শাপ দেও।”

কিন্তু আবার শাপ না দিয়ে বালআম আশীর্বাদ করলেন। তৃতীয় বারেও তাই।

২৫ পরিচ্ছেদ ১০ম চরণ, তখন বালআমের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল, সে আপনা হস্তে হস্তের আঘাত করিল এবং “বালআমকে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তিন বার সর্বতোভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করিলা।

“১১। অতএব তুমি এখন স্বস্থানে পলায়ন কর ; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখ পরমেশ্বর তোমায় সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন।”

তখন বালআম পুরস্কার লাভ না করেই প্রস্থান করলেন, কারণ তিনি বালাকের শত্রুদের অভিসম্পাতের পরিবর্তে দিলেন আশীর্বাদ।

বালআমের যা হয়েছিল প্রকৃত কবি ও রসপ্রস্টাদের প্রায়ই তা হয়। বালাকের পুরস্কার জনপ্রিয়তার লোভে কিংবা লাস্ত ধারণার বশে কবি দেখে না যে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদূত, গাধাও যাকে দেখতে পায়।^১ চায় সে

১ বালাকের আমন্ত্রণে বালআম যখন যাত্রা শুরুর করে তখন তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল যিহুদের দূত। বালআম তাকে দেখতে পাননি, কিন্তু যে গাধার পিঠে চড়ে সে আসছিল সে পেয়েছিল দেখতে—অনুবাদক।

অভিশাপ দিতে, কিন্তু অহো ! সে দেয় আশীর্বাণী ।

ঠিক তাই হল খাঁটি কবি এবং রসস্রষ্টা চেখফের মনোহর এই “দুলালী” গল্পটি লেখবার বেলায় ।

লেখক নিশ্চিত চেয়েছিলেন কৃপার পাত্রী এই জীবটিকে উপহাস করতে । স্বয়ং দিয়ে নয়, বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলেন দুলালীকে—যে প্রথমে কুকিনের দৃষ্টিস্তর বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর কাঠ কেনা-বেচার বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর পশুর ডাক্তারের আওতায় এসে গরু-মহিষের ব্যামোকেই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বলে ঠিক করে, আর শেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং মস্ত টুপি পরা ছোট্ট বাচ্ছাটির ভালোমন্দ নিয়ে ।

কুকিন্ পদবীটি উন্মত্ত, তার অসুখ, যে টেলিগ্রামে তার মারা যাবার খবর জানানো হল তাও উন্মত্ত, কাঠের ব্যাপারী আর খানদানী ঠাট পশুর ডাক্তার, এমন কি ছোট্ট ছেলটি, সবাই, সবই উন্মত্ত, কিন্তু দুলালী, তার অন্তর, যাকেই সে ভালবাসে তারই মধ্যে তার সমস্ত সত্তার নিবেদন—এ উন্মত্ত নয়, অনির্বচনীয় পবিত্র ।

আমার বিশ্বাস, “দুলালী” গল্পটি লেখার সময়ে লেখকের—স্বয়ংয়ের নয়—মনে ছিল একটি অস্পষ্ট মূর্তি, নব্য নারীর, স্বয়ং পুরুষের সমকক্ষ, মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন, শিক্ষিতা, সমাজহিতব্রতে স্বয়ং-নিযুক্ত দক্ষতায় পুরুষের তুল্য কিংবা আরও সুদক্ষ, নারীসমস্যা কথাটা যে তুলেছে এবং তোলে ।

“দুলালী” লিখে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন মেয়েদের কী হওয়া উচিত নয় । জনমত বালাক-চেখফকে বলেছিল, দুর্বল, একান্ত অনুগত, অনুমত, পুরুষসেবায় নিয়োজিত স্ত্রীদের অভিশাপ দাও । চেখফ পর্বতে উঠলেন, বেদীর উপর গোবৎস এবং মেস রেখে দেওয়া হল, কিন্তু যখন তাঁর মূখ খুলল, তখন, যাদের শাপ দিতে এসেছিলেন তাদের তিনি শোনালেন আশীর্বাচন ।

অনবদ্য স্বচ্ছ পরিহাসের রসে লেখা অপরূপ এই গল্পটি : তবু, এর কোনো কোনো অংশ পড়তে গিয়ে আমি অন্ততঃ আমার চোখের জল সামলাতে পারি নি । মন ভিজেছে—কুকিন্, যা কিছ্ নিয়ে কুকিন্ মেতে থাকে, কাঠ-ব্যবসায়ী, পশুর ডাক্তার এসবের প্রতি দুলালীর একান্ত অনুরাগ ও অভিনিবেশের বিবরণ পড়ে ; আরও বেশী যখন সে একা, আর তার ভালোবাসার কেউ নেই—তখন তার যে যন্ত্রণা, তার বিবরণ, আর সবার শেষে, নারীর মাতৃস্বের যে অনুভূতি তার নিজের জীবনে সে পায়নি তার সমস্ত শক্তি এবং অপরিসীম প্রেম যখন সে নিয়োগ করে ভবিষ্যতের মানব মস্ত বড় টুপি-পরা ইস্কুলের ছেলটির মধ্যে, তার বিবরণ পড়ে ।

লেখক মেয়েটিকে ভালোবাসালেন উন্মত্ত এক কুকিন্কে, নগণ্য এক কাঠ-ব্যবসায়ীকে, কাঠখোঁট্টা এক পশুর ডাক্তারকে, কিন্তু প্রেমের পাত্র একটা কুকিনই হোক আর একটি স্পিনোজা পাস্কাল বা শিলারই হোক, প্রেমাস্পদ ঘন ঘন বদলাক—যেমন দুলালীর বেলায়—অথবা চিরকাল একই থাক, প্রেম তাতে কিছ্ কম পবিত্র হয় না ।

কিছুদিন আগে আমি ‘নোভোয়ে ভেম্‌ইয়া’ কাগজে নারী সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটিতে লেখক নারীদের সম্বন্ধে অতি চতুর এবং বড় গভীর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “মেয়েরা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করছে যে যা কিছু আমরা পুরুষেরা পারি, তারাও পারে। এ নিয়ে আমার বিবাদ নয়; আমরা মানতে রাজি যে পুরুষেরা যা পারে মেয়েরাও তার সবই পারে, হয়তো পুরুষের চেয়ে ভালোই পারে। কিন্তু মর্শকিল এই যে, মেয়েরা যা পারে পুরুষদের কীর্তি তার ধারেকাছেও যেতে পারে না।”

ঠিক, কথাটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটি যে শব্দ শিশুর জন্মদান, লালন-পালন ও বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য তাই নয়। পুরুষ সেই সর্বাধিক উন্নত শ্রেষ্ঠ কার্যটি সাধন করতে পারে না যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটতম সম্মিথানে আসতে পারে—এই কীর্তি—প্রেম, প্রেমাস্পদে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। এটি শ্রেষ্ঠ নারী পেরেছে, পারে এবং পারবে—অতি উত্তমভাবে এবং সহজ স্বাভাবিক উপায়ে। কী হত এই জগতের যদি মেয়েদের এই ক্ষমতাটি না থাকতো এবং যদি এর প্রয়োগ তারা না করতো!

মেয়ে ডাক্তার, টেলিগ্রাফের কেরানী, নারী বৈজ্ঞানিক, মেয়ে উকীল, লেখিকা—এ সব না থাকলেও আমাদের চলতো, কিন্তু যারা মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ভালোবাসে এবং সেইটিকে অগোচরে তার মধ্যে সঞ্চারিত, উদ্ভূত করে তার সহায় হয়, সেই মা, সহায়িকা, সাস্ত্রনাদাত্রী—তারা না থাকলে জীবনটা বিপরীত একটা ব্যবহার হয়ে উঠতো। যীশুখ্রীষ্টের কাছে কোনো মগদলীন আসত না, সাধু ক্রিস্টিসের সঙ্গে ক্লারা থাকত না, ডিসেম্বরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পত্নীরা সাইবীরিয়ায় যেত না, দুখবরদের স্ত্রীরা যে তাদের স্বামীদের সত্যের জন্য আত্মদানের পথ থেকে না সরিয়ে দিয়ে বরং সেইপথেই তাদের প্রবৃত্ত করোঁছিল, তাও হত না। থাকত না সেই হাজার হাজার অজানা মেয়েরা—নারীকুলশ্রেষ্ঠা এরা—অজ্ঞাতেরা চিরকালই যা হয়—যারা সাস্ত্রনা দেয় মদ্যপ, দুর্বল, উচ্ছৃঙ্খল জনকে, প্রেমস্নিগ্ধ সাস্ত্রনার প্রয়োজন যাদের সবার চেয়ে বেশী। এ প্রেম যাতেই প্রযুক্ত হোক, কুকিনে বা খ্রীস্টে, এইটেই নারীর প্রধান, মহীয়সী, অনন্যলভ্যা শক্তি।

কী প্রচণ্ড বোঝার ভুল, এই সব তথাকথিত নারীসমস্যা—যার কবলে পড়েছে শব্দ মেয়ে নয়, পুরুষদেরও বেশীর ভাগ। অবঁচীন যে কোনো ধারণার কবলে এরা পড়বেই।

“মেয়েদের মন চায় নিজেদের উন্নতি।” এর চেয়ে ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু স্বভাবগুণে মেয়েদের কাজ পুরুষদের কাজ থেকে ভিন্ন। অতএব মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এবং পুরুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এক হতে পারে না। মেনে নেওয়া যাক যে মেয়েদের আদর্শ কী তা আমরা জানি না। যাই হোক সেটা, এটা নিশ্চিত যে সেটা পুরুষের চরম উৎকর্ষের আদর্শ নয়। অথচ, নারীজাতির পথকণ্টক এই শোখীন নারী আন্দোলনের সমস্ত

উদ্ভট কার্যকলাপের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ পদ্রুপালী আদর্শে পেশীহীনো ।

আমার মনে হয়, এই ভুল বোঝার প্রভাব চেখফের উপর পড়েছিল “দুলালী” লেখবার সময় ।

বাল্যআমের মতো তিনি চেয়েছিলেন অভিশাপ দিতে, কিন্তু কাব্যদেবতা তাঁকে নিষেধ করলেন, আদেশ দিলেন আশীর্বাদ করতে । আশীর্বাদই তিনি করলেন এবং অজ্ঞাতে এমন অপূর্ব প্রভামণ্ডিত করলেন এই মাধুরীময়ী প্রাণীটিকে যে সে চিরকালের মতো একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল—যে নিজেকে আনন্দ চায় এবং নিয়তি যাকেই তার সান্নিধ্যে আনে তাকেই আনন্দ দিতে চায়, এমন একটি নারী যে কী হতে পারে তার ।

গল্পটি যে এত অপরূপ তার কারণ, এর পরিণতি পূর্বকল্পিত নয় ।

আমি বাইসিকেল চালাতে শিখেছিলাম একটা হলঘরে । সেটা এত বড় যে তার মধ্যে একটি সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করতে পারে । অপর প্রান্তে একটি মহিলা শিখাছিলেন বাইসিকেল চড়া । আমি ভাবলাম, হুঁশিয়ার থাকব, ও’র উপর চোখ রাখলাম । চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই আমি ও’র দিকে এগিয়ে পড়তে লাগলাম । উনি বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পিছন হটতে আরম্ভ করলেন । তবু আমি গিয়ে পড়লাম ও’র ঘাড়ের উপর, ধাক্কা মেরে বাইসিকেল থেকে তাঁকে ফেলে দিলাম—অর্থাৎ যা চেয়েছিলাম তার উল্টোটাই করে বসলাম—শুধু এই কারণে যে আমার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল মহিলাটির উপর ।

চেখফেরও তাই হল, বিপরীত মতে । উনি চেয়েছিলেন দুলালীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে, কিন্তু তাঁর কবির দৃষ্টি তার উপর নিবন্ধ থাকায় তিনি দিলেন তাকে তুলে ।

এই টীকাটি পড়ার পর আর কার কি বলবার থাকে ?

[চেখফ বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আমার জীবনে আর কী আশা করতে পারি ?

সত্যোদ্ভনাথ যখন একদিন দেখলেন, কবিগুরু তাঁর একটি বাঙলা কবিতা স্বতঃপ্রসূত হয়ে ইংরিজিতে অনূবাদ করেছেন (অর্থাৎ নিজের স্বজনীকর্ম মূলতুবী রেখে) তখন তাঁর হৃদয়ে কী প্লাঘার উদয় হয়েছিল তার কি কল্পনাও আমরা করতে পারি !]

ধন্য ‘দুলালী’র প্রেম । তা সে যাকেই বাসুক না, যতবারই বাসুক না কেন । রমণীর এই প্রেমই তো জগৎকে শ্যামল করে রেখেছে ।

কিন্তু আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয় । সহস্রয় পাঠক আমার দৃষ্ট কক্ষা করবেন ।

আন্তন চেখফ : ‘The Darling and other short stories’, রুশ কন্সট্যান্স গার্নেটের তরজমা, London, Chatto & Windus, 1918.

‘দুলালী’ যখন ভানিচুকে ভালোবাসছে তখন যদি হঠাৎ ভাসিলিকে দেখে তার প্রেমে মূগ্ধ হয়ে হৃদয়হীনার মত হৃদয় খান খান করে তার প্রেমকে পদদলিত করে (ইংরিজিতে যাকে বলে তাকে ‘জিল্ট’ করে) ভাসিলিকে বরণ করতো তখনও ‘দুলালী’র সে-প্রেম ধন্য ?

ঠাকুর-দেবতার কার্যকলাপ আমাদের সমালোচনার বাইরে । এই যে কেষ্ট-ঠাকুর রাধাকে জিল্ট করে মথুরা গিয়ে একাধিক প্রণয় এবং শূদ্ধতাই নয়, রাধার কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে করলেন, সেগুলোও ধন্য ? অথচ আমাদের হৃদয় তো পড়ে রইল শ্রীরাধার রাঙা পায়ে । শত শত বৎসর ধরে এই বাঙলাদেশে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা আপন আপন বিরহবেদনা আপন আপন পদদলিত প্রেমের নিবিড়তম পীড়া তুলে দিলেন রাধার মূখে । তাই দিয়ে ‘মাথুর’ আর সেই জিনিসই পদাবলীর হৃদয়খণ্ড,—মেরুদণ্ড—যে নামেই তাকে ডাকা যাক । পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা আমি পাইনি : শত শত বৎসর ধরে হাজার হাজার কবি (এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর নাকি প্রায় শতিনেক বিধর্মী মুসলমান কবি ! ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, এই অভাগিনী জিলটেড রাধার প্রেমে কী যাদুমন্ত লোকনো ছিল যে শত শত বিধর্মী কবিকেও তার সামনে নতমস্তক হতে হল !) আপন আপন হৃদয়বেদনা—যার মূল্য বিশ্বাসঘাতক, প্রেমঘ্ন নিরতিশয় স্বার্থপর, নীচ দয়িত দিল না—নিজের মূখে প্রকাশ না করে সর্ব বৈভব নত নমস্কারে রেখে দিল পাগলিনী শ্রীরাধার অধরোষ্ঠে । তার হয়তো একমাত্র কারণ, উপনিষদ বলেছেন, ‘তাকে ত্যাগ করে ভোগ করবে’ । শ্রীরাধা প্রেম দিয়ে আনন্দ পেতে চাননি, মাতৃস্বের বিগলিত মধুরিমা, যশোদার মতো বিশ্বজয়ী পুত্রের গোরবও তিনি কামনা করেননি । তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভোগ করলেন : এ ভোগ ‘দুলালী’র ভোগ নয় । এ শচীপতি ইন্দ্রের ভোগ নয়, এ মশানবাসী নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য । কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে পদদলিত প্রেমের উদাহরণ নেই । যার জন্য তাঁর বিরহবেদনা তাঁর শত শত গানে প্রকাশ পেয়েছে তিনিও কবিকে ভালোবাসেন— তাঁর ‘প্রেমের বেদনা’তে কবির ‘মূল্য আছে’—শুধু তিনি চলে গেছেন দূরে । রবিপ্রেম কখনো লাঞ্চিত হয়নি । সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না ।

কিন্তু এ তো একটা দিক । আমার মূল প্রশ্ন এখনো পাঠকের কাছে রইল, অতি ঘরোয়া ভাষায় শূধোই, এই যে আমাদের সোসাইটি লোড, আজ মূগ্ধযোকে জিল্ট করে কাল সেনকে, পরশু সেনকে জিল্ট করে ঘোষকে— তাঁর প্রত্যেক প্রেমের জয়ধ্বনি গাইবেন টলস্টয় ?

সর্বশেষে পুনরায় বিস্ময় মানি চেখফের এই গল্পটির সামনে । বিস্ময় মানি টলস্টয়ের টীকার সম্মুখে । আমাদের মত জড় পাষণ-হৃদয়কে বিগলিত করে বইয়ে দিল শত শত প্রশ্নধারায় ।

আন্তন চেখফের “বিয়ের প্রস্তাব”

অনুবাদের টিপনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদার-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোন সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর ‘দত্তা’র সঙ্গে এনাটিকার কোন মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা (স্তেপানভনা = স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুদ্ধ নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনো বোধ হয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে-স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধ হয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

পাত্র-পাত্রীগণ :

স্তেপান স্তেপানভিচ্ চুবুকফ—জমিদার।

নাতালিয়া (ডাকনাম নাতাশা) স্তেপানভনা চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা ;
বয়স ২৫।

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ লমফ—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান ফুস্ট-পুস্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোনডিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

[চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ; ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ]

চুবুকফ : [লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে] এস, এস, বন্ধুবর ! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ ! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল [হ্যাঁডশেক]। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছ ?

লমফ : ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন ?

চুবুকফ : মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় ? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দীর্কনি, এত সব ধড়াচড়া পরে কেন। পুরোপাক্ষ্য

ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তানা আর-যা-সব-কি-সব ? কারো সঙ্গে পোশাকী দেখা করতে যাচ্ছে না কি, না অন্য কিছু ভায়া ?

লমফ : আশ্বে না, শূধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি ।

চুব্দ : তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন, ভায়া । মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোশাকী মোলাকাৎ করতে এসেছ ।

লমফ : ব্যাপারটা হচ্ছে (চুব্দকক্ষের হাত ধরে)...আমি কি না, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যার—শূধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না । আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি... কিস্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে । আমি একটুখানি জল খাই । [জলপান]

চুব্দ : [নেপথ্যে] টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই । দেব না । [লমফকে] কি হয়েছে, বলো না ভায়া ।

লমফ : দেখুন স্যার,...কিস্তু মাফ করুন, স্যার...আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে...দেখতেই পাচ্ছেন...মানে কি না, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমার সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এযাবৎ আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হৃদয় আদর্শেই নেই...

চুব্দ : কী বিপদ ! অত সুতো ছাড়ছ কেন ভায়া । বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো ।

লমফ : বলছি, বলছি, এখুনি বলছি...ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে নাভালিয়া স্ত্রোপানভনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি ।

চুব্দ : (সোম্বাসে) ইভান ভাসিলিয়েভিচ ! প্রাণের বন্ধু আমার ! ফের বলো তো, কি বললে । আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি ।

লমফ : অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি ..

চুব্দ : (বাধা দিয়ে) সোনার চাঁদ ছেলে ! আমি যে কী খুশী হয়েছি আর-যা-সব-কি-সব । নিশ্চয় নিশ্চয় আর-যা-সব-কি-সব । [লমফকে আলিঙ্গন ও চুম্বন] ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলাম [এক ফোঁটা চোখের জল] তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি । ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মনের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব । সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলাম...কিস্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি ? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাঙাশ মেরেছে—আমার মাথায় কিছু আসছে না ! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে—আমি গিয়ে নাভালিয়াকে ডাকাছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ : স্যার, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয় ? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি ?

চুব্দ : কি বললে ? নাতাশা যদি রাজী নাও হতে পারে ! অবাক করলে ! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয় ? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর-যা-সব-কি-সব । আমি এখনই তাকে বলছি গে ।

[নিশ্চয়]

লমফ : [একা] আমার শীত-শীত করছে...আমার সর্বাপেক্ষ কাঁপছে, যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি । আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা । বেশী দিন ধরে শব্দ যদি ভাবতেই থাকে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শব্দ আলোচনা করো, গড়িমসি গড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য, কিংবা খাঁটি সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কথখনো বিয়েই হবে না । উহু-হুহু... কী শীত করছে আমার ! নাতালিয়া স্ত্রীপানভনা সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়...এর বেশী আমার কীই বা চাই ? কিন্তু আমি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি । মাথাটা তাশ্জম মাশ্জম করছে । [জলপান] কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না । পরলা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে । দ্বিতীয় : আমাকে মেপেজুকে ছকে কাটা জীবন চালাতে হবে...আমার বৃকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়...আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে যাই...এই তো, এই এখনই আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে...কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল আমার ঘুম নিয়ে । বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখ দুটো জুড়ে আসছে অমনি কি যেন কি একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে । একেবারে ছোরা মারার মত ! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পৌঁছে যায়...আমি খাপার মত লাফ দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শূয়ে পড়ি...কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার ..

[নাতালিয়ার প্রবেশ]

নাতালিয়া : ও, আপনি ! অথচ বাবা বললেন : যাও খন্দের মাল নিতে এসেছে । কি রকম আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ ?

লমফ : আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্ত্রীপানভনা ?

নাতালিয়া : কিছু মনে করবেন না, আমার এপ্রন পরা রয়েছে, ভদ্রদূরস্ত জামা কাপড় পরিণি বলে । আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়িয়েছিলাম রোস্টেরে শূকোবার জন্যে । এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেননি ? বসুন না...[দৃষ্টিতেই বসলেন] দূপুর বেলা এখানে খাবেন ?

লমফ : না । অনেক ধন্যবাদ । আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে ।

নাতালিয়া : সিগারেট খাবেন না ? এই তো দেশলাই...আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুররা সমস্ত দিন কিছই করতে পারলো না । জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি ?

বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলাম, আর এখন তো আমার প্রায় বৃদ্ধ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি? আমার মনে হচ্ছে আপনি খড়াচুড়ো পরেছেন। এ তো নতুন দেখলুম। আপনি কি বল নাচ কিংবা অন্য কিছু একটার যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কি বলছিলাম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে! কিন্তু, সত্যি, আপনি খড়াচুড়ো পরেছেন কেন?

লমফ : [উত্তেজিত হয়ে] ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্ত্রোপানভ্না... আসলে কি জানেন, আমি মনোস্থির করেছি, আপনাকে মন দিয়ে শুনুন... আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি... [নেপথ্যে] আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া : কি বলুন তো! [একটু থেমে] বলুন।

লমফ : সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্ত্রোপানভ্না, যে, আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সামিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলে বয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছ থেকে তিনি গত হলে পরতীর জমিদারী পেয়েছি, তিনি আর পিসেমশাই দুজনারই আপনার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ আর চুবুকফ পরিবারে বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া : মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, ‘আমার’ ভলোভী মাঠ...কিন্তু ওটা কি সত্যি আপনার?

লমফ : হ্যাঁ, আমার...

নাতালিয়া : তাই নাকি! এর পর আর কি চেয়ে বসবেন! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ : না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্ত্রোপানভ্না।

নাতালিয়া : এটা আমার কাছে নতুন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে?

লমফ : তার মানে? আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়...

নাতালিয়া : হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে...ওটা আমাদের।

লমফ : না, আপনি ভুল করেছেন নাতালিয়া স্ত্রোপানভ্না, ওটা আমার।

নাতালিয়া : পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিলিয়েভিচ! ওটা ক’দিন ধরে আপনাদের হয়েছে?

লমফ : ক’দিন ধরে মানে? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে—ওটা তো চিরকালই আমাদের।

নাতালিয়া : আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছি নে।

লমফ : কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিলপত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখাতে পারেন।

একথা অবশ্য সত্য, যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে একসময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুপ্তে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর কোনো প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইঁটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাথেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাস-প্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নতুন বন্দোবস্ত হল...

নাতালিয়া : আপনি যা বলছেন সেটা আদর্শেই ওরকম ধরা নয়। আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হস্ত পোড়া-বন অধি—কাজেই ভলোভী মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারছি নে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ : আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তোপানভ্না !

নাতালিয়া : না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন... বাস্তবিক, এটা একটা তাজব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ' বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠলো, ওটা আমাদের নয়। মাফ করবেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না... অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনো মূল্যই দিই নে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিনশ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিসি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারি নে।

লমফ : আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুরূহ দেখাতে গিয়ে...

নাতালিয়া : ঠাকুন্দা, ঠাকুমা, পিসি... আমার মাথায় ওসব কিছই ঢুকছে না।

মাঠটা আমাদের, ব্যস !

লমফ : ওটা আমার !

নাতালিয়া : ওটা আমাদের ! আপনি ঝাড়া দুদিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়োছড়া সর্বান্তে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই !... আপনার জিনিস আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস

আমার সেটা আমি হারাতে চাই নে...আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন।

লমফ : ও মাঠ আমি চাই নে, নাভালিয়া স্ত্রোপানভ'না, কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাভালিয়া : কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক্ক তো আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিলিয়েভিচ আমার কাছে সব-কিছু বণ্ডই আজগুবী মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা দিলুম; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাদের উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবী—যদি শুনতেই চান...

লমফ : আপনি বলতে চান, আমি তছরূপ করি! আমি কখনো অন্যের জিনিস চুরি করিনি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না...[দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জলপান] ভালোভী মাঠ আমার!

নাভালিয়া : কচু! ওটা আমাদের!

লমফ : ওটা আমার!

নাভালিয়া : ডাছা মিথ্যে! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ : কি বললেন?

নাভালিয়া : আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ : আমি ওদের লাঠি মেরে খেঁদিয়ে দেব!

নাভালিয়া : আপনার সে মুরদ নেই।

লমফ : [বুক আঁকড়ে ধরে] ভালোভী মাঠ আমার! এই সামান্য কথাটা বৃদ্ধিতে পারছেন না? আমার!

নাভালিয়া : দ্বা করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না।

লমফ : আমার বৃকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতুম। [চিৎকার করে] ভালোভী মাঠ আমার!

নাভালিয়া : আমাদের!

লমফ : আমার!

নাতালিয়া : আমাদের !

লমফ : আমার !

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবুকফ : ব্যাপার কি ? তোমরা চ্যাঁচাচ্ছে কেন ?

নাতালিয়া : বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বদ্বিষয়ে বলো না, ভলোভী মাঠটা কার—ও'র, না আমাদের !

চুবু : [লমফকে] মাঠটা আমাদের, বাবা ।

লমফ : মাফ করবেন, স্যার ; ওটা আপনাদের হল কি করে ? আপনি অন্তত হস্তের বিচার করবেন । আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন । চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে । ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই । কিন্তু পরে যখন নতুন বন্দোবস্ত হল—

চুবু : কিছু মনে করো না, বাবা—তুমি ভুলে যাচ্ছে যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনো খাজনা দেয়নি, আর-যা-সব-কি-সব—আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই । তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপ-গুলো দেখোনি !

লমফ : কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার !

চুবু : সে, বাছা, তুমি পারবে না ।

লমফ : নিশ্চয় পারবো ।

চুবু : কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছে কেন, লক্ষ্মীটি ! চ্যাঁচালেই কি কোনো জিনিস প্রমাণ হয় ? তোমার যা হস্তের মাল তা আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই । ছাড়বো কেন ? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরং আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না । এই হল পাকা কথা ।

লমফ : আমি তো বদ্বিতে পারলুম না । পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হস্ত আপনার ?

চুবু : আমার কি হস্ত আছে, না আছে সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও । আর শোনো, ছোকরা, আমি এরকম ধরনের কথা বলা আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই—আমার বরেন্স তোমার ডবল, তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ওরকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না—

লমফ : না । আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন । আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি স্বেবোধ ছেলেরটির মত শাস্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথা—

বার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্ত্রোপান স্ত্রোপানভিচ্ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চব্দ : মানে? কি বললে?

নাতালিয়া : বাবা, এখন খুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চব্দ : [লমফকে] আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যার?

নাতালিয়া : ভলোভী মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফ : সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চব্দ : আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যার, আর-যা-সব-কি-সব।

যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করেছিলেন আদালতে যাবার জন্য, একটা মোকা পাওয়ার আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব। তোমাদের পরিবারের সব কজনাই মামলাবাজীতে ওস্তাদ! সব কটা।

লমফ : দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফগৃহটির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরুপের দ্বায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

চব্দ : লমফ পরিবারের সব কটা বন্ধ-পাগল!

নাতালিয়া : সব কটা—সাকুল্যে!

চব্দ : তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড়ি মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতালিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ : আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো! [হাত দিয়ে বৃদ্ধ চেপে ধরে] আমার বৃদ্ধের সেই বেঘনটা চিলিক মারছে...সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে—হে ভগবান জল, জল!

চব্দ : তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ি আর পেটুকের হস্ত।

নাতালিয়া : তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করলে ও'র জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ : আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে...আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাচি...ও, আমার বৃদ্ধটা গেল...আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি...আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে...আমার টুপিটা গেল কোথায়?

নাতালিয়া : এসব ছোটলোকমি! ধাম্পাবাজি! নোংরামির চুড়ান্ত!

চব্দ : আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক! হ্যাঁ তা-ই।

লমফ : হ্যাটটা পেরিয়েছি...ও আমার বৃদ্ধের ভিতরটা...কোন দিক দিয়ে বেরবো? দরজাটা কোথায়? ও, আমি আর বাঁচবো না...আমার পা বে আর নড়ছে না! [দরজা পর্বস্ত গমন]

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—৭

চুব্দ : [লম্বককে পিছন থেকে চেঁচিয়ে] আমার বাড়িতে আর কখনো পা ফেলবে না ।

নাতালিয়া : আদালতে যান ! আমরাও দেখে নেব !

[টলতে টলতে লম্বকের প্রস্থান]

চুব্দ : জাহান্নমে যাক ! [উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি]

নাতালিয়া : এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনো ? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে !

চুব্দ : আস্ত একটা সং ! বদমাইশ !

নাতালিয়া : পিচেশ ! অন্যের জমি বেদখল করে উঠে বেয় গালাগাল ?

চুব্দ : সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চন্দ্রশূন্য—জানো, ব্যাটার বেয়াধপী কতখানি ? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর-স্বা-সব-কি-সব ! বিশ্বাস হয় তোমার ? প্রস্তাব করতে ?

নাতালিয়া : কিসের প্রস্তাব ?

চুব্দ : হ্যাঁ, ভাবো বিকিনি, এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে !

নাতালিয়া : বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ? আমাকে বিয়ে করতে ? আমাকে আগে বললে না কেন ?

চুব্দ : তাই তো খড়াছুড়ো পরে এসেছিল ! বাদির খাটাশ !

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে ? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ? ও ! [চেআরে পতন—গুঁঙরে গুঁঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস । ওকে ডেকে নিয়ে এস । ও !—ডেকে নিয়ে এস ।

চুব্দ : কাকে ডেকে নিয়ে আসবো ?

নাতালিয়া : শিগরিগর করো, জলদি যাও । আমি যে ভিরমি যাব । ওকে ডেকে নিয়ে এস । [ছমের মত আতঁরব]

চুব্দ : কি বলছো ! কি চাও তুমি ? [দ্রুত হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ কী অভিসম্পাত ! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব । আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো । সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করেছে ।

নাতালিয়া : আমি মরে যাচ্ছি । ওকে ডেকে নিয়ে এস ।

চুব্দ : বাপ্‌স্ ! যাচ্ছি, যাচ্ছি । ও রকম হাউমাউ করো না । [ধাবমান]

নাতালিয়া : [একা, গুঁঙরে গুঁঙরে] আমরা কি করে বসেছি ! ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস ।

চুব্দ : [দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন] এখুঁদনি আসছে ও—আর-স্বা-সব-কি-সব । জাহান্নমে যাক ব্যাটা । আখ্ ! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো ; আমার দ্বারা হবে না, পশ্ট বলে দিলুম ।

নাতালিয়া : [গুঁঙরে গুঁঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস !

চুব্দ : [চিৎকার করে] ও আসছে, আসছে, তোমার বলছি তো । হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গববস্তুনা ! আমি আমার গলার দা বসাও । হ্যাঁ, আলবৎ । আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব । আমরা

লোকটাকে গালাগাল দিগেছি, অপমান করেছি, লাথি মেয়ে বাড়ি থেকে খেঁদিয়ে দিগেছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

নাতালিয়া : না, তুমি।

চুব : ও ! এখন ঘোষ আমার ! আর কি শুনতে হবে তারপর ?

[লমফের প্রবেশ]

লমফ : [অবসন্ন] আমার বৃক ভীষণ ধড়ফড় করছে .. আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা...

নাতালিয়া : আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আমরা ঝোঁকের মাধ্যমে...আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ : আমার বৃকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে ..মাঠটা আমার...আমার দৃটো চোখ করকর করছে ..

নাতালিয়া : হ্যাঁ মাঠটা আপনার, আপনারই...বসুন [উভয়েরই উপবেশন] আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ : আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা...জমিটার আমি কোনো মূল্য দিই নে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দিই ..

নাতালিয়া : সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা...ওসব বাদ দিন...অন্য কথা পাড়ুন।

লমফ : বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের ..

নাতালিয়া : হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে... [স্বগত] কি করে আরম্ভ করবো, বুঝতে পারছি নে . [লমফকে] আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন ?

লমফ : ভাবছি, নবামের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো...মনে পড়ল ; আপনি কি শুনছেন, আমার কি মন্দ কপাল...আমার ট্রাইয়ার বেচারী—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : আহা, বেচারী ! কি করে হল ?

লমফ : আমি ঠিক জানি নে...বোধ হয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে, কিংবা হয় তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে .. [দীর্ঘনিশ্বাস] আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম। জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া : বন্দ বোশি দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

লমফ : আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না।

নাতালিয়া : বাবা তাঁর ফ্রাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্রাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ : ফ্রাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো ? কি যে বলছেন ! [হাস্য] ফ্রাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো !

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই ভালো। অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্রাইয়ার বাচ্চা—এখনো

পদ্রো বয়েস হয়নি—কিন্তু যেমন বৃদ্ধি তেমনি আর সব দিক দ্বিগুণে ।

ভলচানিয়েংস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই ।

লমফ : মাফ করতে হল, নাভালিয়া স্ত্রোপানভনা, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও
থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কথখনো ভালো করে কামড়ে
ধরতে পারে না ।

নাভালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো ? এই প্রথম শুনলুম ।

লমফ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের
চেয়ে ছোট ।

নাভালিয়া : বটে ? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি ?

লমফ : হ্যাঁ । শিকার তড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা
ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না ।

নাভালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর । হার্নেস আর চিজল
ওর বাপ-মা । আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে
বলাই যায় না, ওটা কোন জাতের কুকুর । বিশী চেহারা, বড়ো-হাবড়া
হয়ে গিয়েছে...

লমফ : ও বড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা
ফ্লাইয়ারও নেব না স্বপ্নেও না । ট্রাইয়ার থাকে বলে সত্যিকার কুকুর,
আর ফ্লাইয়ার...কিন্তু এ-নিম্নে তর্ক করাটাই বেকুবি । আপনাদের ফ্লাইয়ারের
মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গন্ডায় গন্ডায় আছে । ওর জন্য পঁচিশ রুবল
দিলেও বন্ড বেশী দেওয়া হয় ।

নাভালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার সময়তান আজ আপনার ঘাড় চেপেছে,
ইভান ভাসিলিয়েভিচ । প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা
হস্ত বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস । কেউ
কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয় । যা বলেন, যা
কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর
নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে ভালো । তা হলে খামকা
উল্টোটা বলছেন কেন ?

লমফ : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাভালিয়া স্ত্রোপানভনা, আপনি ভাবছেন
আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ । আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে
আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো ?

নাভালিয়া : মিথ্যে কথা ।

লমফ : ওটা থ্যাবড়া-মুখো ?

নাভালিয়া : [চিৎকার করে] মিথ্যে কথা !...

লমফ : আপনি চ্যাঁচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম ?

নাভালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন ? পিস্তি একেবারে চটে
যায় । ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে আর আপনি ওটাকে
ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন !

লমফ : মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ : মাফাম, দয়া করে চুপ করুন...আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।...[চিৎকার করে] চুপ করুন।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্রাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস।

লমফ : শতগুণে নিরেস। ওর এত দিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল—ঐ আপনাদের ফ্রাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা...আমার চোখ দুটো...আমার কাঁধটা...

নাতালিয়া : আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু-কামনা করতে হবে না ; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে।

লমফ : [কে'বে কে'বে] চুপ করুন। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া : আমি চুপ করবো না।

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবু : এখন আবার কি ?

নাতালিয়া : আচ্ছা বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো—কোনটা সরেস—আমাদের ফ্রাইয়ার, না ও'র ট্রাইয়ার ?

লমফ : স্ত্রোপান স্ত্রোপানভিচ, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্রাইয়ার থ্যাবড়া-মুখো, কিংবা থ্যাবড়া-মুখো নয় ? হ্যাঁ কি না ?

চুবু : হলেই বা ? যেন তাতে কিছু এসে যায় ! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর যা-সব-কি-সব।

লমফ : কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি ? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন।

চুবু : ও রকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার বুকিয়ে বলছি আমি .. তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদগুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না—জাতে ভালো, পাগলো জোরদার, গড়ন চমৎকার আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা যদি শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খঁৎ আছে—সে বড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ : মাফ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে...কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক ..আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমরা যখন মারদুস্কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমানে ছুটোছিল, আর আপনাদের ফ্রাইয়ার নিধেনপক্ষে প্যাকি আর্থিট মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু : কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ : সেইটেই তার প্রাপ্য। আর সব কটা কুকুর খেঁকিশিয়ালকে তাড়া লাগা-
ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে।

চুব্দ : বাজে কথা। শোনো বাছা, আমি বশ্ত সহজে চটে যাই, তাই তোমায়
অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ক্লাইয়ারকে চাবুক
মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া...
হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দৃঢ়তায় দেখতে পারে না। আর আপনিও, স্যর,
ওর ব্যত্যয় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারো কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের
চেয়ে সরেস, বাস, অর্মানি জুড়ে দিলে কিছ্ একটা...আর-হা-সব-কি-সব...
দেখলে, আমার সব মনে থাকে।

লমফ : আমারও।

চুব্দ : [ভেংচিয়ে] আমারও !

লমফ : বুক ধড়ফড় করছে। আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে...আমি কিছ্ই...

নাতালিয়া : [ভেংচিয়ে] বুক ধড়ফড় করছে ! কী রকম শিকারী মশাই,
আপনি ? আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শূয়ে শূয়ে
আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করছে, হঃ !

চুব্দ : হ্যাঁ, হক্ কথা বলতে কি, শিকারে-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কশ্ম
নয়। বুকের ধড়ফড়ানি আর-হা-সব-কি-সব দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি
খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি
যদি সত্যি শিকার করতে যেতে তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তুমি
তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আর অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর
সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য আর-হা-সব-কি-সব...আমি বশ্ত
সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বশ্ত করাই ভালো। তুমি আদপেই
শিকারী নও, বাস্।

লমফ : আর আপনি—আপনি বুক শিকারী ? আপনি তো যান কাউন্টকে
নিছক তেল মালিশ করার জন্য, আর পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার
জন্য ওঃ ! আমার বুকের ব্যথাটা ! আসলে আপনি কুচুটে।

চুব্দ : কি ? আমি—কুচুটে ? [চিৎকার করে] চুপ করো।

লমফ : কুচুটে !

চুব্দ : ভেড়ে, বখা ছোকরা !

লমফ : বড়ো-হাবড়া ! ভণ্ড !

চুব্দ : চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বশ্মুক দিয়ে তোমাকে তিতির
মারার মতো গুলি করে মারবো। ফস্কিকার কোথাকার !

লমফ : দুনিয়াসুখ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা !—আপনাকে আপনার স্ত্রী
ঠাণ্ডাতো ! ..আমার পা-টা ..আমার মাথাটা...চোখের সামনে বিদ্যুৎ
খেলছে !...আমি পড়ে যাব ..আমি পড়ে যাবি ..

চুব্দ : আর যে ম্যাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বড়ো
আঙুলের তলায়।

লমফ : ও, ও, ও ! আমার হাটটা ফেটে গিয়েছে। আমার কাঁধটা যে আর নেই... আমার কাঁধটা কোথায় ?... আমি মরলুম। [আরাম-চেআরে পতন] ডাক্তার ! (মূর্ছা)

চুবু : ভেড়ে ! বকা ! ফকিকার ! আমি জোর পাচ্ছি নে। [জলপান] ভিরমি যাচ্ছি নাকি !

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ ! ছোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি ! [পিতাকে] বাবা কি হল ওর ? বাবা ! দেখ বাবা, [চিংকার করে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ ! ইনি মরে গেছেন।

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি... আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস, আমাকে বাতাস দাও !

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন। [লমফের আশ্রিত ধরে টালাটানি] ইভান ভাসিলিয়েভিচ ! ইভান ভাসিলিয়েভিচ ! আমরা কি করে বসলুম ! ইনি মারা গেছেন। [আম'-চেআরে পতন] ডাক্তার ! ডাক্তার ! [ছমের মত কখনো ফোঁপানো, কখনো হাসি]

চুবু : ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ? তুমি কি চাও ?

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] মারা গেছেন... উনি মারা গেছেন।

চুবু : কে মারা গেছে ? [লমফের দিকে তাকিয়ে] সত্যি ও মারা গেছে ! হে ভগবান, জল জল ! ডাক্তার ! [লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্রাস জল ধরে] জল খাও ! না, ও জল খাচ্ছে না... তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব... হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল ! আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলুম না কেন ? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন ? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি ? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। [লমফ একটু নড়লো] মনে হচ্ছে, সেয়ে উঠছে... একটু জল খাও তো, বাছা ! হ্যাঁ, ঠিক...

লমফ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে... কুরাসা না কি... আমি কোথায় ?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নামে যাও... ও রাজী আছে [দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে] ও রাজী আছে, আর-যা-সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুবু আমাকে শাস্তিতে থাকতে দাও।

লমফ : এঁয়া ? কি ? [দাঁড়িয়ে উঠে] কে ?

চুবু : ও রাজী আছে। আবার কি হল ? চুমো খাও... আর জাহান্নামে যাও !

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] উনি বেঁচে আছেন... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী...

চুবু : এসো, চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ : এঁয়া, কাকে ? [নাতালিয়াকে চুম্বন] আমার কী আনন্দ ! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি ? ও ! হ্যাঁ, বদ্বতে পেরেছি... আমার হাট...

বিদ্যুৎ...আমি কি সূখী, নাতালিয়া শুপানডুনা...[নাতালিয়ার হস্ত চুম্বন]

আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল...

নাতালিয়া : আমি...আমিও বড় সূখী ..

চুব্দ : ও ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো ! আহ্ !

নাতালিয়া : কিন্তু ..বাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, টাইয়ার
ফ্লাইয়ারের মত অত ভালো না ।

লমফ : সে ভালো ।

নাতালিয়া : সে খারাপ ।

চুব্দ : এই লাও ! পারিবারিক সূখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । শ্যাম্পেন নিয়ে
আয় ।

লমফ : সে সরেস !

নাতালিয়া : ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস !

চুব্দ : [চিৎকার করে মদুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে] শ্যাম্পেন ! শ্যাম্পেন
নিয়ে আয় !

স্ববনিকা

শেষ চিন্তা

উল্টা-রথ

অবতরণিকা।

কত না কসরৎ, কত না তকলীফ বরদাস্ত করে কত চেষ্টা দিলুম, দেশে নাম কেনবার জন্য,—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সব বরবাদ, সব ভঙ্গুল। পরের কথা বাদ দিন, নিতান্ত আত্মজনও আমার লেখা বই পড়ে না। গিন্নীকে—না, সে কথা থাক, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে হয়, ওঁরাকে চাটিয়ে লাভ নেই। অথচ আমার জীবনে মাত্র একটি শখ ছিল, সাহিত্যিক হওয়ার। আপনাদের মনের বেদনা কি বলবো—তবে হ'্যা, আপনারাই হয়তো বুঝবেন, কারণ সিনেমায় দেখেছি, নায়িকা যখন 'হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে?' বলে হন্যে-পারা স্ক্রীনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি টাট্টা ঘোড়ার মত ছুটোছুটি লাগান তখন আপনারা হাপদস-হপদস করে অশ্রুবর্ষণ করেন (যে কারণে আমি হলের ভিতরেও রেনকোট খুলি নে) তাই আপনারা বুঝবেন।

যখন দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালায় পর মালা পরানো হচ্ছে, খাপসদরং মেয়েরা তাঁর অটোগ্রাফের জন্য হস্তমন্দ হছে, তাঁর জন্য ঘন ঘন বরফজল শরবৎ আসছে, সভা শেষে হয়তো আরো অনেক কিছ্ আসবে তখন আমার কলিজার ভিতর যেন ই'দর কুরকুর করে খেতে থাকে, আমার বুকের উপর যেন কেউ পুকুর খুঁড়তে আরম্ভ করে। সজ্জল নয়নে বাড়ি ফিরি। পাছে গিন্নী অটহাস্য করে ওঠেন তাই ঘোরে খিল খিলে বইয়ের আলমারির সামনে এসে দাঁড়াই—তাকিয়ে থাকি আপন মনে আমার, বিশেষ করে আমার নিজের পয়সায় মরক্কো লেদারে বাঁধানো সোনার জলে আমার নাম ছাপানো আমার বইয়ের দিকে।

আমার মাত্র একজন বন্ধু—এ সংসারে। কিন্তু আর কিছ্ বলার পূর্বে আগেভাগেই বলে নিই ইনিও আমার বই পড়েননি। তিনি এসে আমার একদিন শূন্যখোলে, 'বাদার, "আমিয়েলের জুর্নাল" পড়েছ?'

'সে আবার কি বস্তু? বই-ই হবে। না? তা সে কি আমার বই পড়েছে যে আমি তার বই পড়বো?'

'আহা চটো কেন? জল্পাদ যখন কারো গলা কাঠে তখন তার মানে কি এই যে, সে লোকটা আগে জল্পাদের গলা কেটেছিল? অভিমান ছাড়ো। আমার কথা শোনো। এই আমিয়েল সায়েব প্রফেসর ছিলেন। তার বাড়ি আর কিছ্ না। যশ-প্রতিপত্তি তাঁর কিছ্ই হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নির্জনে তিনি লিখলেন তাঁর জুর্নাল।'

আমি বাধা দিয়ে বলজুম, 'জুর্নাল-জুর্নাল করছো কেন? উচ্চারণ হবে "জার্নেল"। উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি বস্তুই পিটিপটি।'

বন্ধু বললেন, 'কী উপাত্ত! ওটার উচ্চারণ ফরাসীতে "জুর্নাল"। এসেছে

“ডায়ারী” থেকে, সেটা এসেছে লাতিন “দিয়েস” থেকে—যেটা সংস্কৃতে “দিবস”। ফরাসীতে তাই “দিন দিন প্রতি দিন” নিয়ে যখন কোনো কথা ওঠে তখন ঐ “জুর্নাল” শব্দ ব্যবহার হয়। তাই দৈনিক কাগজ “জুর্নাল”, আবার প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রাখলে সেটাও “জুর্নাল” অর্থাৎ “ডাইরি”। ফরাসীতে “দিন”কে বলে “রোজ”, তাই প্রতিদিনের ঘটনার “নাম” যেখানে লেখা থাকে সেটা “রোজনামচা”। আবার—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘হয়েছে, হয়েছে।’

‘সেই আমিয়েল লিখলেন তাঁর জুর্নাল। মৃত্যুর পর সে-বই বেরোতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বসন্ত শহর জিনীভাতে হয়ে গেলেন লেখক হিসেবে প্রখ্যাত। বছর কয়েকের ভিতর তামাম ইউরোপে। ইস্তেক তোমাদের রবি ঠাকুর সে বয়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। তাই বলি কিনা, তুমি একখানা জুর্নাল লেখো।’

আমি শূদধালুম, ‘তুমি পড়বে?’

বশু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাখানা বগলে চেপে বললেন, ‘চললুম, ভাই! শূদনলুম পাড়ার লাইব্রেরিতে পাঁচকড়ি দে’র কয়েকখানা অপ্ৰকাশিত উপন্যাস এসেছে। পড়তে হবে।’

ভালোই করলেন। না হলে হাতাহাতি হয়ে যেত।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, তার সেই মোস্ট ইনসেন সাজেশনের পর থেকে এই জুর্নালের চিন্তাটা কিছুতেই আমি আমার মগজ থেকে তাড়াতে পারছি নে। যে রকম অনেক সময় অতিশয় রম্ভি একটা গানের সুর মানুষকে দিবারান্তির হস্ট করে। এমন কি ঘুম থেকে উঠে মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ সুর গুন গুন করছি।

কিন্তু জুর্নাল লিখতে যাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত অসুবিধে রয়েছে—আমার ঐ সংস্কৃতে শ্লোক আছে :—

শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরাস্তে নিশাস্তে
ক্ৰীড়ারম্ভং কুবলয়দংশং যৌবনাস্তে বিবাহম্।

শীতকাল গেলে শীত-বস্ত্র পরিধান

আহার গ্রহণ হবে দিন অবসান

রাত্রিকাল শেষ হলে প্রেম আলিঙ্গন!

বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন!

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র)

একশ’ বছর বয়সে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অসুজ্জ্বল অবস্থার সাততলা এয়ারং বানাবার জন্য কেউ টেন্ডার ডাকে না।

জুর্নাল লেখা আরম্ভ করতে হয় যৌবনে। তাহলে বহু বৎসর ধরে সেটা লেখা যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে পর পাঠক তার থেকে লেখকের জীবনক্ৰম-বিকাশ, তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার বহু পড়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আজ যদি আমি জুর্নাল লিখতে আরম্ভ করি তবে আর লিখতে পাবো কটা

দিন ? তাই কবি বলেছেন, এ যে যৌবনান্তে বিবাহম্ !

তাহলে উপায় কি ?

তখন হঠাৎ একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক বেকার গেছে সায়েব বাড়িতে। কাচুমাচু হয়ে নিবেদন করলে, 'সায়েব, আপনার এখানে যে কি ভয়ে ভয়ে এসেছি, কী আর বলবো ! এক পা এগিয়েছি কী তিন পা পেয়েছিছি !' সায়েব বললে, 'ইউ গাঙ্গা, তাহলে এখানে পে'ছিছে কি করে ?' বেকারটি আদৌ গাঙ্গা—অর্থাৎ যে বন্ধ পাগল শুধু 'গাঙ্গা' করে গোঙায়—ছিল না। বরং বলবো হাজির-জবাব—অর্থাৎ সব জবাবই তার ঠোঁটে হাজির। বললে, 'হক কথা কয়েছেন, হুজুর। আমিও তাই মদ্য করলুম আপন বাড়ির দিকে। এক পা এগুই তিন পা পেছাই। করে করে এই হেথা হুজুরের বাঙলোয় এসে পে'ছিছে গেলুম।'

তাই যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জুর্নাল লেখার মত দীর্ঘ দিনের ম্যাদ যমরাজ আমায় দেবেন না তখন ঐ কেরানীর মত পিছন ফিরলে কি রকম হয় ? অর্থাৎ বিগত দিনের জুর্নাল ? সেই বা কি করে হয় ? পোস্ট-ডেটেড চেক হয়, কিন্তু প্রি-ডেটেড দলিল করার নামই তো জাল। আজ আমি তো আর লিখতে পারি নে :—

জন্মদিনী ১৩১১

আজ আমার জন্ম হল। মা তখন তাঁর বাপের বাড়িতে।

হায়, আমাকে দেখবার কেউ ছিল না। কী হতভাগ্য আমি।

পুলিসে ধরবে না তো !

বিবেচনা করি আপনারা ক্লাসিক্স পড়েছেন—ঋগ্বেদ, মেঘনাদ, হযরত ল ইত্যাদি। শেখোক্তথানাতে এক বড়ো গ্রিশ না চান্স হতে না হতেই বয়েসটা ঘুরিয়ে দিতো। তখন তার বয়েস যেত 'কর্মার'—ফটকা বাজারে থাকে বলে 'মশ্বি' বা 'বেয়া'র—দিকে। তখন তার বয়েস হত গ্রিশ, উনগ্রিশ, আটাশ করে করে আট হয়ে গেলে ফের 'বাড়তি' বা 'তেজী'র দিকে চালিয়ে দিবে নয়, দশ, এগারো করে বয়েস বাড়াত।

কিন্তু এ কৌশল রপ্ত করার জন্য মন্টিযোগটা শিখি কার কাছ থেকে ? হযরত সন্তিকর্তা ওপারে যাবার সময় তাঁর ব্যাটা বাবাজী সত্যিজ্ঞকে কি এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ? তাতেই বা কি ? বাবাজী তো তারো আগে ও'রই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন, 'গেছোদাদা' হওয়ার পছাটি—আমি যদি তাঁর সম্মানে মাই মন্তহারি তখন তিনি ছিকেষ্টপদর। আমি ফিলাডেলফিয়ায় তো তিনি ভেরমন্টে। উ'হু হল না।

ইরানের কবি অন্য মন্টিযোগ বাৎলেছেন—তাঁর বন্ধ বয়সে :

'আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই

জোয়ান হইব ; এ জীবন তবে গোড়া হতে মোহরাই ॥'

‘শবী আগর আজ লবে ইয়ার বোসে এ তলবম
জওয়ান শওম জসেরো জিস্বেগী দ় বারা কুনম্ ॥’
পাড়ার ছোড়ারা ঢিল ছুঁড়বে ।

আমার গদরু রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি বলেন ?—

‘শিশু হবার ভরসা আবার

জাগরু আমার প্রাণে,

লাগরু হাওয়া নির্ভাবনার পালে,

ভবিষ্যতের মূখোশখানা

খসাব একটানে,

দেখব তারেই বর্তমানের কালে ।’

তারপর তিনি কি করবেন ?

‘জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা

তৈরী হবে আমার খেলা—’

সর্বনাশ ! এই বৃন্দ বয়সে যদি সঙ্কলের সামনে তাই করি তবে ডাঃ ঘোষ আমাকে রীচি পেঁচিয়ে দেবেন ।

মোন্ডা কথায় তা হলে ফিরে যাই । আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না । অবশ্য আমার মা বলতো, আমার ঘোষ নেই । আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামোফোনের নীডল্ দিয়ে টিকা দিয়েছিল ।

তাহলে একটা মাস চিন্তা করতে দিন । সামনে হোলি । গায়ে রঙ মাখাবো । মনেও ।

স্লিস্টলার অর্থ নিম উকীল । উকীলের কাছে যাবার পূর্বে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো । সেটি হয় তো পূর্বেও কোনো-কোথাও উল্লেখ করেছি । তাই সেটি আবার বলছি । কারণ মানুুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যা সে পূর্বেও একাধিকবার শুনছে—নম্রা কথা তার ভালো লাগে না । তাই দেখুন—এটাও আমি আরেকবার বলেছি—একই প্লট নিয়ে ক’গুডা ফিল্ম নিত্য নিত্য বেরুচ্ছে তার হিসেব রাখেন ?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই : -

নরক আর স্বর্গের মধ্যখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান । নরক চালার শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিন্ট পীটার । পান্ট্রীসারেবের মূখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি ।

পাঁচিলটি সুরসুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, দেয়ালটা এজমালি । তাই এটার মেরামতি আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর । আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর । কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেজ্জাই পেজ্জাই চুলো । তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম । আর আমার দিকে সর্বক্ষণ বয় মন্দমধুর মল্লয় বাতাস । দেয়াল বিলকুল জখম হয় না ।

বিস্তার তর্কাতর্কির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, ‘দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতিটা করাও। একটু অভাবে আছি।’

পীটার মাই ডিম্মার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু’বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো-পড়ো—শয়তানের সম্ভান নেই। পীটার রেজিস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরত এল। উপরে লেখা, ‘মালিক না পাইয়া ফেরত।’ পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ বেরলো—‘কস্তা বাড়ি নেই। পীটার বাড়ির সামনে ‘লটকাইয়া শমন জারী’ করলেন। কোনো ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাং জোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ। শয়তান অবশ্য ভাঁড়িঘাড়ি পাশের গলিতে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করিছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যান্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্ করে হাত ধরে বললেন, ‘বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতির কী হবে।’

শয়তান গছিগুঁই টালবাহানা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, ‘পাকা কথা দিয়ে যাও।’

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, ‘কিছু মনে কোরো না ভাই, কিন্তু আমি আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো পাকা কথা দিতে পারবো না।’

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, ‘ঐখানেই তো তোরা জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।’

আমার উকিল অবশ্য নরকে যাবেন না। তিনি বলেন, ‘নরক নেই, স্বর্গ আছে।’

আমি বললাম, ‘সে কি কথা! লোকে হয় দুটোতেই বিশ্বাস করে, নয় একটাতেও না।’

উকিল বললেন, ‘ঐখানেই তো ভুল। তোমরা দর্শনের কিছুই জানো না। বাকিয়ে বলছি। স্বর্গ জিনিসটের কল্পনা আমি করতে পারি। খাসা জায়গা, না গরম না ঠান্ডা। তোমাদের পরশদ্রামই তো বলেছেন, ঝোপে-ঝোপে চপ কাটলেট ঝুলছে। পাড়ো আর খাও, খাও আর পাড়ো। হুরুরী-পরীদের সঙ্গে দু’দশ্ড রসালোপ করো, কেউ কিছু বলবে না। অতএব স্বর্গ আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর চেয়ে বেদনাময় জায়গা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। অতএব সেটা নেই। যে জিনিস আমি কল্পনা করতে পারি নে সেটা থাকবে কি করে?’

স্বস্তিটা আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। তবে ঈশ্বরের

অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে গিয়ে মর্দিনিখাবিরা যে-সব বুদ্ধিদেন তার চেয়ে অবশ্য বেশী ঘোলাটে নয়। কিন্তু সে-কথা থাক। ওটা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—আমার উকিলটি নরকে না গেলেও শয়তান তার বাঁ হাতের তেলোতে জ্বল রেখে তাতে জুবে আত্মহত্যা করবে না। বরঞ্চ, একটা উকিলকে যদি কোনোগাভিকে স্বর্গরাজ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলেই তো চিন্তির। ক্লাইভ তো আর গন্ডায় গন্ডায় জন্মায় না! এক ক্লাইভে যা করলে, তার ধকল আমরা এখনো কাটাচ্ছি। দ্ব্যাত্ম তো না দ্ব্যাত্ম, সেস্ট পট্টারের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে, তন্দরুী মর্গী ডানা গজিয়ে পেটের ভিতর ফুরদুং-ফুরদুং করতে থাকবে।

আমার শিরঃপীড়া :—আমি যদি প্রি-ডেটেড চেক সই করি, অর্থাৎ শর্তটিককে তাজা মাছ বলে পাচার করি, অর্থাৎ প্রাচীন দিনের ডায়ারি নবীন বলে চালাই তবে কি আমি ভেজালের ভিটকিলিমিতে ধরা পড়বো না?

উকিল পরম পরিতোষ সহকারে বললে, ‘কিচ্ছু ভয় নেই। তবে যা লিখবে তার ন’আনার বেশী যেন সত্য কথা না হয়। মিথ্যে লিখতে হবে নিদেন সাত আনা। নতুন আইন।’

আমার মিথ্যে বলতে কণামাত্র আপত্তি নেই। লেখক মাত্রই মিথ্যেবাদী। এবং মিথ্যেবাদীকেও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, ‘যে-লোক বড়ো-গ্যক্রমে লেখক হওয়ার সুযোগ পেলে না’,—হতাশ-প্রমিতকের মত হতাশ-লেখক। তবু অবাক হয়ে বললুম, ‘সে কি কথা?’

উকিল বললে, ‘ক্যারেটে কারে কয় জানো? ২৪ ক্যারেটে খাঁটি সোনা হয়। এখন আইন হয়েছে, চোন্দ্র ক্যারেটের বেশী সোনা দিয়ে গয়না গড়ানো চলবে না। বাকি দশ ক্যারেটের বদলে দিতে হবে খাদ।’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘আমি কি স্যাকরা যে আমাকে এ-আইন শোনাত্ছেন!’

উকিল আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকালে। যেন আমি ‘ফিস্সারলেন নাখিরা’ বা কাননবালার চেয়েও খাপসদরং। নিজের চেহারা প্রাতি ভক্তি বেড়ে গেল।

বললে—এবারে অতিশয় শাস্তকণ্ঠে—‘সোনা ভারতবাসীর চোখের মণি, জিগের টুকরো, কলিজার খুন। তাই দিয়ে যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন সর্বগ্রহী এটা ছড়াবে। যাও, আর মেলা বকর বকর করো না। আর শোনো, তোমার মাখায় যা মগজ তা দিয়ে পদুটি মাছেরও একটা টোপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে লেখো। কেউ পড়বে না। তুমিও পড়বে না—অর্থাৎ ধরা পড়বে না।’

আঁতে ফের লাগল। তবে খুব বেশী না। আমার আঁতে গন্ডারের চামড়ার লাইনিং।

তা সে যাক্ গে। আইন বাঁচিয়ে লিখব।

*

*

*

আমার শত্রু চতুর্দিকে। বরঞ্চ আমাকে ‘অজাতশত্রু’ না বলে ‘অজাতমিত্র’

বলা যেতে পারে। তারা যে আমার কী বদনাম করে বেড়াচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। না, ভুল বললুম। পাড়ার ছোঁড়াদের কাছে আছে। 'তুর্কাত' ছাত্রদের বিদ্রোহের সমিতিতে চাঁদা দিইনি বলে তারা সেগুলো জিগির বা স্লেগান রূপে ব্যবহার করে। মহরমের 'হায় হাসান, হায় হোসেন' রোদন রব এর তুলনার অট্টহাস্য।

তারই একটা—আমি নাকি অতিশয় সুন্দর। আপনারা অবশ্য এ-কথা শুনে সরল চিন্তে শূন্যধোবেন, 'এটা আবার কুৎসা হল কি প্রকারে?'

ঐ তো। ছোঁড়াদের পেটে কী এলুম তা তো আপনারা জানেন না। সুস্কম তালেবরদের দৃষ্টবশি। বেঘে নাকি আছে, 'স নো বুদ্ধ্যা শূন্যয়া সংবদনন্ত'—তার এক অর্থ নাকি, 'দেবতা শূন্য বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সংবৃত্ত করুন—এক করুন।' অশূন্য বুদ্ধি যে আরো কত বেশী সংবৃত্ত করে, খাঁষ সেটা জানতেন না। কারণ আমাদের ব'ড়শে ব্যালার বুদ্ধ খানসামা লেনের ছোঁড়াদের ঐক্য তিনি দেখেন নি।

তাহলে আরো বুদ্ধিয়ে বলি। রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আছে, এক হাড়-কিপেটকে শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার ছোঁড়ারা কাগজে মিথ্যে মিথ্যে ছাপিয়ে দেয়, তিনি নাকি অমুখ চ্যারিটি ফাণ্ডে বিস্তর টাকা খরচা করেছেন। আর যাবে কোথা? চ্যারিটি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে চ্যারিটি ম্যাচের ভিড়।

হুবহু ঐ একই মতলব।

তখন স্থির করলুম, একটা ফটো তুলে এই 'উল্টো-রথের' সঙ্গে ছাপিয়ে দেব। শূন্যলুম, কালীঘাটের কাছে 'ফোটা ফ্যাসের' নাকি বাসটিং বিজিনেস—ফেটে পড়ার উপক্রম। গিয়ে দেখলুম, কথটা খাঁটি, ছাব্বিশ ক্যারেট খাঁটি আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেন্স বাস্‌ট করলো। আমার শ্যাটারিও সৌন্দর্য সহিতে না পেরে।

সেই নম্বই বছরের থরথরে ফরাসী বড়ীর কাছে বাজ পড়াতে তিনি ভিরমি যান। হুঁশে ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বাজের কি দোষ? আমি যে বড় বেশী এ্যাক্টাইভ।'।

ফোটা হল না। অইল পোন্টিং-ওলা বলেন, 'কালো হলেও চলতো, তা সে যত মিশই হোক না। কিন্তু এ যে, বাবা, খাজা রঙ। কালো কালির উপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলপারা, না-সবুজ না-নীল না-কিছু। আমার প্যালেট লাটে।'।

সেই থেকে ভাবছি কি করি?

তা হলে আবার একটা মাস ভাবতে দিন।

কিন্তু তাতেই বা কি? দশ ঘণ্টা বাতি জ্বালিয়ে রাখার পর সেটা নিভিয়ে দিলে ঘরে যে অশ্বকার, এক মিনিট জ্বালিয়ে রাখার পর নিভিয়ে দিলেও সেই অশ্বকার।

এক মাস চিন্তা করলেই বা কি, আর এক মিনিট চিন্তা করলেই বা কি?

ওঘাটে যেও না বেউলো

আমার 'উল্টা-রথ' তৈরী হচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। পাকা লোক লাগিয়েছি। খাস মার্কিন। ওরা গ্রেতা গার্বো থেকে আরম্ভ করে ড্যাক্ অব উইনজার—আলকাপোনে থেকে শুরুর করে আর্চবিশপ অব নটিংহাম সঙ্কলনই কোরা কাপড় ধুয়ে কেচে মলমল করে তুলতে জানে। ওটা বেরোলে আর কেউ 'জীবনস্মৃতি' পড়বে না।

ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে কেন—বহুদিন ধরেই আমি বহু লোকের কাছ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। প্রেরকদের কেউ কেউ চান আমি যেন তাবৎ বস্তু পড়ে সেটি মেরামত করে দি। কেউ কেউ অতপটেই সন্তুষ্ট। বলেন, আমার মতামত জানানো। আর কেউ বা সরাসরি শ্রদ্ধা, সার্থক-সাহিত্য কি প্রকারে সৃষ্টি করতে হয়?

উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, রিপদকর্ম-মেরামতি করে যদি লেখক গড়া যেত তাহলে এই যে শান্তিনিকেতন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ সব কর্ম লেখক এবং শিক্ষক উভয়রূপেই করে গেলেন, এখান থেকে বেরিয়েছেন ক'টি সার্থক সাহিত্যিক? আমি তো একমাত্র প্রমথনাথ বিশাীর নাম জানি। পক্ষান্তরে শরৎ চাট্টো তো কারো কাছ থেকে এক রকম সাহায্য পাননি। ও'র মত সার্থক লেখক ক'জন? উত্তরে সবাই বলবেন, উনি এক্সেসপশন—ব্যত্যয়। আমি বলবো, সার্থক সাহিত্যিক হওয়া মানেই ব্যত্যয়।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রশ্ন, আপনি সাহিত্যিক হতে চান কেন?

টাকা রোজগার করতে? হয় না, তা এদেশে হয় না।

অনুসন্ধান করে দেখুন, এই বাঙলা দেশে ক'জন লোক একমাত্র কলমের জোরে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় আছেন। অধিকাংশই কোনো না-কোনো ধান্দায় নিযুক্ত থেকে মাসের শেষে পাকা মাইনে পান। লেখার আমদানি ঘূষের মত। কখন আসে কত আসে তার উপর কণামাত্র নির্ভর করা যায় না। ঘূষের টাকা থাকেও না।

অর্থাৎ, কপালজোরে হয়তো মাসতিনেক আপনি প্রায় পাঁচশ' টাকা করে মাসে কামালেন—এর বেশী এদেশে আশা করবেন না—কিন্তু তার উপর নির্ভর করা চলবে না। পাঠকের মতিগতি কোন দিন কোন দিকে মোড় নেবে তার কোনো স্থিরতা নেই। আপনাকে তবু লিখে যেতে হবে, নতুন বই তৈরী করতে হবে, ঐ দিলে যদি ভাঁটার টান ঠেকাতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতার 'মূলধন' নিয়ে লেখার 'ব্যবসা' আরম্ভ করেছিলেন সেটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কি করে? বয়েস হয়ে গিয়েছে—বন্ধ প্রেমের হাট। লোটাকম্বল নিয়ে ঘোরাখুরিও করতে পারেন না—কোমরে বাত।

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো—সে বড় মজার। ইন্সোরোপে যে কোনও চিত্রকরের বাড়িতে নিত্য নতুন রমণী মডেল হলে আসছে। তারা বিবসনা হয়ে 'পোজ' দেয়। কেউ কিছু বলে না। ওটা

নারিক ওদের দরকার। চিত্রকরদের সবাই যে ভীষ্মদেব, শঙ্করদেব ঠাকুর নন সে-
কথাও সবাই জানে। বস্তুত কোনো চিত্রকর যদি একটুখানি শঙ্করদেবীয় হন তবে
তার তারৎ জীবনীকার সেটা চিত্রকার করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিয়ে
আমাদের কানে ডালা লাগিয়ে দেন। বোধবাকিদের কেউ গাল-মশ্ব করে না।
এ যে বললুম, ওটা নারিক ওদের দরকার।

এদেশে গুরুমহারাজদের এ-অধিকার আছে। ভৈরবী, নর্মসখীরূপে এঁরা
গুরুমহারাজদের সাধন-সজিনী হন। এ প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের
মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু যদি ইয়োরোপের খ্রীষ্টীয়দের ভৈরবী ধরেন তবে তাঁকে তিনদিনও
সমাজে টিকতে হবে না। এদেশের গেরস্তপাড়ায় কোনো আর্টিস্টকে মডেলসহ
বাস করতে দেবে না।

আমি কোনো ব্যবস্থার নিষ্পত্তি বা প্রশংসা করছি নে। সাহিত্যিক হিসেবে সে
অধিকার আমার নেই। এর বিচার করবে সমাজ। সমাজ গুরু চায়, চিত্রকর
চায়, সাহিত্যিক চায়। সমাজই স্থির করবে, কার কোনটাতে অধিকার। সমাজ
ভুলও করে। সেমতান্ত্রকে বিষ, খুঁটকে ত্রুণ দেয়।

এটা কিছু নতুন কথা নয়। সামান্য একটি আলাদা উদাহরণ দি।
বৈজ্ঞানিকদের সাথ্য নেই জাহাজ জাহাজ টাকা যোগাড় করে এটম বম্ব বানা-
বার। মার্কিন সমাজের সর্বপ্রধান মূল্যপাঠ রোজোভেল্ট দেশের টাকা বৈজ্ঞানিক-
দের পায়ে ঢেলে দিয়ে বললেন, ওটা আমার চাই। বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করে
দিলেন। ওটা জাপানে ফেলা হবে কি না, সেটা স্থির করলেন ষ্ট্রুমান—
বৈজ্ঞানিকদের হাতে সে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করার ভার বেওয়া হয়নি। তাঁদের
মতামত চাওয়া হয়েছিল মাত্র। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, বৈজ্ঞানিকদের
অধিকাংশই বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দার্শনিকদের বেলাও তাই। কেউ হয়তো প্রামাণিক বই লিখে প্রমাণ
করলেন, ঈশ্বর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি সে বই ইস্কুলে ইস্কুলে কলেজে কলেজে
পড়ান। সেটা স্থির করবে সমাজ। বিবো মনে করুন, বুদ্ধদেব বলেছেন ঈশ্বর
নেই। সেটা সিংহল বর্মার ইস্কুলে পড়ানো হয়। এদেশে পড়াতে গেলে সমাজ
আপত্তি করবে।

কিংবা এই ফিল্মের কথাই নিন। প্রভুসার ডিরেক্টর দর্শক তো স্থির করেন
না, কোন ফিল্ম দেখানো চলবে আর কোনটা চলবে না। স্থির করে সমাজ—
সেন্সার বোর্ডের মারফতে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মূলতুর্বা থাক।
আপনি কেন সাহিত্যিক হতে চান, সেই কথায় ফিরে যাই।

তা হলে কি আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে চান?
প্রতিপত্তি হবে না। সে-কথা গোড়া থেকেই বলে রাখি।

আমি সামান্য লেখক। 'দেশে-বিদেশে' বইখানা প্রাইজ পেয়েছে। আমি
তাই নিয়ে গর্ব করছি নে, ঈশ্বর আমার সাক্ষী। নিতান্ত এই প্রতিপত্তির কথা
উঠলো বলে সে-কথাটা ব্যর্থ হয়ে বলতে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব এবং
সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী—৮

আপনার মত সম্ভব পাঠক কেউ কেউ বলেন, ‘কাবুলে তো ছিলে মাত্র দু’-বছর। তবু বইখানা মন্দ হয়নি। জার্মানিতে তো ছিলে অনেক বেশী। সে-দেশ সম্বন্ধে ঐ রকম একখানা বই লেখ না কেন?’ আমি ভাবলুম, প্রস্তাবটা খুব মন্দ নয়। মোটামুটি একটা খসড়াও তৈরী করলুম। কিন্তু বিপদ হল হিটলারকে নিয়ে। বিপদ হল ১৯৩৯-৪৪-এর যুদ্ধ নিয়ে। আমি ১৯৩৮-এর পর সেখানে আর যাইনি। আর আজ হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে জার্মানি সম্বন্ধে লেখা, এ যেন মদুরারজী দেশাইকে বাদ দিয়ে চৌদ্দ ক্যারেট গোল্ডের কথা লেখা।

তাই মনে করলুম, আরেকবার না হয় হয়েই আসি। কুড়ি বছরের বেশী হতে চললো, বিদেশ যাইনি। হার্টও ট্রবল দিচ্ছে। জার্মান ডাক্তাররা যদি কিছু একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেয়। পাবলিশারদের বললুম, কিছু টাকা আগাম দিতে। যদিও অনুরোধ করলুম তাঁরা সোল্লাসে টাকা পাঠালেন—এঁরা সজ্জন।

এবারে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিদেশী মদুরার পালা।

উত্তর এল, ফেলেট্ ‘নো’—তিন না চার লাইনে, ঠিক মনে নেই।

কোথায় রইল প্রতিপত্তি? কোথায় রইল খ্যাতির মূল্য? আমি যেতে চাইছিলুম নিজের টাকায়—সরকারের টাকায় নয়। বলুন তো, ক’জন বাঙালী লেখক নিজের টাকায় (অবশ্য সেই আগাম টাকা নেওয়ার ফলে নিভঁর করতে হবে আমার চাকরির মাইনের উপর) বিদেশ যেতে পারে? যে পারলো সেও সদুযোগ পেল না।

পাঠক ভাববেন না, আমি কর্তৃপক্ষকে দোষ দিচ্ছি। মোটেই না। তাঁরা তো আমার দুঃশমন নন। তাঁরা যা ন্যায্য মনে করেছেন তাই করেছেন।

আমি বলতে চাই, কোথায় রইল লেখকের প্রতিপত্তি! আমি চেয়েছিলুম, কুল্লের দু’হাজার টাকার বিদেশী মদুরা। আমার প্রতিপত্তির মূল্য তা হলে দু’হাজার টাকাও নয়। অবশ্য এতে আমার দুঃখিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর শিষ্য জুডাস্ ত্রিশটি মদুরার বিনিময়ে!

ঈশ্বর অবাস্তর হলেও বলি, তবু আমি গিয়েছিলুম। জানেন তো, নেড়ের গোঁ। পকেটে ছিল পঞ্চাশ না ষাটটি জার্মান মদুরা। সেখানে চললো কি করে? ওঃ! সেখানে আমার কিশিৎ প্রতিপত্তি আছে। তবে কি জার্মানরা খুব বাঙলা বই পড়ে? মোটেই না। তবে? আমার প্রতিপত্তি অন্য ব্যবধে—এবং সেটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবাস্তর। ধরে নিন, আমি সার্কাসের ঘাড়ের উপর নাচতে পারি—না, সেটা বিশ্বাস হল না, আমার কোমরে বাত বলে?—তা হলে ধরুন, আমি চিত্রনের পঞ্জাকে হস্তনের গোলাম বানাতে পারি!

এই তো গেল প্রতিপত্তির কথা। এবারে খ্যাতি। আমার খ্যাতি অত্যন্ত, তাই আমার কথা তুলবো না। আমার ইয়ার পাহাড়ী সান্যালের (ওঃ! বলতে গর্ব বুকটা কি রকম ফুলে উঠেছে!) খ্যাতি সম্বন্ধে তো আপনার মত কোনো সন্দেহ নেই। তাকে গিয়ে শ্রদ্ধা, সে কি আরামে আছে। অত্যন্ত গোবেচারী লোক—অন্তত আমার যত্নের জানা—দুটি পয়সা কামিয়ে, কোনো ভালো ছোট্টো ইয়ার বন্ধীসহ একটুখানি মদুরা-কারি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে—তার পানের

খাঁপিটি দেখেছেন তো—বাড়ি যাবে। শ্রুধোন গিয়ে তাকে, হোটেলের বস মাঠই আকছারই তার কি অবস্থা হয়।

অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, গুদস্তির পিণ্ডি-গ্রাফ কি চায় না লোকে তার কাছ থেকে! গোড়ায় আমি জানতুম না। আমার এক ভাগ্নের জন্য চাইলুম অটোগ্রাফ। সে যা করণ নয়নে তাকালে—ভাবখানা ‘এটু টু ব্রুটি’!—যে আমার দয়া হল। তাড়াতাড়ি বললুম, না, না থাক।

বেশ কিছুদিন তাকে দেখিনি। তার কারণ অবশ্য, আমার নিবাস মফস্বলে। শহরে গিয়েছি। রেশ্ত কম। তাই বসেছি তন্দুরী মদুগীর হোটেলের একলা-একলি। মদুগীরা খেয়ে প্রায় শেষ করেছি এমন সময় গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়ি সমেত সমুখে ঝাঁপালেন এক মহারাজ। আমার মুখে বোধ হয় কিঞ্চৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। লোকটাও রস্টিক, —হোটেলের এত টেবিল খালি থাকতে আমার সামনের চেয়ারখানায় ধপ করে বসে পড়বেন কেন?

শ্রুধোলে, ‘কেমন আছ ভাই?’

আরে! এ যে পাহাড়ী। দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে এ্যাম্বিন বাদে খাঁটি পাহাড়ী বনলো। বললুম, ‘খুলে কও।’

কাতর কন্ঠ বললে, ‘আর কি উপায়, বলো!’

আমি দরদী গলায় বললুম, ‘বস্তু পাওনাদার লেগেছে বুঝি?’

পাহাড়ী খাসা উর্দু বলে। সেও বলে বেড়ায়, আমি ভালো উর্দু বলতে পারি। এই করে আমার নিজের জন্য বেশ একটা সুনাম কিনে ফেলেছি।

পাহাড়ী বললে, ‘তওবা, তওবা। ওয়াস্তাগু ফিরদুগ্লা। পাওনাদার হলেও না হয় বদ্বতুম। আর সে কি আমার নেই? এস্তের। কিন্তু তারা ভদ্রলোক। খাবার সময় উপাত্ত করে না।’

বদ্বলুম, মামেলা ঝামেলাময়। বললুম, ‘তা তুমি এক কাজ করো না কেন? এডমারারদের কেউ ধরলে বলো না কেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, মিলটা ধরেছেন ঠিকই। তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তার ছোট ভাই, আমার নাম জংগলী সান্যাল।’ দাড়িটাই অবশ্য ‘জংগলী’র ইন্সপিরেশন জুটিয়েছিল।

ঠান্ডী সঁস লেকর—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাহাড়ী ফরাসীতে বললে, ‘সা ন ভা পা, শের—না, ডিয়ার সে হয় না।’

আমি বললুম, ‘কেন? তুমি কি আডোনিসের মত খাবসদরং?’

তেড়ে বললে, ‘কামাল কীয়া, ইয়ার। নামে কি আপত্তি? তা নয়। একবার তাই করেছিলুম। ফল কি হল, শোনো। এই হোটেলেরই, হ্যাঁ, এই হোটেলেরই একাধিন বসে আছি একলা। এমন সময় কে এক অচেনা লোক এসে শ্রুধালে, “আপনি কি পাহাড়ী সান্যাল?” আমিও তোমারই মত—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক—এক গাল ছেঁসে বললুম, “আজ্ঞে, মিলটা ধরেছেন ঠিকই, তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তাঁর ছোট ভাই।” লোকটা খানিকক্ষণ ইতিভীতি করে বললে, “কি করি বলুন তো! ম্যানেজারবাবু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তিনশ’ টাকা দিয়ে যেতে। তাঁকে পাই কোথায়?” তারপর

আমি তাকে স্বত্বই বোঝাই আমিই পাহাড়ী সান্যাল, সে আর মানতে চায় না ।’

আমি ভেবে বললুম, ‘তা তো বটেই । আমিই সে অবস্থায় মানতুম না ।’

সোৎসাহে বললে, ‘ইয়েহ্ ।’ তারপর আরো ঠাণ্ডী সঁস লেবর বললে, ‘ভাই, সে টাকাটা আর কখনো পাইনি । ম্যানেজার লোকটি ছিল ভালো । অস্তুত আমার টাকাটা শোধ করে লাটে উঠতে চেয়েছিল—আমি কি আর জ্ঞানি । পরদিন সেখানে গিয়ে দেখি সব ফস ।’

হ্যাঁ । একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম । আমার মৃগীর বিলটা পাহাড়ীই দিয়েছিল । কিন্তু এটা বলে কি পাহাড়ীর দৃশমনী করলুম না ? এ যাবৎ তো লোকে শৃধু অটোগ্রাফ চাইত, এখন যদি—?

আরেকটি কথা । আমাদের এত দোস্তী কেন ? সে আমার রই পড়ে না, আমি তার অভিনয় দেখি না । একেবারে খাঁটি হল না কথাটা । আমি ‘বড়-দ্বিদি’ দেখেছি—সে বোধ হয় ‘দেশে-বিদেশে’র পাঁচ পাতা পড়েছে ।

পাঠক সর্বশেষে অবশ্য শ্রমোবেন, আমি এত বাখানিয়া আপনাদের সাহিত্যিক হতে বারণ করছি কেন । তার কারণ সোজা । আমার বিশ্বাস, একমাত্র জির্নিয়াসরাই আমার লেখা পড়ে । অর্থাৎ আপনারা । বাজারে নামলে আমার রুটি মারা যাবে বলে ।

আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন । স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছেন,

অস্য দম্পাদনস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া ।

বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥

ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে ।

বানরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে ॥

(লেখকের ‘অনুবাদ ’)

পেটের জন্যই হোক, আর খ্যাতির জন্যই হোক, সরস্বতীকে বানরের মত নাচাবেন না । আপনারা বলবেন, ‘এটা তো বড় সিরিয়াস কথা হয়ে গেল ।’ সেই তো চেষ্টা করছি গত চৌদ্দ বছর ধরে । সিরিয়াস কথা হেসে হেসে বলার ।

কিন্তু পারলুম কই ? এখন আবার বৃদ্ধ বয়সে ধাতুই বা যায় কি করে ?

উল্ল সারী তো কটী ইশকে বড়তা মে, মোমিন !

আখেরী ওয়স্ত মে’ ক্যা থাক মূসলমা হোংগে ?

‘সমস্ত জীবন তো কাটালে মিথ্যা প্রতিমার প্রেমে,

হে মোমিন !

এই শেষ সময়ে আর কি ছাই মূসলমান হব ?’

বরণ লেখা বন্ধ করাই ভালো । উৎসব শ্রদ্ধিকল্পে এসেছে ।

সুখী হবার পন্থা।

সুখী হবার পন্থা ? সর্বনাশ ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে—যাক্ গে । ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো । এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ । কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না । ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পূজো হয়—অন্য কোনো দেবতা সেখানে কক্ষে পান না—তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পূজো করে আর কাঙ্ক্ষিত-মিনতি করে, ‘হে ঠাকুর আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও ।’ ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে হনুমানের পিণ্ডি চটে গিয়েছে । শেষটার একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হৃৎকার দিলেন, ‘ওরে বৃদ্ধ, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন ?’

তাই বলছিলাম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন ? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উন্নয়নঃ । আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তুষ্টা বিশেষ এবং বৃদ্ধদেব সেটাকে তন্থা অর্থাৎ তুষ্টা বলেছেন, এবং এই তন্থা থেকেই সর্ব দঃখের উৎপত্তি । এই তন্থাজনিত দঃখ নিবারণই সুখ । আমাদের শাস্ত্রেও আছে, ‘ভার্য্যাপগমে সুখীসংবৃতোহমিত্যবং, দঃখাভাবেনে সুখিঃপ্রত্যয়ঃ ।’ বাঙলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললাম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম : আহা কী সুখ, ঘুচে গেছে দঃখ । অর্থাৎ দঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয় । তাই পরদঃখকাতর ফরাসী গুণী ভল্ভের এক অশ্ব মহিলাকে সাস্ত্রনা দিয়ে চিঠি লেখেন, Nous avons un grand sujet a traître : it sagit de bonheur on du moins d’etre le moins malheureux qu’on peut dans ce monde.

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহৎপূর্ণ : প্রশ্ন এই, ‘সুখী হওয়া যায় কিসে, কিংবা অন্ততপক্ষে এ সংসারে অপত্যর দঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে ?’

এটাকে আরো সোজা করে বলি । এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে । আমি শূদালুম, ‘ওরে পাগল মাথায় হাতুড়ি ঠুকীছিস কেন ?’ এক গাল হেসে বললে, ‘যখন ঠুকি না তখন কী আরাম !’ সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলাম, ‘ঘাড়ের বোঝা নেবে মাগুরাতে কী আরাম !’ মহাকবি হাইনেকে আমি বস্তুই প্রমাণ করি, কিন্তু এম্বলে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের পাগলার হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে । তিনি বলেছেন, ‘কড়া ঠান্ডার রাতদপরে লেপের তলা থেকে পা বের করতে বেজায় শীত লাগলো । ফের পা দুখানা ভিতরে টেনে নিয়ে বললাম, ‘আঃ, কী সুখ !’

কিন্তু এরকম নৈতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দঃখের অভাবে সুখ—এটাকে সখ্যই সন্তুষ্ট নন । তাই আমেকেই সুখ বলতে কি বোঝেন সেটা স্পষ্ট ভাষায়

বলে গেছেন। সর্বপ্রথমই অবশ্য মনে পড়ে ওমর খৈয়াম'। কাস্তি ঘোষ' অনুবাদ করেছেন,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছ্ পেয়ালা হাতে
ছন্দ গে'থে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু অনুবাদটা আক্ষরিক নয়। বরঞ্চ সত্যেন দত্তের
সে বিজনে মোর পার্শ্ব বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ, আমার
তৃপ্তি লাভবে প্রাণ।

ফিট্‌জিরাডেও তাই আছে

Beside me singing in the wilderness

And wilderness is paradise enow !

কাস্তিাবাদের 'বিজন ছায়া' নয়, উল্টে বলা হয়েছে, মরুপ্রান্তরেও তুমি, সখী,
যদি থাকো তবে সেই স্বর্গ।

এইবারে মূল ফার্সী'টা শুনুন :

গর দস্ত-দহদ-খগজ-ই গম্‌দমে নানী—
ওয়াজ ময় দোমনীজ গোমফন্দ রানী—
ওয়া আনগেহ মন্ ওয়া তো নিশসুতে দর ওয়রাণী
আয়গশী বদুদ আন না হন্দ-ই-হর সুলতানী—

ফার্সী ফিরিস্তিতে খৈয়াম চেয়েছেন, 'ভালো গমের উত্তম রুটি ; দই মণ মদ
ধরে এরকম একটি পাত্রভরা মদ্য—হ'য়া বিশ্বাস করুন, ফার্সী'তেই আছে 'দো
মণী' এবং যে ফিট্‌জিরাডে নিতান্ত গদ্যময় ভেবে অনুবাদ করেননি—আছে,
একখানা আস্ত দস্তার ঠ্যাং।' এবং সর্বশেষে বলেছেন, 'তখন যা সুখ, সেটা
কদাচ কখনো কোনো সুলতানের ভাগ্যে জোটে কিনা সম্ভব।'।

এগুলো আমাদের অজানা নয়। কারণ আমাদেরই মহর্ষি চার্বাক সুখী
হওয়ার নিষেধ আরো সস্তায় সেরেছেন, তিনি বলেছেন,

যাবজ্জীবং সুখং জীবৎ
ঋণং কৃষ্ণ ঘৃতং পিবেৎ !

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরত তো দিতে হবে না, কারণ এ দেহ ভস্মীভূত
হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ? এখানে কিস্তি
খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কণ্ট দিলে

সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদ্যপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি ঠেকামের ফিরিস্তিতেই সুখী—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, ‘আমি যে-সে সুখ চাই নে।’

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধন-দৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, ‘যেনাহং নামতা স্যাং কিমহং তেন কুৰ্যাম।’ যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে?

দেখুন দিক, মেয়েছেলের কী বায়নাঙ্কা! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনেরা কী সুবুদ্ধিমান। লিং য়ুটাঙ বলেছেন, ‘রাগের অশ্বকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুটকুট করে সেগদুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় শুনি, আমার বেড়ালটা হৃৎকার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ—কী সুখ।’

কিন্তু না,—ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ‘সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।’ আনন্দটা তবে কি? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধন, অনলে পড়িয়া গেল।’ এবং সুখের পরও প্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই ‘অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।’

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্ বদন্তি অমৃতোন্তি সুরালয়েষু,
কেচিদ্ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু,
রমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা,
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে ॥

আহা-হা! কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বলেন, না অমৃত বনিতার অধর-পল্লবে। আর আমরা—আসলে ‘আমি’ এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বীরনীর পূরিত—অর্থাৎ নেবু, জম্বীর, জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কবে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কাঁব শব্দ কাঁব নন—মহর্ষি, দিব্যদ্রুটা—কী করে সেই যুগেই জানলেন, বাঙলাদেশে এমন দিন আসবে যৌবন শব্দ লক্ষপতিরই শব্দরবাড়ি এলে মাছ কিনবেন। আর ইতরজনা—আমরা মাছের কটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারি নে, এঁরা কোন্ প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি

স্বাদাররা জানেন ?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন, সেটা পারবো কোথায় ? একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি ।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজি মরো ?

সুখ তো আছে হাতের কাছে,

শিখে নাও শব্দ ভারে ধীরবারে,

সুখ সে তো রম্য সদা কাছে কাছে ।

Willst du immer weiter schweifen

Sieh, das Gute liegt so nah,

Lerne nur das Glück ergreifen,

Denn das Glück ist immer da !

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালম ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর

খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর !

বিয়ের বিধি

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ । এক ফোঁটা মেন্নে তার বউ মালিকা খানমটা, ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাট-ক্যাট আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিস্কৃতি নেই । ‘মিনবে’, ‘হাড়-হাভাতে’, ‘ড্যাকরা’—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না । আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গল্পনা—সে তো নিত্যকার রুটি পনীর । এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাষপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বাঁবীজানের নেই । আগা আহমদ দিন-মজুর ; খিদে পায় বড়ই ।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের দশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সোন্দ ডিম এবং উল-তেলি আচার !

সে রাতে আগা আহমদ খেল না । বউ ঝংকার দিয়ে বলল, ‘ও আমার লবাব-পুস্তুর রে—রুটি পনীর ও’রার রোচে না । কোথায় পার আমি কাবাব আঁড়া আমার আগাজানের জন্যে—’

সেই কাবাব আঁড়া ! যা বউ নিজে খেয়েছে !

হিস্র করলো ওকে খুন করবে। নুতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত 'একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মদুখ যে কিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যাভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ ঘ্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কাণ্ড কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহমৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কোশলে বউকে ষ্টিয়াস করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কাণ্ড লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুকুরিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিস্কৃত হল। হালদা, মোরশা, তিন রকমের আচার, ইস্ত্রক উত্তম হরিণের মাংসের শট্টক। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সন্মাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শূনে না শূনে আজ তার চোখে নিম্না আসবে—এ-কড়াটা যত বার ভাবে ততই তার চিন্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শাস্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেননি যে তাকে আজীবন রক্ষাবেষকণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দৃশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিলো আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পচিজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'বাক্ গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই যেথেষ মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিচয় চিৎকার! 'আল্লাহ ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নল। অন্যেরো পাতা সরাতে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ

দেখে—বাপ রে বাপ, এ্যাবদড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ ! সে তখনো ‘চে’ চাচ্ছে, ‘বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গদুপুধনের সম্বধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।’

সম্মিষে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, ‘তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নিভিয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসের?’

ঘেমার সঙ্গে সাপ বললে, ‘ধাতুর তোর প্রাণ ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে ! আমাকে বাঁচাও এই দশমিন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।’ তারপর ভুকেরে কোঁদে উঠে বললে, ‘মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাট-ক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মন্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, বাঁড়ের গোবর। আমি—’

আগা আহমদ বললে, ‘তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন ?

চিল-চ’্যাচানি ছেড়ে সাপ বললে, ‘আমি ছোবল মারব ওকে ! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না ? সারাতো কোন্ ওঝা ? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিছুর বাদশা সুলেমানের কসম।’

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাতি সপের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, ‘ওরা গদুপুধনের সম্বধান জানে।’

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শূদ্রের গেছে জানিয়ে অনেক কিসে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, গদুপুধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাংলাে দিচ্ছি। শহর কোতালার মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে ধাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সড়সড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এস্তের ধনদৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।’

ভুতের মূখে রাম নাম ?

সাপের দ্বারা ভালো কাম ?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাশ্ড যে তিন দিন যেতে-না-যেতে সেই বনের

প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছিল কোতয়াল-নান্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা-মনসার বাপ।

প্রথমটা তো আগা আহমদকে কেউ পাস্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বিড়-হুদ হল এখন ফাসী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা

পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

হবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। ‘ওঝা’ আগা আহমদ ঘরে ঢোকা-মাটাই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বোরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল-নান্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মূখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তাঁর বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট অফিসার। এইবার আগা দুবেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিশ্বাস দাসীবাঁদী। ওদের তাম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজ্জীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোনটা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা,

সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, ‘হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন দ্বারা কখনো হয়!’

আগাকে জোর করে পার্শ্বিকতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জলজ্বল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তোমার খাই বড় বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্ গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।’

দশ লাখ টাকম এবং তার সঙ্গে পাঁচশ' ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শত্রুকে গিয়েছে। মদখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ এবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে! স্থির করলেন, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচূষন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশননী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মদুট। চলো শিগগির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে 'কে'বে নিবেশন করলে সেকান্ ফাটা বাঁশের মাধ্যমানে পড়েছে।

কোতয়ালসহর প্রবর মাখম দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারেরগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্দ করো পিঞ্জরামে।'

পাশ্চিতে নওয়াব আসা আহমদ। দূর পাশের লোক তার জন্মধর্নি জিন্দাবাদ করছে। এক বরোকা থেকে কোতয়াল-নামিনী অন্য বরোকা থেকে উজীর-জাদী ভাঙ্গার উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মদ্রিত নরনে মদশীদমৌলার নাম আর ইশ্টিমাস জপছে।

স্বয়ং বাব্বা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর ঘোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুকুম দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুলে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলোছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি তো ও'কে চেনো,—হে', হে'—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপ রে, মা রে' চিংকার শোনা গেল। কোন দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পৰ্বস্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবনযাপন করেছিল।

গল্পটি নানা ঝেঁপে, নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনে-ছিলুম এক ইরানী সফাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাইতে শুনে শুনে।

কাহিনী শেষ করে সফাগর শুধুধেলেন, 'গল্পটার "মরাল" কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা । রমণী যে কি রকম খ্যাতিমান হতে পারে তারই উদাহরণ । এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মর্দন তো এই কীভর্নই গেয়ে গেছেন ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মদাগর বললেন, 'তা তো বটেই । কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে "মরাল" থাকে । এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে । একটা দেখাবার, একটা চিবোবার । দেখাবার "মরাল"-টা তুমি ঠিকই দেখেছে । অন্য "মরাল"-টা গভীরঃ—খল যদি বাধ্য হলে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না । কারণ খল তারপরই চোঁচিয়ে লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো ।'

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খলমের মত বিষ থাকে অন্য কথা । কিন্তু প্রশ্ন, 'ক'জনের আছে ও-রকম বউ ?'

রাজহংসের মরণসীতি

॥ এক ॥

জর্মানির চরম শত্রু ফ্রান্সের একাধিক লেখক সন্নিহিত স্বীকার করেছেন যে, এমন দিন আসবে; যোঁধন রণবিদ্যার চর্চাশীল ব্যক্তি : মাগ্রেই যে রকম ফ্রিডরিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়নের রণকলা অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করে থাকেন, ঠিক তেমনি হিটলারের রণকলাও অধ্যয়ন করবেন ।

আমরা রণচর্চা করি না ; তৎসত্ত্বেও আমাদের মনেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয় । যেমন, যে হিটলার দুবৎসরের ভিতর ইংলিশ চ্যানেল থেকে প্রায় মস্কো অবধি রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যখন তিন বৎসরের ভিতর তাঁর মাটির তলার আশ্রয় ('বুংকার') থেকে খবর পেলেন যে, বিজয়ী রুশ-সেনা সে আশ্রয় থেকে মাত্র পাঁচশ' গজ দূরে, আর চাবিশ ঘণ্টার ভিতরই, রক্তলোলুপ কেশরীর মত তাঁর বুংকারে এসে প্রবেশ করবে, তখন তাঁর মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছিল ? সঞ্জয় যখন বৃশ ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন যে, দুর্যোধনের পরাজয় ঘটেছে, তখন তাঁর ব্যালাডের (আমার বিশ্বাস, চারণদের মধ্যে গীত এই ব্যালাডকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে মহাভারত রচিত হয়) ধুর্যো ছিল, 'যখন অম্বুকাটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি, যখন তম্বুকাটা ঘটল, তখনও আমরা জয়াশা করিনি',—এবং মূল ধুর্যো ছিল, 'আমরা জয়াশা করিনি, তখনও আমরা জয়াশা করিনি ।' হিটলারের বেলাও কি তাই ঘটেছিল ? কারণ তাঁর পরাজয়ও তো একদিনে হয়নি—তিনি কি দিনে দিনে বৃদ্ধিতে পেরে-ছিলেন, 'এখন আর জয়াশা নেই', 'এখন আর জয়াশা নেই, না তিনি শেষ মূহুর্ত' পর্যন্ত দুরাশা পোষণ করে কোন অলৌকিক পরিবর্তনের আশা করে-

ছিলেন?—দুর্যোধন যেরকম উরুভঙ্গের পরও জয়াশা করে অশ্বখামাকে পঞ্চ-পাণ্ডবের গোপন নিধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

আরো ছোটখাটো কত প্রশ্নই না মনে উদয় হয়।

যেমন মনে করুন, হিটলার যখন পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্স, ওঁদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম জয় করে ফেলেছেন, বাঙলা কথায় একমাত্র রুশ ছাড়া এমন কোনো শক্তি ইউরোপে আর নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে এবং পরাজিত ইংল্যান্ড আপন স্বীপে ফিরে গিয়ে এমনি ক্লান্ত যে, জখমগুলো পর্যন্ত চাটতে পারছে না, তখন হিটলার ইংল্যান্ড অভিযানে বেরোলেন না কেন? স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করেছেন, তখন হিটলার সে অভিযান করলে ইংল্যান্ড অনায়াসে জয় করতে পারতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বহু ঐতিহাসিক, বহু জঙ্গীলাট, বহু কূটনীতিবিদ, এমন কি, হিটলারের বহু সান্ন্যাস্ত। তাঁর সেনাপতিরা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে হাজার হাজার না হোক, শত শত পুস্তক লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে তবু কোতুহল জাগে, স্বয়ং হিটলার কি ভেবেছিলেন? অবশ্য তাঁর উত্তরই যে শূন্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের বন্ধু-বান্ধব যখন পরীক্ষায় ফেল করবার পর দফে দফে ফেল মারার কারণ দর্শায়, তখন আমাদেরই দু'একজনা তার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রকৃত কারণ দর্শিয়ে দেয়, আর তখন আমরা অনেক স্থলেই ওঁদেরই বিশ্বাস করি বেশী—সর্বস্থলে না হোক, অনেক স্থলেই ‘স্পেকটেলর সীজ মোর অব দি গেম।’

তবু মনে বড়ই কোতুহল হয়, নেপোলিয়ন কি ভেবেছিলেন, হিটলার কি ভেবেছিলেন?

অধুনা তারই খানিকটো উত্তর মিলেছে।

১৯৪১-৪২ এর শীতে হিটলার গোরবের মধ্যগগনে। ফ্রান্স পদানত—তিনি মস্কো লেনিনগ্রাদের দরজায় সদৃশে দাঙ্গা দিচ্ছেন। আত্মপ্রসাধে পরিপূর্ণ হিটলার তখন লাগু-ডিনার খাওয়ার পর সমবেত ইয়ারবন্ধীদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—জার্মান মনের উপর বিহরাগত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেহেরু না সুভাষ, বর্ণসংস্কারের কুফল, কুকুর মনিবের খাটের নিচে গোবে না অন্য কোথাও,—বস্তুত আকাশপাতালে হেন বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনি তখন আলোচনা করেননি। ‘আলোচনা’ বলে ভুল করলুম—আসলে ইয়ার-দোস্ত দু’একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই হিটলারের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতো। এ যেন নব গীতা—শুধু আমাদের গীতাতে প্রশ্ন করেন একা অজ্ঞান, এখানে অজ্ঞান একাধিক।

হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান তখন হিটলারের অনুমতি নিয়ে ঘরের এক কোণে স্টেনো রাখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর টাইপ করা কাগজের উপর তখন বরমান তাঁর মন্তব্য ও মেরামতি করে দিলে পর শেষ সরকারী কপি তাঁর হু।

হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে পর এগুলো কি ভাবে প্রকাশিত হত, আদৌ প্রকাশিত হত কি না, সে কথা বলা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন চতুর্দিকে লুণ্ঠিতরাজ্য, তখন এ-হাত সে-হাত ঘুরে শেষটায় সে পাণ্ডুলিপি প্রথম জর্মানে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে—‘হিটলারজ টেবিল-টক্’ নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় সাতশ’ পাতার বই।

হিটলার ‘মাইন কাম্ফ’ কিংবা বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্ব-জনের সম্মুখে সরকারী ভাবে, কিন্তু এই টেবিল-টক্ ঘরোয়া। এতে হিটলার-মনের অন্য একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়।

হিটলারের অনুচরবর্গ বলেন, যখন পরাজয় আরম্ভ হল, তখন হিটলার যে-কোনো কারণেই হোক তাঁর জেনারেল, কর্নেল, ইয়ার-বন্দীদের সঙ্গে থানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খেতে লাগলেন, নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্তা তাঁর পাটিকা এবং তাঁর মহিলা-টাইপিষ্টদের সঙ্গে। তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ‘টেবিল-টক্’ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই হিটলারের কাছে না হোক তাঁর শত্রু-মিত্র বহুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আর জয়াশা নেই। তাঁর সেক্রেটারি বরমান অন্তত সে-সম্ভাবনাটার আতঙ্ক ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁরই অনুরোধে হিটলার ফের ‘টেবিল-টক্’ দিলেন। কিন্তু এগুলোকে আর ‘টক্’ বলা চলে না। তাঁর শেষ বাণী, তাঁর শেষ ‘টেস্টামেন্ট’ বললেই ভালো বলা হয়।

॥ দুই ॥

প্রথম প্রশ্ন : ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ড আক্রমণ করলেন না কেন? পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে নানা মর্নি নানা মত দিয়েছেন : এবারে হিটলারের মতে শুনুন :

‘জুলাইয়ের (১৯৪০) শেষের দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের এক মাস

পরে আমি হুসনঙ্গম করলুম, শান্তি আবার আমাদের মুর্তার বাইরে চলে গেল । তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বৃদ্ধিতে পেরেছিলুম যে শরণ-হেমন্তের ঋতু-ঋতুর পূর্বে আমরা ব্রিটেন অভিযান করতে পারবো না, কারণ আকাশযুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারিনি । তার সরল অর্থ, আমরা ভবিষ্যতেও আর কখনো ব্রিটেন অভিযানে সক্ষম হব না ।’

(টীকা : হিটলার এবং গ্যোরিঙের চাল ছিল, ইংলন্ডের উপর বোধহু বোমা বর্ষণ করলে ইংলিশ জঙ্গী বিমান আকাশে উঠবে জার্মান বিমান, বিমান নিধন করবার জন্য । তখন সেগুলোকেও বিনাশ করা হবে । ফলে আকাশে ইংলন্ডের আর কোনো আধিপত্য থাকবে না বলে তখন সহজেই সমুদ্রপথে ব্রিটেন অভিযান সম্ভবপর হবে । ইংরেজ এই চালটি বৃদ্ধিতে পেরে, বরঞ্চ বোধহু বোমার মার খেল, কিন্তু জঙ্গী বিমান আকাশে তুললো অত্যন্তই—বাকিগুলো বাঁচিয়ে রাখলো হিটলারের সমুদ্র অভিযানের জাহাজগুলোকে ঘায়েল করার জন্য ।)

হিটলার পুনরায় অন্য বলছেন,

‘ইংলন্ড-অভিযান ও ফলে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছিলুম । কারণ ইংলন্ডের মূখ্য নেতারা কিছতেই ইয়োরোপে আমাদের একছত্রাধিপত্য স্বীকার করে নিত না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবাপন্ন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রও (অর্থাৎ রুশ) বেঁচে থাকতো । যুদ্ধের তা হলে শেষই হত না—চলতেই থাকতো । এবং ইংরেজের পিছনে মার্কিন এসে জুড়ে তার কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলতো । মার্কিনের আবার যুদ্ধ করার জন্য সব বলই প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তারাও আমাদেরই মত প্রচুর এগিয়ে যেত ; ইংলন্ড থেকে কন্টিনেন্ট দূরে নয় (অর্থাৎ মার্কিন-ইংরেজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তারাও কন্টিনেন্টে নেমে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে)—এ সমস্ত কারণে আমাদের পক্ষে ইংলন্ড অভিযান করে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের দ্বয়ে মজে যাওয়া মোটেই সমীচীন হত না । কারণ স্পষ্ট দেখতে পারছি, সময়—কাল, ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাহায্য করে যেত বেশী । ইংলন্ডের শেষ আশা ছিল রুশ—কারণ রুশ আমাদেরই মত শক্তিশালী—এবং তাকে খাড়া করানো আমাদের বিরুদ্ধে । এই রুশকে ঘায়েল করতে পারলেই ইংরেজ বৃদ্ধিতে যে তার আর আশা নেই, এবারে সশি্ষ করতেই হবে ।’

হিটলার এম্বলে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, কেন ইংলন্ড আক্রমণ না করে তিনি রুশ আক্রমণ করেন ।

এ যুদ্ধিগোলো কতখানি বাস্তব তার বিচার রণ-পাণ্ডিতেরা করবেন । ঈষৎ অবাস্তব হলেও অন্য একটি যুদ্ধির কথা এম্বলে উল্লেখ করি, কারণ সেটি জানা থাকলে ভারতের ইতিহাস বৃদ্ধিতে অনেকখানি সুখিধা হয় ।

একাধিক রণ-পাণ্ডিত বলেছেন, হিটলার এমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার সঙ্গে সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযানের যোগসূত্র বা ঐতিহ্য ছিল না । অস্ট্রিয়াকে ইংরেজ, স্প্যানিশ বা আলবেন মত ম্যারিটিম্ নেশন বলা চলে না । তাই ইংলন্ড

অভিযানের সব-কিছু তৈরী করেও' হিটলার শেষ মূহুর্তে' কিন্তু-কিন্তু করে থেমে গেলেন।

অর্থাৎ জলাতঙ্ক না থাকলেও হিটলারের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল—অন্তত সমুদ্র-প্রাণীত যে ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য মানতে হবে এইটাই সর্বপ্রধান কারণ নয়।

পাঠান-মোগল বংশের রাজাদেরও হিটলারের অবস্থা ছিল। এ'রা এসেছিলেন ল্যান্ড-লক্ট' দেশ থেকে। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁদের কণামাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমার যতদূর জানা আছে, মোগলদের ভিতর প্রথম আকবরই গুজরাত জয় করে চাক্ষুষ সমুদ্রদর্শন করেন। 'আকবর-নামা'র ইংরিজী অনুবাদক সেই সম্পর্কে দৃষ্ণ প্রকাশ করেছেন যে সমুদ্র আকবরের মনে কোনো প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাও আকবর প্রভৃতি বাদশারা যদি সমুদ্রপারে কিংবা অদূরে রাজধানী করতেন তা হলেও না হয় কিছুটা হত। তাঁরা থাকতেন আগ্রা-দিল্লীতে যেখানে সমুদ্রের লোনা হাওয়া পর্যন্ত পৌঁছয় না।

ফলে এদের বিপুল ঐশ্বর্য জনবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের নৌবহর তৈরী হল না।

হোয়াট এ ট্র্যাজেডি ! এ'রা যদি নৌবহর তৈরী করতেন, তবে পর্তুগীজ ইংরেজ এদেশে যে এক রক্তি পাক্তা পেত না তাই নয়, আমাদের পণ্যসম্ভার আমাদের জাহাজে করে দূনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। আজ আমরা মার্কিন ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতুম। এবং পরম পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের মন সমুদ্র-সচেতন নয়—রাজধানী সেই দিল্লীতে যে।

অথচ আমরা সবাই জানি, সমুদ্র-যাত্রায় ভারতের খ্যাতি একদা ছিল।

সে দীর্ঘ কাহিনী তুলবো না। মহাভারতের মাত্র সামান্য একটি কথার উল্লেখ করি। শাস্তিপর্বে ভীষ্ম রাজ্যচর্চা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য প্রজাপতিকৃত লক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক বিরাট শাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, “এ বিরাট শাস্ত্র...নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নৌকার পথরোধ...সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে (শাস্তিপর্ব)।” অর্থাৎ কয়েক বৎসর পরে অ্যান্টনি ইড্‌ন স্লোজ কানালের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে যে-ভাবে খালের মুখ বন্ধ করলেন ! এ সংসারে নতুন কিছুই নয়।

নৌবহর বাবদে ভারতের তখনই সর্বশক্তি গেছে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার

১ যারা হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্মানের বই “হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড” পড়েছেন তাঁরাই জানেন, ইংলন্ড অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা ছিল, এক বিশেষ সম্মুখ রাত দশটায় হিটলার অভিযান আরম্ভের ফাইনাল অর্ডার দেবেন। হিটলার হফ্মান ও অন্যান্য সান্সোপাস্ট্রের সঙ্গে রাত বারোটো অবধি গালগল্প করে শূতে গেলেন। কোন অর্ডারই দিলেন না। অভিযান নাকচ হল।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—৯

নৌশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কারণ তখন তাঁরা বাঙলা এবং গুজরাত প্রদেশকে নৌবহর তৈরী করার জন্য অর্থ দিতেন না—এর মূল্য জানেন না বলে, সেকথা পুবেই বলেছি। অথচ ঐ সময়ে, যেমন মনে পড়ে তীমুর-অভিযানের পর আকবর-জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাঙলা গুজরাত স্বাধীন। নৌবহরের মূল্য জানেন বলে গুজরাতের স্বাধীন সুলতান মাহমুদ বেগড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেই নৌবহর রেখেছেন এবং একাধিকবার নৌসংগ্রামে পর্তুগীজদের বেধড়ক মার মেরেছেন। গুজরাতের শেষ স্বাধীন বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যান, তিনি যখন হুমায়ুন এবং শের শাহের ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তাদের জাহাজে যান। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পেরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন—পর্তুগীজরা বৈঠার ঘায়ে তাঁকে খুন করে।

বাঙলাও যখন স্বাধীন তখন পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়েছে। যদিও তারা সুন্দর-বন অঞ্চল ছারখার করেছে, তবু বাঙলায় গোয়া দমন দিউ-র মত রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

আকবর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাংলা-গুজরাত আতঁকণ্টে বার বার চিৎকার করে কেন্দ্রের হুজুরদের জানিয়েছে, পর্তুগীজরা সর্বনাশ করছে। আমাদের পণ্যসম্ভার হারমদদের ভয়ে বিদেশে রপ্তানি হতে পারছে না। বাধ্য হয়ে জলের দরে পর্তুগীজদের বেচে দিতে হচ্ছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলুম তখন আমাদের আপন টাকা দিয়ে নৌবহর গড়েছি। এখন কুলে টাকা চলে যায় কেন্দ্রে। দয়া করে টাকা দিন; নৌবহর গড়ি।

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! হুজুররা হিটলারের চেয়ে অধম ল্যাণ্ড লক্টু দেশের লোক, এবং এখন থাকেন দিল্লীতে। নৌবহরের মূল্য কি বৃদ্ধবেন?

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি। আজও যদি কেন্দ্র বাঙলাদেশকে বাণিজ্য-নৌবহর তৈরী করবার জন্য বিশেষ মোটা টাকা না দেয়, তবে বৃদ্ধ ইতিহাস বৃথাই পড়ি।

১৯৪১।

॥ তিন ॥

হিটলার আত্মহত্যা করার এক মাস পূর্ব পর্যন্ত বার বার করুণ আতঁনাদ করে বলেছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি চাইনি, আমি চাইনি, আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলুম জর্মনির জন্য তার বেঁচে থাকার মত (লেবেন্সরাউম) 'দুই বিঘে জমি।' জমিটা আসবে চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড ও উক্রানিয়া থেকে। তাতে ইংলন্ডের কি, ফ্রান্সেরই বা কি? আমি তো ফ্রান্স কিংবা তার উপনিবেশে হাত দিতে চাইনি। ইংরেজকেও শতবার বলেছি, তার বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও কণামাত্র লোভ আমার নেই। রুশরা বর্বর, তারা বিশ্বশান্তির শত্রু। তার পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিতে পারলে তার শক্তিকল্প

হয়ে যাওয়ায় সে বিশ্বশাস্তি নষ্ট করতে পারবে না ; জর্ম'নরাও খেয়ে-পরে বাঁচবে, ফ্রান্সের উপনিবেশ বা ব্রিটেনের বিশ্বরাজ্যের দিকে হ্যাংলার মত তাকাবে না ।

কিন্তু ফরাসী-ইংরেজ চায় না, আমরা খেয়ে-পরে বাঁচি । তারা বোঝে না, রুশ বিশ্বশাস্তির কত বড় দৃশ্যমন । তাই যুদ্ধ করলো তারা । আমি যুদ্ধ করিনি ।

এবং এই ফ্রান্স, ব্রিটন ও মার্কিনের পিছনে রয়েছে বিশ্বইহুদিসম্প্রদায় । আমি যেদিন (জানুয়ারী ১৯৩৩) জর্ম'নির কণ্ঠধার হলুম সেদিন থেকেই ইহুদিরা আমার ও জর্ম'নির বিনাশ চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো । আমিও তাদের একাধিক বার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলুম, তারা যদি জর্ম'নকে নিধন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করে তবে আমি তাদের সমুদ্রে নিম্নল করবো । বেদরুদ হুদয়ে । মানুষ ঘেরকম ছারপোকা মারার সময় দয়া-মৈত্রীর কথা ভাবে না ।

(ন্যূরনবের্গ মকদ্দমায় গ্যোরিঙ, কাইটেল, রিবেনট্রপ ও অধুনা আইসম্যান যখন বলেন ইহুদি-নিধন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং হিটলার সম্পূর্ণ স্বাধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন তাঁরা কণামাত্র অতিরঞ্জন করেননি ।)

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে হিটলারের এইটেই মোটামুটি বক্তব্য ।

দু'নিয়ার কুলে অশাস্তি, বিশ্ব-জোড়া লড়াই এ সর্ব-কিছুর জন্য একমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ই দায়ী—এ কথা একমাত্র গোড়া নাৎসি ভিন্ন কেউ স্বীকার করবে না, (অবশ্য আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়ে যাওয়ার ফলে করতে পারে, কিন্তু তাদের সরকারও ইহুদিদের আপন ভিন্ন ভিন্ন আরব রাষ্ট্রে থেকে ব্যাপক ভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেনি—নিধন করার তো কথাই ওঠে না) কিন্তু আমাদের মনে তবু প্রশ্ন জাগে, সত্যি ইহুদিরা কতখানি শক্তি ধরে, বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা কতখানি দায়ী ? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এর সদৃশতর কেউ কখনও পাবে না—উপস্থিত শব্দ এইটুকু বলতে পারি স্বেচ্ছামত টাকার জোরে প্যালেস্টাইনের মত একটা রাজ্যস্থাপনা করা ইহুদি ভিন্ন আর কেউ কখনো করতে পারেনি ।

এখানে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করি ।

সকলেরই বিশ্বাস ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিখে ফরাসী-ইংরেজ যখন অকাতর-চিন্তে চেকোস্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ হিটলারের হাতে তুলে দেন, তখন এদের মান-মর্যাদা উচ্ছন্ন যায়, এবং হিটলারের পরিপূর্ণ বিজয় ও বিশ্বজোড়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ হয় । এই জয়ে গোটা জর্ম'নির জনসাধারণ তখন এমনি উল্লসিত, হিটলারের জয়গানে এমনি মদুখরিত যে জর্ম'নির ভিতরে যে-সব জর্ম'ন হিটলারের পতনের গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তাঁদের চক্রান্ত কিছ-দিনের জন্য মূলতুবী রাখেন ।

এই-ম্যুনিখ ব্যাপারে হিটলারের মত কি ?

তিনি খাপ্পা হয়ে বলেছেন :

সেই কটর ক্যাপিটালিস্ট বুদ্ধিয়া চেম্বারলিন যখন তার ভন্ডামির ছাতা-খানা নিয়ে সর্ব তকলীফ বরদাশ্ত করে সেই সুদূর বেগ'হফে (হিটলারের নিবাস) হিটলারের মত হঠাৎ-নবাবের (আপস্টার্ট) সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, তখন সে বিলক্ষণ জানতো যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ চালানো। আমার সন্দেহ মোচনের জন্য সে তখন যা খুশি তাই বলবার জন্য তৈরী। বেগ'হফে আসার তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কোনো গতিকে সময় পাওয়া (অর্থাৎ যুদ্ধটা মূলতুবী করা)। আমাদের তখন উচিত ছিল ১৯৩৮-এই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা (চেম্বারলেন সম্প্রদায়)— সেই নিবীৰ্ষ কাপদুরূষের দল—আমরা তখন যা চাইলুম তাই দিতে লাগলো। এ-অবস্থায় গায়ে পড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় কি প্রকারে (অর্থাৎ জর্মনির জনসাধারণ বলতো ইংরেজ ফরাসী যখন আমাদের সব খাই-ই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা খামকা লড়াই করতে যাব কেন)? তাই আমরা ম্যানিকে অতি সহজ ও দ্রুত লড়াই জেতার সুযোগ হারালুম। যদিও আমরা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম না, তবু শত্রুর চেয়ে বেশী প্রস্তুতি আমাদের ছিল। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম সময় ছিল।'

মুসসোলীনির মধ্যস্থতায় যে ম্যানিকপর্ব সমাধান হয়েছিল সে কথার উল্লেখ হিটলার করেননি। এস্থলে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—১৯৩৯-এ হিটলার পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধাধারম্ভের পূর্বে বলেন, 'আশা করি এবারে আবার হঠাৎ কোনো বদমায়েশ (শূয়াইন-হুন্ট) ম্যানিকের মত শেষ মূহুর্তে এসে সব-কিছু না ভেঙুল করে দেয়।'

এবারে শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধ হারার জন্য তিনি কাকে দায়ী করলেন?

ইতিপূর্বেই আমাদের জানা ছিল, নরেনবের্গের মকদ্দমার সময় যে-সব দলিল-পত্র পেশ করা হয় তাতে হিটলারের উইলিটিও ছিল। এ-উইলের সত্যতা সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র কেউই কোনো প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটি তিনি তৈরি করেন আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। জর্মনির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

এ উইলে হিটলার নৌসেনার প্রশংসা করেছেন (বস্তুত তিনি মৃত্যুর পূর্বে নৌবহরের বড় কর্তাকেই তাঁর পক্ষে বসিয়ে যাবার জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন নাবিক বড় কর্তা স্বয়ং), যে বিমান বহরের অকৃতকার্যতার জন্য অন্তত অংশত তাঁকে পরাজয় মানতে হল তারও প্রশংসা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন তাঁর 'রিংসক্রীগ' করনেওলা ল্যান্ড-আর্মির জেনারেল ফীল্ড্-মার্শালদের। সাধারণ সৈনিকের উচ্চ প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্ব ক্রোধ আর্মি আপিসারদের উপর।

তরাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। তারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে। তারা প্রতিক্ষণে পরাজয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদে পদে সপ্রমাণ করেছে, তারা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়ছে। অর্থাৎ নতুন

যুগে নতুন লড়াইয়ে যে নতুন কায়দায় লড়তে হবে সেটা তারা আদর্শেই বুঝতে পারেনি।

হিটলারের যদি সুকুমার রায় পড়া থাকতো তবে নিশ্চয়ই বলতেন, এ যেন ‘ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গায়ে হাল ব্যথা!’ সোজা বাংলায়, জাঁদরেলরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন!

তা হলে প্রশ্ন : পোলান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে সম্পূর্ণ জয় করে মস্কোর চোকাট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল কারা? ওই জেনারেলরাই তো!

তবে?

১৯৫১।

হিটলার

এই গত রবিবারের ‘আনন্দবাজারে’ই দেখি, আমাদের শিবদ্বা হিটলারকে নিয়ে একখানা ‘পান্’ ছেড়েছেন। ‘হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল ভাবিয়ে আজে-গুস্তানায় বিরাজ করছেন।’ এর উপর শিবদ্বার ‘পান্’—‘তাঁর গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।’

আমি কিন্তু পান্টার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে, হিটলার এখনো বেঁচে আছেন।

সত্য নাকি?

আমি এবার জর্মনিতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি? যে দু’একজনকে শুধিয়েছিলাম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজবের উৎপত্তি কোথায়?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছে শহর পৎসদ্বায়ে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গ্যা-ঢাকা দিয়ে আছেন। এর কিছুদিন পর রাশান

১ হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩-চৌত্রিশেই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও র্যোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরোলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বন্ধ করে দিলেন ও র্যোম একটি প্রিয়দর্শন তরুণী সঙ্গে নিলেন। এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বহু বেশী যুর্নিয়ম্‌ ভালোবাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগান্ডা চীফ বলে সমস্তক্ষণ বকর বকর করতেন আর র্যোম সমরতিগামী অর্থাৎ হোমোসেক্সুয়েল ছিলেন।

এনসাইক্লোপীডিয়া'র নতুন সংস্করণের প্রকাশ হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কতৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতিপূর্বে দু'নিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আজ 'টাইম' সউদী আরব কোনো জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাস্ট্রিসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাঝখানে বিরাজ করছেন! সে যুগে স্পুর্টনিক জাতীয় কোনো কিছুর আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুর নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যা থেকে লুনারিক—উস্মাদ শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উস্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বশ্চ উস্মাদ নয়, মৃত্ত উস্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নতুন লীজেন্ড সৃষ্টি হয়—১৯১৮ সালে জন্ম নিতে যে-রকম এক লীজেন্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘরগত বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রট, কম্যুনিষ্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেন্ডের প্রচুরতম 'সদ্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেন্ড যেন সৃষ্টি না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘদিন ধরে অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তুর্ণণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরল ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কোঁতুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকীর্ণত উদগ্রীব অবস্থায় পেঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসঞ্চিত করতে হয়, ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভার রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমার জীবনে অল্পই পড়েছি।

কোনো কোনো অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুদ্রিড, অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা; তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-প্রোতে গ্যা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ্র যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এম্বলে

অবশ্য অবন ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসঙ্গেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন। এঁরা যে সব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালদুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এইঃ শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা গেল য়ারা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার—ট্রেভার রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সম্প্রদান পাওয়া গিয়েছে আর্জেন্টিনায়, এবং গ্রীষ্মকালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে শীতল, মনোরম) সুইটজারল্যান্ডে! ট্রেভার রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন,—অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীত জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দ কেটে গেল।

তবে একথা বলা যেতে পারে যে, বইখানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এন-সাইক্লোপীডিয়ার যে নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে য়ারা তাঁর ‘বুংকারে’ (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নিমিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তী কালে বই লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুঁলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনো সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন—এটা অবিশ্বাস্য। আরো নানাবিধ কারণ আছে এবং ট্রেভার রোপার সেগুলো সবিস্তর আলোচনা করেছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কতৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জার্মান অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই। কিন্তু ওভার সিম্প্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐক্যনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জার্মান জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিটলার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালম্ব গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গভর্নালক্রান্ত বণ্ডলাবে কিনা? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি?

যাদের বয়েস পঁচিশ-ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারো কারো কিছুটা মনে আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনো হয়নি। যাদের বয়েস তাদের চেয়ে বেশী তারা একদম ছুপ; কোনো কিছু বলতে চায় না। এরা যে ভয়ে মূখ খোলে না তা নয়,

কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমোক্রট, কিংবা ক্যাথলিক সেন্টার (আজ আউনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিটলার-বৈরী । ১৯৩৭।৩৮-এ বরণ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার-রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন । কিন্তু আজ আর কোনো জর্ম'নই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না । এ যেন একটা দৃঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি ?

আমার কোনো পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদয়তা হয়েছিল । তার স্থান পেলুম না । তার আমার দুজনার অন্য এক বন্ধু বললে—খুব সম্ভব মারা গিয়েছে ।

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্ম'ন মিলিত হলে কথার মোড় ঐ দিকে ঘোরাতুম । কিন্তু তাতে কোন লাভ হত না । পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত । তাতে আর যা হোক, হিটলার দর্শনের উপর নতুন কোনো আলোকপাত হত না ।

একদা যারা কটুর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনো গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে চিন্তার জগতে ; বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হাণ্টিং, অথাৎ ডি-নাৎসিফিকেশন এখনো শেষ হয়নি (এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিস্থাত এক শহর-প্ল্যানার জর্ম'নকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজদুরকে গুলি করে মারার আদেশ দেয়) ।' এরা পুনরায় এক নতুন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই । কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদের জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না ।—হিটলারকে জর্ম'নি যেভাবে পূজা করেছে আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি করেনি ।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না — অবশ্য সাহস তাদের এখনো হয়নি, হতে হলে বেশ কিছুদিন লাগবে । কারণ জর্ম'নি এখনো অবসন্ন । রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে ।

নব-হিটলার

আন্তিলা, চের্সিস, নাদির যখন রক্তের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন তখন অসহায় মানবসন্তান কাতরকণ্ঠে রুদ্ধকণ্ঠে শ্রবণ করে তাঁর দক্ষিণ মূথের কামনা করেছে, কিংবা হয়তো ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু সাহস করে এ আশা করতে পারেনি, ভবিষ্যতের আন্তিলা-নাদিরকে ঠেকানো যায় কি প্রকারে ?

আজ কিন্তু মানুষের চিন্তা, এমন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে আবার যেন আরেকটা হিটলার দেখা না দিতে পারে ? কারণ এই ‘সুসভ্য’ বিংশ শতাব্দীতে হিটলার যে রক্তপাত করে গেলেন, তার সামনে খুব সম্ভব চের্সিস নাদির হার মানেন। তাই আমি যে হিটলার নিয়ে আলোচনা করি সেটা কিছু একাডেমিক ইন্ট্রেস্ট নয়—অর্থাৎ ‘অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অশ্বেশ্বর অনুপস্থিত অসিত অশ্বাভিষেকের অনুসন্ধান,’^১—সমস্যাটা শত লক্ষ্য নিরীহ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে।

হিটলারকে আমি যে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি তার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি এমন সব কীর্তিকর্ম করে গেছেন যা আন্তিলা চের্সিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধ হয় রুদ্দের ‘নবমাবতার’ হিটলারের পর ‘দশমাবতার’ চীনের গোকুলে বাড়ছেন—নেফার সংবাদ থেকে আমার এই অনুমানটি হয়েছে।) এখানে সামান্য একটি উদাহরণ দি। পাঠককে আবার শ্রবণ করিয়ে দিচ্ছি—অপরাধ নেবেন না—এটা অশ্বেশ্বর অশ্বাভিষেকের অনুসন্ধান নয়। চের্সিস-নাদির যখন কোনো শহর দখল করে পাইকারী কচু-কাটার হুকুম দিতেন তখন দেখা যেত তাঁদের সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে খুঁবা-বুখ-শিশুর গলা কেটে কেটে শেষটায় হয়রান হয়ে গিয়ে ক্ষান্ত দিত, শব্দ তাই নয়, শব্দের উত্তেজনাহীন আপন-জীবনমরণ-সমস্যাবিহীন এরকম একটানা কচুকাটা কেটে কেটে তাদের এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদ দেখা যেত, যার ফলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসা—পিপাসারও তো একটা সীমা আছে—বর্বরও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ তত্ত্বটি বুদ্ধিতে হিটলারের বেশী সময় লাগেনি। হিটলার, হিমলার, হাইড্রিস আইসম্যান^২ গোড়ার থেকে লক্ষ্য করলেন যদিও বাছাই

বাছাই ব্ল্যাক-কোট পণ্টনের পর-পীড়ন-উল্লাসী (স্যাডিস্ট)-দের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বালবৃন্দবিনতা ইহুদিদের গুলি করে মারার—তারাও শেষ পর্যন্ত মানসিক অবসাদের স্নায়বিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন হিটলার হিমলার বের করলেন এক নয়া কল—যে কল চোঙ্গিস-নাদিরের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, কারণ সে যুগে বিজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায়। বিরাত একথানা এয়ারটাইট ঘরে ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিয়ে ছাত্তের উপর থেকে ভোর্টলেটেরপানা ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একটিন বিষে-ঠাসা গ্যাস ফেলে দেওয়া হত—দশ মিনিটেই ঘরের সব-কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা। এতে করে যে গ্যাসের টিনট ফেলল তার কোনো মারাত্মক স্নায়বিক ‘ঝামেলা’ হওয়ার কথা নয়।

হালে আইস্ম্যান সম্বন্ধে একথানা বাঙলা বই পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলেছেন, পাঁচ লক্ষ ইহুদির প্রাণহরণের জন্য হিটলার সম্প্রদায় দায়ী। পাঁচ লাখ নয়, হবে পঞ্চাশ লাখ। ফাইভ মিলিয়ন পাঁচ লাখ নয়। হয়তো লেখক আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, পঞ্চাশ লাখ কি করে হয়—এত অসংখ্য লোক মেরে ফেলা অসম্ভব—পাঁচ লাখই হবে। আমরাও আশ্চর্য হই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একাধিক সহানুভূতিশীল এবং একাধিক নিরপেক্ষ জন বহু গবেষণার পর যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার থেকে দেখা যায়, আমেরিকার প্রকাশিত হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার, প্যারিসের হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার, লন্ডনের হিসেবে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। অন্য আরেক হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার। নাৎসিরা যে-সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি সেগুলো ন্যূনতমবেগের মকদ্দমায় মিশ্রপক্ষ পেশ করেন। সেগুলো থেকে অনায়াসে চল্লিশ লক্ষের হিসেবে পে’ছিনো যায় (আত্মহত্যা, অনাচার ও অকালরোগে যারা মরেছে তাদের হিসেব এতে বা অন্যান্য হিসেবে ধরা হয়নি)।

তাই আমি হিটলারকেই বেছে নিয়েছি। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন—এই বিরাত নরমেধ যজ্ঞ কি আবার অনুরূপিত হতে পারে? কিংবা বিরাতের?—এটম বমে যখন হাত বাড়ন্ত নয়? সে সম্ভবনা যদি থাকে তবে আগেভাগে সময় থাকতে এমন কোনো এক কিংবা একাধিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে কি গ্রহণ করা যায়?

চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, আরেক হিটলার খাড়া হয়ে উঠেছেন। এবং ইনি হিটলারেরও বাড়া। কারণ হিটলার মেরেছেন প্রধানত ইহুদিদের, এবং শেষের দিকের যুদ্ধে পরাজয়ের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে হনো হয়ে গিয়ে জার্মান জাতকে—১৩১৪ বছরের বালকরাও বাদ যায়নি—পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে, জয়ের আশা যখন সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছে তখনো। আর এক চৈনিক নব হিটলার গোড়ার থেকেই পাঠাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ চীন যুবককে লস্ অব ম্যান-পাওয়ারের কোন চিন্তা বিবেচনা না করে। আমাদের অফিসাররাই বলেছেন, ওরা নেমে আসে একেবারে পি’পড়ের মত। আফটার অল্ হাউ মের্ন আর ইউ গোয়িং টু কিজ্, হাউ মের্ন ক্যান ইউ কিজ্! আমি শুনছি কোরিয়াতেও

চীনেরা এইভাবে নেমে এসেছিল। শূন্যে প্রথম সারির হাতে বন্দুক থাকে, দ্বিতীয় সারির হাতে তাও না। শত্রুপক্ষ প্রথম সারিকে কচুকাটা (মো ডাউন—আমি শব্দার্থে ‘কচুকাটা’ বলছি, কারণ এদের ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে, শত্রু বন্দুক দিয়ে মেশিনগানের মোকাবেলা করতে, তাতে করে সামান্য একটি ঘাঁটি দখল করতে কত হাজার আপন সৈন্য অথবা মারা গেল বিলকুল তার কোনো পরওয়া না করে) করে ফেললে দ্বিতীয় সারি সেই সব বন্দুক তুলে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হয়। কোরিয়াতে নাকি একটা সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে শতিনেক মার্কিন সৈন্য—এখানেও মেশিনগান বনাম রাইফেল—চীনাঘের কচুকাটা করতে করতে শেষটায় তাদের প্রায় নাভাস ব্রেকডাউন হতে চললে কমান্ডার আদেশ দেন, ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটে যেতে। অর্থাৎ যেখানে লস্ অব ম্যানপাওয়ার সম্বন্ধে দ্বিবিধিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধাধীন নব-হিটলার অগ্রসর হতে চান সেখানে তাঁর উপস্থিত জয় হবে, কিন্তু আঁতেরে সমূলস্থ বিনশ্যতি—কিন্তু অগণিত আপনজন ও বিস্তর পরজনকে মৃত্যু, অনাহার, মহামারীর কবলে তুলে ধরে ও বহু বহু গৃহে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে।

হিটলারের একাধিক সেনানায়ক শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বলেন, ‘যেদিন আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলাম, লস্ অব জার্মান মেনপাওয়ার হিটলার আর হিসেবে নেন না, সেদিন থেকেই আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা আরম্ভ করি।’ স্থালিনগ্রামে পাউলুস তাই করেছিলেন—যদিও হিটলারের কড়া হুকুম ছিল কচুকাটা হয়ে মরার। স্পের কলকারখানা, পুঁজু ধ্বংস করতে নারাজ হয়েছিলেন ও মোডেলের মত একাধিক সেনানায়ক আত্মহত্যা বরণ করেন।

মৃত্যুর আটশতদিন পূর্বে হিটলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীন যে একদিন মারমর্তি ধারণ করবে সেটা তিনি জানতেন। তবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এ তথ্যটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেছিলেন—From the point of view of both justice and history they (চীনারা) will have exactly the same arguments, or lack of arguments to support their invasion of the American continent as had the Europeans in the sixteenth century. Their vast and undernourished masses will confer on them the sole right that history recognizes—the right of starving people to assuage their hunger—provided always that their claim is well-backed by force.

হিটলারের এই শেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এরপর তিনি কিছু বলে থাকলে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছানি।

হিটলারের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। তিনি মনে করেছিলেন, রুশ এবং মার্কিনে লড়াই লাগবে। ফলে আমেরিকা ছারখার হবে। তখন চীনারা সে দেশ দখল করবে। সেই দখল করার ভিতর অনায়াস বা অধর্ম কিছু নাই। কারণ ইতিহাস যাত্র একটি সত্য স্বীকার করে—ক্ষুধিত পঙ্গপালের মত যে জন-

সমাজ কাতর সে যন্ত্রস্ত বেদখলী করে ক্ষুদ্রিম্বন্তি নিবারণ করার হস্ত ধরে ।

অর্থাৎ হিটলারের মতে ইতিহাস ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না । আমরা করি । শাস্ত্রে আছে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ।

অধর্ম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মঙ্গল দেখা যায়, শত্রু (সপত্ন = প্রতিদ্বন্দ্বী, সপত্নী এরই স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাঙলায় চলিত) পরাজিত হয়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয় ।

এই তত্ত্বকথাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত—আ পস্তুরিয়োরি—এবং অভিজ্ঞতা থেকে নীতিসূত্র বের করা ইতিহাসের কর্ম, অথবা ইতিহাসের দর্শন (ফিলজফি অব হিস্ট্রী) এটি করে ।

হিটলার ফ্রান্স হল্যান্ড ইত্যাদি এমন কি রাশের বহুলাংশ জয় করতে ভদ্র, মঙ্গল দেখেছিলেন, সপত্নগণকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু বিনাশ যখন এল তখন সেটা সর্বস্ব সমূলে উৎপাটন করলো ।

এর আরেকটি গৌণ অর্থ আছে । আমরা যে ছোটোখাটো পাপ-অবিচার করে থাকি তার জন্য এই পৃথিবীতেই অসম্পূর্ণ সাজা পাই—কারণ আমরা হিটলার কিংবা লাই সায়েবের মত ডাঙর প্রাণী নই । আমাদের বিনাশ সমূলে হয় না । কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আদ্যন্ত গৌরবময় নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুধার তাড়নায় বা অন্য কোনো কারণেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করিনি ।

বড় হিটলার, ছোট হিটলারের ডরাবার কারণ নেই ।

কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে হবে ।

শীসালো জার্মনি

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনো দেখিনি ।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি । সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বস্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যান্ডেই সব চেয়ে ভালো । ১৯২৯।৩০ সালের কথাই ধরুন । ইংল্যান্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে । সুইটজারল্যান্ডের কলনি নেই ; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানী করে । কিন্তু ইংল্যান্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গৃহটিকয়েক পরিবারের হাতে, কিন্তু সুইটজারল্যান্ডে সে ধনের ভাগ-বাটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানেমোদিরূপে । সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জনসাধারণ ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয় । কিন্তু সমুদ্র, পরিভ্রমণ দেশ ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনো তার সামনে হুদোহুদো টাকা আর কখনো সে লাটে উঠি-উঠি করছে। কখনো রেশমারীকাবারে গমগম করছে, কখনো রাস্তায় রাস্তায় মেয়ে-মন্দ্র কাজের সস্থানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনই যখন তার দুর্ভিঁন প্রায় চরমে, তখন, ১৯২৯ সালে, প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুর্ভবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুত চালে তৈরী এবং রুচিসঙ্গত। ওয়ালপেপার পর্দা, টেবলক্লং পদ্রনো হয়ে এসেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দাম্য এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু রিপদ্রকমে'র পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, ‘অম্লক কাকের ছানা কিনেছে’—তার অর্থ সে দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মানে বলা হয়, সে জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখের কেছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মনি ভাষাভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পল্‌ডি।

ল্যাংডলোডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পল্‌ডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জম্বর দাম্য একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পল্‌ডি শূধোলে, ‘কে ও?’ ল্যাংডলোডি বললে, ‘রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা বেদার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ছে।’

পল্‌ডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শূধোয়, ‘কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কি?’

এবারে জর্মনি গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুঁড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুগ্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মূটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই-মণী ইয়া লাস ভার্ভিজা নামল একটাউস স্‌টকেস নিয়ে। মূটে নদারদ। ওপারে যেতে হবে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী স্‌টকেস টানছে আর বলছে, ‘দুটো স্‌টকেসে ভাগাভাগি করে নিয়ে এলেতব্দু নাহয় ব্যালান্সড হয়ে চলতে পারতুম।’ বাবাজী ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে—হামবুর্গে সে-সম্ম্যায় টেম্পারেচার ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীকে থেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী-চাকরাণী? তবে শূদুন।

সবসম্ম্য আর্টটি পরিবারে ডিনার লাগের নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারো বাড়িতে দাসী দুই থাক, একটি হেল্পিং হ্যান্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শূধোলে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, মেডু? তা রাখা যায় বই কি। চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিম্বোটা অবশ্য

তিনি নিজেই আনবেন। সিনেমায় ক’দিন যাবেন, ছুটি ক’দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ-চকচকে নেলপলিশ, এইমাত্র লাগানো হয়েছে, এখনো পেটের গন্ধ বের হচ্ছে। তাই কাজ করেন অতি সন্তুর্পণে, পাছে বানিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাধে দেখবে তিনি নেই। বীবী আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে। সেটা দিনে ক’বার হয়, না হয়, সে তোমার কপাল! তার উপর মোটা ঝড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন মনে করো জানলার সাঁশি-গুলো জল দিয়ে ধুয়ে পৌঁছা। তার জন্যে সপ্তাহে একবার করে তোমাকে অন্য লোক আনতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাঙ্কার ভিতর গিয়ে!

*

*

*

ট্যান্ডিওয়ালাকে শূধোলুম, ‘ওটা কি হে?’ দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কিনা প্রতিইণ্ডিজমহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজারখানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, ‘সেকেন্ড-হ্যান্ড কার। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্টপ্ কন্ডিশন। ট্যান্ডক পেট্রলে ভর্তি। দুটি কথা কইবেন—সাঁ করে তেড়ে হে’কে বোরিয়ে যাবেন।’

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়িগুলো যেন কাল-পরশু কেনা। আমি শূধোলুম, ‘তা গাড়িগুলো এই খোলা-মেলায় জলঝড় খাচ্ছে?’

বললে, ‘ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।’ তারপর শূধোলে, ‘আপনার দেশে হাল কি রকম?’

আমি বললুম, ‘আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে।’ —পূর্ব-জন্মটা কি চীজ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, ‘সেই পূর্ব-জন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।’

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সূবাদে বলে ফেলি। এর কিছুদিন পর গিয়েছি সেই বন শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা স্লিস্টার—সঙ্গে ছিল। শূধোলুম, ‘পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছে-পিঠে কোথায় যেন থাকেন?’

শূধোল, ‘কেন?’

‘ঐ যে অত মটোর গাড়ি।’

‘সে তো স্টুডেন্টদের।’

বলে কি ! ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ' তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে গুনে বলতে পারতুম । আর আজ !

হামবুর্গে ফিরে যাই ।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনেরো বড় । তিনি যুদ্ধের পর গত হন । উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে । তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন, আজকাল এ দেশে অনেক ছেলেমেয়ে স্টুডেন্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে । কত'গিম্মী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে — যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ । পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি । কলেজে পেশীছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেসে । বড়টা গেল বাগানে খেলতে ।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে । সত্যি আছে কিনা সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি । তবে এ-কথা সত্য এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে করে ।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে ?'

বললে, 'আগে বাপ-মায়ের এত টাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে "তুই বিয়ে কর' । নাতি পোষার পরস্যা আমার আছে ।" আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করবেই একদিন তখন শূদ্রকিয়ে শূদ্রকিয়ে পুঁইডাটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন ?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গ'তা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল । তোরা যে পিস্তি না চাটিয়ে খেতে পারিস নে ।'

কিন্তু এম্বলে বলে রাখা ভালো, জর্ম'নিতে কোনো ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে ।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে । এস্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা ?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্রোহ খেলে গেল । তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে আমরা পেশীছেছিলুম এই পশ্চাতিতেই—ধাপে ধাপে ! কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না । তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্ম'নিতে । তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পুর্বেই । আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে ক'রে গোরীদান !

এ পৃথিবীতে নতুন কিছুই নেই ।

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জবর একথানা ব্রেকফাস্ট। শূধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠে বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একথানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-মেষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগৎ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি-চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সময় পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ)। ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তারপর খাবেন গ্র্যান্ডা গ্র্যান্ডা দুটো আন্ডা ফ্রাই (আকারে এদেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনো বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরো খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্স!

ফরাসী-জার্মান ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চার বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জার্মান করে গুরুভোজন।

রাতিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জার্মান খায় অত্যুপ। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠান্ডা, শূধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইরই কান্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সব-কিছুই ঠান্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবার খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যে রকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি, এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনো ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনোটা থেকে টমাটো সস, কোনোটা থেকে মাছের পেপ্ট। শূন্যেছি, দেখিনি, মাংসের পেপ্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া ক'রো না, যত পায় খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একথানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্‌স্‌ মিটেল গেশেফ্ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারো বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনো কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্‌ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইন্ডেক স্কচ্‌ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—খাক না বেচারীরা প্রাণ ভরে। এই যে সেভন ডেজ ওয়াশার—তিনদিনের ভেঙ্কবার্জ—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুটি' করো। হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়।

এ তথ্যটি জর্ম'নরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ার থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাব'টি ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানানার উপায় নেই। গৃহী-জ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গৃহী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কার্যদামাফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম মাত্র দু'দিনের তরে। কোনো একটা পাবে শাবার ফুরসৎ পৰ্ব'ন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুদ্ধো, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিস্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনো জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখেছিলুম তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যান্সি! এসব জিনিস তারা আমেরিকান "এড্" ছাড়াই তৈরী করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজরাজদারী ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেসকল সউদী আরব, কুয়েৎ, বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়,—কিন্তু আর পাঁচজনের সম্বলতা কি রকম ছিল অতথানি আমি জানি নে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরণে মোটামুটি ভালো সন্টাই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনো বুদ্ধি নাৎসি যুদ্ধের গেষ্টাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সদর বদলে যায়। এ তথ্যটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচ্চাটন মস্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যৎবাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুদ্ধোলে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'এস্তের মোটর গাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের ক'জন সত্যি সত্যি মোটর পুুষতে পারে জানো? শতকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজ-রাজদারী ধনী ছিলেন ষাধবাক্ষের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাঁড়ি বেড়াচ্ছেন ষাবুদ্রা, এদের ক'জন মোটরের পুরো দাম সেরদ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১০

শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্সট্রুমেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন স্ন্যবার ঈরে ফেরহেস্তানিসে—যে আর লিভিং বিজন্ড বেরার মীনস্—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।’

আমি বললুম, ‘সে কথা বললে চলবে কেন? কটুর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।’

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, ‘কে বলেছে ধনদৌলত বাড়িনি। বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনার খরচ করছে অনেক বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিন্মাদ।’

আমি বললুম, ‘তাতেই বা কি ক্ষয়না হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিন্মাদও তো সুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।’

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, ‘জী লেবেন স্ন্যবার ঈরে ফেরহেস্তানিসে, জী লেবেন স্ন্যবার ঈরে ফেরহেস্তানিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।’

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি আর সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলাম, সে এতক্ষণ হাঁ-না কিছুই বলে নি। এবারে নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘বুড়োর কথা একে-বারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দৃ’হাতে। এমন কি, যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।’

আমি বললুম, ‘যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে? তারপর বললুম, ‘ওঃ! বুঝেছি! ধার করে।’

বললে, ‘ঠিক ধার করে নয়। কারণ, ধার করলে সে পরস্যা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্লোক করে। কিন্তু ইন্সট্রুমেন্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।’

ইতিমধ্যেই সেই ফিস্‌ফিস্‌-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, ‘টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোজা টাকার কথা বলছি, ইন্সট্রুমেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্লোক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইন্সট্রুমেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্লোক করা যায় না।’

আমি বুড়োকে বললুম, ‘আপনি সব-কিছু বড় বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।’

বুড়ো বললে, ‘আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনাওয়ারও তো

ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিলেছেন, “এ সন্ধান বৈশীদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!” পড়েছি কাগজে?”

আমি বললাম, “অতঃপর বুঝি নে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হল বড় কথা।” তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তাকে শুধোলাম, “তোমাদের শহরের মাধ্যমানে যে হাজার খানেক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার্ ফর সেল দেখলাম, সেগুলো কি ইন্সটলমেন্টে কেনা ছিল, আর কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?”

বললে, “নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।” বড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, “তোমাকে বলিনি, জী লেবেন ম্যাবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা!”

* * *

সবুদ্বিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানি নে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনছি, সেইটেই রিপোর্ট করলাম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব ‘পাবে’ শম্পেটোর, কেইনস্, শাখ্‌ট্ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দেশের মত খদ্দার তবল।

হাসির অ-আ, ক-খ

॥ এক ॥

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির ‘চুটিকলা’ (উইট্, হিউমার, এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সংকলন বেরোয়, সেগুলো বৈশী ভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াশিংটনের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইস্‌লারের মত চিত্রকর নন। আবার একথাও অতি সত্য যে, বৈশী ভাগ চুটিকলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প বলে, কারো কথার উত্তরে হাসির-জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনো কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মদ্রুদ্বী তাকে ‘বিশ্ব-বকাটে’ পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মায়ফৎ থু গুহিগী তার কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে, এবং হয়তো বা তাঁরই মত মদ্রুদ্বীকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটিকলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরেফিরে এ-দেশ ও-দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরষ ওরই মত যে লোক-সঙ্গীত মানুষের মত মত ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও নির্মাতার সম্মান

কোনো কোনো স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, ক'রে কোনো লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এই সব হাসির চুটিকিলার সৃষ্টিকর্তা প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদু-হাস্য, অট্টহাস্য, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারো একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন, আইনস্টাইনের গৃহিণী ছিলেন অতিশয় সরলা নারী। কী-এক পরব উপলক্ষ্যে, স্বামী অসুস্থ বলে, তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণদর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তব্যাবৃত্তিকে তিনি শূন্যে ধাক্কা দিয়ে, 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তব্যাবৃত্তি বিগলিত হয়ে স্তম্ভিত মৃদুহাস্য হেসে মৃদুস্বরীতে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এইসব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর থিয়োরি সব সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফপানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমার স্বামী তো এসব টোকেন পূরনো খামের উত্তো দিকে।'।

এ গল্প বানানোর ভিতর কারো কোনো কেরদানী নেই।

এই রকম দু'নিয়ার যত রকমের হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণতঃ এরকম সংকলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সংকলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশীর ভাগ চুটিকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সংকলন করবে সাধারণ জন—এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডক্স। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।' এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শক্তি মস্তুর জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শক্তিকে তো মস্তুর মূল্য বিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনো কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, 'আ বেৎসে ডেস লাথেনস',—হাসির অ-আ ক-খ। (এক ওয়াই জেড—যদি কখনো বেরোয়, তবে 'দেশের পাঠকে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমন্ট ফন্ রাডেকি। ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এ'র জন্ম ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জি-

১ এ'র সরল হৃদয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারাস্তরে সে-কথা হবে।

সীমারিং পাস করেন জর্ম'নিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এজিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বালি'নে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকর এবং সাহিত্যিকরূপে। উত্তম ইংরেজী জানেন। জি. কে. চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্ম'ন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্ম'নিতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্ম'নে তর্জমা করার ফলে।

এ'র জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণায় প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তার প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর স্মিতহাস্য।

জর্ম'ন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিকস্ নথাগ্রন্থপ'ণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এ'র সংকলন হাসির 'অ-আ, ক-থ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট'। ব্যালাকতাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনো যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দৃ'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এ'র পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মৃদুশব্দ। আমার বিশ্বাস গোটা সংকলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনো লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সংকলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সংকলনের সংকলন বিপদসংকুল। তবে চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গদ্যগীতা যখন 'অরুণ্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনো কোনো মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কন'ড্ বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নতুন অফিসার। রাষ্ট্রাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন - শর্কলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিস্তারিত মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কন'ড্ বীফ।'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একাটি রা-ও কাড়লে না। ছাঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন এক কক'নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন।'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভুতের দরকার হয় না হৃদয়'।' আশু না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাস্য-গবেষ্ট ছিলেন, সেটা

হোমস্পিয়ারসীদের জানা। এটি প্রধানতঃ তাঁদের জন্যই। আসছে বার নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পদার্থোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সংকলন থেকেই নেওয়া।

॥ দুই ॥

সিগিসমুন্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্যরস সংকলনের পদুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্ম'নের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্ম'নদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্ম'নরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা খেরকম হস্ত না-হস্ত গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পদ্ব'বঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরাপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিও যখন ন্যূরনবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে, তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ কেলিকে নিজের চুটকিলাটি বলেন :

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইন্ডিয়ট। দু'জন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নতুন এক সাম্রাজ্যজয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দু'জন হলে ডুয়েট। তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বার বার সপ্রমাণ হয়েছে।)

একজন জর্ম'ন, পাণ্ডিত্য। দু'জন জর্ম'ন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিওর গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যাই হোক, রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

‘ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষ্যই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একমাত্র মানুষ্যই হাসতে জানে। মানুষ্যের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের দৃপাশ এবং ভূঁড়ি দুলিয়ে হাসায়।

১ রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, ‘জার্মান পাণ্ডিত্যের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বাটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শৃঙ্খলা তাহার মধ্যে নাই।’ এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ‘জার্মান’ লিখতেন—বহিও এখানে ‘জার্মান’ লিখেছেন। হালে জনৈক পত্রলেখক ‘জার্মান’ লেখার জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে একখাটি বলতে হল। ‘জার্মান’ লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে ?

প্রশ্ন শ্রুতিয়ে উত্তরে রাডেকিই বলছেন, 'সব, সব কিছুই...। যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায়ই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্ব-সংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অধেক পশু থেকে এবং অধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর সৃষ্টিকর্তার মূখের ফু' দিয়ে তৈরি মানুষ—তার হাসি এবং কান্না উভয়ের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার খেলে মানুষ কাঁদে—এ কান্না অতি সাধারণ সরল,—আর গভীর মনো-বেদনায় যখন মানুষ কাঁদে তখন তার সে-রোদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে। হাসির বেলাও তাই। মানুষ যখন ফুঁর্তিতে থাকে তখন সে হাসে কিন্তু কৌতুকরসের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ অকস্মাৎ যে অট্টহাস্য করে ওঠে সে হাসি ভিন্ন। কিন্তু ফুঁর্তিতে থাকলেই যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা নয়। সেখানে মানুষ হাসে সে ফুঁর্তিতে আছে বলে, আর এখানে তার উল্টোটা—এখানে মানুষ হেসে ফুঁর্তি পায়।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ এখানে রাডেকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি বলছেন, 'সুখে (অর্থাৎ যখন ফুঁর্তিতে আনন্দে আরামে—লেখক) আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটি আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।' এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি তত্ত্বও যোগ দিয়েছেন—'আমি বোধ করি, যে কারণ-ভেদে একই ঈশ্বরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য ও কৌতুক-হাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।' ২

আর বর্তমান লেখক শ্রদ্ধায় তাহলে বেদনাজনিত অট্টহাস্যও কি ঐ একই পর্যায়ে পড়বে? কিংবা দেখবো, আকাশের জল, চোখের জল আর গোলাপের জল একই কারণে ঝরেছে?

মূল কথায় ফিরে যাই। রাডেকি বলেছেন, 'একদা সব' প্রকারের কাব্যই

২ পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড ৬১৭। পঞ্চভূত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তারপর ১৩২৮ এবং ১৩৩৩-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে "আমরা হাসি কেন?" এই নিয়ে বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় আলোচনা করেন। তার অনুলেখন আমার কাছে ছিল, কিন্তু বৃদ্ধাণ্ড্যবশতঃ অন্যান্য আরো বহু অনুলেখনের সঙ্গে এটিও কাবুল বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। সে-সভায় ক্রিষ্ণমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা হয়তো ঐ সময়-কাল "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় এর অনুলেখন পাওয়া বাবে।

ইতিমধ্যে জনৈক লেখক একটি অত্যন্তম প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন, হাস্যের কারণ সম্বন্ধে আঁরি বের্গস ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বের্গস'র পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

আবৃত্তি করা হত কিংবা গাওয়া হত। এর বহু পরে মানুষ এগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলো। এবং এরও পরে ছাপাখানায় সে কৃষ্ণমৃত্যু প্রাপ্ত হল (আমরা বলবো মা কালী কালির চরণাশ্রয় পেলে) এবং আজ সে শব্দ মানুষের চিন্তাকাশেই জাগরিত হতে পারে। একমাত্র কৌতুকরসই এখনো মূখে মূখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানায় সে পণ্ডিতপ্রাপ্ত হয় না। এ বেন কলকল উচ্চহাস্যে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ধরণী—মাঝে মাঝে এক পাশে গুটিকয়েক পাথরের মাঝখানে যে সে শ্রবণ করে ঘুমিয়ে পড়ে সেই হল তার ছাপায় প্রকাশিত রূপ, কিন্তু সে অতি সামান্য এবং তার উদ্দাম গতিবেগকে কণামাত্র ব্যাহত করে না। এবং অন্য সর্ব কাব্যকলা যেমন যেমন ছাপার গোরস্তানে নীরব হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক-কথিকা এগুলো নিজের ভিতর সংহরণ করে তাদের পুনর্জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। তাই কৌতুক-কথিকা চুটিকিলা, কখনো বা কথক ঠাকুরের রূপকথা, কখনো বা (বিষ্ণু শর্মার) উপকথা, দশ-ছত্রে উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা এমন কি রোমাঞ্চকর নাট্য। সংবাদপত্রের শক্তি এ ধরে এবং কয়েকটি শব্দের সাহায্যে যন্ত্রতন্ত্র যখন তখন এক লহমায় নাট্যশালার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। সে একাধারে রাজদূত, লোকদূত, চারণ এবং নাট্যকার। কৌতুক-কথিকা হাস্যগাথা রচনা পেশাদারের একচেটিয়া নয়, বরঞ্চ বলতে হবে এটি পাণ্ডজন্য রসসৃষ্টি। “হাস্যরস-লেখক বলতে যা বোঝায় তাঁদের মত একটি ছত্র না লিখেও মানুষ তার জীবনে হাস্যরস সঞ্চার করতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে—” জ্যাঁ পল বলেন।’

লোকমুখে এই হাস্যরস সৃষ্টির ঐতিহ্য বেঁচে রইল কি করে?

রার্ডেক বলেন, ‘সমাজের বাস্তব রূপ নিত্য প্রয়োজনীয়। স্মৃতি বাক্য দ্বারা মানুষ আপন মনের চিন্তা হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার লীলাভূমি—রাজনৈতিক সভা-সমিতি, থিয়েটার, বারোয়ারী পুজো ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আশ্রয়িতা প্রকাশ পায় তখনই যখন রামাশ্যামা সবাই সমান অংশীদার হয়ে হাস্যকলার সৃষ্টি করে (এখানে বর্তমান লেখকের টীকা—শব্দ তাই নয়, চুটিকিলা-ভূমিতে গণতন্ত্রের এমনই কটরতা যে অতিসাধারণ জ্ঞানও আকছারই ছোট একটি টিপসনই কেটে গেরেমভারী মাতঙ্গর-জনকে ডিগবাজী খাইয়ে দেয়)। তারপর রার্ডেক এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে :—‘হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।’

আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এখানে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠক-খানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রামাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হস্তদস্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ঢুকলে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

এ বড় অস্বস্তি সমস্যা। দঃখ-বেদনা আমরা দেখতে চাই নে, কিন্তু কাব্যে

ঠিক সেই জিনিসটাই আমরা খুঁজি।

কোটুক-হাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও ‘পঞ্চভূতে’ লিখেছেন, ‘রামায়ণের সীতা বিষ্মোকে রামের দৃষ্ণে আমরা দৃষ্ণিত হই, ওথেলোর অমূলক অসুয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাপরিবন্ধ উন্মাদ লিররের মর্ম্মবাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দৃষ্ণপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত।’ এতখানি বলার পর রবীন্দ্রনাথ সূত্র দিচ্ছেন ‘বরণ দৃষ্ণের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সম্বাদর করি।’ আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে তিনি যে কারণ দিচ্ছেন—‘কারণ, দৃষ্ণানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে’—সেখানে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

আজ যে বাঙলা দেশে রাজশেখরের এত খ্যাতি তার কারণ ‘গভলিকা’ ‘কজ্জলী’ নয়—তার কারণ তাঁর ‘চলন্তিকা’, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, হয়তো বা তাঁর প্রবন্ধাবলী। যদিও আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হাস্যরস অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করার মত—তা সে শ্রেষ্ঠতর কিংবা নিকৃষ্টতরই হক—লেখন বাঙলা দেশে আছে। চলন্তিকার চেয়ে ভালো অভিধান ইংরাজীতে আছে কিন্তু হাস্যরসিক রাজশেখর জেরম কে জেরম, উড-হাউসের বহু বহু উর্ধ্ব।

তা সে থাক্। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবং আমরাও স্বীকার করলাম, ‘দৃষ্ণের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সম্বাদর করি’—তাই যদি হয় তবে ফিল্মওয়ালারা কেন বলেন ট্রাজেডি অচল, দর্শক কমেডি দেখতে চায় এবং শুধু এ-দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি অসুখবিস্তর তাই!

তার কারণ বোধ হয় এক হতে পারে যে শিশুর রূপকথা কখনো ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয় না, এবং যেহেতুক সিনেমা-দেখানেওয়ালারা গ্রিন বক্স বয়সেও শিশু-মন ধরেন তাই তাঁরা ট্রাজেডি পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে সে আলোচনা কিঞ্চিৎ অবাস্তব।

* * * *

রাজ্যিক তাঁর অবতরণিকায় আরো অনেক মধুর এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। এবং শেষ করেছেন এই বলে, ‘হাস্যকথিকার (চুটকিলার) প্রাণরস কিন্তু ঐ বস্তু শব্দের মাধ্যমে বলাতে—ছাপাখানায় মারফতে নয়।’ তুলনা দিয়ে বলেছেন, ‘প্রথমটা যেন উজ্জ্বল প্রাণরসে সঞ্চারিত উদ্ভূত প্রজ্ঞাপতি—ছাপাখানার মাল যেন পিন দিয়ে বেঁধা কাঁচের বাস্কের ভিতর মৃত প্রজ্ঞাপতি।’

রাজ্যিক অবতরণিকা শেষ করেছেন তাই এই বলে, ‘আমি হালে একটি চমৎকার রসিকতার গল্প শুনতে পেলাম। তদুপেই সেটি লিখে নিলাম। পরে সেটি ছাপায় প্রকাশিত হল। যিনি সেই গল্পটি বলেছিলেন সে কথক সেটি পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বেশ হয়েছে—কিন্তু স্বরলিপি কই?’

অর্থাৎ এ যেন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনাল। স্বামী-জীর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি নাকি এরই কাছাকাছি অন্য একটি তুলনা

দিয়েছেন। অনুবাদ যেন কাশ্মিরী শালের উল্টো পিঠ। ডিজাইনটা বোঝা যায় কিন্তু অন্য সব কিছু লোপ পায়।

হাসি-কান্না

তরুণ লেখককে সাবধান করে দি, তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অটেল করুণ রস। আর বাঙালীর হৃদয়ের উপর যদি ‘জগরনটের’ মত তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেংলে, নিংড়ে, একদম সম্ভ্রম তত্ত্বের চেয়েও ততো করে পরিবেশন করেন। দেবদাস রক্তবর্মী করছে আর গাড়োয়ানকে বার বার শূধোচ্ছে আর কত বাকি, কিংবা অরক্ষণীয়ার ‘সাজ’ দেখে বাচ্চা বলছে, ‘পিসিমা সং সেজেছে’—ছাড়ুন এ-রকম কিছু মাল, আর দেখতে হবে না, আপনি আমাদের ডিহি শ্রীরামপুর সেকেন্ড বাইলেন কম্বল বিতরণী সভা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে ‘ভাল্লা’ মাদ্রা কালীবাড়ি প্রসাদ-বিতরণী সমিতি হয়ে নাক বরাবর পেঁছে যাবেন পশ্চিমী, আকাধেমি প্রাইজে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আহা, বাঙালী বস্ত্রই কোমল হৃদয়। শূন্যে, এক বাঙালী ছোকরালন্ডনে বাসকালীন তিনটি বছর মাত্র অবশ্য-কর্তব্য ব্যারিস্টারি ডিনারটি খাবার জন্য—ভুল বললুম, খাবার জন্য নয়, নিছক এটেঁড করার জন্য—হস্টেল থেকে বেরতো; ফিরে এসে ফের ধূতি গেঁজি পরে লেপের তলায় ঢুকে দেবদাস পড়তো আর তার তলায় যতখানি সম্ভব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে কুমড়া গড়াগড়ি দিত।

আল্লা রসুলের কসম খেয়ে আমি মুসলমানের ব্যাটা বাঙালী মুসলমান ফের বলবো, রাজশেখরের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কারণ তাঁর ‘গভলিকা’ ‘কঞ্জলী’ নয়। তাঁর খ্যাতির কারণ ‘চলন্তিকা’ এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। অথচ চলন্তিকার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় অভিধান ইংরিজী জর্মনে আছে, ইংরিজীতে গ্রীক কাব্যের অনুবাদ করে একাধিক লেখক রাজশেখরকে আগের থেকেই ছাড়িয়ে বসে আছেন। অথচ হাস্যরসে রাজশেখরের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে তুলনা করি কার সঙ্গে। সেরভাস্তেস, মালিয়ের, জেরম, উডহাউস কেউই কাছে দাঁড়াতে পারেন না। গ্রীক সাহিত্যের কথা আর তুলছি নে, সেখানে আছে ব্যঙ্গ, সেটার,—বিশুদ্ধ হাস্যরস নয় এবং সেগুলোও রাজশেখরের কাছে আসতে পারে না। এটা ডবল কসম খেয়ে বলাই।

বাঙলা কথা শুনুন। আপনাকে একটা সোনার মোহর দিলে আপনি ধূশী হবেন, কিন্তু ভুলে যাবেন দুদিন বাবেই। যদিও কেউ যদি পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে শোধ না করে তবে সে কলিজার ঘা দগদগ করবে বহু-বহুকাল অবাধি। শারীরিক স্তরে মেবে বলতে পারি, আপনাকে কেউ সুড়ঙ্গাড়ি দিয়ে হাসাতে চাইলে আপনি বিরক্ত হবেন কিন্তু কেউ যদি শরীরে পিন ফোটায় তবে মার-মুখো হবেন।

আরেকটি কথা ; করুণ রস বন্ধুতে হলে বিদ্যোদ্ভাসিত বিশেষ প্রয়োজন নেই । হাস্যরসের বেলা ভাষাজ্ঞান (বিশেষ করে ‘পান্’ বোধবার বেলা) ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, অনেক-কিছুই জানতে হয় । যেমন মনে করুন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই ছোট হাস্যরসের চুটকিলাটি ।

একটি ছোট্ট মেয়ে ঠিকমত হাটিতে পারছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কড়ে আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন, সে যেন ওটা ধরে সোজা হয়ে চলে । মেয়েটি খপ করে তাঁর গোটা হাত ধরে নিলে । রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ‘দেখলে, মেয়েকে একটি আঙুল দিয়েছি কিনা, সে তখুঁনিই পাণিগ্রহণ করতে চায় ।’ এখানে পাণিগ্রহণের অর্থ যদি কেউ না জানে তবে সে বন্ধুতেই পারবে না, এর রস কোথায় ।

এরই পিঠ-পিঠ একটি মার্কিন রসিকতা আছে, কিন্তু অতখানি সূক্ষ্ম নয় । তারা বলে, ‘গিভ এ ডেম এন ইণ্ড...এ্যাণ্ড শী উয়ান্টস টু বী এ রুলার ।’ ‘মেয়েছেলেকে এক ইঞ্চি (লাই) দিয়েছ, কি সে আমি রুলার হতে চায় ।’ এখানে রুলারের যে দূটো অর্থ আছে সে তব্ব যদি প্রোতার জানা না থাকে তবে সব গুড় বরবাদ ।

এদেশে উত্তম ক্লাস রসিকতা করে গেছেন আরেকটি ব্যক্তি । তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পূণ্যশ্লোক, সায়ংসন্ধ্যা স্মরণীয় । তিনি তাঁর ঠাট্টা-মস্করা ছদ্মনাম ‘কস্যচিৎ ভাইপোস্য’ নিয়ে করেছেন বলে অনেকেই এ-তব্ব জানেন না । তাঁর একটি গল্প অতুলনীয়—দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে নেই । মোটামুটি যা বলেছেন তা এই, অমুককে আমি নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়ার পর শুনিতে পাইলাম অন্য অমুককে ইহারপূর্বেই নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়া হইয়া গিয়াছে । আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম—কারণ আকাশে একদিকে দুইটি চাঁদ কখনই দেখা যায় না । এক্ষণে এই উপাধি লইয়া দুইজনে হাতাহাতি গদাগদীত হউক তাহা আমি চাহি না । বিদ্যোদ্ভাসিত অবশ্য দুইজনই একই প্রকার (অর্থাৎ দুটোই আস্ত পঠা—লেখক) । অতএব, স্থির করিয়াছি আকাশের চাঁদটি লইয়া, সেইটিকে দুই ভাগ করিয়া, দুইজনকে দুইটি অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিব ।

অর্ধচন্দ্র এখানে কেউ যদি শব্দ ‘ক্রেজন্ট্ মুন’ অর্থে নেন তা হলেই তো চিহ্নিত !

এ-পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত হই-চই হয়েছে—অর্থাৎ ধর্ম যে রকম সম্মান পেয়েছে সে রকম গালাগাল খেয়েছেও সে বিস্তর—অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ে অতখানি হয়েছে বলে জানি নে । কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকখানি খুঁটি-নাটি না জানলে তাদের নিয়ে একে অন্যকে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে সেগুলো ঠিকমত রসিয়ে রসিয়ে চাখা যায় না ।

প্রথম একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি ।

‘মোল্লার ষোড় মসজিদ তক্ ।’ শ্রীমন্ত সূরীল দে এটিকে ‘বাঘে মোঘে (রাজার রাজার) বৃন্দ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়’, এরই সমার্থে ধরেছেন । শ্রীমন্ত দে তাঁর ‘বাংলা প্রবাদ’ গ্রন্থখানা রচনা করে আমাদের যে কী উপকার

সাধন করেছেন সেটি অবর্ণনীয় ; কাজেই আমি যদি এখানে আমার জানা অন্য অর্থটি নিবেদন করি তবে তাঁর পার্শ্ভত্য-জ্যোতি কিছুমান স্থান হবে না ।

মোম্বাকে কড়া কথা শোনালে বা তার উপর চোটপাট করলে সে তো আর জমিদার নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদ নেবে । সে বেচারী ছুটে যায় মসজিদে । সেখানে গিয়ে আল্লার কাছে সে তার ফারিয়াদ জানায় ও অপরাধীর সাজা কামনা করে । কিন্তু কথায় বলে, ‘শকুনির শাপে কি গরু মরে’ (সুশীল দে, ৭৮১১) — অপরাধীর কিছুই হয় না । — মোম্বা কথা তা হলে দাঁড়ায়, মোম্বার আর কী মরুদ ! সে ঐ মসজিদ তক্ ছুটে গিয়ে চেম্বারোম্যান্ট মাত্রই করতে জানে ; তাতে কারো ক্ষয়ক্ষতি হয় না ।

ঠিক ঐ রকম শাস্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়াঝাটি জানা না থাকলে নিচেরটা বুঝবেন কি করে ?

(শাস্ত-বৈষ্ণব উভয়ের কাছে সর্বিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা করতঃ)

বৈষ্ণব : আচ্ছা, ভাই তোমরা তো বলো, ‘যা দেবী সব ভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা’ — তবে পঠাটাকে যখন বলি দাও তখন তার ভিতরের ‘শান্তটাকে’ কি বলি দেওয়া হয় না ? লক্ষ্য করোনি পঠার কী অসাধারণ প্রাণশক্তি — লক্ষ্যবস্তু !

শাস্ত : না, ভাই, তা নয় । পঠাকে যখন ধরে বেঁধে হাড়িকাঠে পুঁদুরি তখন সে নিজীব । তখন আর তার শক্তি কই ? আছে শুদ্ধ চৈতন্য । তখন শুদ্ধ ওইটুকুকেই বলি দি ।

এ বছরে প্রতিটি লেখার সময় স্বামীজীর কথা মনে পড়ে । তিনি যে শুদ্ধকান্ত অরসিকজন ছিলেন না সেইটে এই সুবাদে মনে পড়ল । নিম্নের রসিকতাটি দ্বিষং দীর্ঘ কিন্তু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘতর শুনতেও কারো আপত্তি থাকার কথা নয় ।

(মুসলমানদের শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গোস্তাকীর বেহদ্ মারফ চেয়ে)

‘লক্ষ্মো শহরে মহরমের বড় ধুম । বড় মসজিদ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে । বেসুয়ার লোকের সমাগম । হিন্দু-মুসলমান, কেরানী যাহুদী ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতির লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে । লক্ষ্মো শীয়াদের রাজধানী । আজ হজরত হাসান-হোসেনের নামে আত-নাদ গগন স্পর্শ করছে — সে ছাতি-ফাটানো মসিয়ার কাতরানি কার না হৃদয় ভেদ করে ? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে । এই দশকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত্র তামাশা দেখতে হাজির । ঠাকুর সাহেবদের — যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে — বিদ্যাহুঁনে ভরেবচ ।

সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফগাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লক্ষরী জবানের পুষ্পবন্দি, আবা কাবা চুস্ত পারজামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ চঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও

পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিন্ধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াঙ্গান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুররয় তো ফাটক পার হয়ে মসজিদের মধ্যে প্রবেশোদ্ভাত, এমন সমস্ত সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্ব মদুর্দ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার তবে ভিতরে যেতে পাবে। মর্তি'টি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মর্তি'। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসান-হোসেনকে মেরে ফেলে; তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মর্তি' পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝালি রাম—ঠাকুররয় গললম্বীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মর্তি'র পদতলে কুমড়ো-গড়াগাড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—“ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি? অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভালা বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিভক্ রোবত। (ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে !!)’।”

রস তো পেলেনই, কিন্তু পাঠক স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিকটি লক্ষ্য করুন।

রসিকতা

হাসতে হয়, না ছেসে উপায় নেই। এমন কি যারা ‘হাতুড়ি আর কাস্তুর’ নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণ খুলে নয়, কিংবা ‘পাবে’ বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তুর্ণণে টাপেটোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-স্ববনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মদুখে মদুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিষ্ট আরেক কম্যুনিষ্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, ‘জানিস ভাই “প্রাভদা” কাগজ সব চেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।’

দ্বিতীয় কম্যুনিষ্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) ‘পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?’

১ বেস্‌মার = অগদর্ভিত; আদমশ্‌মারী তুলনীয়। মর্সিয়া = শোকগীতি। কাফগাফের উচ্চারণ = কাফ আরবী বর্ণমালার অক্ষর। আরব ইহুদী ছাড়া অন্যের পক্ষে উচ্চারণ কঠিন। গাফ উচ্চারণ সহজ। তবে কাফ-গাফ সংযুক্তভাবে সমষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়। জবান = ভাষা। আবা কাবা = ঝোলা জামা। চুস্ত = টাইট। তাজ মোড়াসা = বাঁধা তৈরী পাগড়ি। শহরপসন্দ = শহরের সকলেই যে বস্তু পছন্দ করে। জমামরদ = জওয়ান মর্দ। ইয়েজিদ = আজকাল। এজিদই লেখা হয়, কিন্তু ইয়েজিদ মূল উচ্চারণের অনেক নিকটবর্তী।

প্রথম কন্ট্রানিস্ট : ‘কুড়ি বছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।’

‘নির্বাসন’ না ‘উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যান্ড হলিডে’ আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ চীনে বুদ্ধি মানুষ মৃত্যু বন্দ্য করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জার্মানিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জার্মান আরেক জার্মানকে শব্দধোলে, ‘তুই নাকি ভাই, ডেন্টিস্টি পড়া ছেড়ে দিলেইস ? কেন ?’

‘কি আর হবে ? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে ? কেউ যে মৃত্যু খুলতে আরো রাজী হয় না।’

তা নয়। লোকে মৃত্যু খোলে। কারণ যে কর্তব্যাক্তির রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাংলির উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন ধরনের রসিকতা ‘হারাম’ বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন বেশে, শুনিয়েছি, নেফা অঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধা হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই এগুলো সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে এমনই সচেতন যে এ নিয়ে মশকরা করে তাই সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নতুন অক্টোবর রেভলুশন অধ্যাকার কর্তব্যাক্তির পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলাশ্চ-রুম্যানিয়ার কাস্ট-রসিকেরা বলে, ‘সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তুভ।’

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরো তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মশ্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সঙ্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মশ্কার উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের বেধা। একজন আরেকজনকে শব্দধোলে, ‘কোথায় চললি কমরেড ?’

‘তুই যদি আমার পিছদ না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কক্সসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।’

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে ?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপাতির সাথে রসকোলেতে মত্ত। হৃৎকার দিয়ে স্বামী বললে, ‘এই বুদ্ধি প্রেম করার সময় ! ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।’

সত্যি তো। প্রেম ভো আর পাঠিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর

নিতি-নিতি মেলে না ।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে ।

গৃহবটন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ক্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না ? তা আর এমন কি ? আমার উপদেশ নিন । স্ত্রী বদল করুন । ঢের কম হাজিরাম পাবেন । ক্যাট পাওয়া কি চাটখানি কথা !'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টিচার শ্রুতলেন, 'লেলিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছো ?'

'আজ্ঞে কোথাও না ।'

'কেন ?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে । আমরা থাকি মধ্য-খানে । আমাদের তো দেয়াল নেই ।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বস্তুতা দিচ্ছেন, ১৯৪৭ এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়িতে পেরেছি ।

১৯৪৭ এ বছরে দুশ' গুণ—দাঁড়ান, কি হল ? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিও অ্যাসিস্টেন্ট, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি ।'

তবে কোনো কোনো বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে । এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো । আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত । এখন সে দুর্দিন গেছে । এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শাট'টা দাও তো । আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও ।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মদ্রলকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরো পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপঞ্চাৎ বিবেচনা না করে বাংলাে দেয় কিভাবে কর্ম'গুলো সুদৃষ্ট-রূপে করতে হয় । ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে । সেটা পরের পদক্ষেপেও সংক্রামিত হয় । হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সকলকে হুস্তায় দু দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারম্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মরবে । তার চেয়ে আপিসের কলম পেয়া ঢের ভালো ।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নতুন ধল-দাসত্ব ।]

কম্যুনিষ্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোয়বেলা —এদেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি । এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী বরদাস্ত করা হয় না ।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওয়ালা ক্যাটে ক্যাটে খুঁটা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে,

‘কমরেড, অব্থা ভয় পাবেন না। আমি শূদ্ধ বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।’ কিংবা,

‘কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।’ কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, ‘আমাদের স্বর্গস্থ স্মৃতিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।’ আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দৃজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবদন করছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দৃনীতি, বড়কর্তাদের বিলাসবাসন (হালে চীনও খুশ্চককে গালাগাল দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দূখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন-চিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপে দৃনীতি সহ্য করতে পারে না তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, ‘তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?’

দ্বিতীয় কয়েদী, ‘কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।’ কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে ‘পাগল’ বলার অপধাখে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কম্যুনি কথায় কথায় বললে, ‘আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বারদের জন্য কাজ করতে।’ সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, ‘বড় আনন্দের কথা। তা, আপনি কি কাজ করেন?’ ‘আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।’

কিংবা,

চেকোস্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, ‘রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।’ রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, ‘সবাই? সবাই?’

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর : ‘এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।’

‘আমরা “মশাইরা” নই, আমরা কমরেড।’

‘মশকরা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।’

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টোপোটোপে নিভাস্ত

আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

‘তিন বৃক্ষ পার্কে’র বেষ্টিতে চূপচাপ বসে। তার মধ্যে বৃক্ষজনা ওয়াক্ বৃক্ষ ওয়াক্ বৃক্ষ বলে খুঁখু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, ‘দয়া করে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।’

ইংরিজীতে বলে, ‘নীরবতা হিরময়।’

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরাপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নিৰ্বাসন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও ‘অস্তরে অস্তরে অস্তরীণ’ হয়ে থাকে।

‘চতুর পোলিশ ইহুদি মর্থ’ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?’

‘নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।’ কিংবা,

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, ‘কমরেড লেডি, আপনি ফর্ম’ লিখেছেন, আপনার কোনো আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।’

‘তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।’

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় ‘বড় পাণ্ডাদের’ নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতারও বৃদ্ধি যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গোণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিও তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শৃঙ্খল বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি নেই তবু বৃদ্ধি-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপায়ে। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পলিসকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাধারণ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাধারণ বললেন, ‘কেনোডির অলংকারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাদা।’

নিকিতা বললেন, ‘না কই, যে তো।’

মাল্যপ্রাণ

যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে-সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন পূর্বে বাঙলার লেখা কয়েকখানি মুসলমানি কেতাব বা পদীখ হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফারসী, যদিও নায়ক-নারিকা কোনো কোনো মূল কাব্যে আরবদেশের—ফারসীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর,—আরবী কাব্যের মূল সুর দার্ঢ্য।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে সব কবি বাঙলায় এসব কাব্য ‘স্বাধীন অনুবাদ’ করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফারসী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন, এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিত্বের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেরোমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানি করতে হয় সে বাৎ বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কুছ কুছ ত্রিপদী-ভী-বগ্‌হার দিয়ে কবি-ধর্মের ইমান দূরন্ত রাখলেন।^১

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যারা বাংলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন, তাঁরা উত্তম ফারসী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানি করলেন না কেন ?

দর্শনের অনুশাসনে, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, যে উত্তর কোন দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না, সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাগপনিক ‘উত্তর’ এসেছে সে দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবাস্তুরে বলছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে স্বেচ্ছা বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রা হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে ‘বিদ্রোহ দমন করতে’—আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাংলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজত্বত বিনিময় করেছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনো লড়াই করেছে, কখনো আশ্রয় দিচ্ছে, এবং জনপ্রদীত যে, বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হারিফজকে বিস্তর সওয়াং পাঠিয়ে দাওয়াং করেছেন এমশে। অবশ্য নোপথে।

১. ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি।—সকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২০, ১২১ পৃষ্ঠা।

এখানেই হয়তো রহস্যঘরের গুপ্ত কুণ্ডিকা ।

স্বল্পপথে ইরান ভাষার কথাই ওঠে না । মাকথানে জোনপদর, দিল্লী, লাহোর, কান্দাহার, হিরাত কত না স্বাধীন রাজ্য ! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ । নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-ভূরানের ভাগ্যাম্বেষী যোদ্ধারা পর্বস্ত মেয়ে কেটে হয়তো দিল্লী অবাধি দু'একজন এসে পেঁছেছে, 'দিল্লী দর অন্ত' বরঞ্চ 'দিল্লী নজদীক মীশওদ' (দিল্লী কাছে এসে), কিন্তু 'বাঙলা দর অন্ত' শুধুই নয় 'দরান্তর অন্ত' ।

এদিকে বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফারসী নয়, ফারসী তাদের কোর্ট লেনগুইজ মাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয়—যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিদেশাগত নূতন কবি নূতন লেখক সে ভাণ্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফারসী দিনের পর দিন শুনিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে ?

দু-চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা । রামমোহন হীরু জানতেন, হরিনাথ যে না জানি ক'টা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন । অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আলিম-ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অপ্রাধ্ব (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনো প্রাধ্ব ছিল না) । এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া বারণ করতেন । কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ওটাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায় । তাই দৌলত কাজী, আলা-ওল, সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব ।^১ পূর্বেই বলেছি এঁরা ফারসী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন । কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই ।

(এর সঙ্গে আজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি । খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনো উটকো খবরের কাগজ

২ 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহাম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন । মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনো সম্মান বেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যত এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান । তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল বেশী । এবং ঠিক যে রকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায়, এবং শাস্ত্র ভাঙ্গে তারাই—রামমোহন বিদ্যা-সাগরের কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সৈয়দের ভাঙ্গা-গড়ার সাহস বেশী । হিন্দুর বৈক্য পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোতুজ্জা ।

থেকে আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ভূত করে আভ্যন্তরীণ ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী-ফারসী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নতুন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বর্ণিত-রবির বাঙলা 'বর্ণিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখেছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে—দু'চারটি 'আম্বা', 'আম্বা', 'ফজরের নামাজের' কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের বেশী আরবী-ফারসী শব্দ আলাল হুতোমে আছে—এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফারসী জাননে-ওলালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফারসী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফারসী জানেন না। এখানে অবশ্য মর্ডান কবিদের মত যারা মনে করেন, মত দু'বোধ্য লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংসা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না।)

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লভ', 'কলেজ' ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ' 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'সুদাটিং' 'শুদাটিং', 'হাসপাতাল' 'হাসপাতাল' একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুড়েছে এসে আরেক আপদ। ছেলে-ছোকরারা ফরাসী, জার্মান ভাষাতে ওকী-ব-হাল হয়ে উঠেছে, 'প্যারি' 'প্যারী' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পৰ্বশ দেখা দিচ্ছে,—'প্যাসিনে', 'পাশিনে' আরো কত কী?

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ মাত্রাধিক আরবী-ফারসী শব্দ বে-এজেরার ভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি বারি বা খুশী করেছিলেন, না কতক-গুলো সুপ্ত আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসান রাজা গাইলেন,

“মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মদুলমানী দিন।”

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে দেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে মদুলমানী ধর্মের খবর পে'ছিল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেলে, যেহেতু আমি যখন আঁখি মেলে চাইলাম তখনই মদুললোক ভুলোকের সৃষ্টি হল।' কটর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসান রাজা বলেছেন, 'দিলোকের চিন্তন মন্থন জগৎ তাহের অস্তিত্বের জন্য আমার চিন্ত ও পোর্শনের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'।

পদ্যরায় বলেছেন,

“আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমা হইতে প্রজগৎ, আমা হইতে রব।”

এখানে ‘রব’ আগুৱাজ এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী ‘রব’ শব্দের অর্থ ‘ভগবান’। হাসান রাজা বলতে চান, ‘আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তার স্বরাস্ত্র অস্তিত্বই হত না।’

॥ দুই ॥

টিকির কল্যাণে আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টিকি আসার পূর্বে আমরা ভাবতুম, আমরা রকে বসে বেহারী মূর্খের সঙ্গে যে উচ্চারণে হিন্দী কথা বলি, সেইটেই অতি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ, এবং ক্লাসে মাস্টার মশাই যে ইংরাজি উচ্চারণে টেনিসন, ওয়াড-সওয়ার্থ পড়েন সেই উচ্চারণই অক্ষরভেদে কেমব্রিজে চালা।

পৃথিবীর সব ‘আর্য’ ভাষা, এমন কি সেমিতি ভাষাতেও একটি ধর্মান কথায় কথায় আসে, কিন্তু বাঙলায় (এবং ওড়িয়া, আসামীতে) নেই। ইংরাজিতে ‘the’-র ‘ই’ উচ্চারণ; ফরাসীতে ‘le’-র ‘e’; জার্মানের ‘gegeben’-এর তৃতীয় ‘e’-উচ্চারণ, আরবী ফার্সী, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীতে ‘কলম’ শব্দে ‘ক’ এবং ‘ল’-এর মধ্যে, ‘ল’ এবং ‘ম’-এর মধ্যে যে উচ্চারণ আছে, সেটি বাঙলাতে নেই।

সোজা কথায় হিন্দীর ‘আমি’ বা ‘আমরা’ বলতে যে হম শব্দটি আছে তার ‘হ’ এবং ‘ম’-এর মাঝখানে যে ধ্বনিটি আছে সেটা আমাদের কেউ শুনেননি ‘অ’ এবং তাই লিখেছেন ‘হম’ এবং অধিকাংশই শুনেননি ‘আ’ এবং তাই লিখেছেন ‘হাম’। এ বদলে সচেতন হয়ে আমাদের অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন ‘হাম’। (উপস্থিত আমরা এই ধ্বনিটির নাম দিলাম ‘অপট স্বর’)।

বোলত কাজী, আলাওলের সামনে সব প্রথম এই ‘অপট ধ্বনি’ নিয়েই এল সমস্যা। কলম জবরদস্ত, মজা, মদিনা ধরনের অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দে আছে এই অপট ধ্বনিটি; এটাকে প্রকাশ করেন কোন্ চিহ্ন দিয়ে? ‘কলম’, না ‘কালাম’, না ‘কল্যাম’ (আজকে পূর্বেল্লিখিত ‘হাম’-এর মত)?

আলাওলরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন, এবং এটাও জানতেন যে সংস্কৃতে এ ধ্বনিটি আছে বটে, কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে ‘অ’ রূপে। যেমন সংস্কৃতে ‘কমল’ শব্দের ‘ক’ এবং ‘ম’-এর মাঝখানে আছে সেই ‘অপট স্বর’, কিন্তু বাঙালী সেই অপট ধ্বনির পরিবর্তে ‘কমল’ উচ্চারণ করে ‘অ’ দিয়ে, অর্থাৎ বাঙলা শব্দ ‘কমল’ উচ্চারণ করতে যে ‘অ’ উচ্চারণ করি সেই ‘অ’ দিয়ে।

তাই তাঁরা মনে মনে আশ্বেষা করলেন, সংস্কৃতির ‘কমল’ এবং আরবী-ফার্সীর ‘কলম’ যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনো পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা ‘কলম’ না লিখে ‘কালাম’ লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ ‘হাদিস’ না লিখে ‘হাদিস’ লেখেন, ‘বরকৎ’ না লিখে ‘বারাকৎ’ লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, হাদীস আ-কর-বদুত ‘কালাম’ নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে (সেটার অর্থ ‘বাণী’)

আব্দুল কালাম আজাদ-এর অর্থ ‘বাগীর পিতা, যিনি স্বাধীন’) সেটাতে এবং ‘লেখনীর’-তে (অর্থাৎ ‘কলম’-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যেত না।’

অবশ্য তাঁরা ‘ক্যাম’ (কলমের জন্য, এবং ‘কালাম’ বাগীর জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয় — এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিরেছিলেন, কিন্তু বাঙালী কি ভাবে ‘অ’ এবং ‘আ’ উচ্চারণের ভিতর পার্থক্য করে সে-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে ‘আলিফ’, ‘আয়েন’, বা ‘হে’ থাকলে সেখানে ‘আ’ ব্যবহার করেছেন — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই ‘আল্লা’ ‘অহমদ’ না লিখে লিখেছেন ‘আল্লা’, ‘আহমদ’; ‘আব্দুলে’র বদলে ‘আব্দুল’ এবং ‘হামিদে’র ‘হসেনে’র পরিবর্তে ‘হামিদ’ ‘হাসেন’।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত ‘দীন’ এবং ‘দীন’ উচ্চারণে, ‘কুল’ এবং ‘কুল’ উচ্চারণে আমরা কোনো পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙলাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্ববর্ণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী ‘ধম’ অর্থে ‘দীন’ শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে দিন-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত ‘নূর’ ‘রসুল’ না লিখে ‘নূর’ ‘রসুল’ লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটেকেই এক উচ্চারণ ‘শ’ অর্থাৎ ‘sh’-এর মত করে থাকি। শব্দ সংস্কৃতির বেলা এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে ইংরিজি s-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত ‘স’-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে, শ্রাবণ, প্রমুখ ইত্যাদিতে আমরা ‘শ’ উচ্চারণ না করে ‘স’, অর্থাৎ ‘sh’ না করে ‘s’ করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি ‘স’ দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পূর্ব বাঙলায় ‘ছ’ অক্ষর ‘স’-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) ‘ছ’ এসে ‘স’-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে তারই রীতিনীতি মেনে নিরেছিলেন। উদ্ভট বিধকূটে বানান লিখে নতুন নতুন ধনি আমদানির ব্যখ্যাগমন করেননি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভুলের ন্যূন আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান নিয়ন্ত্রণ ও সরল করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনার অধিকাংশ পাঠকেরই কোনো উৎসাহ নেই। তবু যে

আমি করছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে, বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার ‘নানা প্রশ্ন’র কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নতুন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য-পরিষদ (?) জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে উঠতে পারেননি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পর্বিনিয়াস অর্থাৎ সিনটেক্স্ এল কার অনুকরণে ?

ফার্সীতে বলি, চুন (বখন) পাওয়া (বাধা) মরা (আমাকে) হাঁদা (দেখলেন) উনহা (উনি) মরা (আমাকে) গদ্যতত্ত্ব (বললেন) তু (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ারী (যাচ্ছি) ?

হুবহু একই সিনটেক্স্ ?

ফার্সী থেকে ?

এবং সবশেষে প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনো জায়গায় মোটা কোনো জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে ? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে ?

জাতীয় সংহতি

মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

এই যে ফার্সী নামক ভাষা এটি সাতশ’ বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। বাকি পাঠান ও মোগল কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। শেষ বাঘা বাহাদুর শাহ’ বাগদাদির অন্তঃপুরেও তুর্কী বলা হত। যদিও রাজবরবারে ফার্সী চলতো, কিন্তু কবি সম্মেলনে প্রধানত উর্দু।

ইংরেজও প্রথম একশ’ বছর এ দেশে ফার্সী দিয়েই কাজ চালায়। ১৮৪০-এর কাছাকাছি একদিন তারা ফার্সী নাকচ করে দিয়ে ইংরিজি চালালে। যে হিন্দু কারমচরী একথা অত্যন্ত ফার্সী শিখে পদস্থ রাজ-কর্মচারী হতেন, তাঁরা ৫০৬০ বছরের ভিতর ফার্সী বেবাক ভুলে গিয়ে ইংরিজির মাধ্যমে রাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মধ্যে শূন্য, কলকাতা হাইকোর্টে নাকি এখনো তাঁদের প্রাধান্য অতুলনীয়। বাদশাহি ভারতবর্ষে এখন কখন স্রোত

ফার্সী জানেন সেটা বের করতে হলে দিনের বেলাও লঠন নিয়ে বেরতে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা হচ্ছে—অবশ্য এই দুই সম্প্রদায়েরই বারী উদ্দার শক্ত গোড়াপত্তন করতে চান তাঁরা ফার্সী শেখেন—বাঙালী যেমন আপন বাঙলাকে জোরদার করতে হলে সংস্কৃত শেখে।

যে ফার্সী প্রায় সাতশ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে দাবড়ে বেড়াল, হাজার বছর ধরে তুর্কীস্থান থেকে তাইগ্রীস নদ অবধি রাজত্ব করলো (লাতিনের মতই ফার্সীকে সে যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা যেতে পারে) সেই ফার্সীই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে লোপ পেল!

ইংরিজি মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছে। তার লোপ পেতে কত দিন লাগবে?

শ্রমধরা বিজয়লক্ষ্মী সৌদীন বলেছেন, 'ইংরিজি আমাদের লিগেসি, ওটা আমরা ছাড়ব কেন? তাঁর পদ্যল্লোক স্বর্গীয় পিতা মোতীলাল ফার্সীকে তাঁর লিগেসি মনে করতেন। ইংরেজ আমলে একদা দ্বিমূর্তির বিধানগভায় দুই ইংরেজ একে অন্যকে প্রচুর অহেতুক প্রশংসা করলে পর মোতীলালজী বললেন, 'ফার্সীতে একটি সদ্‌স্বর প্রবাদ আছে; "মন তোরা হাজী মীগোইম্, তো মরা কাজী বগো!" অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলে সম্বোধন করবো, আর তুমি আমাকে কাজী বলে সম্বোধন করো—অথচ ইনিও মক্কাতে গিয়ে হজ করেননি, উনিও কাজী বা ম্যাজিস্ট্রেট নন।' সেই ফার্সী ভাষার লিগেসি গেছে,—ইংরিজির কবে যাবে?

পাঠক ভাববেন না, আমি ইংরিজি তাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। আদপেই না। নিজের স্বার্থেই আমি চাই, ইংরিজি থাকুক—এই বৃন্দ বরসে কোথায়, মশাই, হিন্দীর 'গাড়ী আতী হৈ, জাহাজ জাতা হৈ' লিঙ্গ মৃৎস্থ করে করে হিন্দী বাদীর মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাব! যে কটা দিন বেঁচে থাকবো, ইংরিজি ভাঙিয়েই খাব। সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, আমি আপনি চাইলে না চাইলেও ইংরিজির ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

আরেকটি উদাহরণ নিন। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওকীবহাল নই—যা শুনছি তাই বলছি। ইংলন্ডে নাকি নরমান বিজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রভাষা ছল্লো যায়, এবং তামাম ইংলন্ডের লোক নাকি পড়িমরি হয়ে ফরাসী শেখে। কবি চসারের সামনে নাকি সমস্যার উদয় হয়, তিনি ফরাসী না ইংরিজিতে কাব্য রচনা করবেন? (ভাগ্যিস ইংরিজিতে করেছিলেন, কারণ ফরাসী লিখে কোনো ইংরেজ বশ অর্জন করেছেন বলে শুনিনি; এদেশে যেমন আটশ' বছর ফার্সী চর্চার পর এক আমীর খুসরৌই কিছুটা নাম করতে পেরেছেন—তাও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সী)।

নরমান বিজয় ষষ্ঠম হুঙ্কার পরও ইংরেজ আশ্রয় চেষ্টা করেছে তার ফরাসী লিগেসি যেন মকুব না হয়ে যায়। কোটি কোটি পেণ্ড খর্চা করে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফরাসী শিখিয়েছে, কাচা-বাচ্চার জন্য ফরাসী গভার্নেস

রেখেছে, ছুটিছাটা পেলেই প্যারিস পানে ধাওয়া করেছে। আর তার ভাষার ভাই মার্কিনও ফরাসী মস্ততায় কিছুমানুষ কম নয়। শুনছি, মার্কিনী ইংরিজিতে নাকি প্রবাহ আছে, ‘সাধু মার্কিনেরই মৃত্যুর পর প্যারিস-প্রাপ্তি হয়—’ সেই তার স্বর্ণপদুরী, মসলমানের বেহেশৎ, হিন্দুর কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির মত।

ফরাসী শেখানোর বাজে খর্চা বরা কমাতে চান তাঁরা নাকি হালে হাতে-কলমে সপ্ৰমাণ করেছেন যে, লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ইংরেজকে ফরাসীতে প্রথম শব্দখোলে শতকে গোটেক ফরাসীতে উত্তর দিতে পারে, কি না পারে।

শুনছি বিজ্ঞ দিয়ে নাকি ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যোগ করে দেওয়া হবে। হায় রে কপাল! যখন ভাষার সেতু ছিল, তখন লোহার সেতু ছিল না; এখন লোহার সেতু হচ্ছে তো ভাষার সেতু নই!

আরেকটি উদাহরণ দিই। খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার পর খৃষ্টভক্তগণের বাসনা হলো, খৃষ্টধর্মের কল্যাণে সমস্ত ইয়োরোপে যে এক নবীন ঐক্য দেখা দিয়েছে, সেটা যেন লোপ না পায়। তাই তাঁরা আপ্রাণ লাগিতেন আঁকড়ে ধরে রইলেন। পাছে সেই ঐক্য লোপ পায়, তাই দেশজ অনদ্ভূত ভাষায় বাইবেলের অনূবাদ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না (মসলমানরাও বহুকাল কোরাণের ফার্সী কিংবা উর্দু, বাঙলা অনূবাদ করতে দিতে চাননি, ঐ একই কারণে)। লুথারের অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনূবাদ প্রচার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী লাগিতেন স্থানটি কেড়ে নিল—এই সেদিন পর্যন্ত জার্মানভাষী ফিজিরিক দি গ্রেট ফরাসী কবি ভলতেয়ারকে নিমন্ত্ৰণ করে তাঁর অতি-কাঁচা ফরাসী কবিতা মেরামত করিয়ে নিতেন—এবং সর্বশেষে ইয়োরোপের সর্বভাষা আপন আপন দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। ইস্তেক ডেনিশ, ফিনিশ পর্যন্ত। লাগিতেন-ফরাসী সংহতি গেল। অনেক পর্যটকের মধ্যে শুনতে পাবেন—সে আসন এখন ইংরিজি নিচ্ছে। শুনেন হাসি পায়। হোটেলবয়রা কিছুটা ইংরিজি বলতে পারে বইকি, যেমন মাদ্রার হোটেলবয়ও কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থানী কপচায়, কিন্তু প্যারিস কিংবা ভিয়েনার রাস্তায় এসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরিজিতে দৃঢ় রসালাপ করবার চেষ্টা দিন না, দেখুন না ফলটা কি হয়।

আমি যদি বলি, সমস্ত ইয়োরোপে যতখানি ইংরিজি বলা হয়, তার তুলনায় ভারত পাকে বেশী হিন্দুস্থানী বলা হয়, তবে ভুল বলা হবে না—অবশ্য বই পড়ার কথা হচ্ছে না, সেটা নির্ভর করে জনসাধারণের শিক্ষার বিস্তৃতির উপর।

অর্থাৎ ইংরিজি ও লাগিতেন সংহতি এনে দিতে পারবে না।

কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ আরব-আফ্রিকা ভূখণ্ডে। ইরাক থেকে আরম্ভ করে সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুর্কিস, আলবজজিরিয়া, মরক্কো, এথিওপিয়া, বাহরেন, মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, জর্ডন, সর্বত্রই আরবী প্রচলিত। লেবানন বায় দিলে এদের প্রতিটি রাষ্ট্রে চৌদ্দ আনা পরিমাণ লোক মসলমান

এবং উত্তর আফ্রিকার কিছুটা বের্বেৰ্ কণ্ঠীক ও নিগ্রো রক্ত বাদ দিলে সকলের ধমনীতেই প্রায় অভিজাত সন্নিবিষ্ট রক্ত ।

কিন্তু কোথায় সেই আরব সংহতি ?

প্রাচীন দিনের কাহিনীতে ফিরে যাব না । এই আপনার আমার চোখের সামনেই দেখতে পেলুম, ইরাক সে-সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, কুয়েইত জাতভাই কাসেমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিধর্মী (কারো কারো মতে 'কাফের') ইংরেজকে দাওয়াত করে খানা খাওয়ালে, এবং পরশু না তরশু দিন সিরিয়াও নাসেরের মিশরীদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে । এমন কি, সিরিয়ার মসজিদে মসজিদে নাকি মোল্লারা নাসেরকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন, নাসের নাস্তিক, টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে, তারই আশকারায় মিশরের টেলিভিশন অগ্নীল ছবি, অধঃনমা রমণী দেখায় !

এক ধর্ম, এক রক্ত, এক ভাষা । এক ভাষা, বিশেষ করে বললুম, কারণ সিরিয়া, ইরাক, মিশরের কথ্য ভাষাতে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও ওসব জ্ঞানগায় কোনো উপভাষা সৃষ্টি হয়নি—সেই এক হাজার বছরের পুরনো ক্লাসিকাল আরব্বাই সব্ঠ চলে । তবু আর মিলন হয়ে উঠছে না ।

*

*

*

কাজেই সংহতির স্থানে অন্যত্র যেতে হবে । গুজরাতী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, সবাই মিলে হিন্দী কপচালেই যে রাতারাতি আমাদের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে, এ-দুরাশা যেন না করি ।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বলেই বলাই তা নয়, আমার মনে হয়, তিনিই এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার চিন্তা করেছেন ।

ভারতীয় সংহতি

ভারতীয় সংহতি তবে কোথায় ?

এস্থলে নিবেদন করে রাখি যে আমার ধারণার সঙ্গে অল্প লোকেরই ধারণা মিলবে ও হাঁদের সঙ্গে মিলবে তাঁরা এবং আমিও এ দুরাশা পোষণ করি না যে বিংশ শতাব্দীর লোক আজ অথবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বক্তব্য কান দিয়ে শুনবে ।

বেদ উপনিষদ নমস্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষেই এসবের চর্চা অতি কম । এমন কি পণ্ডিতদের মুখে শুনোঁছি, গীতা পর্যন্ত এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না ।

আপনি ভারতবর্ষের যে কোনো গ্রামে যান না কেন, তা সে মালাবারে আসামে পাজাবেই হোক—সেখানকার লোকনাট্য চারণ গানে সর্বত্রই মহাভারত রামায়ণ বিরাজিত । জনপদবাসীর রসাম্বাদনের প্রধান উৎস রামায়ণ মহাভারত । আমি একবার মালাবারের গ্রাম্য কথাকলি দেখতে এবং শুনতে গিয়ে তিন মিনিটেই শুধু বাই, হনুমান সভাজনকে সালংকার বর্ণনা করছেন, তিনি কি

করে লংকার উপস্থিত হলেন, নগর পরিদর্শন করলেন, লংকার কবলীবনে কি প্রকারে লংকাকাণ্ড ঘটালেন, অবশেষে রাবণের অনুচর তাঁর পুচ্ছটিতে অগ্নি-সংযোগ করলে তিনি কি প্রকারে গৃহ থেকে গৃহান্তরে লক্ষ্যপ্রদান করে নগরীতে ব্যাপকভাবে বহিঃ প্রজ্জ্বলিত করলেন। মালায়ালাম ভাষার এক বর্ণ না জেনেও আমি স্বচ্ছন্দে গল্পটি উপভোগ করলাম।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যারাই পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন, রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় জীবনের কতখানি গভীর অতলে প্রবেশ করেছে।

এবং এই নাট্যনৃত্য উপভোগ করে শুধু হিন্দু না, মুসলমানও। কারণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক। বাঙ্গলার মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন বাঙলা, গুজরাতী মুসলমানের মাতৃভাষাও গুজরাতী। লক্ষ্মীপুরের মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন উর্দু; হিন্দুরও তাই—এখন অবশ্য হিন্দী ক্রমে ক্রমে উর্দুর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মাতৃভাষায় আমোদ-আহ্লাদ করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা—শুনছি দেশবিভাগের পরও ‘হরহর মহাদেব’ ফিল্ম ঢাকাতে যে বক্স আপিস ভরলে তাতে সিনেমার মালিকগণ বিম্মিত হন।

কিন্তু অমিলও আছে।

ধর্মজগতে হিন্দু ভীষ্ম-কর্ণকে আদর্শ বলে ধরে নেন, মুসলমান নেন না। গোত্রাঙ্ককে শ্রদ্ধা করবার কোনো কারণও মুসলমানের নেই। অবশ্য আউল-বাউল মর্শীখীরা মিষ্টকণ্ঠের গানে কিছুটা রামায়ণ-প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ব্যাপকভাবে সেটা গ্রহণ করেনি।

*

*

*

রামায়ণ-মহাভারতের উৎস থেকে সজীবনী-সুধা আহরণ করে হিন্দু সংহতি পুনর্জীবিত করা যায়—অবশ্য যদি সাহিত্যিক, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতাদের এ পন্থায় আস্থা থাকে এবং সেই কর্মে নিজেরের নিয়োগ করেন, বিনোবাজী যে রকম করেছেন, কিন্তু যদি ভারতীয় সংহতির কথা তোলা যায় তবে সমস্যাটা কঠিন হয়, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান খৃস্টান পার্শী গারো-নাগা আদিবাসীও আছেন। জৈনদের কথা তুলছি নে, কারণ একমাত্র উপাসনা-পন্থাতি বাদ দিলে তাঁরা সর্বার্থে হিন্দু।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমানের একা কৌন জায়গায়? রসের ক্ষেত্রে যে তাঁরা একাবন্ধ সে-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

এখন যা বলতে যাচ্ছি, সেটি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আরব দেশাগত দু’একটি আরব মুসলিমের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপন্থতির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তী যুগে আরব দেশে থাকবার আমার সুযোগ হরোঁছিল।

এঁদের ধর্মবিশ্বাস সরল। এঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাতাল্লা এই বিশ্ব মানবের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পাছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে তাই তিনি ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। সেই ধর্ম কতকগুলি বস্তু ও আচরণ

আল্লা বেআইনী বলে হুকুম দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লা-তাল্লা হুকুম দিয়েছেন, তুমি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যদি সকলকে সমান সম্মান সমান প্রেমের চোখে দেখতে পারো। না পারলে তোমার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অন্যায়।

আরব ভূমি তথা অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে তাই যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় ভাৰ্ষা গ্রহণ করে তবে তাই নিয়ে লোকনিন্দা হয় না। সমাজ ভাবে, সে একাধিক স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে কিনা, সে দায়িত্ব তার পক্ষে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান অর্থাগম হলেই দ্বিতীয় দ্বারা গ্রহণ করে না। তার ভিতরে কেমন যেন একটা ত্যাগের আদর্শ আছে। তার বক্তব্য, ‘আল্লাতাল্লা আমাকে এটা সেটা অনেক কিছুই উপভোগ করতে দিয়েছেন সত্য কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখি না, আমার এগুলো না হলে চলে কিনা?’

একথা বলা আমার আশে উদ্দেশ্য নয় যে কোরানে ত্যাগের আদর্শ নেই। বিস্তার আছে। বস্তুত জকাৎ (বাধ্যতামূলক দান-খয়রাত) ইসলাম সৌধের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং নিত্যন্ত দীন-দুঃখী ছাড়া সকলকেই কিছুটা দান করতে হয়। তদুপরি সুফী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায় তো চূড়ান্ত ত্যাগের আদর্শই বরণ করে নেন। উপস্থিত এঁদের কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য ভারতীয় মুসলিম ষত্থানি ত্যাগের আদর্শ বরণ করেছে—সে শূদ্ধ ধনদৌলতের বেলায়ই নয়, আমোদ-আহ্লাদ পরিতোষ-আনন্দের আভ্যন্তরীণ জগতেও—অন্যান্য মুসলিম তত্থানি করেনি।

এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা—অর্থাৎ তাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে।

* * * *

এক্সলে ঈষৎ অবাস্তর হলেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

যার কিছু নেই, উপার্জন করার কোনো ক্ষমতা নেই, তার মধ্যে ‘ত্যাগ’ শোভা পায় না। বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীতে। যখন অক্ষম জন সর্বদায়িত্ব এড়িয়ে ‘ত্যাগের’ অছিলা ধরে সোশাল সার্ভিসের নাম করে আশা করেন, সমাজ তাকে পুষবে, এবং ভালো ভাবেই পুষবে, কারণ তিনি ‘সর্বস্ব’ (!) ‘ত্যাগ’ করেছেন, তখন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে (এরই অন্য উদাহরণে মহাত্মাজী বলেছেন—‘শক্তিহীনের ক্ষমা ক্ষমা নয়’)। সোজা কথা, বিড়লা-টাটার দৌলত তাঁরাই ত্যাগ করতে পারেন,—আমি পারি নে, কারণ ও-দৌলত আমার নয়।

গুণিকে আবাব উপনিষদ বলেছেন ‘মা গৃধঃ কস্যাসিদ্ধনম্!’ অন্যের ধনের উপর লোভ করো না।

অর্থাৎ চাষা, মজদুর, সাহিত্যিক, মাস্টার আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে, অন্যের ধনের প্রতি লোভ না করেও।

সেই ধন অর্জন করে ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করতে হবে।

এই আদর্শ হিন্দু-মুসলমান দুইয়েরই আছে, এবং বহু বৃদ্ধ ধরে জীবনে

উপলব্ধি করেছে বলে এই দৃষ্টান্তের উপর জাতীয় ঐক্য গঠিত হতে পারে । তাহলে আর কোনো স্বপ্ন থাকবে না ।

শুধু তাই নয়, তা হলে ভারতবর্ষ যে শুধু শিক্ষালী রাষ্ট্র বলেই গণ্য হবে তা নয়, সে ভদ্রতম সম্ভ্রান্ততম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হবে ।

ভাষা

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে :—

এই যে লোকসমবাগের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কিংবা জনবিরল ফিনল্যান্ড, কিংবা ঐ ধরনের ছোট-বড় নানারকমের রাষ্ট্র রয়েছে, কোনখানে দেশটা সে দেশের আপন ভাষায় না চালিয়ে অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় চালানো হচ্ছে ?

সুইজারল্যান্ডের লোক তিন অঙ্গলের তিন ভাষায় কথা বলে । জার্মান, ফরাসী এবং ইতালীয় । রোমান্শ্ ভাষায় এত কম লোক কথা বলে যে সেটার কথা না হয় নাই তুললুম । এদের সকলের পক্ষে একটি ভাষা শিখে নিয়ে, সেটাকে ‘রাষ্ট্রভাষা’র সম্মান দিয়ে— তা সে ভাষা দিশীই হোক আর বিদেশীই হোক— কাজ চালাতে যে বিস্তর সুবিধা হত সে বিষয়ে কি সন্দেহ ? কত পরস্যা খরচ করে তিন-তিনটে ভাষায় সরকারী-বেসরকারী বিস্তর জিনিস ছাপাতে হয়, তিন ভাষায় লোকে বক্তৃতা দেয় বলে পার্লামেন্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগোয় না, এক অঙ্গলের জিনিস অন্য অঙ্গলে বেচতে হলে তার জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন, আলাদা এজেন্ট রাখতে হয়, এবং আরো কত যে ঝামেলা তার ইয়ত্তা নেই । কিন্তু ওরা হাসিমুখে সব-কিছুই মেনে নিয়েছে ।

তার কারণ মাত্র একটি, এবং সে-কারণ পৃথিবীর সবটাই প্রযোজ্য ।

মাতৃভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষায় কাজ চালানো যায় না ।

অবশ্য আজ যদি বাঙলা দেশ চালানোর জন্য একজন রাজা, তাঁর জন্য প’চিশ মনসবদার এবং একটি পদ্রুণ্ট সৈন্যদল থাকলেই যথেষ্ট হত—তাহলে ইংরিজি হিন্দী যে-কোনো ভাষা দিয়েই অল্পায়াসেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত । যেমন ধরুন একটা চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার, গদুটিকয়েক কেরানীতে ইংরিজির মারফতে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয় । কিন্তু আজ পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আজ বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর যেমন কতব্য আছে, তেমন কতকগুলো হস্ত এবং দাবিও আছে । এরা প্রত্যেকেই যে শহরে এসে মশ্তী হতে চায় তা নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গা-গতর খাটানোর পর যদি দু’মুঠো না খেতে পায় তবে রাষ্ট্র অবিচার করছে ।

গণতন্ত্রের সামনে এই বড় পরীক্ষা ।

এবং আমি এর উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে চাই ।

গ্রামবাসীর সক্রিয়, সতেজ এবং দরদী সহযোগিতা না পেলে বাঙলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই ।

কিন্তু প্রশ্ন, নেতারা, সমাজপতিরা এদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন কোন্ ভাষার মাধ্যমে? ইংরিজির কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি; এইবার হিন্দীতে আসি।

প্রথমেই একটা সাফাই গেয়ে নই। আমি হিন্দী-প্রেমী এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। হিন্দী বাঙলার বৃকের উপর চেপে বসে একদিন ‘হিন্দী ইম্পিরিয়ালিজম’ কায়ম করবে এ দৃর্ভাবনা আমার মনের কোণেও আসে না। বস্তুত স্বরাজ-লাভের পর কলকাতা তথা বাঙলা দেশে হিন্দী প্রচারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই—এর চেয়ে ঢের ব্যাপকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে—কিন্তু সে-কথা পরে হবে, উপস্থিত ফের গ্রামে ফিরে বাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালা পাঠশালা হিন্দী শেখাতে হলে যে কতখানি রেষ্টোর প্রয়োজন হবে সেটা একবার শিক্ষামন্ত্রীর জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর করতে চাই নে—জিনিসটা এতই সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যে দেশের লাখের মধ্যে একজন গ্রামবাসীও আপন প্রদেশের বাইরে যায় না, তার পক্ষে ভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

সবসুন্দর মিলিয়ে দেখা গেল, নেতারা তা হলে এঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন বাঙলার মারফতেই।

কিন্তু নেতারা যদি পরিপূর্ণ হন হিন্দী চর্চা করে, তাহলে ইংরেজ আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে—তারা জানতেন ইংরিজি, প্রোতারা জানত বাঙলা, দুজনার চিন্তা-জগৎ, অনুভূতি ক্ষেত্র ভিন্ন। শেষটায় নেতারা যে অতি কষ্টে বাঙলা শিখে কাজ চালালেন, সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

ওদিকে ভারতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি তো চাই। এই যে প্রদেশে প্রদেশে স্বতন্ত্র, একই প্রদেশের ভিতর সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুদের অবিচার, এ তো ক্রমাগতই বেড়ে চলছে, এর বিরুদ্ধে তো কিছু-একটা করা চাই।

এর সরল সহজ রাস্তা নেই।

ভাষা এক না করেও সংহতি হয়—যেমন সুইজারল্যান্ডে, বেলজিয়ামে আছে—এবং ভাষা এক হলেও সংহতি না হতে পারে—যেমন নাসের, কাসেম, মজার বাদশা, কুয়েতের শেখ সকলেরই ভাষা আরবী কিন্তু এদের ভিতর স্বতন্ত্র-কলহের অস্ত নেই। এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র (U.A.R.) করা হল তার সূতিকাগৃহ তো শ্মশান-শয্যার পরিণত হতে চলল।

মহাত্মাজীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক শূন্থিহীন ছিল, ‘তোমরা আপসে এত লড়ো কেন?’ মহাত্মাজী বলেন, ‘ইংরেজ লড়ায় বলে।’ ফের প্রশ্ন—‘ইংরেজ লড়তে চাইলেই তোমরা লড়ো কেন?’ উত্তর হল, ‘আমরা মর্খ বলে!’

সেই হল মূখ্য কথা! আমরা মর্খ!

এখন তো আর ইংরেজ নেই, কেউ ওস্কাছে না, আমরা তবু লড়ে মরাছি!

তাহলে প্রশ্ন—এই মর্খতা ঘুচাই কি করে?

বিদ্যাদান করে, ধর্মবৃদ্ধি জাগ্রত করে, রাষ্ট্রের প্রতি ভার কর্তব্য সম্প্রদায়কে সচেতন করে।

এইখানেই অধীনের সিবিলন নিবেদন—সেটি মাতৃভাষার মারফতেই করতে হবে, অন্য কোন পছন্দ নেই, নেই, নেই।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিক প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললেন, ‘অহো-হো! কী সুন্দর সুসৌন্দর্য।’ বৈজ্ঞানিক গভীর কণ্ঠে টিপনি কাটলেন, ‘হস্তীমূর্খ! সুসৌন্দর্য আবার উদ্ভব, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে বাওয়াতে মনে হল সুসৌন্দর্য হয়েছে।’

কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয়েই এক মত পোষণ করেন।

কবি গাইছেন,

‘কে বলে সহজ, ফাঁকা বাহা তারে

সহজ কাঁধেতে সওয়া

জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়

ততই কঠিন বওয়া ॥’

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, ‘প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে’—

‘নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।’

ধর্মের উচ্ছ্বাস বারাই কামনা করেন তাঁরাই এ তথ্যটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফির-ধর্মের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—‘জগন্মূল রাষ্ট্র’ বললে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই : ‘কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অন্য কার মূরখ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।’ এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীর তীক্ষ্ণ আদেশ, ‘আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনো উপাস্য দেবতা থাকবে না।’

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানতঃ ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিংবা স্বাধীনতা পেলেই তারা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে, কিন্তু বেশের ডিক্টেটর একবার জোর করে, ভয় দেখিয়ে, যে করেই হোক—যদি ‘আইন’ পাল করিলে নিতে

পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূল্যধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলাও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দী পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্বত যখন অকথ্য অত্যাচার, নিৰ্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগতে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হয় পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামে'র সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বহুৎ এক অংশ জুড়ে বসে ছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যার কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত (তাও স্বাক্ষণের); তার বাধ্য-বাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খৃষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মে প্রচুর বাধ্যবাধকতা। ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনো চলেছে, সেটা প্রধানতঃ খৃষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এ দেশের হিন্দু পাঠকেরা খৃষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জেন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে,—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেবদেবীও আছেন অসংখ্য কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে—তা হলে তুমি শুদ্ধ পাপী না, তুমি অখৃষ্টান (খৃষ্টান দৃষ্টিবিশ্ব থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন তা নয়, তাঁদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্থালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুদ্ধ্যনির্মিত, প্রলো-তারিয়া-শোষণ গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্পফ' কিংবা 'ডাস্ কাপিটাল'। বিশ্বাসী খৃষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনো ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিক্যাল ম্যাটিরিয়ালিজমে কোনো দৃষ্টি-

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানদের সমাজ নিয়ে নতুন হিন্দু-জীবন গড়তে হবে। বাক্সও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহু-বিবাহিনীরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছেঁয়ার বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাংকিউয়াম স্ট্রট হল কিনা, হলপ করে কিছুর বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাংকিউয়াম ঠেঁয়ালি হস্ত সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বড়োরা যাক—মরুক গে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচকাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পছীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে ‘হাইল (জয়তু!)’ জোয়ানরা সম্মুখে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে—‘হিটলার!’ ফের ‘হাইল!’ ফের ‘হিটলার!’ ফের ‘হাইল!’ ইত্যাদি। টকটকে লাল মৃৎ বস্ত্রধারী নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্তোচ্ছারণ করেন দৈবের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেন হুই-চারিটি শব্দে কিংবা শব্দ ‘আমেন’ (তথ্যসূত্র) বলে।

ক্রিসমাস, ঈস্টারের উপাসনা জবদর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে নরুনবেগে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব! ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহুর উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন বেদী—থ্যাড্ডি—থ্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত ‘কাফির’ (অর্থাৎ এখনো যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) তো বে-এক্কেয়ার—ইশ্বেক জার্মানীর হুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন। অবশ্য পাড়ি কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিসেরে জঁসোয়া প’সে। তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারী তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব ‘পরব’ হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল ‘আইন-টপ্ফ্—গারিস্ট’। সপ্তাহে একদিন থাকে শব্দ এক পদের খানা। মাংস আলু, ফুলকাঁপ, চর্বি সবসম্মিলিত ঘ্যাট। ‘অর দ্যভর’ দিয়ে আরম্ভ করে ‘সেভারি’ পর্বস্তু অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও, ‘ডুবে ডুবে জল খাই’, ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেসার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, ‘আইন টপ্ফ্—অর্থাৎ এক হাঁড়িতে’ রান্না খাদ্য—এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপাত্ত আর কি?) হিটলারের কর্তৃত্বজ্ঞা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার ‘মীটলেস্’, তিনি ‘কাটলেস্’। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘ্যাট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে ‘ধর্মরক্ষা’ করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুরারের ‘কাটলেস্’ (কটলেট)।

খুঁটান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অধিদেবতার আধার দেখতে—(হিন্দুর ও বিষয়ে কিশিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব সৈন্য মজুতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১১

তীর্থযাত্রার প্রচুর পদ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দরুস্ত শীতে রেড স্কেয়ারে ঘাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেলিন-স্তালিনের ‘মামি’ দেখবে বলে। আর ‘মামি’ যে কান্ট্রি বা গোরস্তানের চেয়ে স্বয়ংমনের উপর বেশী দাগ কাটেবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিষ্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাঙ্গণী :—

ক্যাথলিক যারা তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষশেষের পর্বে আপন আপন ধর্ম্মকর্ত্তা স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কন্ফেশনের ধর্ম্মদ্বার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সম্ভবের বৃদ্ধ চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, ‘না না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বানুকূল।’

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলাও হালে শুনেছি, রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রহৃত্তদের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটা ‘মামি’ পেয়ে গেলেন। খুঁচফ খুশী হয়ে শুধোলেন, ‘ওটা কত দিনের পুরনো?’ পণ্ডিতেরা নিরুত্তর। খুঁচফ শাসালেন, ‘চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।’ পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খুঁচফ বললেন, ‘হু?’ পণ্ডিতেরা সম্ভবের : ‘চার হাজার দুশ বৎসর।’ ‘বেশ, কি করে জানলে?’ পণ্ডিতেরা একতানে, ‘মামি স্বীকার করেছে (কন্ফেশন)।’

*

*

*

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায়-টায়, দফে দফে, প্রো ফর্ম দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন :

‘হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিষ্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দিই। কম্যুনিষ্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের ‘বিস্ত্রানসম্মত’ ‘র্যাশনাল’ কর্মকাণ্ড ‘ধর্মের আফিও’ মাথানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এখানে সেই ফরাসী প্রবাদবাক্য স্মরণ করি :—‘মুদা সা শাজ, মুদা সে লা মেম শোজ।’ ‘যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।’

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তব কি?

ধর্ম

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কে, ওটার কী-ই বা প্রয়োজন? প্রশ্নটির ভিতর অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম তাঁর রাজস্ব ভাগ-বাটোয়ারা করে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্রকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদা গঙ্গাঙ্গান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত বলে সেটি ধর্মের আদেশ রূপে মেনে নেওয়া হত, কিংবা বলা যায়, ধর্মের আদেশ বলে সেটি পুণ্য বলে বিবেচিত হত। এখন সেটা ডাক্তারই “স্ট্রিংলি রেকমেড” করেন, এবং অধুনা বিজ্ঞানও নাকি সপ্রমাণ করেছে, গঙ্গাজলে কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্য জলে নেই। ধর্ম এখানে বৈদ্যের হাতে এ পুণ্যকর্ম করার আদেশ ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা বলা যায়, বৈদ্য সেটা কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুটা কেড়ে নিয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি—কোনো কোনো দেশে ম্যুনিসিপ্যালিটিই ফরম্যান জারি করে, বাড়ি বানাবার সময় প্রতি কখনো ঘর পিছু একটি বাথরুম রাখতেই হবে। না হলে প্র্যান মঞ্জুর হবে না। আহারাদি-তেও তাই। ডাক্তারই বলে দেখে কোন্টা খাবে, কোন্টা খাবে না—অর্থাৎ কোন্টাতে পুণ্য আর কোন্টাতে পাপ। এবং আকছারই তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অনুশাসন দেন। যেমন খেতে বলেন চিকেন-সুপ—হিন্দুধর্মে, অস্তত বাঙলা দেশের হিন্দুধর্মে সেটা পাপ।

দান করা মহাপুণ্য। ধর্মের সনাতন আদেশ। কিন্তু আজকের দিনে আপনি আমি এ-অনুশাসন মেনে চলি আর নাই চলি, সরকার কান পকড়কে তার ইনকাম এবং অন্যান্য বহুবিধ ট্যাক্স তুলে নেবেই নেবে এবং সভ্যদেশে তার অধিকাংশই ব্যয় হয় দীন-দরিদ্রের জন্য। (আজ যে মুরারজীভাই দিবারাও, “অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ” করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যদি সে পয়সা দু হাতে খরচা করে যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়ান—সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা অনেকখানি ঘুচবে, বেকার-সমস্যা ঘুচলো বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে—তিনি যদি কজ্জুশি করেন, তবেই হবে আমাদের চরম বিপদ—কিন্তু এটা অর্থনীতির একটা উৎকট সমস্যা এবং হিটলারই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন দু হাতে পয়সা খরচ করে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশের প্রাচীন-পশ্চীম অর্থমন্ত্রীর তখন দেশের দুরবস্থা দেখে আকুল হয়ে, পাছে ভবিষ্যতে আরো কোনো নতুন বিপদে পড়তে হয় সেই ভয়ে সরকারের খরচা প্রাণপণ কমিয়ে “রিজার্ভ ফান্ড” নামক দানবের ভুড়ি মোটোর চেয়ে মোটা করতে থাকেন। তাদের দেখাও দেখি ব্যাংকার সাহুকাররাও ক্রেডিট দেওয়া বন্ধ করে কিংবা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো কমতে থাকে এবং সৃষ্ট হয় “দাউচক্র”—ভিশাস্ সারকল। সরকার ব্যাংকার টাকা দেখে না বলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়বে না, আর দেশের উৎপাদন শক্তি

বাড়ে না বলে সরকার খাজনা ট্যাক্সো পায় আরো কম এবং তারস্বরে চিংকার করে, “আরো ছটিাই করো, আরো ছটিাই করো।”)^১

এই পরিস্থিতি হতে পারে বলেই ধর্ম প্রাচীন দিনে তার একটা ব্যবস্থা করেছিল।

দোল-দুর্গোৎসবে দান। এতে মহাপুণ্য।

বহুকাল পূর্বে আমি বাচ্চাদের মাসিকে একটি অনুপম প্রবন্ধ পড়ি। অসাধারণ এক পণ্ডিত সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজসাসি, পাখুকা, খটর, অলংকার—দুনিয়ার কুলে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কসারি, কামার, মূচি, মিশ্রি—বস্তুত গ্রামের যাবতীয় কুটির-শিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তার বিক্রি করে রীতিমত সঞ্চল হয়ে যেত। শূদ্ধ তাই নয়, কসারি দু পয়সা পেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওয়ালার চার পয়সা হল বলে সে শাখা কিনত—ইত্যাদি ইত্যাদি, আম্ ইনফিনিটুম্। এবারে আর “নটচক্র” বা “ভিশাস সারঙ্গ” নয়—এখন থাকে বলে স্পায়ারেল মডেমট—“চক্রাকারে স্বর্গ-বাগে!”

তারপর লেখক দুঃখ করেছিলেন, আজ যদি বা জমিদার পুণ্য-সংস্কারে পূর্ববর্ণিত সর্বদানই যথারীতি করেন তবু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বস্ত্র এসেছে বিলেত থেকে (তখনকার দিনে দিশী কাপড় অল্পই পাওয়া যেত), ছত্র রেল ব্রাদার্সের, বাসনকোসন অ্যালুমিনিয়ামের এবং অন্যান্য আর সব জিনিসের পনেরো আনা এসেছে হয় বিদেশ থেকে, নয় দেশেরই বড় বড় শহর থেকে (শাখা জাতীয় মাত্র দু-একটি জিনিস আপন গ্রামের কিংবা গ্রামের বাইরের কুটিরশিল্প থেকে)। মোন্দা মারাত্মক কথা—জমিদারের গ্রাম এবং/কিংবা আর পটখানা গ্রাম নিয়ে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনগোষ্ঠী (ইউনিট) সে কোনো সাহায্যই পেল না। আখেরে দেখা যাবে কোনো কুটিরশিল্পই ফায়দা-দার হল না, হল শিল্পীতরা—দিশী এবং বিদেশী।

১ এ রকম ক্রাইসিসের সময় আরো একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ঐ সময় বড় বড় প্রাচীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাঙ্কের কাছে আরো ক্রেডিট চায় তখন ব্যাঙ্ক ভাবে, “এদের বিস্তার টাকা দিয়েছি—আর কত দেব? এত কালের বড় ব্যবসা—নিশ্চয়ই টিকে যাবে।” ব্যাঙ্কার তখন ছোট ব্যবসাকে টাকা দেয়, পাছে তারা দেউলে হয়ে যায়, এবং ব্যাঙ্কের আগর দেওয়া সব টাকা মারা যায়। ফলে বিপদ কাটার পর দেখা যায় অনেক প্রাচীন, খানদানী ব্যবসা দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর ছোট ব্যবসাগুলো টিকে গেছে। অবশ্য এর একটা নৈসর্গিক—অতএব দুর্ভোগ্য—কারণও থাকতে পারে। মহামারীতে বাড়ির রোগা-পটকাটাই যে মরে এমন কোনো কথা নয়। অনেক সময় তাগড়াটাই মরে। হয়তো মা রোগা-পটকাটারই স্বল্প বেশী করেছিল বলে! ব্যাঙ্কার বড় ব্যবসাকে যে রকম স্বল্প না করে করেছিল ছোটটার।

এবং লাওংসে বলেছেন—অবশ্য বর্তমান চীনা সরকার সেটা মানে না—যখনই দেখতে পাবে বড় শহরে বড় বড় ইমারত তখনই বৃক্ষতে হবে, এগুলো গ্রামকে শূন্যে রক্তসঞ্চার করেছে। পতন অনিবার্য।

ধর্ম এখন পুণ্যের দোহাই দিয়ে দানের কথা জমিদারের সামনে তোলে না—আর জমিদারকে সে পাবেই বা কোথায়? হয়তো তিনি শহরে থাকেন, কিংবা সরকারের নতুন নীতির ফলে লোপ পেয়েছেন। তা সে বাই হোক, এ কথা তো ভুললে চলবে না, দান মাত্রই দান, “পেরসে”, পুণ্য নয়। গ্রাম পোড়ার জন্য কেউ যদি দেশালাই চায় তবে আমি তো তাকে দেশালাই দান করে পুণ্যসঞ্চার করি নে!

শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করলেই যে দান হত তা নয়। জামি মসজিদ নির্মাণ করে শাহ-জাহান নিশ্চয়ই পুণ্যসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু তাজ বানাতে—অর্থাৎ খাসপেয়ারা বেগম সাহেবের জন্য গোর বানাতে—কোনো পুণ্য আছে বলে ইসলাম ফতোয়া দেয় না। তাই বোধ হয় পাশে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে একটুখানি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু যে রাজা-বাদশা-জমিদারই এ সব পুণ্যকর্ম করতেন তাই নয়। বছর কুড়ি পূর্বে আমি মোটর-বাসে করে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ ষাওয়ার পথে “পাগলা” গ্রামের কাছে এসে দেখি এক বিরাট মসজিদ। ড্রাইভার বললে, এক জেলে হাওর-বিলের ইজারা নিয়ে বিস্তর পরস জম্যানোর পর এ মসজিদ গাড়িয়েছে।^২

এই বীরভূমে যে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে তার পরোক্ষ কারণে কিছুটা পুণ্য কিছুটা স্বার্থ আছে। মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়ার সময় সর্বপ্রথম জলের চিন্তা করেছিলেন। কুয়ো তো খোঁড়াবেন, সে তো পাকা কথা, কিন্তু যদি সেটা শুকিয়ে যায়? শান্তিনিকেতনের অতি কাছে ভুবনডাঙা। রাইপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন সিংহ সেখানে খাদের মাটি খনন করে নীচু জমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উঁচু বাঁধ (দীঘি) পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। (মতান্তরে এটি রাইপুরের ঘোষালদেব—এরা সিংহ পবিবারের পুরোহিত—ব্রহ্ম ছিল।) এই পুণ্য-স্বার্থে মেশানো বাঁধের উপর ভরসা

২ ঈশ্বর অবাস্তর হলেও এই নিয়ে একটি সমস্যার কথা তুলি। রোজার মাসে অসুস্থ ছিল বলে একজন লোক উপবাস করতে পারেনি। এখন ঈদ পরবের পর সে রোজা রাখতে যাবে, এমন সময় সে মসজিদ (কিংবা কুয়ো, কিংবা পাশাশালা—এ সবকে “সবীল-আল্লা” “ঐশ মাগ”, ‘যে পথ আল্লার দিকে নিয়ে যায়’ বলা হয়) বানাতে চাইলে। তখন প্রশ্ন, সে উপবাস করা মূলত্ববী রেখে মসজিদ বানাবে কি না? ভারতের মুসলমান যে “মানবধর্ম-শাস্ত্র” মানেন তাঁর মতে, রোজা পরে রাখবে। এ অনুশাসন যিনি দিয়েছেন, তিনি আসলে ইরানী।

রেখে মহাবিধেব এখানে আগ্রহ গড়েন ।^৩

এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না । এখন অন্য পন্থা । গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে, সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনো পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা একজোটে দেবে ভোট !

ভাবি, কোন্‌ প্রার্থী — না, কোন্‌ বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ! ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায় ।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয়, সব দেশেই ধর্ম তার ভালুক-মলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় । আসলে কিন্তু ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না । ধর্মনিরপেক্ষ আমরা ‘সেকুলার’ শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি, এবং সেই সেকুলার শব্দের অন্য অর্থ ‘প্রোফেন’—‘হিরেটিক্যাল’ও বলা যেতে পারে । অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষাপন্থতি ধর্মবৈরী এমন কি ধর্মঘৃণ হতে পারে ।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না । করলে বরং ভালো হত । ধর্ম তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত । কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি অত্যন্ত হলেও । কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাজিল্য করে, অবহেলা করে, এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না । তার ভাবখানা অনেকটা এই :—ধর্ম বাদ দিয়ে যদি শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাসের পর যদি কাজকর্ম করে দু’পয়সা কামাতে পারে—তবে ধর্ম অপয়োজনীয় অবাস্তব ।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বদ্বিধিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালে, “কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই ।”—উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলোছিলেন, ‘ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল গুটিটাইনি, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন ?’ কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, “কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি ।” সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি । সেকুলার শিক্ষাপন্থতি ধর্মের সেই কাঙ্ক্ষনিক প্রয়োজনীয়তা-টুকু স্বীকার করে না ।

বেদের বড় বড় দেবতা ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ নয় যে কোনো বিশেষ বর্গে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম-সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন । আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার

নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি-বর্ষণ, ফসল উৎপাদন, গোধানবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এঁদের না ডেকেও সমাধান হয়। তবে বিশ্বাসীজনের কথা শ্রবণ। দীর্ঘদিনব্যাপী অনাবৃষ্টি হলে এখনো তাঁরা হোমযজ্ঞাদি করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনো মোকদ্দমা জেতার জন্য মোলাআলীর দরগায় গিয়ে ধনী দেয়।^১ ভলটেরারকে কে যেন শূঁধিয়েছিল, ‘মস্তোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?’ তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সশ্বেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।’

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা মানুশকে তার ন্যায্য হক্কাহক্ক (হক্ + না + হক্, অ + হক্) ইনসাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনো লাভ নেই, তখন মানুশ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্ষদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্ষদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্ষরা অনুমত। তারা এসব দেবীর সহায়তায় তখনো বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মোলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম ‘বৃষ্টি’—পূরাত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিন্তা তো আর পূজাপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি-শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—‘কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই’—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণ চড়ান না। তাই যে টু-মনসা মোলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরো শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পূরাত দুজনাইই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবাস্তব নয় বলে, এখানে আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরাপে বেদে যে মধুর এবং গুঞ্জবিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বৃদ্ধি দিয়ে যেটা বৃদ্ধিই সেইটে কবিমর্মানীষীর প্রসাধন তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

১ দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক বৃষথোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকরীরা (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিস্বরে (পুল্পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টাঁকাকার বলছেন, ‘টিউকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।’

এরই ভুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিয়ন্ত্রণের—একটি উদাহরণ দিই।
তিন্ত অভিজ্ঞতার পর বদ্বিধ দিয়ে বদ্বালদ্রম, বদ্বরাশা করে শদ্রদ্র বদ্বিত্ত হতে হয়।
তখন যদি কেউ এসে আব্রুতি করে—

‘আশার হলনে ভুলি কি ফল লভিন্দ্র হার, তাই ভাবি মনে।’

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সাস্থনা লাভ করি।

ক্লাস যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সংকল্প, তখন ‘মাসে ইয়েজ’ গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের দ্বন্দ্বয়ে সঞ্চারিত করেছিল!

অনেকখানি দাগা খাওয়ার পর যখন মাইকেল ‘আশার হলনা’র কথা ভাবছেন তখন যদি কুরান শরীফের ‘উবস্’ সূরা পড়তেন তবে কি অনেকখানি সাস্থনা পেতেন না?

৯৩ অধ্যায়

উবস্

(অদ্—দুহা)

মক্কায় অবতীর্ণ

(একাদশ পংক্তি)

আল্লার নামে—আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

উষালগনের আলোর দোহাই,

নিশির দোহাই ওরে,

প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো

ধৃণা না করেন তোরে।

অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো

রয়েছে ভবিষ্যৎ

একদিন তুই হবি খুদাই লভি

তার কৃপা সন্মহৎ।

অসহায় হবে আর্সিলি জগতে

তিনি দিয়েছেন ঠাই

তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দূঃখ যা ছিল

মুছারে দেছেন তাই।

পথ ভুলেছিলাম তিনিই সুপথ

দেখিয়ে দেছেন তোরে।

সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।

অসহায় জন, ওরে—

—দাঁস নে কভু। ভিত্তারী—আতুর

বিমুখ যেন না হয়।

তার করুণার ব্যর্থতা যেন রে

দোখিস জগৎময় ॥

সত্যেন দস্তের অনুবাদ

সত্যের দ্বন্দ্বের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই গুণে।' অথচ আরবীতে 'অব্-দুহা' অর্থ 'উষা'। ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আলি' আওয়ার অব দি মনিং।' হয়তো সত্যের দক্ষ ভেবেছিলেন, আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনো নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় উষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে, রাত্রির অন্ধকার যতই সূচ্যভেদ্য এবং নৈরাশ্যজনক হ'ক না কেন, উষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এখানে বলছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যারা কুরান শরীফকে 'মেটামর্ফিকালি' ও 'সিম্বলিকালি' (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী-ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎ-প্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপাণ্ডাশিকা 'কালী-পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন এখানে 'প্রভাসসূর্য' (উষা, অব্-দুহা) হজরৎ মুহাম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষ রূপে আগমনের সূচনা করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু কুরান শরীফকে এ রকম রূপক অর্থে নেন না।

ধর্ম ও কন্মুনিজম্

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কম'সূচী-এজেন্ডাও বলতে পারেন—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হ'ক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাদিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন,—ভগবান অতিকণ্ঠে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট। ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পার্বলিসিটি ডিপার্টমেন্ট অতিশয় রক্ষী, তাঁর 'মাথুর' সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন; জীপ, মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না; তাঁর টাউটরা উভয় পক্ষের পরস্পর খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডায় আঁড়া ফেলে দু'ধমন কাফিরদের সঙ্গে। তবেও হয়তো তিনি আরও দু'চারখানা বেশী ভোট পেতেন, যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামদুলাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমরাজ ভদ্রকার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনো তরীবে না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনো ক্লোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে ছিল তিনি ধর্মচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে নেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিস্টিং ব্যাংক! তবে এখানে নিছক সত্যের খাঁজরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে: গডের ধূম্ননরই যে শূন্য এই জাঁগির তুলেছিল তা নয়, এর কম-সে-কম পঁচিশ বছর আগে প্রাজ্ঞস্মরণীয় আন্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন, ‘অম্ম ! অম্ম ! যে ভগবান এখানে আমাদের কাছে আসে দিতে পারেন না, তিনি যে আমাদের স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না ।’

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রদ্ব শ থেকে বিদায় নিলেন ।

‘উম্মাদ, উম্মাদ, বশ্ব উম্মাদ !’ পাড়ি আজকেরা অবশ্য বলবেন, ‘ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তর্কপর্যন্ত প্রমাণ করার চেষ্টা বাতুলতা । এ সেই পূরনো লোকসঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে

সোনার জহুরী

নিকষে ঘষয়ে কমল

আ মরি আ মরি ॥

আম্মার উপলব্ধির চরম কাম্য দ্বন্দ্ব । তিন কোটি গাথা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে ম’য়া, ম’য়া, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন !’

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রদ্ব শের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি । সংগ্রামে পরাজিত, এমন কি নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পান না । তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, ‘ধর্ম গেল’, ‘ধর্ম গেল’, কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন ‘ইসলাম ইন ডেনজার’, তখন অধর্মের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না । ‘ইসলামের’ শব্দার্থ, ‘সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা ।’ খ্রীষ্টিয় যখন অজ্ঞানকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আবেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করেছেন । ‘সর্বধর্ম’ বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি different ideals, different values । আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন ‘আদর্শ’ বুঝিবা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য । তা নয় । সত্য এক । সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না । তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বললেন, ‘দশদিশ ভেল নিরবশ্ব’ ।

তাই সত্য নিরূপণার্থে স্বপ্নের প্রয়োজন হয়তো হয় । কিন্তু অবহেলা ভয়ংকর জিনিস ।

আমার মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, রোমকরা যদি প্রথম খৃষ্টানদের অত্যাচার না করে অবহেলা করতো, মন্সাবাসিগণ যদি মহাপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীদের নিষ্পত্তি না করতো তাহলে কি হত ?

উনিবিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মকে অবহেলা করা হল । গোড়ার দিকে যখন খৃষ্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয় । ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হল আত্মজিজ্ঞাসা—যে সভ্যতাহ, বহুবিবাহ, অপরোধ-প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে আপনমনে কোনো চিন্তাই করেননি, তাই নিয়ে

আরম্ভ হল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যে-রকম রাজনীতি, সাহিত্য ও ফুটবল-সিনেমা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে, ঠিক সেইরকম প্রায় একশ' বছর ধরে চললো ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা। রাম-মোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'সমাজে যে সব অনাচার প্রচলিত আছে, এর পিছনে ধর্মের সম্মতি নেই।' তাই নিয়ে চললো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর আলোচনা, প্রচুর আন্দোলন।

পঞ্চাশেরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র এবং মন একত্র হয়, সেখানে যদি ধর্ম অবহেলিত হয়, সেখানে যদি ধর্ম নিয়ে তর্ক আলোচনা না হয়, তাহলে শহরের গলিতে গলিতে এবং গ্রামে গ্রামে পুরুত-মোস্তাফা পেয়ে যান প্রায় অব্যাহত রাজস্ব—উদ্ভূত বলে, তখন তাদের 'দোনো হাত ঘি মে ঔর গর্দন ডেগমে'—ডেগাঁচির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ। বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারী পূজার নাম করে তুর্কিবিলা তছরুপাং, মা-দুর্গা চেহারা নেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পুজা-কমিটি-সেক্রেটারির লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানা যেন রবারের তৈরী, সর্বাস্থে সেটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপিস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন্ টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন! পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াবরুদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট, বার বার খসে পড়ছিল, বার বার হাত ওঠাচ্ছিলেন ঘোমড়া ঘোমটা দরস্ত করতে। শেষটায় নাকি সজ্জের দৃষ্টি পড়ে রইল মোস্তানীর হাত-কসরৎ দেখার দিকে।

শুনছি রুশের সংবিধানে নাকি আছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকার সর্ব কম্যুনিষ্টের আছে।' ফলে ঐ সময়কার একথানা রুশভাষায় লিখিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানের পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত কথোপকথন :

প্রথম ছাত্র : ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছাত্র : ওটা একটা বুদ্ধিজীবী কুসংস্কার—ভুতেরই মত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাবুলে থাকাকালীন স্নিয়েশকফ নামক একটি পরিবার—বাপ, মা, ছেলে—তিনজনাই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জয়গাঁটি এল, তখন স্নিয়েশকফ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা থাক।' ব্যাপারটা ১৯২৭ সালের। তখনো কম্যুনিষ্ট রেন্ডল্ফশন হাউসইলড এগু' হয়নি। জোয়ানদের সকলেই 'ইকনের সামনে বিড় বিড় করে বড় হয়েছে। আমি বললাম, 'থাকবে কেন? আমি তো বোধধর্মের বই পড়ি। সেখানেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা

হয়।'

তাপরে ১৯৪১৪২ সনে রুশ যখন হিটলারের হামলায় ঝান-ঝান, তখন শ্তালিন খুঁলে দিলেন বেবাক চার্চ, বিস্তর মঠ, নিমন্ত্রণ করলেন মিত্র ইংলন্ডের ডাক্তর পাদ্রীকে। আবার গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো, 'হে ঈশ্বর, হোলি রাশাকে ("হোলি" ?—তওবা, তওবা) বাঁচাও।'

সেই অরণ্যের মত জনসমাগম, ধর্মোচ্ছ্বাস দেখে শ্তালিন খুঁশী হয়েছিলেন, না পাড়ি কম্যুনিষ্টের যা হওয়া উচিত—ব্যাজার হয়েছিলেন, জানি নে। হয়তো বা বিষাদে হাঁরষ, কিংবা হাঁরষে বিষাদ। কে জানে।

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে তাকে অবহেলা করা হত, তবে বোধ হয় ঠিক এতটা হত না।

এক ঝাণ্ডা

বহু শক্তিকামী জন, দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। কারণ সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা মূর্খির নানা মত, নানা পাণ্ডার নানা দল। এসব ঝামেলার ভিতর ঢুকতে হলে প্রথমত দরকার গণ্ডারের মত চামড়া, দ্বিতীয়ত বিপক্ষকে নিম্নমভাবে হানবার মত ক্ষমতা, তৃতীয়ত দেশের নেতা হওয়ার মত এলেম এবং তাগদ আমার আছে—এই দস্ত। যদিও এ-সব নেই, তাঁরা হয়তো আপন গণ্ডির লোককে তাঁদের মতামত জানান, বড়-জোর কাগজে লিখে সেগুলো প্রকাশ করেন, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনীতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন তাঁরা এক ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়ান। সেদিন এসেছে।

পররাষ্ট্র জাতের একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করা। স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের অন্য কোন রাজনীতি থাকতে পারে না। বিধানসভা, রাজ্যসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি পাড়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে তখন বিরুদ্ধ পক্ষ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশের লোক যাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে তাকে তখন প্রশ্নজালে উদ্ধাস্ত না করা, কিংবা গুরুগম্ভীর মাতব্বরী ভর্তি উপদেশ দিয়ে তাঁর একাগ্র মনকে অথবা চম্পল না করা। যদি সে নেতার প্রতি দেশের আস্থা চলে যায়, তবে তাঁকে তাড়াবার জন্য গোপনে দল পাকাতে হয় না। দেশের সর্বসাধারণ তখন চিংকার করে ওঠে ও সে সময় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪০-এ চেম্বারলেন বেরকম মানে মানে সরে দাঁড়ালেন।

এটা শব্দ সম্ভব, যেখানে গণতন্ত্র আছে। ডিক্টেটরদের স্বৈরতন্ত্রে এ ব্যবস্থা নেই। সেখানে গেন্ডাপো, ওগপু বজ্রহস্তে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে—যতদিন পারে। তারপর একদিন মদুসলিনকে মরতে হয় গুলি খেয়ে

এবং মাথা নিচের দিক করে ঝুলতে হয় ল্যাম্পপোস্ট থেকে, হিটলারকে মরতে হয় আত্মহত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন, ‘আমি যে আমার ভগবানে বিশ্বাস করি তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন’—ঠিক-ঠিক কথাগুলো আমার মনে নেই বলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আমি যে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি, তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিশ্বাস করেন বলেই সে-স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই আপনাকে, আমাকে, আর পাঁচজনকে বিশ্বাস করেছেন—আমরা যে-রকম তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর সে বিশ্বাস ভঙ্গ না করি। শত্রু দেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই ভাষায় বলি, “আরাম হারাম হ্যায়!”

* * *

আমার দৃষ্টির অবধি নেই, শেষ পর্যন্ত চীনদেশ আমাদের আক্রমণ করল! প্রায় ষ্টিশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখন ভারতবাসীমাথেরই মর্মাহত হয়েছিল। সদয় পাঠক এস্থলে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে অনুমতি দিন। আমি তখন জার্মানীতে পড়াশুনা করি। সে সময় আমাকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে ‘চীন-জাপানের’ কথা ওঠে। আমি বলেছিলাম, ‘এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বৃকে বসে তার দাঁড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদ্ভুতের নিম্ন পরিহাস আর কি হতে পারে!’ পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত—এঁরা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। জার্মানী এসেছিলেন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন আমার দৃহত চোখে ধরে বললেন, ‘জাপান শক্তিশালী জাতি। অল্প চীনের প্রতি দ্রব দোঁখিয়ে তার বিরাগভাজন হতে যাবে কে? আপনি কোল সম্ভায় যা বললেন, সে শত্রু ভারতবাসীই বলতে পারে।’ অন্য জনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতুম, চীনা ভদ্রসন্তান অত্যন্ত সংযমী হয়, সহজে আপন অনুভূতি প্রকাশ করে না, কিন্তু এখানে এক কী করণ দৃশ্য! আর আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবন্ত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার।

আজ জানতে ইচ্ছা করে, এই দুই অধ্যাপক এখনো বেঁচে আছেন কি না! থাকলে তাঁরা কি ভাবছেন!

কিন্তু এ-সব কথা বলার প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে কত যুগের হার্দিক সম্পর্ক, সে তো ইন্সকুলের পড়ুরাও জানে। শত্রু এ-দেশ নয়, চীন দেশেও। কারণ চীন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আছে; আজ যদি চীনের টুথব্রাশ-মস্‌ট্যাশ্‌হীন নয়া হিটলাররা সে-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বর্বর অভি-

যানই কামা মনে করেন, তবে যে-সব সভ্য-ভূমিতে এখনো ঐতিহ্য সংস্কৃতির মৰ্যাদা আছে, তারা চীনের এই অব্যবসায়ী আচরণ দেখে স্তম্ভিত হবে। অবশ্য এ-আচরণ সম্পূর্ণ নতুন নয়। রুশ দেশ যখন প্রথম কম্যুনিজম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে-দেশও তার গগল, পূর্ণাঙ্গিন, তুর্গেনিয়েভ, চেখফকে ‘বুজুর্গা’, ‘শোষক’, ‘প্রগতিপরিপঙ্খী’ বলে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলে, কুপমন্ডুক হয়ে থাকতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—মানবসভ্যতার যে চিরন্তন দেয়ালী উৎসব চলছে, তাতে যদি রুশ তার ঐতিহ্যের প্রদীপ নির্ভয়ে বসে থাকে, তবে সে অশঙ্কার কোণ থেকে কেউ তাকে টেনে বের করবে না। তাই আজ আবার রুশ দেশ বিনা বিচারে তার সাহিত্যিকদের পুস্তক ছাপে—সেগলোতে সে বৃগের অনাগত কম্যুনিজমের জয়ধ্বনি থাক আর নাই থাক।

তাই যখন কম্যুনিজম গ্রহণ করার পর চীন বললে, ‘পৃথিবীতে হাজার রকমের ফুল ফুটুক’—তখন আমরা মনে করেছিলাম, অপরের প্রতি সাহসিকতার ঐতিহ্য স্মরণ করেই চীন এ-কথা বলেছে, কিন্তুকালের জন্যে রুশ আপন ঐতিহ্য অস্বীকার করে যে মূর্খতা দেখিয়েছিল, তার থেকে সে শিক্ষালাভ করেছে, এবং এখন লাওংসে কনফুংস এবং বোম্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে কম্যুনিজম মিশে গিয়ে এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-বন্টন পদ্ধতি দেখা দেবে। তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু সে এক্সপেরিমেন্ট যে বিশ্বজনের কৌতূহল আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই ‘হাজার রকমের ফুল ফুটুক’ যে নিতান্ত মূর্খের কথা, সেটা তিন দিনেই ধরা পড়ে পেল। আমরাই যে শব্দ ধরতে পেরেছি তাই নয়, চীনা আক্রমণের পরের দিনই এক সুইস কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। ছবিতে জনমানবহীন বিরাট বিস্তীর্ণ এক বরফে ঢাকা মাঠে মাঠে একটি ফুল ফুটেছে। তার নীচে লেখা ‘ভারতবর্ষ’। তারই পাশে দাঁড়িয়ে চু এন-লাই। পাশে যে সখা দাঁড়িয়ে, তাকে বলছেন, ‘এ-ফুলটি আমি তুলে নেব।’

অত সহজ নয়।

একদিন জাপান তার উত্তমর্গ চীনকে আক্রমণ করেছিল। আজ চীন তার উত্তমর্গ ভারতকে আক্রমণ করেছে।

চীন দেশ কখনো কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেনি। লাওংসে, কনফুংস যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন, তাতে আছে কি করে সাধু, সৎ জীবন স্থাপন করা যায়, কিন্তু ইহলোকে পরলোকে মানুষের চরম কাম্য কি, এই পঞ্চভূত পণ্ডিতপ্রসিদ্ধ মরমেহ-ঐতন্যের উদ্দেশ্যে আছে, কি করে সেখানে তথাগত হওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তারা কোনো চিন্তা করেননি।

অথচ বুদ্ধের বাণী যখন মন্ডু কার্ভিল রবে চীন দেশে পৌঁছিল, তখন থেকেই বহু চীনা এদেশে এসেছেন। ইংসিং, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চাঙ, আরো সামান্য কয়েকটি নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এরা ছাড়া এসেছেন আরো বহু বহু চীনা ভ্রমণ। বিশেষ করে য়ুয়ান চাঙের ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে আজও

মনে হয়, যেন পরশু দিনের লেখা ! বৌদ্ধ শ্রমণ যেমন যেমন ভারতের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তখন তাঁর স্বপ্নমনে কি উদ্বেজনা, ভারতবর্ষে পৌঁছে তার প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে তিনি কী রকম রোমাঞ্চ-কলেবর ! কামরূপের রাজা যখন তাঁকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন ঐ আপনার মাতৃভূমি, পঁচিশ মাইল হয় কি না হয়, তখন বুদ্ধ শ্রমণ চিন্তা করে-ছিলেন, কত না বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কত না ঘোরালাপে তাকে তথাগতের জন্মভূমিতে আসতে হয়েছে ।

ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে সসম্মানে সথারূপে গ্রহণ করেছিলেন ।

আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক ।

ভারতও তার রত্ন রূপ দেখাতে জানে ।

জয় হিন্দু ।

“রাঁধে মেয়ে কী চুল বাঁধে না ?”

চীনেদের ঠেঙিয়ে বের করতে হবে, এ তো বাঙলা কথা । কিন্তু ‘রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?’—এর অর্থটি সরল । যে মেয়ে রাঁধছে তার যদি খোঁপাটি তখন ঢিলে হয়ে যায় তবে সে কি রাঁধতে রাঁধতেই চুল বাঁধে না ? রাম্মা বড়ই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু চুল বাঁধাটা এমন কিছু মারাত্মক অপরিহার্য শূভকর্ম নয় যে, তদভাবে বাড়িসুদ্ধ লোক মারমুখো হয়ে ঢেলি নিয়ে বাড়ির বউয়ের দিকে তাড়া লাগাবে । তবু বাড়ির বউ জানে, রাঁধতে হয়, চুলও বাঁধতে হয় ।

অর্থাৎ চীনাকে ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা কাজ আছে । সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও দেশসুদ্ধ লোকের কষ্টের কুছন্দসাধনে লিপ্ত হয়ে শিবনেত্র হয়ে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না । অবশ্য এ কথা সত্য, যুদ্ধের বাজারে কোনটা যে ‘রাঁধা’ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক আর কোনটা যে ‘চুল বাঁধা’ অর্থাৎ দোহার, এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে যায় । ধড়িবাজ মেয়ে যে চুল বাঁধার ছল করে রাম্মার গাফিলি করে এটা জানা কথা, এবং কটুর গিন্নী যে বেধড়ক রাম্মার তোড়ে খাটাতার মত চেহারা বানিয়ে তোলেন সেও জানা কথা ।

এ দুটোর তফাত করবেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা । আমার শাস্ত্রাধিকার নেই । তবে কিঞ্চিৎ অতি সামান্য অভিজ্ঞতা আছে । একবার আমি অতিশয় অনিচ্ছায় এক খণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে তুচ্ছ উল্লেখেরও জীবন যে কি মর্মাস্তিক নিদারুণ হতে পারে তার প্রীহাতঙ্কী—পীতাতঙ্কের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না, ওটা আমার নেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম । সে দুর্দিনে পেটের ভাত জুটছিল না বলে ভয়ের চোটে সেটা শূন্যকিয়ে চাল হতে পারিনি । তার বর্ণনা পুস্তকাকারে ছাপিয়েও ছিলাম । তবে আপনারা সেটি পড়েছেন বলে মনে হয় না—বিক্ষিপ্ত চাটুয্যে স্ট্রীট তো তাই বলে ।

বিত্তীয়বার আমি স্যানা হয়ে গিয়েছি—কথায় বলে, ‘একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দু’বার ঠকলে তোমার ঘোষ।’ সন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উত্তম পক্ষের বন্দুধানকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন আমার প্রীতি বিত্তীয়বার উদ্ভাষণ হতে কবুল জবাব দিল, তখন নিরপেক্ষ ছিল অকুশলে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আমি আমার বন্দুভী স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করি (‘য পলায়তি স জীবতি’—কে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে!)।

দেশে ফিরেই কানটি সেটে দিলুম বেতারের লাউডস্পীকারের সঙ্গে। জার্মান কি বলছে না বলছে সে তো ইংরেজ এই কালা আধমুকি সন্ধ্যা হয়ে শোনাবে না। তারপর মস্তোকে বেতার। সেটা যখন হিটলার গর্দিয়ে দিল তখন কুই-বিশেষ। সেটাও যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়েও শোনা যায় না, তখন রুশদেশেরই ছোট্ট বেতার কেন্দ্র আজারবাইজান—ভাগ্যিস তারা ফার্সিতেও খবর প্রচার করত।

যুদ্ধের পর হালের বলদ নোকোর পাল বিক্রী করে বৃদ্ধ বাবদে জার্মান এবং ফরাসী বই কিনেছি দেদার। ইংরিজি বই এদেশে পাওয়া যায়। চুরি করে চালিয়ে নিই।

মোকা পাওয়া মাত্রই দু’বার জার্মানি ঘুরে এসেছি। ১৯৬৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-তে। এবং জোর গলায় পরিষ্কার করে ফের বলতে হল, প্রধানত মিশেছি নিয়মধায়েণী এবং ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে—তাদেরই মিলন-কেন্দ্র ক্লাইপেতে, লকালে বা বিয়ারখানায়, যা খুঁশি বলতে পারেন। বড়লোকদের সঙ্গে মিশেছি অপূই। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় মিশতে হয়েছে খানিকটা। ব্রুপ্‌স্টাইনসদের সঙ্গে মেশবার কোনো সুযোগই হয় নি। আমার লেখা গোথাসে না গিলে আশ্বে আশ্বে পড়লেই ঐ কথাটা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। জার্মানি সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান-গম্য তার ৯০ নং পঃ বিয়ারখানা থেকে সংগৃহীত, বাকিটা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের বাড়ি থেকে। তাদের সঙ্কলেরই মোটরগাড়ি ছিল কিন্তু দাসী, হাউস-টখটর, এমন কি হেল্পিং হ্যান্ডও ছিল না।

এর থেকে আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই জোরে দু’একটি কথা নিবেদন করি।

এই ‘চল বাঁধার’ কথাই ধরা যাক্‌।

১৯৩৯-এ হিটলার যখন লড়াইয়ের জিন্‌বোতল থেকে বের করে আসমানে ছেড়ে দিলেন তখন বৃদ্ধ বাবদে তারও অভিজ্ঞতা ছিল কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি করপরেসনরূপে লড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে করে তো ‘অল আউট ওয়ার’ সম্বন্ধে ওকী-হাল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, সর্বপ্রথম উচিত-কর্ম হচ্ছে, বিলাসব্যসন ত্যাগ করা। তাই বৃদ্ধ করে দাও হেয়ার ড্রেসিং সলুনগুলো।

এখানে একটুখানিক সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়, জার্মানির শহুরে মেয়েরা এই ড্রেসিং সলনের উপর কতখানি নির্ভর করে। এবং আজকের চেয়ে ১৯৩৯

সালে নির্ভর করত আরো অনেক বেশী। তখনো পাম্পানেশ্ট ওয়েড-এর জোর রেওয়াজ। সলুনওলী প্রথম চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে পরিষে দেয় এক মদুকুট, চালিয়ে দেয় ইলেক্ট্রি যন্ত্র। এসবের মারপ্যাঁচ আমি বদ্বিধি নে। তবে মদুকুট খোলার পর দেখা যায়, দিব্য ঢেউ-খেলানো চুল হয়ে গিয়েছে। নতুন করে গোড়ার দিকের চুল বেশ খানিকটে না গজানো পর্যন্ত এ ঢেউ লোপ পায় না।

যারা সলুনে ঢেউ-খেলানো চুলের মাথা বানিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মস্তকে হল বজ্রাঘাত—হিটলারের এই হুকুম শুনেন। শহরের বহু বহু মেয়ে আপন চুলের তদারকি নিজে করতে পারে না। এক মাসের ভিতরই দেখা গেল মাথায় মাথায় বাবুইয়ের বাসা। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে হুজুর হিটলারের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়! সবাই গিয়ে কেঁদে পড়লেন ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের পায়ে। এভা ব্রাউন, রীফেনটালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে হিটলার প্রায় প্রতিদিন গ্যোবেল্‌সের বাড়ি যেতেন। শেষ দিন পর্যন্ত হিটলারের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি—স্বৈরভ্রমের সর্বধিনায়কের উপর যতখানি হতে পারে। (তাই ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স যখন জানতে পারলেন হিটলার আত্মহত্যা করবেন, তখন তিনি বললেন, ‘ফ্যুরার-হীন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ, আমিও আত্মহত্যা করব’, এবং তিনি তাই করেও ছিলেন।)

ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স হিটলারের সামনে গিয়ে বললেন, ‘মাইন ফ্যুরার (প্রভু আমার) ! আপনি কি চান যে আপনার জওয়ানরা রণক্ষেত্র থেকে ছুটিতে ফিরে এসে দেখুক কতকগুলো উস্কেখুস্কে চুলওলী খাটাশীদের?’

হিটলার আইন নাকচ করে দিলেন।

তাই বলছিলুম রীথে মেয়ে কি চুল বঁধে না ?

* * *

এখন প্রশ্ন, কোন্ কোন্ কর্ম স্থগিত রাখতে হবে, আর কোন্ কোন্ কর্ম আরো জোরসে চালাতে হবে। পূর্বেই এ-প্রশ্নের আভাস দিয়েছি এবং এখনো বলছি, আমি সমাজপতি নই, কাজেই আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তবে একটা কথা বলতে পারি, বুক ঠুকে বলতে পারি—আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই। অর্বাচীন চীনের আচরণে ব্যথিত হয়ে আমাদের শিবুদা (শিবরাম চক্রবর্তী) যদি মশকরা করতে ভুলে যান তবে আমি হাসতে হাসতে তাঁকেই জবাই করব।

এই হাসতে পারাটা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। পশ্চিমতন্ত্রী চীনকে বিশ্বাস করে যে ঠকেছেন তাই নিয়ে সূবে বিলেড-মার্কিন পশ্চিম ইয়োরোপ হাসছে। কত না কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র বেরোচ্ছে। আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি নে সত্য কিন্তু শীতকালে ঠোঁট ফেটে গেলে লোক যে রকম হাসে সে রকম হাসছি তো সত্য। কারণ একা পশ্চিমতন্ত্রী তো চীনকে বিশ্বাস করেননি, আপনি আমি রামা-শ্যামারাগ করেছিলুম। এখন সবাই আমাদের নিয়ে হাসছে। এ অবস্থায় আমাদের চটে যাওয়াটা অতিশয় অরসিকের কর্ম হবে। আমরাই শূদ্ধ দুর্নিয়ায় পাগলামি, দুষ্টামি দেখে হাসব, আর আমাদের সরলতা আমাদের ভালো-মান-

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৩

যামী যেখে অন্য লোকের হাসি আমরা সহিব না, এটা কোনো ভালো কথা নয়।

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলাম।

পূর্ব জম'নীর এক কুকুর পশ্চিম জম'নীর মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শূধোলে, 'তোকে কি খেতে দেবো বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাণ্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জম'নীর কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্ক্! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে! তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শূধোলে, 'তবে, তবে, কিছ্ একটা চাট'বি? জল? শরবৎ? ধূধ? মদ?'

'না, ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিছ্ দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসে-ছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে?'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে খেউ খেউ করা যায়। আমি খেউ খেউ করব।'

*

*

*

ঐ হল লৌহ-স্বনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চে'চিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইনকানুন সর্ব'নেশে। আমরা এদিকে যত খুশি খেউ খেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

ওয়ার এম

রাজা প্রজাগণকে কহিলেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত' বংশের^১ ন্যায় অচিরে বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্যে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।^২ আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষতঃ অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকল্যাণাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে! তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে যার-

১. ২ ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়ার-বনড, ডিফেন্‌স্ সার্টিফিকেট'।

পরনাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন-উৎপাদনপূর্বক^৪ রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।’

রাজ্যপালন সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মকে প্রশ্ন করায় ভীষ্মের উত্তর। মহাভারত, শান্তিপর্ব, সম্ভাষণীতম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে তৃতীয় খণ্ড, ৪৬০ পৃঃ ॥

যুদ্ধ কাম্য নয়। একথা সত্য, যুদ্ধের সময় অনেকেই আপন শৌর্য, বীরত্ব দেখিয়ে আপন জাতকে গৌরবান্বিত করেন, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যায়, যুদ্ধে অমঙ্গলের অংশই বেশী।

তাই যখন কোনো জাতিকে বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়—আজ আমরা যে-রকম নেমেছি—তখন তাকে খুব ভালো করে, অতিশয় সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে আবেগ-উচ্ছ্বাসসরিহিত হৃদয়ে চিন্তা করে নিতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায়? একে বলা হয় ওয়ার এম্।

তার খানিকটা নিভর করে বিপক্ষের মতলবটা কি, সে কি চায়—তার ওপর।

চীন প্রাচ্যদেশের জনবলে বলীয়ান মহারাষ্ট্র। কিন্তু জন থাকলেই ধন হয়

৪ ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাকশন্ বাড়ানো। অর্থাৎ ইনডাসট্রিয়াল ও এগ্রিকালচারল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, ববর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আশ্বাসী খলিফার রাজধানী বাগদাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হ’ল, তখন মঙ্গল সেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহরৎ। নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম আহারাদি। খেতে খেতে খলিফাকে শব্দধোলেন, ‘হুজুর, যাচ্ছেন না কেন?’ হুজুর চুপ করে রইলেন। পদনরায় সেই প্রশ্ন। পদনরায় ‘নো রিপ্লাই’। তৃতীয় বারে নিরুপায় হয়ে খলিফা বললেন, ‘এগুলো তো খাবার জিনিস নয়।’ মঙ্গল বললেন, ‘সে কি হুজুর, আপনার রাজত্ব জয় করার পর আপনার ধনাগার বোঝাই পেলুম এই সব সোনা-জহর। ভাবলুম এগুলো বন্দি আপনি খান। অন্য কোনো কাজে লাগাননি তাই।’

অর্থাৎ, শুধু ধন দিয়ে সব-কিছু হয় না।

তা হলে ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি হত না।

হিটলার কি আদর্শ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সেটা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ দেউলে রাষ্ট্রকে তিনি কি করে জোরদার করলেন সেটা জানা উচিত। তিনিও বলেছিলেন, ‘আমার ব্যাঙ্ক সোনা-জহর নেই। বয়ে গেল! আমি চাই জেয়ান মেয়েমন্দ। যারা উৎপাদন করতে পারে। আপন বাহুবলে। আমি রাজা, তখন সেগুলো কিনব।’ তাই ভীষ্মদেব ধন উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন।

না। চীন গরীব দেশ। তাই গত দশ-বারো বৎসর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি করে সে আপন ধনদৌলত বাড়াতে পারে। প্রধানত রুশের সাহায্যে।

ইতিমধ্যে এই নয়া কম্যুনিষ্ট জাত অর্থাৎ চীন-খানদানী কম্যুনিষ্ট জাত অর্থাৎ রুশকেও খানদানিচ্ছে এক কাঠি ছাড়িয়ে যেতে চাইল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আকছারই হয়েছে। পূর্ববাংলায় মুসলমানরা বলে, ‘নয়া মুসলমান গোরু খাওয়ার যম হয়।’ অর্থাৎ শ্মশানের চাঁড়াল যদি হঠাৎ দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যায় তবে তার বাড়িতে যা সম্ভ্রম-আহিকের ঘটনা লাগে তা দেখে জাতি-ব্রাহ্মণ পরিগ্রাহ্য রব ছাড়ে। চীন বেশ কড়া গলায় রাশাকে বললে, ‘তুমি যেভাবে মার্কিনিংয়ের সঙ্গে দহরম-মহরম করছ সেটা মার্ক’স্-লেনিনবাদের বিশ্ব-কম্যুনিজম আশ্রয় আনয়ন করার বিপক্ষে যায়। তুমি শাস্তি চাইছ; এ করে এখনকার মত শাস্তি পাছ বটে, কিন্তু চিরন্তন শাস্তি আসবে একমাত্র বিশ্ব-কম্যুনিজমের ফলরূপে। তার জন্য দরকার আপন “ধমে”—অর্থাৎ কম্যুনিজমে—বিশ্বাস। তার অর্থ শাস্তির মারফতে ইহসংসারে কোনো প্রকারের প্রগতি হয় না। সর্ব প্রগতি যুদ্ধের মাধ্যমে। অতএব মার্কিনিংয়ের যেখানে বলবে “শাস্তি চাই”, তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে “যুদ্ধ চাই”। এই করে আসবে বিশ্ব-কম্যুনিজম।

রুশ বললে, ‘হক্ কথা। কিন্তু মার্ক’স্-লেনিনের আমলে অ্যাটম বম্ ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ চালাই তবে আত্মের যে সব-কুছ ল’ডভ’ড হারখার হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে কে?’

এখানে এসে চীন কিছু বলে না। কারণ চীন জানে, রুশ ইংল’ড-আমেরিকার জনসংখ্যা ৯৯ পার্সেন্ট মরে গেলেও তার আপন দেশে থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক। কারণ তার জনসংখ্যা সঙ্কলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তারাই তখন পৃথিবীর রাজত্ব করবে।

এটা কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। ১৯৩৮-এ ইংরেজ-ফরাসী চেয়েছিল হিটলারে-স্তালিনে লড়াই লাগিয়ে দুই ব্যাটাই মরে; তাঁরা পরমানন্দে বিশ্বসংসারটা চষে বেড়াবেন।

কটুর কম্যুনিষ্ট বিশ্বাস করে যে, যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তার কাছে মার্কিন যা ভারতবাসীও তা। ইংরিজীতে কথায় কথায় বলে যে আমার স্বপক্ষে নয় সে আমার শত্রু—নিরপেক্ষ বলে কোনো জিনিস নেই। কাজেই আমরা যে ভারতীয়েরা চীনের শত্রু-মিত্র কিছুই নই, আমরাও তার শত্রু—আমাদের একমাত্র ‘অপরাধ’ আমরা কম্যুনিষ্ট নই—অথচ ধর্ম জানেন, আমরা কম্যুনিষ্টদের প্রতি ষড়যন্ত্রি সহনশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যান্ড অত্যাচারি হবে না। যদি আজ পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তবে কম্যুনিষ্টদের ঠেঙিয়ে ঠান্ডা করে দেবে। এই যে পশ্চিম জার্মানী গণতান্ত্রিক দেশ, সেও কম্যুনিষ্টদের বরদাস্ত করে না।

খুশ্চভ এ তথ্যটি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ভারতকে শত্রুর চোখে

দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি এবং অন্য কম্যুনিষ্টরা যদি আমাদের দিকে চোখ রাঙায়—আক্রমণ দূরে থাক—তবে আমরা পুরোপাক্ষা ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গিয়ে মার্কিনকে আমাদের দেশে বিমানঘাটি বানাতে দেব, এবং শেষ হিসেবের দিন তার হয়ে রুশের বিরুদ্ধে লড়ব।

চীন যখন রাশাকে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করতে পারলো না, এবং শত্রু তাই নয়, রুশ যখন চীনের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করতে পেরে তার সর্ব সাহায্য বন্ধ করে দিল—শুনতে পাই রাশানরা চীন ত্যাগ করার ফলে তাদের তৈরী কারখানাগুলো চালকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে—তখন চীন বললে, ‘এটার একটা ইস্-পার-উস্-পার করতে হবে। আমি ভারত আক্রমণ করে দেখি রুশ তখন কি করে? সে তো আর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র—অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য করতে পারবে না।’

এইটে চীনের গোণ ওয়ার এম্—যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মুখ্য ওয়ার এম্ তবে কি?

পোলান্ড-রুশের বিরুদ্ধে হিটলারের ওয়ার এম্ ছিল, (১) ওদের সৈন্য-বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করা, (২) ওদের নেতৃস্থানীয় কমিসারদের নিধন করা—তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, অর্থাৎ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। (৩) তাদের রাজস্ব জর্মন্দের বসতি স্থাপনা করে তাদের দিয়ে দাসের কাজ করানো।

রুশভেগ্ট ঠিক অতখানি চাননি। তবে তিনিও জর্মন্দের কাছ থেকে শত্ৰুহীন আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন—আনর্কিডিশনাল সারেন্ডার। অর্থাৎ তিনি নাৎসী গুন্ডা ও জর্মন্ জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি। চার্চিল এটা পছন্দ করেননি—তিনি চেয়েছিলেন নাৎসী রাষ্ট্রের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ঐ ছিল তাঁর ওয়ার এম্।

চীন আমাদের সমূলে ধ্বংস করে এ-দেশে চীনা চাষাভুষার বসত করতে চায় নি, কিন্তু চীনের অন্যতম ওয়ার এম্ ছিল এদেশে কম্যুনিষ্ট রাজ বসানো। চীন আশা করেছিল, সে ভারতে হামলা দেওয়া মাত্রই এ-দেশের কম্যুনিষ্টরা দেশের জনসাধারণকে তাতিয়ে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বসাতে পারবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল না। এমন কি অনেক খাঁটি কম্যুনিষ্ট, চীনের এ আচরণে অত্যন্ত লাজ্জিত হয়েছেন এবং অনেকেই পিণ্ডিতজীর ঝাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন—আর খুঁচুচু-পশ্থীরা তো রীতিমত উম্মা প্রকাশ করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, চীনাদের এ ওয়ার এম্ উপস্থিত মূলতবী থাকলেও সেটাকে সে কখনো বর্জন করবে না। আমাদের তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে—হয়তো বা বহু বৎসর ধরে।

আমার মনে হয় চীন চায় আমাদের পঙ্গু করে রাখতে। প্রাচ্য দেশের দুই বিরাট ভূখণ্ড চীন এবং ভারত। ভারত কম্যুনিষ্ট না হয়েও দেশের ধনদৌলত বাড়াতে চেয়েছে, আর চীন কম্যুনিজমের মাধ্যমে। এবং চীন যে বিশেষ সফল হয়নি এ কথা বিশ্বসৃদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যে অনেক-

খানি এগিয়ে গিয়েছি সেও জানা কথা। আথেরে তা হলে আমরাই প্রাচ্য দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় হবো। চীনের কতরা এটা কিছতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না।

তাই তাঁদের মতলব আমরা যেন আমাদের ধনদৌলত বাড়ানো বন্ধ করে বন্দুক-কামানের দিকে মন দিই। তাই নিয়ে চীনের কোনো আশংকা নেই, কারণ চীন বিলক্ষণ জানে, আমাদের বন্দুক-কামান যতই বাড়ুক না কেন, আমরা কখনো চীন আক্রমণ করবো না। মাঝের থেকে বন্দ্য বন্দুক-কামানের সেবা করে আমাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি ক্ষান্ত হবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বন্দুক-কামান বাড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওয়ার এম্ চীনার বিনাশ-সাধন নয়। আমাদের ওয়ার এম্ অত্যন্ত লিমিটেড—সংকটকালে আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা। এবং ভবিষ্যতে যেন সে দস্ত-ভরে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়। তার জন্য বেশ কয়েক বৎসর ধরে বন্দুক-কামান বানাতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরীব-দুঃখীর মধ্যে অল্প তুলে দেবার জন্য আমাদের ধনদৌলতও বাড়াতে হবে।

তাই বলছিলাম, রাঁধবো এবং চুলও বাঁধবো।

ছা গল্

একপাল কাকের মধ্যখানে ডাংডা ছুঁড়ে মারলে যা হয়, কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপামেরিকায় তাই হয়ে গেল। বারোয়ারী বাজার, বারোর হাট, যুক্তহট্ট—যা খুশি বলুন—তারই দিকে তাগ করে জেনেরাল শার্ল দ্য গল্ ইংরেজকে জল-চল করার বিরুদ্ধে যে ডাংডাখানি হালে ছুঁড়লেন, তারই ফলে ইউরোপামেরিকায় তো কা-কা রব উঠেছেই, এদেশেও কা-কা রব ছাড়িয়ে উঠছে স্বাস্থ্যের প্রবাস। এ অধম অর্থনীতির খবর রাখে যতখানি নিতান্ত না রাখলেই নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সর্বিনয়ে বলবো, যত দিন যাচ্ছে ততই অর্থবিদ ‘প্যানডিট’দের প্রতি ভক্তি আমার কমছে।’ মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি, তবু এই সুবাদে নিবেদন, এদেশের কতরা যে ভয়ে আতকে উঠেছিলেন, রিটন্ বারোর বাজারে ঢুকে পড়লে ভারতীয় মাল অনায়াসে রিটেনে ঢুকতে

১ হিটলার এঁদের নিয়ে বড় মস্করা করতেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি যখন দেশের ভার কাঁধে নিয়ে বেকার-সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করলাম তখন দাঁড়িওলা অর্থবিদ অধ্যাপকরা ভল্যাম ভল্যাম কেতাব লিখে সপ্রমাণ করলেন, দেশের সর্বনাশ হবে। যখন সমাধান করে ফেললাম, তখন ফের ভল্যাম ভল্যাম কেতাব বেরোলো যাদের মূল বক্তব্য, “বলোছিলাম, তখনই বলোছিলাম, এই সমস্যার এই সমাধানই বটে”।’ কেইনস্, শাখ্‌ট, শুমপেটার কজন?

পারবে না, আমার হৃদয় সে ভয়ে কঁপিত নয়। বস্তুত আমি কাম্বোজের মত বলবো, এই বিলিভী তথাকথিত সুখ-সুবিধেই আমাদের সর্বনাশ করছে। দুনিয়ার সব্বত্র আমরা প্রতিষ্ঠাশ্রিতা করে নিজের মাল চালাবার চেষ্টা করছি নে। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া ক্যাপিটালিস্টরা ইংরেজের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লক্ষ্মীলাভ করছেন। কিন্তু ওদেরই বা দোষ দিই কেন? স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার বার এ নির্জন প্রান্তরে আমি চিন্তা করছিলাম, তাঁর সব কিছই তো অস্পষ্ট বদ্বি, তাঁর ‘রাজযোগ’ আমার নিত্যপথ-প্রদর্শক,—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কথা, বড় কাজ কি ছিল? যে সিংহাস্তে পেঁছিলুম সেটি জড়জ্বনাশ। চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং কর্মে আমরা জড় হয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে কর্মে। গীতায় আছে, কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নেই। আমরা গীতার উপর আরেক কাঠি সরেস হয়ে গেলুম। বললুম, ‘কর্মেও আমাদের অধিকার নেই।’

‘এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বদ্বি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস^১ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার^২ এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চুড়ামণির দল পদার্থ খুলে বলেন, বেহুঁশ^৩ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুদ্ধি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকে, “প্রবৃদ্ধিমিব সুপ্তঃ”।’

সুপ্তি তবু ভালো। তার থেকে জাগৃতি আছে। কিন্তু জড়ত্বের কোনো ম্যাদ নেই।

এই জড়ত্বেরই অন্য শব্দ ক্রৈব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, “ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ।”

পাণ্ডিত্যীও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলছেন—‘আমরা যেন কমপ্লেন্সেন্সের স্রোতে গা ঢেলে না দিই—ক্ষণতরে চীন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে।’ কমপ্লেন্সেন্স জড়ত্বেরই ভিন্ন নাম।

আমাদের ছাত্রেরা গাইডবুক মূখস্থ করে পাস করে, আমরা—অধ্যাপকরা—শ্রিশ বৎসর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলাম তাই পড়িয়ে কর্তব্য সমাধান করি, আমাদের ধার্মিকজন কোনো এক গুরুদেবে আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন পালন হল বলে আশ্বস্ত হন, যে-বই লিখে আমাদের সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তিনি বার বার সেইটেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আমাদের ফিল্ম-পরিচালকেরা একই প্লট সাতাশ বার দেখান, এবং যে ব্যবসায়ীদের কথা নিয়ে এ-অনুচ্ছেদ আরম্ভ

২, ৩, ৪ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়বিংশ খণ্ডের ১৩১ পৃঃ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ‘হুঁস’, সঙ্গে সঙ্গে ‘হুঁশিয়ার’ এবং ‘বেহুঁশ’ লিখলেন কেন? খনে ‘স’ খনে ‘শ’? স্পষ্টত একই মূল থেকে তিনটি শব্দ তো এসেছে।

করেছিলুম—একই বাজারে বছরের পর বছর মাল পাঠিয়ে পরমানন্দে শয্যায়া গা এলিয়ে দেন। ‘নব নব সঙ্কটের অভিযানে’ পদক্ষেপ করার জন্য যে বিধিদত্ত প্রাণশক্তি আমাদের রয়েছে সেটা জড়ত্বের বন্ধ্যাকে আচ্ছাদিত।

আমাদের ‘জীর্ণ আবেশ’ ‘সূকঠোর ঘাতে’ কাটাবার জন্য স্বামীজী এনে-ছিলেন ‘জড়ত্ব-নাশা মৃত্যুঞ্জয় আশা’।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীর উদ্দাম অফুরন্ত স্বতন্ত্র প্রাণশক্তি দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভয় পেয়ে বললেন, ‘এ আমি কি গড়লুম!’ তাই সে ‘ভুল শোধরাবার’ জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি নিজের কাছে টেনে নিলেন। শঙ্করাচার্যকে যে-রকম টেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যকে যে-রকম।

*

*

*

আশা করি কেউ ভাববেন না দ্য গল্কে আমি চৈতন্য স্বামীজীর পর্ষায়ে তুলছি : কিংবা আমি দ্য গলের গলে মালা পরাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। স্বরূপবিস্তার নিবেদন করি।

ইংরেজের যে-রকম রাজকীয় সেন্ডহাস্ট সামরিক বিদ্যালয়, ফরাসীর তেমনি স্যার সীর। দ্য গল সেখানে শিক্ষালাভ করেন। ছাশিষ বছর বয়সে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জর্মন্দের কাছে বন্দী হন। এই সময় বন্দী অবস্থায় তিনি জর্মন্ ভাষা শিখে নেন। হালে তিনি জর্মন্গণ কতৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ দেশ ভ্রমণের সময় একাধিক শহরে জর্মন্ ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের কোনো রাষ্ট্রপতি জর্মন্নীতে যাননি—নেপোলিয়নের কথা বাদ দিলে, তিনি গিয়েছিলেন বিজেতারূপে—তার উপর ইনি বলছেন তাদেরই মাতৃভাষা, জর্মন্-রাত্তর। তাদের হর্ষধ্বনি বেতারে শুনিয়েছি।

কিন্তু পুরানো কথায় ফিরে যাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিন ফরাসী বীর দেশের সম্মান পেতেন। ফক, জফর এবং পেতী। প্রথম দুজন মারা যাবার পর পেতীই ফ্রান্সের রক্ষণবিভাগের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সূক্ষ্মজিত প্রাকার নির্মাণই ফ্রান্স সংরক্ষণের জন্য প্রশস্ততম—ফলে কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হল মাজিনো লাইন—বহুশত বৎসর পূর্বে চীনারা যে-রকম দেওয়াল গড়েছিল।

দ্য গল্ ছিলেন পেতীর সহকর্মী। কিন্তু পদে পদে তিনি পেতীর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বার বার বলেছেন, এরকম পাঁচিল তুলে, জড়ভরতের মত পিছনে বসে থাকলে আত্মরক্ষা হয় না। পেতী তাঁর কথায় কান দেননি।

তারপর যখন ১৯৪০-এ ফ্রান্স নির্মমভাবে পরাজিত হল তখন সবাই বদ্বলো প্রাচীন যুগের দেয়াল-বাঁধার জড়ত্ব সত্য সংরক্ষণ নয়।

এইখানেই দ্য গলের মাহাত্ম্য!

॥ দুই ॥

ফরাসী বিদ্রোহ শেষ হলে পর এক ফরাসী নাগরিক জনৈক নামজাদা জাঁদরেলকে শ্রুত্বায়, ‘মিসিয়ো ল্য জেনারেল, এই যদুগান্তকারী বিদ্রোহে আপনার ক’ল্লিবিউসিয়ো—“অবদান”—কি ছিল?’ মিসিয়ো ল্য জেনারেল গৌফ মোচড়াতে মোচড়াতে সপ্রতিভ মৃদু হাস্য হেসে বলেছিলেন, ‘পৈতৃক প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।’

বাস্তবিকই তখন ঘড়ি ঘড়ি কণ্ঠধার বদল, এবং এক এক কণ্ঠধার প্রান্তন অন্য কণ্ঠধারের কণ্ঠকতন করেই সম্মুখীন নন, কানের সঙ্গে মাথাও চান। হালে ইরাকে যা।

১৯১৮ এবং ১৯৪০-এর মাঝখানের সময়টাতে একই ধূস্রধুমার। তবে মাথা কাটাকাটি আর হত না। শ্রুত্ব ‘মিস্ত্রিসভার পতন’ নিয়েই উভয় পক্ষ সম্মুখীন হতেন। এবং এসব পতন সর্বক্ষণ লেগে থাকত বলে ১৯৩৮-এ এক ফরাসী কাফেতে চুকুশ চুকুশ করতে করতে বলেছিল, ‘এই প্যারিসেই অস্তুত হাজার খানেক প্রান্তন মস্ত্রী আছেন। একটু কান পাতলেই শ্রুত্বতে পাবে, পাশের টেবিলে কেউ বলেছে, “ক’ৎ জেতে ল্য মিনিস্ংর”—আমি যখন মস্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।’ তারপর সেই ফরাসী আমাকে সাবধান করে দেয়, আমি যেন বেশী দিন ফ্রান্স না থাকি; বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ হয়তো একদিন ক্যাক করে পাকড়ে নিয়ে মস্ত্রী বানিয়ে দেবে। তাঁর উপদেশ আমি পদ্রোপদ্রি নিইনি। তবে কাফেতে বসে প্রায়ই অজানা জনকে বলতুম, ‘ক’ৎ জেতে ল্য মিনিস্ংর—আমি যখন মস্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।’ আশ্চর্য কারো চোখে অবিশ্বাসের আমেজ দেখিনি। ফরাসী কলনী আলজেরিয়া থেকে কালা আদমী ভী মিসিয়ো ল্য মিনিস্ংর হতে আপত্তি কি?

তা সে কথা থাক্।

আসল কথা হচ্ছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ানে বিস্তর বই বেরোয়, ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে! এতদিন পর আমার আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় মাদাম তাবুই লিখিত একখানা বই বাজারে বেশ নাম কেনে।

ইংরেজী অনুবাদে তার নাম ছিল, ‘পেরিফিডিয়াস আলবিয়োন অর্ অর্জাঁৎ-কর্দিয়াল?’—‘বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ কিংবা তার সঙ্গে দোস্তী?’

বৈঠে মেরেছি সমস্ত রাত; ভোরবেলা দেখি, ব্যাড্রি ঘাটেই নৌকা বাঁধা। ব্যাপার কি? যে-দাড়িতে নৌকা বাঁধা ছিল সেটা খুলিনি।

৫ ম্যাট্রিকের বাঙলা পরীক্ষায় একটি ছেলে লিখেছেন,

নৃপতি বিশ্বসার

নমিয়া বৃন্দে মাগিয়া লইয়া

পদ নাক কান তাঁর

এও তাই। দ্য গল আবার ফিরে এসেছেন যেখানে মাদাম তাবুই আপন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পাকাপাকি কোনো দোস্তী করা যায় কি না? পূর্বেই বলছি, দুই যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সে এতই ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হত যে, ভেবেচিন্তে ইংরেজের সঙ্গে কোনো একটা চুক্তি—আর্থাৎ—করা, কিংবা আরো মনস্থির করে না-করা, কোনোটাই করা যেত না। মাদাম তাবুইয়ের বিশ্লেষণ—যতদূর মনে পড়ছে—একটু অন্য ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, উভয় দেশেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোনো পাকাপাকি সমঝোতায় আসতে পারছি না। তার কারণ, আমাদের এখানে যখন গরমপছীরা (কনজারভেটিভ) মন্ত্রিসভা গড়েন, তখন বিলেতে নরমপছীরা (লিবরেল অথবা লেবার), এবং আমরা যখন নরম তখন ওরা গরম।

তা সে যে-কোনো কারণেই হ'ক, দুই যুদ্ধের মাঝখানে কোথায় না ফরাসী-ইংরেজ একজোট হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্স হ'ক, কিংবা অন্যত্রই হ'ক পাকা বন্ধনস্বাদ গড়ে তুলবে, না আরম্ভ হল দু-জনাতে খ্যাচা-খেউ। এর উদাহরণ তো মাদাম তাবুই প্রচুর দিয়েছেন। তাঁর বই বেরোনোর পরের শেষ উদাহরণ আমরা দিই। হের হিটলার যখন সগর্বে সমস্তে রাইনল্যান্ডকে সমরসম্ভায় সাজাতে আরম্ভ করলেন তখন ফ্রান্স আতঁকঠে সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভের্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, জার্মান এ কর্মটি করতে পারবে না, এবং সে চুক্তির বরাত ফরাসী ইংরেজ দু-জনের উপর ছিল। ইংরেজ সে আতঁরব শব্দে সাড়া তো দিলই না, উল্টে দেখা গেল, সে গোপনে গোপনে হিটলারের সঙ্গে একটা নৌচুক্তি করে বসে আছে। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী এম্বলে বোঝা কঠিন নয়—তা আপনারা সেটাকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ ‘পারফিড’ বলুন আর নাই বলুন। তার শক্তি জলে। হিটলার যদি তাকে কথা দেয়, সে সেখানে লড়ালড়ি করবে না, তবে চুলোয় থাক রাইনল্যান্ডের সমরসম্ভা।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। ফ্রান্স গেল। ব্রিটন যায়-যায়। প্রথমবারের মত এবারও মূর্শকিল-আসান মার্কিন সবাইকে বাঁচালে।

কোথায় না এখন এ-দুজাত শিখবে একজোটে কাজ করতে, যাতে করে ফের না একটা লড়াই লাগে, উল্টে দ্য গল লেগে গেলেন ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপের উপর সর্দারী করতে!

দ্য গলের বিশ্বাস, ইংরেজ তার সর্বস্ব বেচে দিয়েছে মার্কিনের কাছে। তাই মার্কিন ইংরেজের কাঁধে ভর করে ইয়োরোপে নেবে সেখানে সর্দারী করতে চায়। পক্ষান্তরে ফ্রাঁস, লা ফ্রাঁস, তুজুর লা ফ্রাঁস। বাঙলা কথায়, সভ্যতা-ঐতিহ্য-বৈদ্যোদয় মক্কাদিনা ফ্রাঁস। ইয়োরোপ তথা তাবৎ দুনিয়ার কেউ যদি সর্দারী করার হুকু ধরে তবে সে ফ্রাঁস।

তাই তিনি করতে চাইলেন জার্মানীর সঙ্গে দোস্তী। তা তিনি করুন। খুব ভালো কথা। দোস্তী ভালো জিনিস।

তারপর তিনি হাত বাড়ালেন খুশ্চফের দিকে। সেও ভালো কথা। আমরা—অন্তত আমি—রাশার শত্রু নই।

ইংরেজ চাইলে, চতুর্দিকে এত সব দেদার দোস্তী হচ্ছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? বারোয়ারী বাজারে সে-ই বা ঢুকবে না কেন?

দ্য গল মারলেন ইংরেজের গালে চড়।

এখন কি হবে?

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ফ্রান্স যে সর্দারী করতে চাইছে তার মত কোমরের জোর তার নেই। জর্মনির সঙ্গে তার দোস্তীও বেশীদিন টিকবে না। কারণ জর্মনি চায়, পূর্ব-পশ্চিম জর্মনির সম্মেলন। রাশা তার প্রতিবন্ধক। দ্য গলকে একদিন তার বোঝাপড়া করতে হবে। তখন হয় জর্মনি না হয় রাশাকে হারাতে হবে! তখন কোথায় রইল ইয়োরোপের উপর সর্দারী?

তলস্তয়

“কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।” রবীন্দ্র-জীবনের সন্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের মৃত্যু-সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গব্বার কাছে পৌঁছিল, তখন তিনি তাঁর শোকার্লিপ শেষ করার সময় লিখেছিলেন, ‘তাঁর দিকে তাকিয়ে—যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি নে—মনে মনে বলেছিলুম “এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড-লাইক)”।’

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন পদ্ধতিতে? ভারতীয় আশ্রম উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং জৈন ওঁদের পূজা করেন অবতার-রূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর ‘প্রফেট’, ‘পয়গম্বর’, ‘রসূল’, ‘প্রেরিত পুরুষ’ নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এঁরা কখনো কখনো অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনো হন না।

খৃষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনো বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনো ঈশ্বর-রূপে কখনো বা স্বেচ্ছামাত্র ‘প্রেরিত পুরুষ’ রূপে অর্থাৎ পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী (‘মুআজিজা বা ‘মিরাকল’ করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খৃষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার

১ লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্‌নায়্য পলিয়ানা (তুলা) ৯-৯-১৮২৮; মৃত্যু আন্তাপভো (তামবভ) ২০-১১-১৯১০।

পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যধর্মের প্রভাব আছে।

এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিটাইটদের আমল থেকেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর তটান্তরে আৰ্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দু'জন অবতার সর্বজননমস্যা, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্টকৃত্তির বিনাশ করেন ও পুণ্যাশ্রয় জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এ যুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করছিলেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবননাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এ'ড) মহান হলেই কি যা খুশি সে পন্থা (মীন'স) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ্য অজ্ঞানকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বৃন্দদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবননাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে ঘেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে ঘেরকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বৃন্দদেবকে সেরকম কোনো রাষ্ট্রের বৈরীভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তুষণীভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন?

বৃন্দদেবের পর খৃষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাপ্রিত রাষ্ট্রগঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন দ্বন্দ্ব বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভকর ধনপতি ও ধর্মাদিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্রধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাববেন না, তাই বলে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল—বস্তুত খৃষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস, প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হল, তাঁর জীবনদানের ফলেই আমরা জীবন লাভ করলাম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবাস্তব।)

এরপর ঐ সৌমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে ষতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হলেন—তারা অস্ত্রধারণে পরামুদ্বিগ্ন ছিল না।^২

২ বার্নার্ড শ খৃষ্ট মুহম্মদের এক কাণ্টপনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে।

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনো কোনো অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়করূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিস্খাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না।) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে মুসলমানরা তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না)। বার্নার্ড শ মুহম্মদ-চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর এক কাণ্ড-নিক কথোপকথনে এ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন, “I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying.”

বিস্মৃত নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোম্বা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্রে যখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাম্ভু না হয়ে ‘শর সংহরণে’ প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচরণকারীর সম্মুখে সশ্রদ্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এরপর তেরশত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। পাণ্ডা পুরোহিতদের টীকা-টিপনীর ভিতর খৃষ্টের বাণী নানা বিকৃত রূপ ধারণ করল—পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মস্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পুত-পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এধুগে তলস্তয়ই পুনরায় খৃষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি করলেন উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতা-বৈদেশ্যর মূলে কুঠারাঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—

“Who is to be the judge of our fitness to live? said Christ. “The highest authorities, the imperial governors, and the high priests find that I am unfit to live. Perhaps they are right.”

“Precisely the same conclusion was reached concerning myself”, said Muhammad. “I had to run away and hide until I had convinced a sufficient number of athletic young men that their elders were mistaken about me: that, in fact, the boot was on the other leg.”

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, P. 57.

৩ যারা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খৃঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

এগুেলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকানো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্চ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ‘ওয়র এন্ড পীস’ তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম নিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলক্ষি তিনি লিখলেন দখীচির অশ্রু-নির্মিত দমশ্ কী তলওয়ার দিয়ে আপন বৃকের রক্ত মাখিয়ে।

‘রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অশ্রুধারণ মহাপাপ’ তাঁর এ-বাণী ‘দুখবর’ সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুখবরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনো সম্মুখবৃদ্ধ আহ্বান করেনি ব’লে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশবরণ করতে হত কি না। তবে একথাও ঠিক, আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয়-কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরো এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনো শেষ হবে কিনা জানি নে।

গাথীকে বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

আবার এটম বোমা তৈরী হচ্ছে।

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দাম্বুনুজিয়ো

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলাসৃষ্টির আদর্শ ও তাকে ম্শ্ময় করার পদ্ধতি সব কিছই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক, লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি—বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পৌঁছানোর পর অহমিয়া তার রস-সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বদরুজ্জী বা দলিল-দস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্যভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুভূতির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি গত শতাব্দীতেও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদুনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে) ইতিহাসের অর্থনৈতিক

কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদুনের ‘মোকদ্দমা’—‘প্রলেগমেনন’ অনুবাদ করেছেন লাভিনে। এ শতাব্দীতেও জলালউদ্দীন রুমীর ফার্সী থেকে ইংরাজীতে তজ্জমা করার সময় ইংরেজ তথাকথিত অল্পলি অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাভিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্ত-বয়স্কের হাতে এ বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাভিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবাবস্থায়ই দাস্তুর মত অতুলনীয় মহাকাব্যের আবির্ভাব, তবু কাব্যে দেখা গেল লাভিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শূদ্ধ সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনীশক্তির বিকাশ করছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মন্ডা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জার্মানির হাইনে, পোলান্ডের শাপা, এমন কি ইতালীর রসসীনি—এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পরই ফরাসীতে যাকে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য সিয়েকল্—‘শতাব্দীর সূর্যাস্ত’।

দাম্ভুন্দজিয়ো খ্যাতিলাভ করেন ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাররূপে এবং কর্মযোগী—ফিউমের ‘রাজা’রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় ‘জু অল্ করনেন’—‘দুই শতাব্দীর অধিপতি’।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিন ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক, নৌবাহিনী ও বিমান-বহরে সর্বত্রই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান পরিচালনায়। আজ যেটাকে স্ট্যান্ট্ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দাম্ভুন্দজিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেন, তখন কবি দাম্ভুন্দজিয়ো তাঁর রুদ্ধতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপনা করে নিজেকে ‘অধিপতি রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, সৈনিক, নেতা তিন রূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে ‘রাজত্ব’ করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে ‘ফিউমের বীর’, জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দাম্ভুন্দজিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একসঙ্গে পাঁচসেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোকে বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্টেট করতেন)

এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘লে ভেজ’-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্কির করতে পারছেন না, তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলাস্তে, মাসসিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অঙ্কন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দাম্ভান্দজিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দাম্ভান্দজিয়ো চরিত্র বৃত্তিতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলাম। আমরা যদি হটেনটট বা বশ্টুর মত ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্ভরম হত না। ফ্যা দ্য সিয়েক্লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ডকে। এমন কি যে অল্পবয়স্ক সমস্যা তাকে তখনো (এখনো) কাতর করে রেখেছে—সেটাকে ঐতিহ্যহীন সুইটজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যাভিমानी স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতি বছর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম নেপলস্‌ ভেনিস পরিভ্রমণ করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কাহিলাম, “ওগো রাণী,

কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।

এসেছি শুনিয়া তাই,

উষার দ্বারা পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।”

রবীন্দ্রনাথ, পদ্যবলী।

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি

কেন ধরেছিলে হায়!

অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে

নিরাশার কালিমায়।

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte.)

এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেন ইতালিয়ার মরমে মরাটা কি হৃদয়সম করাটা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দাম্ভুন্দ্জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্ব গৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সমাজগ্রন্থ পণ্ডিত্য অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশংসা গেয়েছেন, কিন্তু দাম্ভুন্দ্জিয়োর উপন্যাস ‘ইল্ ফ্লোরোকো’—‘অগ্নিশিখা’, ‘স্নেহ অব লাইফে’—তাঁর যে বর্ণনা এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কিনা সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যারা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভু দাম্ভুন্দ্জিয়ো। মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান, তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস সৃষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিকসের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দাম্ভুন্দ্জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরে খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি অনবদ্য সংকলন অসম্ভব।

কর স্মরা, ওগো,
তোল ফুলগুদুলো
ভরা মধু গন্ধে ।
পলাতকা ঐ
মুহুর্তগুলির
পরা নীবিবন্ধে ॥

FRANCIPITATE MORAS,
VOLUCRES CINGATIS,

UT HORAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SEETA, ROSAS.

Hasten, hasten ! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে ; সে বলছেঃ—

জীবন সলিল
পান করিবে কি ?
এ যে বড় মধুভরা—
আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা ॥

FLETE HIC OPTANTES. NIMIS ESS ACOQUA DULCIS AMANTES.
SALSUS, UT APTA VERHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst.
Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলংকার। আজ যদি বাংলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস শব্দগুণের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো হয় এ যুগের বাতাবরণেরই—কারণ দাঁম্পন্দ্যুজিয়ো ক্লাসিকসে নির্মলিত থাকা সত্ত্বেও নিশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তার সঙ্গে দাঁম্পন্দ্যুজিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে প্রধানত নীংশে, শোপেনহাওয়ার, দস্তেয়ফস্কি এবং সুদারকারদের মধ্যে ভাগনার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ‘অতিমানব’, ‘সুপারম্যান’ বা ‘সুপারমেনশে’র যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল মাদ্জানি হয়ে নীংশেতে পেঁচায়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কীপলিং, হাউস্টন, চেম্বারলেন এবং বের্গসো—দাঁম্পন্দ্যুজিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েছেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন, সুপারমেন—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন ‘হেরেন-ফল্‌ক্’ ‘প্রভুর জাত’—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

রাস্‌ল্ বলেন, ‘তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্জানিতে মূখের মিষ্ট কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীংশেতে এসে তাও নেই।’^২ সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে ‘সুপারম্যানের’ আপন শক্তিসম্পন্নই সর্বপ্রধান কর্তব্য, ‘স্বধর্ম’। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দাঁম্পন্দ্যুজিয়ো এসব কটুরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধ হয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পশ্চিম দিয়ে যে রসিক প্রতি মূহুর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছন্দে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধস্পর্শধ্বনির সমাবেশ, তুলনা-ব্যাঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অরণ-নিটোল সুডৌল নির্মাণপদ্ধতিতে—সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনো বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দাঁম্পন্দ্যুজিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি তবে সেটা মাদ্জারের অতিরিক্ততায়—‘কাদম্বরীতে’ যে-স্বপ্ন।^৩

২ বার্ট্রান্ড রাস্‌ল—দ্য এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজম্।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ‘দেবপ্রিয়’ ‘বিধিদত্ত’ ‘সকলের সেরা জাতের’ ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদীরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খৃষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

৩ প্রিন্স গ্রাভিয়েলে দাঁম্পন্দ্যুজিয়ো—১২ই মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯০৮

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিলাস্-উদ্-দীন আব্দুল ফত্হ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্য-পাশ্চাত্তো সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পুণর্গোদ্যমে নানাপ্রকারে গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মস্তনে যে বিষ ওঠে, তাও দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো জর্মণ গবেষক বলেন, ‘খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনো সম্ভেদ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনো কবিতা রচনা করেননি।’ জনৈক রুশ গবেষক বলেন, ‘কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—“তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম”—এটার অর্থ কি?’ তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত—তঁার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অতুক্তি হয় না—মাত্র নয়টি রুবাইয়াৎ (চতুঃপদী) ওমরের বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন। অথচ পাটিশনের পূর্বেও কলকাতার তালতলায় যে বটতলা সংস্করণ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ পাওয়া যেত তাতে থাকতো প্রায় বারো-শ’টি।^১ তবে অতিশয় এক-নজর ফেললেও ধরা পড়ে, এর শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের একাধিক কবির কাব্যসংকলনে—বিশেষত হাফিজের—ওদেরই নামে চলেছে। কোনো কোনো রুবাই (রুবাইয়াতের একবচন) তো পাওয়া যায় দু’ তিন চার কিংবা ততোধিক কবির কাব্যে। এক জর্মণ পণ্ডিত তাই এক বিরাট নিঘণ্টু (কনকরডেন্স, ক্রসরেফারেন্স সম্বলিত কাড-ইনডেক্স—যা খুশি বলুন) নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাই কোন কোন কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টাইমটোবলের মত কলামের পর কলাম গে’থে গে’থে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খুদ খৈয়ামের দেশে ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন, যারা কোন রুবাইটি খাঁটি আর কোনটা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনো সম্ভেদ নেই, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যেটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন তার কতগুলো ওমরের নয়। তৎসঙ্গেও ইরানে তারই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরো বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে ফরাসী জর্মণ শেখার প্রতি অনেকের উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

১ তাপসী রাবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ ‘চতুর্থ কন্যা’। ‘রুবাইয়াৎ’, ‘রাবেয়া’ ইত্যাদি শব্দ আরবী, ‘আরবাৎ’ অর্থাৎ ‘চার’ থেকে এসেছে।

২ ইরানে ১৪০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন অক্সফোর্ডে।

খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে : ১) ফিট্‌স্‌জেরাণ্ডের ইংরিজি অনুবাদ, ২) সেই অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল (ফিট্‌স্‌জেরাণ্ড অনেক সময় ভাবানুবাদ করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন ফার্সী রুবাইটি অনুবাদ করেছেন, আবার এমনও দেখা যায়, একাধিক রুবাইয়াৎ থেকে তিন-চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়াট্রেন ‘সৃষ্টি’ করেছেন), ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনো মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌স্‌জেরাণ্ড স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেননি, আর কখনো বা ফিট্‌স্‌জেরাণ্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জার্মান অনুবাদ—একাধিক জার্মান অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাণ্ডের অনুদ্রকণ এঁরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জার্মান ফার্সীবিদ রোজেন, ফিট্‌স্‌জেরাণ্ড, আরব পণ্ডিত আদীব অলতুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়ামপ্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌স্‌জেরাণ্ডের অবতরণিকা পড়া হয় ‘পদ্যাত্মক’ হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জার্মান কোনো নতুন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন, টিকিট, প্র্যাটফর্ম, খাদ্যাদি, বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়ারা—এবং আমরা সচরাচর একটু বয়েস হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—পায় অগ্নিপাই মনের খোরাক। লাগে একঘেয়ে—শিখে যাই গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকে মন এবং হৃদয়েরই খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা শেখার পরেই তো মস্তময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি দু’একখানা দেখেছি। এস্থলে আমার মূল বক্তব্য এই, আট বছরের বাঙালী ছেলে ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে একরকম, আঠারো বছরের কিশোর শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জার্মান, অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তঁারা এই সংকলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই, ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওমরের সবচেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি :—

ফার্সীতে আছে—

গর দস্ত দহদ জ্ মগজে গন্দমে নানী
ওজ্ মৈ দোমনী জ্ গুসফন্দী রানী

ও আনগে মন ও তো নিশসন্তে দর ওয়রানী
 গ্রয়েশী বৃদ্ধ ওয়া আন নৃহদ-হর স্দলতানী

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
 A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
 Beside me singing in the Wilderness—
 And Wilderness is Paradise enow.

Pour celui qui possede un morceau de bon pain
 Un gigot de mouton, un grand flacon de vin.
 Vivre avec une belle au milieu des ruines,
 Vaut mieux qu d'un Empire etre le souverain

Wein, Brot, ein gutes Buch der Lieder :
 Liess ich damit selbst unter Truemmern
 mich nieder,

Den Menschen fern, bei Dir allein,
 Wuerd'ich gluecklicher als ein koenig sein ৩

মূল ফার্সীতে আছে :

হাতে (দস্ত) যদি থাকে
 গমের মগজের (মগজ্) রুটি (নান)
 দুই মনী (দো মনী) মদ ও
 ভেড়ার একখানা ঠ্যাঙ (রান্),
 তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
 সেটি যদি ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণও হয়

৩ বাঙলায় :

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
 পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী,
 সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহো গো মধুর গান
 বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লাভবে প্রাণ ॥

সত্যেন দত্ত

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
 খাদ্য কিছ্, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
 মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
 সেই ত সখী স্বর্গ আমার, সেই বনানী স্বর্গপূর ।

কান্তি ঘোষ

(তবুও) আনন্দ (আয়েস) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হদ্) চেয়েও বেশী ।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে, ভেড়ার ঠ্যাঙ বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে ; সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গ-পদবী । কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারিনি । প্রথম ছত্রে আছে, ‘বিনীৎ দ্য বাও’—পরে আবার সেটাই ‘উইলডারনিস’ হয় কি করে ? (সত্যেন দত্ত বর্শ্চ-মানের মত ‘বিজন’ ব্যবহার করেছেন, ‘উইলডারনিস’ ও ‘বনচ্ছায়া’ দুই-ই বিজন । কান্ডি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে স্বব্দমুক্ত হয়েছেন ।)

ফরাসীটিতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাঙ ও তবে মদের পাত্রকে গ্রা (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, ‘দু মনী’ বাদ পড়েছে এবং ফরাসীতে যেখানে সূক্ষ্ম ‘তুমি’ আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে । অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক ।

জর্মানে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch) । দুম্বা বাদ পড়েছে, তবে ‘বাও’ নেই—আছে ফরাসীর সরল অনুবাদ ‘ভ্রমাবশেষ মধ্যে’ (Truemmern) ।

ইরানী চিত্রকর চতুঃপদীটি বর্ণে অলঙ্কৃত (ইলস্ট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ভাঙাচোরার মাঝখানে বিধবস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে । দূরের পটভূমিতে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, সপারিষদ সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে গায়িকা—কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন প্রেতলোকের আবহাওয়াতে ভাসছে ।

চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—কিঞ্চিৎ । যুবক-যুবতীর সম্মুখে দুম্বার ঠ্যাঙ আছে, মদের পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট নয়, ‘দু মনী’ তো নয়ই এবং সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে পঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তিমাফিক—তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না । পায়ের কাছে আমাদের খোয়াই-ডাঙার বুনো ফুল । তেরঙা ছাঁব, রেজিস্ট্রেশন খারাপ ।

আমাদের কৈশোর-যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন । সে রেওয়াজ এষুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি । যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী-জর্মানে অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন । হয়তো বা তারই ফলে আমরা আরেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো ।

পুস্তকে পঁচাত্তরটি চতুঃপদীর জন্য পঁচাত্তরখানা তিনরঙা ছাঁব তো আছেই, তার উপর এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কারুকার্য, আবছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অধঃসুপ্ত চৈতন্যের স্বপ্নপ্রকাশ—কাব্য পড়ে

চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ার রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মণ স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের ঢের কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন—জামাকাপড়, বাড়িঘর, গাছপালা, আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয়, তবে সে সামান্য। বিদেশী—বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর—যে রকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্ভূত বদখৎ ‘হাঁসজারু’ তৈরী করেন, তিনি তার থেকে স্বভাবতই মুক্ত। এবং তার ছবিতে যে এক নতুন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে উপক্রমণিকায় লিখেছেন :

“At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing and this could be an Ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic), I wish they call them to my attention, I’ll be most greatful (sic)”...Akbar Tajvidi

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।^৪

The quatrains of Abolfath Ghiat-e-Din Ebrahim KHAY-YAM of Nishabur, Published by Tahir Iran Co, ‘Kashani Bros’ Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

“তেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার”—

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনো হতাশ হয়, কখনো বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোকটে পাওয়াতে সে বেদনা না-পাস্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। স্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ দুর্নির্ধারি পীর-প্যাকস্বর বলেন, ‘তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সম্ভান করো।’ একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, ‘যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!’

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুর্নিয়ার তাবৎ ধর্মের, (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়েতে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্য বেঁচে আছি, ওর পিছনে ছোটোছোটো করার আমাদের কী

৪ খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম কৃত তাঁর অনূবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

প্রয়োজন ! আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোই অন্যায়। অন্তত একটি মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মদুস্তো জমা রেখে গেছেন ; তিনি বলেছেন, ‘শ্রমোরেব সামনে মদুস্ত ছড়িয়ে না।’ তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ একথাটা বলার সময় ক্ষণেকের ভরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো ? তাতেই হয়ে যাবে। ‘মোক্ষ’ নামক ‘অমৃত’ বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং হস্ততলং। অবশ্য সে ‘অমৃত’ের জন্য কোনো অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে !

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খই মেটাবার জন্যে বৃন্দ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই চম্বার ? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিষস। প’চিশ হতে না হতেই প্রাচীন অব’চীন দ্বিশী-বিদেশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে ? কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেকস্পীয়ারের ভাষায়—টু টেক্ আম’স্ এগেনস্ট্ এ সী অব ট্রাবল্’স্ ?’ কী দরকার ছিল অরবিন্দের নিজ’নে ধ্যানে ধ্যানান্তরে উর্দ’ হতে উর্দ’তর লোকে রন্ধের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে নিয়ে, তারো নিয়ে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসম্ভানকে পুনর্জীবিত করার ?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মতন নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই যে আমরা রামশামা, আমাদের ভিতর বিবেক-রবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সকলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম ? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনাবোধ কি আমাদের সকলেরই ওঁদের চেয়ে কম ? বরঞ্চ বলবো, বিধি-প্রসাদাৎ, কিংবা আপন সাধনবলে তাঁরা চিন্তাজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনাবোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে গেল। আমরা যে ক’টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্যে ছিল।

১ ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটা মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

ডিগিডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে-গাঁয়ের আর কোনো ছেলে কখনো বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলোটো কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্সপেক্টর এসেছেন ইন্সকুল দেখতে। তাকে শুনিয়েছেন একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার উপর উত্তর জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নাভাস্। ‘তোৎ তোৎ’ করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্সপেক্টর তার দিকে তাকিয়ে চললেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস! গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইন্সকুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নিজের কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য-অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক ‘মহাবংশের’ ঘোষ—বিনা পণে। ছেলোটো গরীব এই যা ঘোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কমঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যান্ডবিল বিয়ে-প্রাশ্দের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরই বরাবর, সবত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, ‘এই হয়ে এল।’ অর্থাৎ শিগ্গিরই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে ধরধী ভাবতো তাকে বলতো, ‘মাকে নিয়ে আসছি।’ গরীব মা গায়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পেঁছবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন বড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে, পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছমের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগারেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোট-বোনের ক্লাসমেন্ড। আমি তার মুরব্বী। সিগারেট দিলাম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে, ‘মাকে নিয়ে আসছি।’ মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার

শহর এই দিগ্নে আমায় ঘরে তুলছে ?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায় ? পাগল হয়ে গেছে।'

তব্দ এখনো তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যেরকম দৃংখ-দৃশ্চিন্ধ্য মরে।

আর মাধবী? আমার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মন্থোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো তেতলার একটি মেয়ের। আমরা ঘোঁবনে যে সুযোগ পেলাম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনো ফোন নেই। ভাবলাম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমামদম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সম্ভাব্যবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটাতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতে বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনো কোঁতুল দেখাইনি। কিন্তু তৎসম্বন্ধে খবরটা কানে এসে পেঁছিল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন, 'He walked out on her to another girl!'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলোটো পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয়! না?

আজ আর মনে নেই—কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফান্দুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আগ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর যাই করুক অজানার মাঝেও অবদান জানে সে তার মাই। কিন্তু যখন দাঁরিত walks out on her, তখন

বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায় ? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা । এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনো জায়গা থেকে এসেছে—বাপ মা সমাজ যেখন থেকেই হোক—তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে তার দয়িতকে । ঐ বলা-টুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা । আর আজ ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল । বরঞ্চ পাষণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে । কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে । কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন ।... (অবশ্য মডান'রা বলবেন, 'ওসব রোমাণ্টিক প্রেম আজ আর নেই । আজ এক মাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায় ।' তাই হোক, আমি তাই কামনা করি । আমার সর্বাস্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর ।)

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে । কেউ বলেন, 'এসব মায়া । তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তথাপি কেন শোকাভূর হও ।' কেউ বলেন, 'লীলা । ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো । সান্ত্বনা পাবে ।' কেউ বলেন, 'মনই সর্ব দঃখের উৎপত্তিস্থল । সেই চিন্তের বৃত্তি নিরোধ করো । তাতেই শান্তি ।' আরো অনেক মত আছে ।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি । মা-ঠাকুরমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরো ভাল হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে পারতো—তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন ।

কিন্তু ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্যকে চিন্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুখলো না সেই দারুণ দুর্দ্বেষ থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শাস্তি সহবার—ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার ? শুধু তাদেরই দোষ ? ধর্মের আত্মশাস্তি কমে যার্নি কি ? কিংবা দোষ উভয়ের ?

কম্যুনিজম তাই বুঝি । সে বলে রাষ্ট্রই সব । তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছই না । তুমি বেশী গম্ব ফলাও, বেশী কামান বানাও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য । সব ভুলে যাবে । কম্যুনিষ্টরা এ 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন কিনা তা জানিনে কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ বিশ্বাস তাদের হৃদয়-মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে । অন্য ধর্মেরা করে ?

*

*

*

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম । নানা রকম দঃখ সুখের কথা হচ্ছিল । আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বচ্ছই স্পর্শকাতর ডাক্তার । হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাসপাতালে একটি চার বছরের ছেলে বচ্ছ ভুগে খানিকটা সেরে বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে । ও সারবে না । আমি যখন ইনজেকশন তৈরী করছিলাম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, "দাক্তার, দিয়ো না, বন্দো লাগে" ।'

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে ?

দুন্দুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, ইনজেকশনের ভয়ে শিউরে উঠে চেয়ে দেখে, এই বিশাল পদুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন ?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সারিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো বা তাকে কোনো প্রদোষ-নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরো উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বন্ধুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অসরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের!

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনো comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্যকে রুখবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সে দিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নিজর্জন প্রাস্তরে এ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে ‘নিশির ডাকে’র মত শুনতে পাবো, ‘দাক্তার, দিয়ো না, বন্দো লাগে—’, দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস ॥

রাজা উজ্জ্বল

বন্দ্যবর

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

করকমলে

হিটলারের প্রেম

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মে জার্মানির জনসাধারণ পেল তার মোক্ষমতম শব্দ—যেন দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার মস্তকে স্বয়ং মূর্ছিতযোদ্ধা ক্লে একখানি সরেসতম ঘর্ষি মেয়ে তাদের সবাইকে টলটলায়মান পড়পড়ায়মান করে দিলেন। ঘর্ষিটাএল হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র থেকে—ইতিমধ্যে মিশ্রশক্তি আকাশ থেকে জার্মানির বৃহৎ বৃহৎ বেতারকেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে শট'ওয়েভের—প্রায় সবগুলোকেই খতম করে দিয়েছেন।

বেতারে তখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান ক্ষণভরে বন্ধ করে বলা হল, ‘আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তৈরী থাকুন।’ কিছুক্ষণ পরেই বেতারে ঘোষিত হল, ‘আমাদের ফ্যুরার আডল্ফ হিটলার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।’

এরপর যে শব্দটা পেল সেটা তাদের খুঁলি ভেঙ্গে দিল না বটে, কিন্তু মাথার মগজ দিলে ঘুলিয়ে। যেন অমলেট বানাবার কল ব্রেন-বকস্টার মাধ্যম-খানে তুর্কিনাচন লাগিয়ে দিলে।

হিটলার মৃত্যুর চতুর্দশ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীমতী এফা ব্রাউন নাম্নী—তাবৎ জার্মানদের কাছে অজানা অচেনা এক কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। সমস্ত জার্মান যেন বৃদ্ধলগ্ন-জনের মত একে অন্যকে শুধালো, সে কি! গত বারোটি বৎসর ধরে যে ফ্যুরারের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তো সর্বভাগ্যী সন্ন্যাসীর ছবি। যিনি সুখময় নীড় নির্মাণ করেননি, বল্লভার সন্ধান করেননি, এমন কি বংশরক্ষা করে উত্তরাধিকারীরূপে কাউকে স্বহস্তনির্মিত ক্রেডারিক দ্য গ্রেটের সিংহাসন বিনির্মিত সহস্রায়ু রাইষের (নার্সি রাজ্যের) সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাননি। অথচ তিনি কী ভালোই না বাসতেন শিশুদের,—যখনই জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেখেছি তিনি কী হাসিমুখে শিশুদের আদর করে বাহুতে তুলে নিয়েছেন, তাদের মাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের শ্রেষ্ঠা নর্তকী, অভিনেত্রী, গায়িকা, সুন্দরীদের জন্মদিনে তাঁদের বাড়িতে দ্বিধা-বিদেশী বিরল ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন। প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী গ্যোবেলস আমাদের বেতারে কতশত বার বলেছেন, ‘এই সন্ন্যাসীর স্বয়ংকন্ডেরে কিন্তু নিভুতে বিরাজ করেন সৌন্দর্যের দেবতা। এ তপস্বী সেই বিশ্বকল্পনাময়ী চিন্ময়ীর উপাসক। সে চায়, নিভুতে নিজনে একাগ্র মনে তাকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে, তোমাদের গৃহ সুন্দরতরূপে নির্মাণ করে তারই প্রতিষ্ঠা করে তোমাদেরই গৃহ মধুময় করে তুলতে। কিন্তু হায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জার্মানির ভাগ্যবিধাতা তাঁর শব্দে তুলে দিলেন বিরাট বিশাল রাইষের গুরুভার। তাকে বিরাটতর, বিশালতর এবং সর্বোপরি তাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে নির্মাণ করার গুরুভার। এবং সে রাষ্ট্র এমনই প্রাণবন্ত, দীর্ঘজীবী হবে যে এবাবৎ পৃথিবীতে যে-সকল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আপন নাম ইতিহাসে রেখে

গেছে তাদের সবাই হতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের তুলনায় বালখিল্যবৎ—এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর—থাউজেন্ড-ইয়ার-রাইষ ।’

আরো অনেক কথা বলেছেন ফ্যুরার সম্বন্ধে, অনেক ছবি এঁকেছেন আডল্‌ফ্‌ হিটলারের তিন, একের পর এক বিজয়মুকুট পরে ফ্যুরার যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে—যেন রাশার মৃত্যুদূত এসেছে তার আত্মাকে শয়তানের অতল গভীরে চিরতরে বিলীন করে দিতে—তার সে বিজয়-গর্বিত ছবি ; এবং তারপর যখন পরাজয়ের পর পরাজয় দ্রুততর গতিতে চারিদিক থেকে বজ্রমুষ্টিতে তাঁকে ধরতে গেছে তখনও চিরশাবাদী গ্যোবেলস তাঁর বীণাযন্ত্র ভেঙে ফেলেননি, উচ্চতর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন তাঁর প্রভু, ফ্যুরারের প্রশস্তি-সঙ্গীত । সেখানে ফ্যুরার কৃষ্ণস্বাধন-রত যোগী । তিনি সর্বস্ব স্ববিসর্জন করে, সর্বধ্যান নিয়োজিত করে নির্মাণ করেছেন সেই ব্রহ্মাণ্ড (প্রায় শব্দার্থ, প্রথমা বিজয়িনী victory one, অনুজ্ঞা বিজয়িনী V II)—এবারে দধীচির অস্থি নিঃপ্রয়োজন (অর্থাৎ অন্য কোনো মিত্রশক্তির সাহায্যে জয়লাভ নয়, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মিত্র ইতালী ও জাপান তাদের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ রণাঙ্গনেও কোনো বিজয়চিহ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছে না) । তিনি এই বালিন নগরী ত্যাগ করবেন না । এই ধ্যান-পীঠের সম্মুখে এসেই শত্রুসংঘ হবে অবলুপ্ত, লীন হবে মহাশূন্যে ।

এবং বিশ্বের ইতিহাসে এই অতুলনীয় ‘ধর্ম’ প্রচারক বক্তা, জনগণমনজয়ের বীর গ্যোবেলস প্রায় প্রতিবারই তাঁর ভাষণ শেষ করতেন এই বলে, ‘বিশ্বের ইতিহাসের এই সর্বোত্তম আত্মত্যাগ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক লালিত হবে না ।’ (কানে কানে বলি, গ্যোবেলস ছিলেন নিরঙ্কুশ নাস্তিক ; বরং তাঁর প্রভু হিটলার অন্তত অদৃশ্য অস্ত্রের অশ্ব নিয়ন্ত্রিত—‘শক্জাল’—বিশ্বাস করতেন) ।

আজ হিটলার চিতাশয্যা । বস্তুত তাঁর ও পত্নী এফার দেহ তাঁরই সর্বশেষ আদেশানুসারে দেশাচারানুযায়ী গোর না দিয়ে পেট্রল দিয়ে পোড়ানো হয়) প্রবেশকালের প্রাক্কালে বিবাহ করলেন তাঁর ‘রক্ষিতা’কে—যার সঙ্গে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ববিলাসবৈভবে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শৈলাবাসে কাটিয়েছেন কত না ক্লাস্তিহীন দিবস, নিদ্রাহীন রভস যামিনী, বৎসরের পর বৎসর, অন্তত চৌদ্দটি বৎসর, অর্থাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রায় দু-বছর আগের থেকে !

কই, গ্যোবেলসের অধিকতর সেই বিলাসবিমুখ জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী রাইষের মঙ্গল কামনায় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে তো বেতারে প্রচারিত, একগুণকে শতগুণে বর্ধিত করে বিজয়ী মার্কিন সেনা—উপস্থিত তারা জর্ম্মনিতে থানা গেড়ে তার উপর সার্বভৌম রাজত্ব করছে—এবং তাদের অভ্যাসার্জিত ‘কেলেঙ্কারি কেচ্ছা’ বর্ণনের সুমেরু শিখরে তথাগত তথাকথিত জানলিষ্টের প্রকাশিত জর্ম্মন এবং ইংরাজি ভাষাতে প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হিটলারের ছবি আদৌ মিলছে না ।

বেষট্‌গেগাডেনে হিটলারের শৈলাবাস ছিল দশাধিক বৎসর ধরে সর্ব ‘ধার্মিক’ নাৎসি, এমন কি মধ্যপন্থী সরলহৃদয় লক্ষ লক্ষ জর্ম্মনেরও পুণ্যতীর্থ-ভূমি । হিটলার সচরাচর থাকতেন নিরস বিরস বৈশ্যভূমি বালিনে ; সম্মুখে

কৃষ্ণকঠিন প্রস্তর-নির্মিত অপ্রিয়দর্শন বস্তুতান্ত্রিক রাজবর্ষা, চতুর্দিকে অভেদ্য পাষণপ্রাচীর, পাষণভর ফ্লয়নির্মিত, বদনমণ্ডলে সর্বপ্রকারের অনুভূতি-প্রকাশবিজিত, শীতল কৃষ্ণধাতুতে নির্মিত অগ্রহস্তে রক্ষীদল, পাত্র-অমাত্যের স্বতচ্ছল শকটের যন্ত্রীরব-বিবোধ-নিনাদ, সদাই ফ্যারারের পরিদর্শনের জন্যে বিকটতম শব্দ করে দ্রুতগতিতে গমনাগমনরত দৈত্যসম পর্বতপ্রমাণ ট্যাংক-বর্মপরিহিত সাজোয়া যান, আরো কত না নবীন নবীন বৃহৎ বৃহৎ মারগাস্ত, এবং ফ্যারার-ভবনের প্রশস্ত মর্মর সোপান বেয়ে উঠছেন নামছেন অভিজাত শ্রেষ্ঠ-তর মৃকুটমণি রাজদুতরাজি—তাদের বেশভূষার দিকে তাকালে অশ্ব হয়ে যাবার আশংকা। বেশের উত্তমার্ধ স্বর্ণস্তরণে এমনই অলঙ্কৃত—যে তার পটভূমি চীনাংশুক, পটুবস্ত্র, না কিংখাপে নির্মিত সে তত্ত্ব নিগ্নয় করা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সেই স্বর্ণাস্তরণের উপর হীরকখচিত ভিন্ন ভিন্ন মহাঘ্য ধাতুনির্মিত সারি সারি মেডেল—বিজয়-লাঞ্ছন—মনে হয় তার যে-কোনো একটা সারির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে একটিবার আঙ্গুল চালিয়ে নেওয়া মাত্রই বেজে উঠবে যেন জলতরঙ্গে স্বরসপ্তক।

মানুষের ভক্তি যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়—গভীরতম মহাসমুদ্রেরও তল আছে। যতই গগনচুম্বী হোক গৌরীশংকর নয়—এবং তিনিও চুম্বন করেন মহাউর্ধ্বের পদরেণুকণা অভ্ররাশিমাাত্র। কাজেই সেই ভক্তি বালিনের ঐ মারগাস্ত ‘স্বক্ষপূরী’কে পৃণ্যতীর্থভূমিতে পরিণত করতে পারেনি।

তারা ছুটে আসতো বেশটেশগাডেনে। তার পরিবেশ, তার বাতাবরণ, তার চতুর্দিকে দীর্ঘাশির অভিজাত শ্যামল বনস্পতি, উচ্চতায় সেই সব বনবৃক্ষের তুলনায় সহস্রগুণে উচ্চ পর্বত, মেখলাকার শৈলমালা, তাদের অনেকেই শীতে-গ্রীষ্মে তুষারাবৃত, আর শীতকালে হিটলার ভবনের চতুর্দিকে হয়ে যায় ধবল বরফাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে বনস্পতিরাজি নিরবচ্ছিন্ন বন্য বিহঙ্গ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে লাইন বেঁধে হিটলারের সামনে দিলে গৃহীর সরলতামাথা—অর্থাৎ কক’শ মিলিটারিকেতায় নয়—‘মার্চ পাস’ করতো—হিটলার বিদেশাগত লয়েড জর্জ, জন স্যামুয়েল, অ্যাটর্নি ইডেন জাতীয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে বা চপেটাঘাত প্রদানে অত্যধিক তৎপর না থাকলে পর।^১ নইলে এমনিতে দৈনন্দিন গেরস্তালি জীবনে হিটলার ছিলেন আদর্শ

১ আমার আশ্চর্য বোধ হয় এইসব ডিমোমেটরা সেই নরঘাতন হিটলারের সম্মুখে তখন কী বেহদ্ বেহায়া, বেশরম, বেইজৎ বাদির-নাচ, আবার বলছি, কোমরে ছিটের ঘাগরা পরে বাদির-নাচ নেচেছেন! পরে এঁদের অনেকেই বলেছেন,—শিশুর মত গদগদ সরল কণ্ঠে—‘আমরা তখন জানতুম না, মাইরি, লোকটা ও-রকম একটা আস্ত নর-পিশাচ!’ বটে! ন্যাকামির জায়গা পাওনি? তোমরা fool তো বটেই তদ্‌পরি knave! তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমরা জানতে না, হিটলার রাজ্যাসনে বসার প্রথম দিনই কম্যুনিষ্টদের উপর

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৫

অতিথিসেবক, এবং এসব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রতি মাত্রাধিক সদয়। হিটলারের সেই বাড়ি নতুন জমিতে গড়া হয়েছিল বলে তখনো ছায়া দেবার মত বিস্তৃত ও দীর্ঘ বৃহৎ বৃক্ষ একটিও ছিল না। সেই কঠোর রোড়ে (উঁচু পাহাড়ের উপর রোদ বড় কড়া হয়) কখনো কখনো তিনি পুরো-পাক্ষা দু'ঘণ্টা ধরে হিটলারি হাইল সেলুটে ডান হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত করে সঞ্চাবধি উত্তোলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন—পুরো প্রসেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একদিন তাঁর সখা ওস্তাদের ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান (এঁর নামটি মনে রাখবেন, পাঠক, ইনি হিটলারের প্রেম-মণ্ডে বিদুষক—বিশুদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী তিন অঙ্ক নাটিকার শেষের দুই অঙ্কে অভিনেতা মাত্র তিনজন,—নায়ক, নায়িকা ও বিদুষক হফ্‌মান) হিটলারকে শ্রদ্ধাধন, তিনি কি করে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে, এরকম হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন! হিটলার উত্তরে বলেন, নিছক মনের জোরে।

দ্বিতীয় 'শকে'র পর এই সব লক্ষ লক্ষ তীর্থ-প্রত্যাভর্ত ও 'ভগবান' হিটলারের শ্রীমুখ-দর্শনপ্রাপ্ত নরনারী বিহবল, সামান্য দুটি অসংলগ্ন বাক্য সংযোজিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কর্তাভজাদের ন্যায় গুরু কাণ্ডারীতে যারা সর্ব প্রত্যয় সর্ব আত্মোৎসর্গ করে আপন আপন নোঙর ভবনদীতে অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে বসেছিল, তারা তখন কি ভেবেছিল?

এই গম্ভীর 'মাচ' পাস', হিটলারের সৌম্যম্মিত বদন (অবশ্য তাঁর টুথব্রাশ মুস্টাশ বাদ দিয়ে—এফা ব্রাউনও ছিলেন এটির জন্মবৈরী—কিন্তু ভক্তের কাছে তো 'বিটকেল গোঁপো গুরু ট্যারা চোখে চায়। তথাপি সে মোর গুরু, নিত্যানন্দ রায় II') স্বস্তিবাচক আশীর্বাদসূচক, অভয়মুদ্রার উত্তোলিত দক্ষিণ বাহু—তাঁর পিছনের পুত শান্ত সঞ্জন ভবন, যেখানে গুরু অহোরাত্র জর্ম-ন-মঙ্গল-কামনায় অহরহ তপস্যামগ্ন—তাঁর পিছনে ছিল এত বড় ধাপ্পা! একটা রক্ষিতা রমণী নিয়ে সঙ্গোপনে ঢলাঢলি! তার জন্য অতিশয় সযত্নে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ বাড়ির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্ত wing!

মার্কিনরা মেতে উঠেছে, এবং রুচিবহীন একাধিক জর্মনি যোগ দিয়েছে সেই ভুতের নৃত্যে (আমি দোষ দিচ্ছি নে, জর্মনি তখন চরমতম দৈন্যপাশে)

কী অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, তারপর ইহুদিদের নিয়ে, তারপর ২০শে জুলাই ১৯৩৪-এ তাঁর সহকর্মীদের—রোয়াম, এন'স্ট, হাইনৎস (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এরা ছিল নিদোষী)—mass murder without any trial (শম্ভাৰ্ণে নিবিঁচারে পাইকারী হারে খুন), তোমরা তো তখন নিতম্ব বাজিয়ে নৃত্য করেছ! কষ্টক কষ্টকে নাশ! মূখে যতই ধানাই-পানাই করো, ইহুদিদের প্রতি তোমাদের মনোভাব অন্তত আমার অজানা নয়।

আর যদি এ-সব না জানতে তবে নিজেদের 'ডিপ্লোমেট' বলে পরিচয় দাও কেন? রাস্তার মেংরানী আর তোমাতে তাহলে কি তফাৎ!

এমনি নিমগ্ন যে বেটাৰেটির দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করার জন্য অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত—আমার আপন দেশের দৈন্য কি আমি চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিনি, পরে বুঝিনি? এখন ঘাড় ফেরাই। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গতম গোপন কথা বের করে রগরগে পর্নোগ্রাফ ছেড়ে টু ক্রোর পাইস্ কামাতে।

আর জার্মানি খালি শকের পর শক্। অবশ্য তখন জার্মানির এমনই দুঃবস্থা যে প্রেস নেই, নিজ'লা মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রকৃত সত্য দিবালোকে প্রকাশ করার উপায় নেই। এবং 'সমূহ বিপদও তাতে আছে! লেখককে যে কোনো 'মুহূর্তে' বিন্-ওয়াশেটে, ষাঁড় সে নাৎসি ছিল না—ধরে নিয়ে যাবে denazification (of delousing) কোর্টে,' এবং অন্য কিছু সাক্ষীসাব্দ

২ এরা যখন মার্কিন জেল থেকে মুক্তিলাভ করলো, ততদিনে আবার জার্মানিতে আপন আধা-স্বাধীন সরকার, মায় আদালতসমূহ বসে গেছে। এই আদালত এদের এবং অন্য বহু লোককে ধরে আবার আরম্ভ করলে denazification (অর্থাৎ দেশকে ভূতপূর্ব নাৎসি-মুক্ত করা) মোকদ্দমা—গাডায়-গাডায়। এনারা আবার ও'য়াদের চেয়ে এক কাঠি সরেস। কারণ জজদের অনেকেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন এমন সব নাৎসি ষাঁদের হাতে বিচারকরা নাৎসি-রাজত্বে লাঞ্চিত হয়েছিলেন। (অবশ্য লাঞ্চিত হওয়ার সময় তাঁরা জজ ছিলেন না, কিংবা ডিসমিস হয়েছিলেন) এ'রা নিলেন তাঁদের পূর্ণ প্রতিহিংসা—জেল, নাগরিকাধিকার লোপ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল বহু লোকের—এমন কি ষাঁদের মার্কিন কোর্ট কোনো প্রমাণ না পেয়ে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিল। আবার উন্মোচনাও হল। যেখানে জজ নির্বাচিত হলেন কোনো 'প্রচ্ছন্ন নাৎসি', তখন তিনি পাড়ি নাৎসিদের অনেককেও ছেড়ে দিলেন কিংবা দিলেন মোলায়েমতম সাজা। তারপর হল আরেক ফাস। জার্মান আইনে নিয়ম (এ আইন রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ আইন তা নয়) কোনো অপরাধের বিশ বৎসর পরে সম্ভবতঃ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা হতে পারে না। হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। মোটামুটি বলা যেতে পারে হিটলার নির্বাচিত নবীন চ্যান্সেলর মিশ্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮ই মে। অতএব লেগে গেল ধু'ধুমার। তা হলে ৮ ও ৬৫ তারিখে দেশে-বিদেশে লুণ্ঠায়িত খুনিয়া খুনিয়া সব নাৎসি 'অজ্ঞাতবাস' থেকে বেরিয়ে আবার নবীন নাৎসি সংঘ তৈরী করার চেষ্টা করবে। হয়তো বা এই কুঁড় বৎসরে যারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল তারা প্রাণ দেবে গদুপ্ত নাৎসি ঘাতকের হাতে, অন্ততপক্ষে গোপনে অপমানিত লাঞ্চিত এবং প্রহৃত হবে। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন পয়লা নম্বরী নাৎসি যেমন হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরম্যান, এবং ইহুদী নিধনের গ্যাসঘর তথা কনসানট্রেশন ক্যাম্পের চোপদার (ন'টি ল্যাজতলা চাবুক মারনেওলা), কমান্ডান্ট, কয়েদীদের উপর মারাত্মক (এদের ৯৫% মারা যায়) সব ব্যারামের

না নিয়ে, তুমি যে পাড়ি নাৎসি ছিলে সেইটে মার্কিন জংলী পদ্ধতি ‘প্রমাণ’ করে পাঠিয়ে দেবে গ্রীষ্মে (অবশ্য তখন সেই বীভৎস খাদ্যাভাবের করাল কালে জেলে ভালো হোক, মন্দ হোক দু’মুঠো জুটতো)।

কিন্তু সুইটজারল্যান্ডের বৃহত্তম অংশের ভাষা জার্মান। বহু নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং জেলমুক্ত নাৎসিবৈরী লেখক সেখানে গিয়ে আপন আপন বই বের করতে লাগলেন। তখন পরিপূর্ণ সত্য জানার ফলে জার্মানরা ধীরে ধীরে আপন আপন শক্‌মুক্ত হতে লাগল। এঁদের অনেকেই যদ্যপি হিটলার-মুগে মানব-দুর্লভ সাহস দেখিয়ে নাৎসি-বিরোধিতা করার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও জেল বরণ করেন, (এবং সেখানে প্রায় সকলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর মারা যান) আজ তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে অনেক স্থলে নাৎসি-বিরোধী এবং মিথ্যা হিটলার কেলেকারি প্রচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার হিটলারের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তথ্য বেরুলো, যেগুলো nosy American and peeping British—and some French thrown in the bargain for good measure—বহু পরিশ্রম করেও বের করতে পারেনি।

তারই অন্যতম, হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য বেরুলো যা দিয়ে প্রকৃত সত্য আজ হয়তো কিছুটা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই যে মৃত্যুর চাক্ষুশ ঘণ্টা পূর্বে ১৯৪১৫ বছরের রক্তিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দের্মি ম’দেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্ল্যাটিনিক প্রেম করেছিলেন (when “just nothing happens”), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভাস ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যি ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জার্মানির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো

experiment করনেওলা ডাক্তার, অথবা পাড়ি নাৎসি সম্পূর্ণ বিবেকহীন আইন বাবদে পরিপূর্ণ নাৎসি কর্তাদের মেহেরবানীতে নিষ্পত্ত জজ যারা কারো বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ (নাৎসি) মোকদ্দমা আনা মাত্র আসামীকে অপমানিত লাঞ্চিত করে—মৃত্ত অথবা গুপ্ত আদালতে হয় ফাঁসির হুকুম, নইলে চোদ্দ বছরের জেল। এদের অনেকেই বা অজ্ঞাতবাস থেকেই বেনামীতে নাৎসিবৈরীদের শাসিয়েছে।

তাই বহু আন্দোলনের পর—এমন কি ক্যাবিনেটে এ-বাবদে ঋদ্ধি ছিল যে, যদ্যপি ১৮৬৪-এর পর কোনো নাৎসি-রাজ ছিল না, এবং ফলে তারপর কোনো নাৎসি অপরাধ হয়নি—এবং বিশ বৎসর পর সব খতম হওয়ার কথা। তবু—আরো দশ না কুড়ি বছর ধরে (আমার ঠিক মনে নেই) পূর্ব নাৎসিরা ধরা পড়লে মোকদ্দমা চলবে।

চাইতেনই যে ফ্যারার হোন আর যাই হোন, ফ্যারার হলেই তো আর দেহ পাষণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল ; তিনি বলেছেন, “বিধবা হইলেই তো তার ‘দেহ’ পাষণে পরিণত হয় না”, তার পূর্বের সমাজ-সংস্কারকরা বলতেন, “বিধবা হইলেই তো আর ‘হৃদয়’ পাষণে পরিণত হয় না”), অতএব তাঁরও বিষয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি, যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত-সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠেট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল? সেইটেই আজকার বিষয়বস্তু।

ন্যূরনুবেগের মোকদ্দমার সময় (মিশ্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই ‘ফ্যারার’ হতেন; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা—হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন রোডল্, ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুস্থ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগ্ভুত প্রশ্নগুলো আসামীর দোষী না নির্দোষ সে বিচারে ‘অস্পেক্ট’র চেয়ে ‘বিস্তার’ অবাস্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সত্যি শয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন,—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অসম্ভবশীর্ণ গাঞ্জিকা-নিগত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেবো না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের ‘প্রেম’ সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তার লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গাটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অস্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বেষ্টটেশগাডেনের বাড়ি বেক’হফে এ’রা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সম্ভাষ্যই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবাস্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এ’দের শূধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিঙ বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, ‘Of course, he was normal like any one of us’, অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নর্মাল।

সেই সময়ই জর্মনির জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মনি সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম, গেলী (Angelika—এবং Geli এ’র ডাক-নাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2}$ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দু’বার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক ‘কাফ্ লভ্’, অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজ্ঞ প্রবর্তন করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্নতর টুঁ মেয়ে নিজের মস্তকদেশেই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্নতর ‘প্রেমে পড়ে’ নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটান্ নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীতর্ন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যানিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বান্তরঙ্গ জন-সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের ‘ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্’ বলেছেন—‘গ্রেটেস্ট’ বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম ‘হাফ’ ও দ্বিতীয় ‘হাফ’ রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই প্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কোতুল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্য উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দু’বার করে দূর-দূর-বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাও করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনো জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর ‘পরিচয়’ দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশ-বর্ষীয় হিটলার

‘আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্ফ্ কুটরে’

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গে আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি জু-কুঞ্চিৎ করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে ‘saw red’, অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগা ‘আর্মি-র পাপাত্মা অফিসারদের’^{৩০} বন্ধু বলছেন, বন্ধুয়া

৩ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যাধিক তথ্য বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যাধিক সরল করে ফেলা’র—ভদ্র-সিম্প্রিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে একথা সত্য, পরবর্তীকালে জার্মান আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মি’র

সম্প্রদায়ের প্রতি হিটলার অতি বাল্য বয়স থেকে সমস্ত সন্তা দিয়ে নিকৃষ্টতম ঘৃণা প্রকাশ করতেন—এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্মাট-সেনাবাহিনীর অফিসারদের এবং তাদের উদ্ভূত ভাব, দাঙ্কিক আচরণের প্রতি—যত্নতর সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট বশু, আদর-আপ্যায়ন যেন তাঁদেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য, যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং সেন্ট পীটারস্বহস্তে তাঁদের জন্য সে শাহ-ইন-শাহী ফরমান লিখে দিয়ে নিজেই ধন্য হয়েছেন—এই ভাব।^৪

সর্বপ্রধান কত্যা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেলকে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মান আর্মি-অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, ‘উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও’ বলে রক্তশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, ‘গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জার্মান অফিসারগণের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের অফিসারদের কোনো তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ সংগ্রামকারী জোয়ানদের সাফল্যের তুলনায় অফিসারগণ যেটুকু সামান্য করতে পেরেছেন সেটা জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।’

৪ হিটলারের খাস চাকর—valet—ছিলেন জনৈক হাইনৎস লিঙে। ইনি হিটলারের জামাকাপড় দরদস্ত রাখা, ওষুধপত্র হামেহাল হাজির রাখা এসব শত কাজ তো করতেনই—এমন কি ইভলিং-ড্রেস পরার সময় বো-ওটি তিনিই বেঁধে দিতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ—এবং গরিমাময় কর্মও বটে—জার্মানির ফ্যুরার ও তার প্রিয়া এফার বিছানা তৈরী করা। একদা তিনি দুজনকে এমন অবস্থায় পান—হিটলার ব্যত্যয়-বিহীন অভ্যাসমত মাত্র সেই এক দিন দ্বারে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যে তাঁর চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। এই কর্মের জন্য তাঁকে বাছাই করা হয় হিটলারের অতিশয় খাস সেনাবাহিনীর (এস্. এস্.=শুৎস্‌টাফেল) সর্বশ্রেষ্ঠ এক হাজার সৈন্য থেকে। প্রভুকে পূর্ণ দশটি বছর সেবার পর যখন হিটলার মিত্রশক্তির নিপীড়নে বালিনে প্রায় অवरুদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন অবশ্য মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে আপন পরিবারে চলে যাবার অনুরোধ দেন। প্রভুভক্ত লিঙে ধাননি। ফলে হিটলারের শেষ পর্বের আত্মহত্যার বুলেটশব্দ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পান, তাঁর মৃতদেহ চিতাশ্মলে বয়ে নিতে যেতে, চিতাতে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করেন। এফাও একে বড়ই বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণের কথাও খুলে বলতেন।

হিটলারের ভূগর্ভস্থ, বিরাটতম বোমার আক্রমণেও নিরাপদ ‘বৃষ্কার’ তিনি প্রভুর শব্দবাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। সে কর্ম সমাধান করে তিনি যখন রুশ সেনানী ভেদ করে—রাশানরা তখন বৃষ্কার থেকে তিনশ গজ দূরে—মার্কিন অধিকৃত এলাকায় আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তখন বালিনেই রুশদের হাতে বন্দী হন। পূর্ণ দশটি বৎসর তিনি ঐ দেশের ডাকসাইটে সব কারাগারে—(কিছুকালের জন্য সাইবেরিয়া বাস করে তিনি বিশ্ববন্দীমণ্ডলীতে যেন সোনার তাজ পেয়েছেন!)—বহু

পদুপোৎসবের প্রভাতে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম সজ্জা পরে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছেন, তাঁর প্রিয়ার জন্যে, তিনিও আসবেন শম্ভারথে পদুপপথে, পদুপাভরণ পরিধান করে। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে তিনি এলেন। হিটলার হ্যাট তুলে অন্যদিনের তুলনায় প্রচুরতর সসম্মম অভিবাধন জানালেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও প্রিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পদুপগদুচ্ছ থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্ন মদুদহাস্য করলেন।

সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে—বরণ বলা ভালো ‘সে মহালগনে’ তিনি সপ্তম স্বর্গেও যেতে সম্মত হতেন না—হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এই চার বৎসরের ভিতর হিটলার ঐ তরুণীটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর সখার কাছে, তিনিও যতখানি পারেন উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু হিটলার তাঁর কোনো উপদেশ, কিংবা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনো কৌশলই হাতে-কলমে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করেনি! এ বড় আশ্চর্যের কথা। এ নিয়ে প্রাগুক্ত জীবনীকার বিস্তর গবেষণা, বিস্তর চিন্তা করেছেন, কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব এবং ঈষৎ অবাস্তর বলে বর্জন করতে অনিচ্ছায় বাধ্য হলুম। শাস্তি, সময় ও সুযোগ পেলে পরে চেষ্টা করবো। কারণ যদিও মদুজনাতে কোনো কথা হয়নি, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত হয়নি, তবু ঘটনাটি সত্যই চিন্তাকর্ষণ করে—কারণ হিটলার তাঁর ‘স্বর্গীয় প্রেমের’ অভিব্যক্তি, প্রিয়াকে এক শূভদিনে দাম্পত্য বন্ধনে বন্ধন করার শূভেচ্ছা, সবই বন্ধুকে বলতেন। গৃহনির্মাতার স্কেচ আঁকাতে হিটলার সেই তরুণ বয়সেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন (ফ্যারার রূপে পরবর্তী জীবনে তিনি শতকর্মের মাঝখানে, এমন কি আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বেও বহু অভূতপূর্ব বিরাট প্রাসাদ, সৈন্যদের জন্য য়ুনিফর্ম, মেডেল, নৌবহরের জন্য সাবমেরিন ইত্যাদি নানা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্কেচ করেছেন এবং প্রায় সব স্কেচই কর্মে পরিণত করা হয়েছিল) এবং তাই

যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৩৪-এ পশ্চিম বার্লিনে ফিরে আসেন। এসেই তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুবিধ গুজোব বিনাশার্থে একথানা চিঠি বই লেখেন। তার এক স্থলে আছে, বিদেশের কোনো হোমরা-চোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পদলেহন করার পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ‘দেখলে লিঙে (ইনি কোনো কোনো সময় অভ্যাগতের জন্য পানাদি নিয়ে যেতেন—লেখক), ব্যাটারী কি রকম গত যুদ্ধের সামান্য এক জোয়ানের (হিটলার কর্পোরেল ছিলেন) সামনে হাঁটু নিচু করছে। আর বিদেশী কোনো জঙ্গীলাট হলে তো কথাই নেই। বস্তৃত হিটলার প্রকৃত মহান পুরুষদের মত এসব ‘বুদ্ধি’য়া স্নবধের উপেক্ষা না করে তাদের ‘সান্টাঙ্গ প্রণামে’ পরিতুষ্ট হতেন—যেন তাঁর তরুণ বয়স ও যৌবনকালের আহত আত্মাভিমান সাম্বনা-প্রলেপ পেয়ে বেঘনা দাগটা (তখনো!) লাঘব করে দিত। লিঙে সম্বন্ধে আমি ‘হিটলারের শেষ দশ দিন’ নামক প্রবন্ধে, ‘দু-হারা’ গ্রন্থে ঈষৎ সবিস্তার লেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

বিবাহের পর যে ভবনে কপোতকপোতী বাস করবেন তার অসংখ্য স্কেচ আঁকতেন হিটলার সমস্ত দিন ধরে।

হিটলার যখন স্কেচের উচ্চতম নভলোকে উজ্জীয়মান তখন কিন্তু তাঁর সখা, জীবনী-লেখক প্রথর ব্যবসায়-বৃদ্ধিধারী—তার পিতাও ব্যবসায়ী—ঘোর বস্তুতান্ত্রিক গুস্তাফ—এক কথায় স্বপ্নলোকনিবাসী ডন কুইক্সোটের যেমন হুবহু উল্টো কড়া সংসারী তামাসিক সাংস্কা পান্জা, এম্মলে হিটলারের সাংস্কা পান্জা ভিন্ন গোত্রের বসওয়েল, স্কেচের পাশে দাঁড়িয়ে বলতো, ‘হঃ! সবই বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু সেই বস্তুটি টাকা!’ তিনি জানতেন হিটলারের বুদ্ধিমত্তার অতি ক্ষুদ্র পেনশন ভিন্ন সে পরিবারে একটি কানাকড়িরও আমদানি ছিল না।

হিটলার স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলতেন, ‘আহ, তোমার শব্দ টাকা, টাকা!’

কিন্তু এ কাহিনী এখানেই থাক। আমি শব্দ ভাবি, কবিসম্মত দাস্তের কথা।

ও আসলে কিন্তু এই সখা অতিশয় সদাশয় ভদ্র নিরলোভ ব্যক্তি। ওঁদের বয়েস যখন প্রায় কুড়ি (১৯১০।১১ গোছ) এবং একসঙ্গে একই কামরায় ভিয়েনায় বাস করতেন তখন হিটলার দৈন্যপক্ষে নিমজ্জিত হতে হতে শেষটায় এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সখা গুস্তাফকে বিরত না করার জন্যে—হিটলার আমতা ছিলেন এমনই আত্মাভিমানী, touchy, যেটাকে নিশ্চয়ই morbid বলা চলে—একদিন সখাকে কিছু না বলে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তার প্রায় ২৫ বৎসর পর হিটলার লোকচক্ষের সম্মুখে রাজনৈতিক নেতারূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন গুস্তাফ খবরের কাগজ মারফৎ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলেন। তারপর ১৯৩০-এ যখন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন তখন দীর্ঘ ২৩ বছর পর গুস্তাফ তাঁকে চিঠি লিখলেন। উত্তরও পেলেন। ১৯৩৪-এ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে যখন বিজয়ী বীরের মত লিন্ৎসে পৌঁছলেন তখন দুই সখাতে দেখা হল। গুস্তাফ ছোট্ট সরকারী চাকরি করতেন এবং অগেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন বলে হিটলারের big offer তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে প্রতি বছর দুই একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পোষ শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সদুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, ‘যেখানে খুশী বলা, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সর্বসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেকশন!’ গুস্তাফ সে লোভও সম্বরণ করেন।

তার প্রিয়া বেয়াগিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহীন কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পদুপের জন্য বিখ্যাত ফ্লোরেন্স (flora) নগরীর পদুপাংসবে যখন সবাই সবাইকে পদুপাং-পহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবে-চিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। বাস্ ! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী। সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দাস্তের সদুপ কবিসত্তা তাকে সচেতন করে দিয়ে বলল, ‘তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?’ বিনয়-ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দাস্তে রচনা করলেন তার ‘স্বর্গীয় কাব্য’ (দভানী কস্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দাস্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জার্মানি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর ‘রাজমুকুট’ পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দাস্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াগিচে কে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দাস্তের ইন্ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিখে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জার্মান সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিখে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিখ শহর রাজনৈতিক ঝগড়াবাত্যায় বিকল। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialistische Deutsche Arbeitspartei—এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কতৃৎ লাভ

করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিষ্টবৈরী
রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দূসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিটলারের
(ইনি পরবর্তী যুগে জার্মানির প্রেসিডেন্ট হন) সহকর্মী জেনারেল এরিখ
লুডেনডোর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না
যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি
শক্তিসম্পন্ন হল যে তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের
অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর
দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেনডোর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের
নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন।
রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত
হলেন (কিছু বন্দকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে
পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময়
তিনি মাদ্রিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন,
(এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্টদের শাসিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ‘কটক দ্বারা কটক উৎপাটনার্থে’) হিটলারকে অল্প
কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার
প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে বিক্ষিপ্ত পার্টি'কে দিনে দিনে
শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনো কিছু
বলে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা
দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা।
ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর
প্রিয়র (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন ‘স্ট্রফানি’) খবর নিতেন। তারপর
সেই বন্ধু, গুস্তাফও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্ট্রফানি
হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে
অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্ৎস শহর খুজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত
না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায়
মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় ‘ধনগর্দগ্গ ভিক্ষণের’ অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা
থাকাকালীন স্ট্রফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন
পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ তাঁর সঙ্গে তখন
ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্ট্রফানিকে চিনতেন না—
এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার
উপক্রম !

কিন্তু এখানে তাঁর স্থাপত্য শিক্ষালয়ে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া, তাঁর নিদারুণ দৈন্য, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অবিচারে নানা জাতের বই এনে সে-গুলো গোথাসে ভক্ষণ—এর কোনোটাই আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমরা জানতে চাই, ওয়াশিংটন-ইউনিয়ন-সং—মধ্যমৈথুনসঙ্গীত—এই তিন বস্তুতে যে রাজসিক প্রিয়দর্শন ভিয়েনা নগর প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দিত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তো বহু পূর্বে সে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গিয়েই ছিল, সেই ভিয়েনাতে নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিটলারের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা।

গুস্তাফ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, ষাটদিন হিটলার তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন ততদিন ওঁদিকে তাঁর কণামাত্র উৎসাহও তিনি কখনো দেখেননি। বস্তুত দীনবেশে সজ্জিত হলেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর চোখেমুখে যে দীর্ঘত পথিক-জনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভিয়েনার ভদ্র, দৌম মনোদৈন্য, গণিকাদের চোখেও সেটা ধরা পড়তো হিটলারকে দেখে। এবং তরুণ হিটলারের দিকে কটাক্ষনয়নে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতও দিত। সাদামাটা, কিশোরী ঈর্ষান্বিত গুস্তাফ সেদিকে হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁর বাহু ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতেন, 'চল, চল, গুস্তাফ, বাড়ি চলো।'

পূর্বেই বলেছি তারপর তিনি উধাও হলেন।

সেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৯/২০ পর্যন্ত যে ষাটকিছু লেখেন তার পনের আনা কাগজপত্র। অবশ্য ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন জওয়ানরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সম্বন্ধে সে সময়কার খবর সরকারী কাগজপত্রে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে অবাস্তব।

বস্তুত একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯০৮ থেকে ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত কোনো রমণী তাঁর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

৬ এমন কি পরবর্তী কালে এফা ব্রাউনও না।

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ১৯৪১ এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সেনাদল যখন বীরবিক্রমে জয়ের পর জয় লাভ করে মস্কোপানে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন লাগু-ডিনারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গম্বপ করতেন। ১৯৪২-৪৩-এর শীতে স্থালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর জেনারেলদের উপর ক্রোধ হয়ে তিনি শূদ্ধ তাঁর মহিলা সেক্রেটারি-স্টেনোদের সঙ্গে খেতেন। এফার হেডকোয়ার্টার্সে আসার অনুমতি ছিল না। হিটলার সময় পেলে বেস্টেগাডেনের বাড়ি বেগ-হফে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। কিন্তু ঐ ১৯৪১/৪২ এক বা দেড় বৎসর তিনি যে-সব গালগম্বপ করেছেন সেটি লিখে রাখা হয়েছিল স্টেনোদের দ্বারা। প্রকাশিত হয়েছে 'হিটলারস্ টেবিল-টক' শিরোনামায়। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার কেতাব। এ-পুস্তকের বহুস্থলে পাওয়া যায় রমণীজাত সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। কিন্তু ভিয়েনা বাসকালীন কিংবা ১৯২৫/২৬ পর্যন্ত তিনি যে কোনো রমণীকে কাছের থেকে চিনতে পেরেছেন, এর কোনো ইঙ্গিত নেই। অবশ্য এ-দ্বারা কোনো কিছু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না।

পরিচয় হয়েছিল তাঁর বহু রমণীর সঙ্গে—একে ভিয়েনায় তাঁর যৌবনের বেশ কিছুকাল কেটেছে, যে-ভিয়েনা রমণীজাতিকে খাতির করতে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ সচেতন, কিংবা ‘অট্টতর্ন্যা’, দুটোই বলতে পারেন, এক কথায় ভিয়েনা গ্যালাস্ট নগর—তদুপরি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিখের রাজনৈতিক আকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান গ্রহ, কম্যুনিষ্টদের মোকাবেলা করতে পারেন একমাত্র তিনি, রাস্তাঘাটে নাৎসি আর কম্যুনিষ্ট দলে প্রায় প্রতিদিন মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য খুনও হয়ে গিয়েছে—এ সবার নেতা তো বীষবান না হয়ে যায় না। তদুপরি মহিলাদের প্রতি কি প্রকারের ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার্য্য সব আদব-কায়দা-এটিকেট-গ্যালানিটি তিনি জানেন—ভিয়েনাতে অবশ্যই তার বেশীর ভাগ তিনি দেখে শিখেছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত অসাধারণ জিনিয়াসের পক্ষে সেইটে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। এবং সর্বশেষ কথা, তাঁর যে একটা ম্যাগনেটিক চার্ম—চৌম্বিক আকর্ষণ শক্তি ছিল সেটা তো জার্মান ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বিদেশী রমণীও বলেছেন।

আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিটলার জীবনে প্রেম হাফ প্রাস ওয়ান প্রাস হাফ।

শুস্তফানির প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম হাফটা, শেষ হাফটা এফা ব্রাউন, যাকে তিনি শেষ মূহুর্তে বিয়ে করেন এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর বহুলোক এ প্রেমের খবর পায়। কিন্তু আমরা এস্থলে যে দৃষ্টিবিন্দু—অর্থাৎ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে—হিটলারকে দেখছি, সেভাবে কেউ দেখেননি, লেখেননি। হয়তো সেই হাফটি এস্থলে আগে বর্ণনা করে মাঝখানের ফুল ওয়ানটিতে গেলে ভাল হত, পাঠক পুরো পার্সপেক্টিভ পেতেন, কিন্তু শেষটায় অনেক চিন্তা করে দেখলুম বিশেষ কারণ না থাকলে এ ধারার খেলাতে কালানুক্রমিক অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত (সিনেমার ক্লাশবেক কিংবা ক্লাশ ফরওয়ার্ড টেকনিক অবশ্য আজকাল বড়ই জনপ্রিয়)। দ্বিতীয়, এফার সঙ্গে হিটলারের সর্বশেষ প্রেম ১৯৩৯-৪৫এর যুদ্ধাদি দ্বারা এতই বিক্ষুব্ধ যে বহু অবাস্তব নরনারীকে সেখানে টেনে এনে প্রবঞ্চন কলেবর বাড়াতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকেই সে-প্রেম সম্বন্ধে অতপবিত্তর পড়েছেন বলে স্বতঃপরিসর প্রবন্ধে মূল ঘটনাগুলো শুদ্ধ আবার তাঁরা শুনতে পাবেন মাত্র—অর্থাৎ, সে প্রেম বর্ণাতে হলে পূর্ণ পুস্তকের প্রয়োজন।

এস্থলে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি, রমণীর প্রতি পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম এদেশের এবং ওদেশের বহু কাব্যকাহিনীতে আছে কিন্তু বাস্তবে যদ্যপি যে কোনো কারণেই হোক। কুলীন প্রথার কথা তথা গ্রীক বা দশরথের কথা এস্থলে স্মরণে আনিছি নে। আমরা আজ এদেশে একদারনিষ্ঠতাকে সম্প্রশংস দৃষ্টিতে দেখি, ইয়োরোপে বহুকাল ধাবৎ একই রমণীকে আজীবন পূজো করার বিশেষ মূল্য দেয়নি। অতএব পাঠক যেন শুস্তফানির কথা স্মরণে এনে হিটলারের

সর্বমহৎ, সর্বগ্রাহী প্রেমকে তার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হয়।

ঠিক কোন সালে সে প্রেমের সূত্রপাত হয় সে কথা তাঁর অন্তরঙ্গতম ব্যক্তিও জানেন না—যদিও আমার সুদৃঢ় অচল বিশ্বাস, বয়সে পরিণত হওয়ার পর তিনি কারুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেননি, ফোটোগ্রাফার হফ্মান ছিলেন তাঁর একমাত্র নিত্যলাপী বিদুষক—তবে নিশ্চয়ই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ইতিমধ্যে হিটলারের একটি বিশিষ্ট স্বভাবের উল্লেখ না করলে সে প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোটামুটি ১৯২৭, পাকাভাবে বলতে গেলে তার দু'তিন বছর আগের থেকেই হিটলার মুনিকান্জলে এমনই প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। দিনের পর দিন বিশাল জনতার সামনে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশের দুঃখদৈন্যের নিদারুণ বর্ণনা দিচ্ছেন, বিশেষ করে শিশু পুত্রকন্যার জন্য আহার বসন সংগ্রহার্থে মা-জননীদের কঠোর সংগ্রাম (মেয়েরা দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে কাঁদলেও তার সম্মিলিত ধনি হিটলারকে কখনো কখনো পুরো দু'তিন মিনিট বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করতো) এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের জৈব্য তথা পাপাচার (করাপশন) নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর আশাবাদ যে তিনিই মেসায়্যা (কৃষক, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনা করবেন) তিনিই ভের্সাই ডিকট্যাট (ডিকট্যাট = ডিক্টেশন থেকে, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের প্রতি যে কোনো অন্যায় পশুবলপ্রযুক্ত অলম্ব্য আদেশ, যে আদেশ পালন না করলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সবংশে নির্বংশ করা হবে এবং জার্মান রাষ্ট্র থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জার্মানিকে পুনরায় সার্বভৌম এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেশানরূপে পরিণত করবেন।^৭

ব্যক্তিগত জীবনেও হিটলার আর কাউকে আমল দিতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রিয় তিনটে ক্যাবের একটাতে কয়েকজন বন্ধুসহ বসতেন। কিন্তু আমরা যাকে বলি আড্ডা মারা, কিংবা গালগল্প করা—যে কর্মে ভিয়েনা বাঙ্গালীর চেয়েও এক কাঠি সরেস—এবং যে ভিয়েনায় হিটলার প্রথম যৌবন কাটান—সেটি হত না। হিটলার ভিয়েনাতে অনেক কিছু শিখেছিলেন, শুধু এই সমাজনন্দন আচরণটি রপ্ত করতে পারেননি। সর্বক্ষণ তিনিই কথা বলতেন, একমাত্র তিনিই।

এসব ম'ডলীতে মহিলাদের নিরঙ্কুশ 'প্রবেশ নিষেধ' না হলেও তাঁদের মাত্র

৭ হিটলারের বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়—লেখক তাঁর বহু বক্তৃতা শুনছেন। এ বাবদে একটি অত্যন্তম—সর্বোৎকৃষ্ট বললেও অত্যাধিক হয় না—পরিচ্ছেদ লিখেছেন জনার্লিস্ট মার্কিন মাউরার তাঁর 'জার্মান পদুট্‌স্ দি ব্লক ব্যাক্' পুস্তিকায়।

দু'একজন আহবান পেতেন অতিশয় কালেভদ্রে। হিটলার ভিয়েনার কায়দায় তাঁদের হস্তচূষন করতেন (যদিও জর্ম'নিতে তখন সেটা বিলকুল আউট অব ডেট), তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন, সামান্য হাঁ, হুঁ কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে দিতেন, কিন্তু একটা দিকে তিনি কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখতেন, কোনো রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে—তা তিনি যত বদুশ্চিন্তাই হোন, মাদাম প'পাডুর, ইজাবেলা ডানকান, মাদাম দ্য শ্তাল যেই হোন না কেন।

গেলীর প্রবেশ

সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অবিবাস্য—অতিপ্রাকৃত বা মিরাকুল্‌ই বলা যেতে পারে।

নিতান্ত্র একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার তাঁর অন্যতম কাফেতে। অতি ভদ্রভাবে সে সবাইকে নমস্কারাদি করলে। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা'জব কি বাৎ। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে তাবৎ কথাবার্তা সে-ই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—ওঁদিকে এতই বিবেচনা ধরে, যে একে কথা বলতে দেয়, ওকেও কথা বলতে দেয়, কাউকে অস্বাভাবিক আড়ম্ব হতে দেয় না—সবাই, ইংরিজিতে যাকে বলে ভেরি মাচ্‌ অ্যাট ইজ—কিন্তু সব মন্তব্য, সব আলোচনা ঘুরে ফিরে যায় ঐ মেয়েটিরই কাছে।

আর অতিপ্রাকৃত, মিরাকুল্‌ হল এই যে, স্বয়ং হিটলার চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে সুমধুর পারিতৃপ্তির মৃদুহাস্য বদনমণ্ডলে ছাড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন।

হিটলারকে যখনই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় মরুদুশ্বীস্থানীয় পার্টি-মেম্বরেরা শূদ্রোতেন, 'বয়েস তো হল, বিয়ে-শাদীর কথা—'

হিটলার বাধা দিয়ে বলতেন, 'জর্ম'নি আমার বধু!'

ঠাট্টাছলে বললেও এর ভিতর যে অনেকখানি সত্য লুক্কায়িত আছে সে তত্ত্বের কিছুটা সে-সব মরুদুশ্বীরা জানতেন। নইলে এ-জাতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে ধ্বিরদ্ব-নির্মিত শিখরবাসী হিটলারকে জিজ্ঞেস করবে কে? কারণ তাঁরা এবং পার্টির অন্য সবাই জানতেন, হিটলার জাত-ব্যাচেলার। তা সে ভিয়েনাজ কেতায় সুন্দরীদের সামনে যতই গ্যালানট্রি, শিভালরি দেখান না কেন, রমণী-দের কথা উঠলে টেবিলে দু'হাত রেখে, সুমুখের দিকে মু'কে যতই সিরিয়াসলি তিনি কোথায় কোন সুন্দরী রমণী দেখেছেন, যে-বেভেরিয়াকে তিনি এত ভাল-বাসেন যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন সেই বেভেরিয়া মায় তার মুন্যিক সুন্দরীর ব্যাপারে যে ভিয়েনার কাছেই আসতে পার না—এসব নিয়ে যত ধানাইপানাই তিনি করুন না কেন, পার্টির উ'চু মহলের প্রায় সবাই জানতেন যে হিটলারের পক্ষে কোনো সুন্দরীকে নিয়ে পার্টির অতি সংকীর্ণ গ'ড়ীর ভিতর কিছুটা টলটল বরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, কিন্তু বিয়ে করে বউ কাচা-বাচা নিয়ে ঘর বাঁধবার মত মানু'ষ হের হিটলার

নন। মাঝে মাঝে তাঁকে এ মন্তব্যও করতে শোনা গেছে : ‘সুন্দরীদের ভালো-বাসবো না—সে কি ? আমি কি এতই রসকম্ববর্জিত আকাট ! যা বলুন, যা কন’ আপনারা তো জানেন, আমার সন্তার অন্তস্তলে যে পুরুষ লোকানো আছেন তিনি আর্টিস্ট ! এবং আমি ফুলও ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে কি আমাকে বাগানের মালী হতে হবে ?’ প্রায় এ সত্যটিই চার্লস ল্যাম্ বলছেন, ‘আমার ঘরে ফুল নেই কেন, শুধোচ্ছেন ? আমি কি ফুল ভালোবাসি নে ? নিশ্চয় বাসি। আমি শিশুদেরও ভালোবাসি—তাই বলে তাদের মৃদুগুণগুলো কেটে ঘরের ভিতর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি নে।’ আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যের শেষ শব্দটি বলতে হলে বাঙলা প্রবাদেই শরণাপন্ন হতে হয়—‘বাজারে যখন দুধ সস্তা তখন গাই পোষার কি প্রয়োজন ?’

পূর্বেই বলেছি, সত্যাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিটলারের কেউ ছিল না। তবু মোটামুটি থাকে বলা যেতে পারে তিনি তাঁর ফটোগ্রাফার হফ্‌মান। এঁকে তিনি এই প্রসঙ্গে খাঁটি বৈষয়িক তত্ত্বকথাটি বলেন, ‘জর্মানিকে গড়ে তোলা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, আদর্শ। একবার আমার জেল হয়েছে, আবার যে কোনো মূহুর্তে আমার ছ’বছরের জেল হতে পারে। তখন বড়-বাচ্চা বাইরে, আমি গরাদের ভিতর। এটা কি খুব বাঙ্কনীয় পরিস্থিতি ?’

তবু বেশীর ভাগই এই নবাগতা সুন্দরী, ব্রিডনী, মধুরভাষিণী, আত্ম-সচেতন অথচ বিনয়ী মেয়েটিকে দেখে (এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করে যে হিটলার কার্ফ-চক্রের চক্রবর্তীর সম্মানিত আসন সানন্দে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন) ভাবলেন, তবে কি হিটলারের ‘জর্মানি আমার বন্ধু’ নীতিটি পরিবর্তন করার সময় এসেছে ?

মেয়েটির নাম আর্ডেলকা রাউবাল। হিটলারের সংবানের মেয়ে—ভাগ্যী। সৈদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু তেমন কোনো অলঙ্ঘ্য আপ্তবাক্যপ্রসূত নিষেধ নেই।^৮ মেয়েটির মা বিধবা, সামান্য যে পেনসন পায় তাতে দুই কন্যাসহ জীবনযাপন সহজ নয় ; এদিকে যে ছোট বৈমাত্রেয় ভাই আডল্‌ফকে, তার বহু দোষ—তার মারাত্মক গোটা তিনেক পূর্বেই নিবেদন করেছি—থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে স্নেহ করেছেন, সেই আডল্‌ফ, এখন স্বচ্ছল হওয়ার দরুণ আপন জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার কাছেই—সীমাস্তরের লাগোয়া অঞ্চলে ম্যুনিখ থেকে একশ মাইল দূরে বের্শটেশগাডেনে বাড়ি কিনে তাঁকে অনুরোধ করেছে সীমাস্তরের এপারে এসে সে বাড়ির জিম্মা নিতে। বেচারী আডল্‌ফকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ম্যুনিখ শহরে রাজনীতি নিয়ে, সময় পেলে ঐ গ্রামের নতুন বাড়িতে গিয়ে যেন

৮ এই ভারতের অঞ্চ অঞ্চলে হিন্দুসমাজে আপন সহোদরা ভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক, ও নিত্য নিত্য হয়। বস্তুত প্রথমেই মামাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে হয়—যেন ন্যায্য হক তারই। সে রাজী না হলে অন্যত্র তার বিয়ে হয়।

একটুখানি আরাম পায়। তদুপরি এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে আঙেলিকা রাউবালের মা, হিটলারের এই সৎবোনটি যেমন বাড়ি চালাতে জানে, অতিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের সেবা করাতে নিপুণা, তেমনি পাচিকা রূপে সমস্ত নগরীতে অতুলনীয়। স্বভাবতই সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই মেয়েকে। এদের বড়টিই আঙেলিকা বা গেলী।

৯ হিটলার-পরিবারের কুলদ্বীপটি দিশী-বিদেশী কোনো ঘটক-ঠাকুরেরই অমলানন্দের কারণ হবে না। প্রথমত হিটলারের (Hitler, Hiedler, Huetler, Hueftler—আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত চাষাদের মত হিটলারের ঠাকুরদারা নানাভাবে এ নাম বানান করেছেন; স্বয়ং হিটলারের পিতা—তঁার জন্ম জারজরূপে—সেফথা পরে হবে, গোড়াতে Hiedler এবং পরে Hitler বানান করেছেন) পিতা এবং মাতা উভয়েই দুই ভাই, অর্থাৎ হিটলার পদবী ধরেন এমন দুজনার বংশগত, এবং এই কারণে হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন তখন চার্চের পক্ষে থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্যারার আডল্ফ হিটলারের পিতামহ বিবাহ করেন Mari Anna Schicklgruber-কে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তার পাঁচ বৎসর পূর্বে Schicklgruber একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন কুমারী অবস্থাতেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন। এই পুত্রই ফ্যারার আডল্ফ হিটলারের পিতা। এবং যেহেতু নবজাত শিশুর মাতা বিবাহিত নয় তাই রীতি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় মাতামাতামহের পরিবারিক নাম Alois Schicklgruber। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের পরও পিতা তাঁর পুত্রের নাম Hiedler (তিনি এভাবেই বানান করতেন) —এ পরিবর্তন করার মেহমতটুকু আপন স্বেচ্ছা তুলে নেননি। অবশ্য একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি বাতিলও করা যায় না যে Alois সত্যি ফ্যারারের পিতামহ Johann Georg Hiedler-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তবে সে অঙ্কের সাধারণজনের বিশ্বাস ছিল Alois-এর জন্ম Johann Georg-এর ঔরসেই। Alois-এর মাতা Maria ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মারা যেতেই Johann Hiedler অস্ত্রধান করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় দেখা দিলেন এবং তিনজন সাক্ষী ও নোটারির (উকিলের) সামনে শপথ নিলেন যে, Alois Schicklgruber তাঁহাই ঔরসজাত পুত্র বটে। ঐদিন থেকে তাঁর নাম হল Alois Hitler (বা Hiedler)। ইনিও একাধিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর পিতারই মত। এদিক ওদিক বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বিয়ে করেন শুল্ক বিভাগের এক পালিতা কন্যা Anna Glasl-Hoerer-কে। এ বিয়ে সূত্রে হয়নি। এবং এঁকে তালাক দেওয়ার পূর্বেই Alois ‘বন্দু’ করেন কুমারী Franziska Matzelsberger-এর সঙ্গে। ফলে একটি পুত্রসন্তান হয়। এর নামও Alois। ইনিও জারজ; পরে আইনতঃ পিতার নাম পান। এঁর পিতা তাঁর মাতা Franziska-কে বিয়ে করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত প্রথম স্ত্রী Anna Glasl-Hoerer-এর মৃত্যুর পর। বিয়ের তিন মাস পর Franziska সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৬

মেয়েটি অসাধারণ সন্দেহরী ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সম্বন্ধে এবং মামা আডল্ফের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে একাধিক লেখক আপন আপন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতর দু'জন দুই মত পোষণ করেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সত্যনিরূপণ করা অসম্ভব। তবে দু'জনাই একমত যে ঐ গেলী-ই হিটলারের 'ওয়ান গ্রেট লাভ'! এঁদের একজন হিটলারের ফোটোগ্রাফার বন্ধু হাইনারিখ হফ্‌মান। হিটলারের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি হিটলার সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার নাম 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' (ইংরিজি অনুবাদ)। বলা বাহুল্য যে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারেননি, তবে এ-কথা সত্য, সব সত্য—গ্যাস চেম্বারে ইহুদী পোড়ানো ইত্যাদি—জেনে-শুনেনও তিনি হিটলারের নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই করেছেন বেশী—তবে এ কথাও বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক ব্যাপারে হফ্‌মানের কোনো চিন্তাক্ষণ ছিল না,—ঐ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, কনসানট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা হত খুবই কম। ফটোগ্রাফার হলেও হফ্‌মান উত্তম উত্তম ছবির কদর ও সম্মান জানতেন, এবং হিটলারেরও রুচি ছিল স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। দু'জনার আলাপ-আলোচনা হত আর্ট নিয়ে।

অন্যজনের নাম পদুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেট্‌স। এঁর বইয়ের নাম 'আনহাড'

একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন (এঁর নাম Angela এবং ইনিই পরবর্তীকালে হিটলারের নতুন বাড়ি দেখাশুনো করার ভার নেন ও সঙ্গে নিয়ে আসেন কন্যা, হিটলারের প্রেয়সী Angelica, ডাক নাম Geli)। কিন্তু Angela-র জন্মের এক বৎসর পরে Franziska ক্ষয়রোগে মারা যান। এর চার বৎসর পর ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা Alois Hitler বিয়ে করেন তাঁর ঠাকুন্দার ভাইয়ের নাত্নী শ্রীমতী Klara Poetzel-কে, এই জানুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। এ বিয়ের চার মাস দশ দিন পরে জন্মান ফ্যুরারের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা Gustav এবং বাল্যকালেই মারা যান, এবং তার পরের কন্যা Idaও অল্পবয়সে মারা যান। ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার তৃতীয় সন্তান (পিতার তৃতীয় বিবাহের)। তাঁর ছোট ভাই Edmund এ পৃথিবীতে মাত্র ছ'মাস ছিল। সর্বশেষ সন্তান—পঞ্চমা—Paula ফ্যুরারের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত চিরকুমারী অবস্থায় Salzburg-এ বাস করতেন। এই পাউলা একবার ভ্রাতার (হিটলার ভ্রাতা ফ্যুরার) বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন, কিন্তু দীর্ঘদিন (হিটলারের হিসেবে) থাকেন বলে ভ্রাতা আডল্‌ফ তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি।

সংভাই (পিতার ২য় বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র Alois) বার্লিনে মদ বেচতেন। তাঁর সম্বন্ধে হিটলার কখনো একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর ছোট বোন Angela বেশ কয়েক বৎসর হিটলারের গ্রামের বাড়ি চালানোর পরে ঝগড়া করে চলে যান, এবং এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেন। হিটলার এমনই চটে যান যে বিয়েতে কোনো উপহার পর্যন্ত পাঠাননি।

উইটেনেস'। হিটলার যখন মন্ট্রিয়কে তাঁর দল গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন তখন উজয়ের পরিচয় হয়। পুংসি বিস্তালালী খানদানী ঘরের ছেলে বলে তিনি হিটলারকে নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হন। হিটলার ফ্যারার হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল তিনি 'দরবারে' আসা-যাওয়া করতেন, এবং প্রায়ই নিভূতে হিটলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'দরবারে'র কুটনৈতিক মারপ্যাচে হেরে যান এবং সুইটজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন। ইনি তাঁর পুস্তকে হিটলার এবং গেলী উজয়েরই বিরুদ্ধে প্রচুর বিবোধগার করেছেন। তাঁর মতে গেলী অতিশয় সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মত ফ্লাট করার জন্য আকুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হিটলার সম্বন্ধে আপন আপন বই লেখার পর, এই দুজনার বই বেরিয়েছে এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা হফম্যানের কাছাকাছি।

তা সে যা-ই হোক, একথা সত্য হিটলার তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে কাফেতে যেতেন এবং আগে কাজের চাপে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরায় অল্প যেতেন—এখন গেলীর চাপে সেগুলো বেড়ে গেল। কিন্তু আসলে হিটলার সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন গেলীকে মোটরে করে নিয়ে পিকনিক করতে—মন্ট্রিয়কের চতুর্দিকে পিকনিকের জন্য অত্যাশ্চর্য স্থল বিস্তর। পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বনফুলে ভর্তি মোলায়েম ঘাসের ঢালু মাঠ, মহান বনস্পতি—কোনো বস্তুরই অভাব নেই। হফম্যান পরিবার প্রায়ই সঙ্গে যেতেন।

সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করতেন। এবং তাই লোকজনসমক্ষে তিনি কখনো বে-এক্সেয়ার হয়ে এমন কোনো আচরণ করেননি যা মৃদু প্রণয়ী ইয়োরোপে মাঝে মাঝে করে থাকে। গেলীর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল,—হিটলার সে স্বর তালিম দিয়ে অপেরার জন্য গেলীকে তৈরি করতে চাইলেন এবং উপযুক্ত গুরু নিয়োগ করলেন। পুংসি বলেন অন্য কাহিনী। তিনি বলেন, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত বাজে ফ্লাট টাইপের। অপেরার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করতে হলে যে রেওয়াজ এবং বিশেষ করে যে কণ্ঠের অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, গেলীর চরিত্রে তার কণামাত্র উপাদান ছিল না। প্রায়ই গুরুকে ফোন করে রেওয়াজ নাকচ করে দিত এবং এই ফাঁকে ফ্লাট করার তালে লেগে যেতো। পুংসির মতে শেষ পর্যন্ত গানের ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে একথা সর্ববাদিসম্মত যে ভিয়েনায় যে গুরুর কাছে গেলী সর্বপ্রথম গান গাইতে শেখা আরম্ভ করে সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইতো। জনশ্রুতি একথা বলে, সেখানে নাকি গেলীর দ্ব্যিত বাস করতো।

এবং ঠিক এইখানেই ছিল হিটলারের ঘোরতর আপত্তি। শূদ্র তাই নয়, যদিও গেলীকে শূদ্রী করার জন্যে হিটলার সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন—যেমন গেলীর সঙ্গে টুপি-জুতো কিনতে যাওয়ার মত পীড়াদায়ক মারাত্মক একঘেয়ে ঘটানিও তিনি বরদাশ্ত করে নিতেন (হিটলার নিজেই বলেছেন, গেলীর সঙ্গে হ্যাট টুপি কাপড় কিনতে যাওয়ার চেয়ে কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষা

ত্রিসংসারে আর নেই। আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরে সে দোকানের মেয়েকে দিয়ে বস্তার পর বস্তা কাপড় নামাবে, তার সঙ্গে সে সব নিয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুটা না কিনে গট গট করে বেরিয়ে চলে যাবে অন্য দোকানে। হিটলার ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে আঙুলের নখ কামড়াতে, কিন্তু যা-ই করুন আর না-ই করুন, তার পরের বারও বাছুর ছানাটির মত গেলীর সঙ্গে কেনা-কাটা করতে যেতেন ঠিকই। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি অচল অটল। তাঁর অন্তর্মতি ভিন্ন গেলী যার-তার সঙ্গে আলাপচারী করতে পারবে না। এমন কি পরিচিতজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলবে না। এবং এই ফরমান্ যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা স্বয়ং গেলীও জানতো না।

গেলী অবশ্যই জানতো হিটলার তাকে ভালোবাসেন, তার প্রেমমুগ্ধ, সে প্রেম যে কত অতল গভীর সে-সম্বন্ধে বেচারীর কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন সেটা সে বুঝতে পারলো রীতিমত ভীতশঙ্কিত হয়ে।

হিটলারের পার্টির সদস্যগণ যে যে কাজই করুন না কেন, সমাজে তাদের যে-স্থানই হোক না কেন, পার্টির ভিতর একটা প্রশংসনীয় সাম্যবাদ ছিল। হিটলারের মোটর জাইভার এমিল মরিস ছিল প্রাচীন দিনের পার্টি-মেম্বার। সে একদিন কাঁপতে কাঁপতে হফম্যানের সামনে এসে বললে, সে গেলীর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করছিল, এমন সময় হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকে রাগে, জিঘাংসায় যেন সর্ব আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে চিংকারের পর চিংকারে মরিসকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। মরিস তো রীতিমত ধাবড়ে গিয়ে ভাবলো, হিটলার যে কোনো মূহুর্তে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারেন। ঘটনাটি হফম্যানকে বলার সময় সে তখন ভয়ে কাঁপছে।

হফম্যানের মতে গেলী ছিল পুত, পবিত্র পদুপটির মত। তিনি বলেন, অপরাধ তার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। কিন্তু মরিসটি ছিলেন ঈষৎ নটবর। কিন্তু সেও যে ফ্যুরারের ভাগ্যীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সেটা অবিশ্বাস্য। করতে গেলে তার বহু পুর্বেই মরিসের বন্ধুবান্ধব তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।

হিটলারের শত্রুর অভাব কোনো কালেই ছিল না। এমন কি তাঁর প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট দলের কিছু কিছু সদস্য পার্টির আদেশানুযায়ী নাৎসি মেম্বার-শিপ নিয়ে হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যথাস্থানে তাদের রিপোর্ট পাঠাতো। এদের তো কথাই নেই, আরো কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি খোয়া তুলসীপাতা ছিল না।^{১০} তা সে যাই হোক, হিটলার আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বহু কাল পরে—ইতিমধ্যে মরিস গা ঢাকা দিয়ে থাকতো

১০ হিটলারের প্রখ্যাত জীবনী-লেখক বুলক বলেন—‘He (Hitler) discovered that she (Geli) had allowed Maurice to make love to her’, ইংরাজিতে to make love হয়তো একাধিক অর্থ ধরে।

—হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেত।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিটলার প্রোপাগান্ডা-সফরে বেরুলে গেলী মায়ের কাছে, হিটলারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। বোধ হয় তারই কোনো এক সময়ে হিটলার প্রিয়া গেলীকে একখানা চিঠি লেখেন—সেটাতে নাকি য়োনসম্পর্ক সম্বন্ধে হিটলার অতিশয় প্রাজ্ঞ—শত্রুপক্ষের অভিমতে—
 ‘অগ্নীল ভাষায় আপন কাম্য আদর্শ য়োনসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। য়োনবিজ্ঞানীরা বলেন অত্যাচারী শাসকদের (টাইরেণ্ট) অনেকেই নাকি মাজেকিস্ট হয়ে থাকেন—অর্থাৎ স্বাভাবিক য়োনসঙ্গমের পরিবর্তে উলঙ্গ রমণী সে স্থলে পুরুষকে তীব্র কশাঘাত করে, কিংবা তলায় সূক্ষ্ম লোহা লাগানো রাইডিং বুট পরে পুরুষের স্কন্ধোপরি ঘন ঘন বুটোঘাত করে, তবেই নাকি পুরুষ তার য়োনানন্দ পায়।’^{১১} শত্রুপক্ষের মতে হিটলারের চিঠি মাজেকিস্ট দর্শন বিবৃত করেছিল। সে চিঠি নাকি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যায় অন্য লোকের হাতে। অতি কষ্টে, বহু অর্থ নিয়ে (বলা হয় পার্টি-ফান্ড থেকে) এক ক্যাথলিক পাদ্রী—ইনি তাঁর ইহুদি-বিশেষ নার্সিস পার্টিতে যোগ দিলে কার্যে পরিণত করতে পারবেন এই আশায় পার্টিতে যোগ দেন—তারই বিনিময়ে চিঠিখানা কিনে নেন। (কথিত আছে, ৩০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলার যখন বিনা বিচারে এক তথাকথিত ‘বিদ্রোহী’ দলের নেতা রোয়াম্‌ হাইনৎস ইত্যাদিকে গুলি করে মারবার আদেশ দেন তখন সেই মোকায় আরো জনা চারশ’র সঙ্গে এই ফাদার স্টেম্পফেলেকেও খুন করা হয়। তাঁর দ্বাষ তিনি ঐ চিঠির সারমর্ম স্বমস্তিত্বে সীমাবদ্ধ না রেখে দু’একজন অন্তরঙ্গ পার্টি-মেম্বারকে বলে ফেলেন। হিটলার-সখা হফম্যান অবশ্য ঐ চিঠি উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ স্টেম্পফেলে ও অন্যান্য নার্সিস নেতা নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর হিটলারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা মাত্রই নাকি হিটলার বলে ওঠেন, ‘জানো হফম্যান, শুষ্মোরের বাচ্চারা আমার প্যারা ফাদারকেও খুন করেছে!’ অবশ্য এ-কথা সত্য যে, জুন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলারের আদেশে যে পাইকারি খুন ‘জুন পার্জ’ বা ‘জুন মাসের জোলাপ’ হয়—এ লেখক তখন জার্মানিতে ও ধুম্‌ধামারের যতখানি আর পাঁচটা রাস্তার নাগরিক দেখতে পেয়েছিল, সেও

১১ লন্ডন পুলিশ নাকি বেশ্যাবাড়িতে হামলা চালালে মাঝে মাঝে চাবুক, লোহার গুলিওয়ালা রাইডিং বুট, ইত্যাকার যন্ত্রপালায়ক সাজসরঞ্জাম পায়, বেশ্যাদের বস্ত্রব্য, ‘খন্দের ভদ্রলোক’। তিনি স্ত্রীকে এসব করতে আদেশ দিতে পারেন না—স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ। তাই এ ধরনের লোক আমাদের কাছে আসেন। আমরাও সাজসরঞ্জাম তৈরী রাখি। স্ত্রীলোক মাজেকিস্টও আছে, এবং যেসব রমণী স্বামী মারপিট করলে চিৎকার করে, কিন্তু য়োনানন্দ পায়, তাদের ‘নরমতর’ মাজেকিস্ট বলা হয়। অনেকের মতে অনেক রমণী বাড়িতে এমন সব কাজ করে থাকে বা করে না (যেমন ঘর ঝাট দিল না রান্না করলো না, বা স্বামীর গামছাখানা লুটিকিয়ে রাখলো) যাতে করে স্বামী তাকে ঠ্যাঙায়।

পেয়েছে, কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলার জাতির সম্মুখে যখন আপন সাক্ষ্যই গেয়ে বক্তৃতা করলেন, তখন আর পাঁচজন নাগরিকের মত সে সেটা বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরবর্তী ইতিহাস-উদঘাটন লেখককেই সমর্থন করে—তখন গ্যোরিং, হিমলার আদেশদাতা হিটলারকে না জানিয়ে, পরে মিথ্যে অভিযোগ এনে, আপন আপন ব্যক্তিগত শত্রুও খতম করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ফ্যুরারের গোপনীয় কেলেকারি বাবদে যখন ফাদার এতই অসতর্ক তখন এ মোকায় তাঁকে সরিয়ে ফেলাই ভালো—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকেও খুন করা হয়। কিন্তু এই ‘পাজ’ বা জোলাপ গেলী-প্রেমের ছ’বছর পরের কথা, আমরা ১৯২৮-এ ফিরে যাই।

তা সে চিঠি আদৌ হিটলার লিখেছিলেন কিনা সে তর্ক উত্থাপন না করলেও জানা যায়, ঐ সময়ে পার্টি-সদস্যদের ভিতর কানাঘুসা আরম্ভ হয়। কারণ ইতিমধ্যে হিটলার আরো ভালো রাস্তায় বৃহৎ ভবন কিনে সেখানে গেলীর জন্য রাজধানীর মত আবাস নির্মাণ করে সেইটেকে আপন স্থায়ী আবাস-বাটি করেছেন, গেলীকে যত্নতর সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যান, এবং নিত্যন্ত সরল পার্টি-সদস্যও দু-চারবার লক্ষ্য করলেই বলতো, নিশ্চয়ই ফ্যুরার এ মেয়েতে মজেছেন। তা তিনি মজুন, কিন্তু একে বিয়ে করলেই তো পারেন। নইলে শত্রুপক্ষ যে বলছে হিটলার রক্ষিতা পোষণ করেন, দু’কান কাটার মত স্বভাবনে তার সঙ্গে বাস করেন, তিন কান কাটার মত সগর্বে সদৃশ্যে তাকে নিয়ে সর্বত্র—এমন কি পোলিটিকাল পার্টি মিটিঙেও—যাতায়াত করেন, এবং আপন ভাগিনার—তা হোক না সে সৎবোনের মেয়ে—ভবিষ্যৎটি যে ঝরঝরে করে দিচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো বিবেকবংশন নেই; আর এতদিন ধরে প্রচার যে, হিটলারের মত সর্বাত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর হয় না, তিনি যে উনচাঞ্চল্য বছর বয়সেও দারগ্রহণ করেননি তার একমাত্র কারণ, দারাপুত্রপরিবার দেশের জন্যে তাঁর আত্মোৎসর্গে অন্তরায় হবে বলে। জিতেন্দ্রিয় না কহু!

এই ‘কেলেকারি’তে পার্টির কতখানি ক্ষতি হাঁচলি বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা সত্য যে নাৎসি পার্টির ভ্যুরটেম্বেগ অঞ্চলাধিপতি মূর্খবদী, পার্টির এক অতি প্রাচীন সদস্য যখন হিটলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন তখন তিনি রাগে ক্রোধে চিৎকার করে তাঁকে পার্টি থেকে স্রেফ খেঁদিয়ে দিলেন।

এদিকে হিটলারের কড়া পাহারা গেলীর উপর। হফম্যানের মতে তিনি আদৌ জানেন না যে গেলী অন্যজনকে অতি গভীরভাবে ভালোবাসে—ভিয়েনায় নাকি দায়িত্বের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং এ কথাও সত্য, গেলী বার বার সঙ্গীতচর্চা করার জন্য তার প্রাচীন গুরুর কাছে ভিয়েনায় যেতে চায়—এবং হিটলারের কবুল জবাব, ‘নাইন’ অর্থাৎ নো। যে ম্যার্নিকের সহস্র সহস্র নরনারী হিটলারের উচ্ছ্বাসত ভক্ত, সেই হিটলার যখন গেলীর পদপ্রান্তে তাঁর প্রণয় রাখলেন তখন আর কিছু না হোক, এত বড় সর্বজনপ্রশংসিত একটা স্ট্রেটম্যানের বশ্যতা গেলীকে নিশ্চয়ই মৃদুবিহ্বল করেছিল। (প্রেমের প্রতিদান দিক আর না-ই দিক) এবং হয়তো হিটলার সেই বিহ্বলতাকেই প্রণয়ের

প্রতিদান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। হফ্মানের মতে হিটলারের ‘গ্রেট লভ্’ ছিল স্বার্থপর প্রেম—অনেক মূর্খাধিরাও বলেন, ‘গ্রেট লভ্’ কখনো নিঃস্বার্থ হতে পারে না, সে ‘লাভার’ অন্য সকলের প্রতি হয়ে যায় হিংসাপরায়ণ, তার বদভূক্ষা অসীম। বার্নার্ড শও বলেছেন, ‘গ্রেট লভ্’ সামলে-সমলে অস্পষ্ট মেকদ্বারে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হয়। নইলে দ্বিগুণ দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন কোনো ‘ম্যানিয়াক’ প্রেমোন্মাদ তাকে অষ্টপ্রহর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিরুদ্ধনিবাস করে তুলছে।

মূর্খানকের বছরের সব চেয়ে বড় নাচের পরব এগিয়ে আসছে। প্রাগচণ্ডলা গেলী কেন, নিতান্ত অর্থাত্তাব না হলে, কিংবা প্রেমিকও দরিদ্র হলে, মূর্খানকের কোনো তরুণী সে নাচ বর্জন করে? প্রথমটায় হিটলার তো কানই দেন না। আর গেলীও ছাড়বে না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হিটলার রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত রইল দুটি। সঙ্গে যাবেন দুই গার্জেন এবং দুই গার্জেনদের প্রতিজ্ঞা করতে হল যে রাত এগারোটোর ভেতর গেলীকে ফের বাড়ি পেঁাছে দিতে হবে।

সেই ডান্সের জন্য যে পারে সে-ই নতুন হালফেশানের স্বাক্ষর করায়। মূর্খানকের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার-দীর্জ ডাই ডাই অতি অরিজিন্যাল ডিজাইন রেখে গেল। হিটলার এক নজর বদলিয়েই সব কটা নামজাদ করে দিলেন। এগুলো বহু বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বহু বেশী সালস্কার—যদ্যপি স্বাক্ষর হিসাবে অত্যাশ্চর্য। গেলী যাবে সাধারণ ইভনিং ড্রেস পরে।

তাই হল। স্বয়ং হফমান ও তাঁর চেয়ে বড়ো পার্টির প্রাচীন সদস্য আমান্ গেলীর ‘চারিগ্রন্থকস্বরূপ’ তাকে মধ্যখানে নিয়ে গেলেন নাচের মজলিশে। এক্ষেত্রে তরুণীরা প্রায় সর্বদাই আপন আপন লভারের সঙ্গে এ নাচে কেন—সব নাচেই যায়।

এখন ফিরতে হবে রাত ১১ টায়। বলে কি? মাথা খারাপ!

হফমান বলেছেন—এবং এ লেখকও আপন একাধিক অভিজ্ঞতা থেকে অসংকোচে সায় দেবে—এ-সব নাচে ফুটি-ফাতি ফণি-ফণি এমন কি কিঞ্চিৎ বেলেজাপনা আসলে আরম্ভ হয় রাত বারোটোর পর। আমার মতে জমে প্রায় দুটোয় এবং নাচ ভাঙ্গে ছ’টায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে গেলী অত্যধিক আপ্যায়িত বা সন্তুষ্ট হয়নি। নাচের মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় ফোটো-গ্রাফ তোলায়। গেলীর যথেষ্ট কান্টরাস ছিল। সে-ও ছবি তোলালে ঐ দুই প্রহরী ‘ডালকুস্তার’ মাঝখানে। কপোত-কপোতীর এক হাতে থাকে সফেন শ্যাম্পেন গ্লাস, অন্য হাতে গোটাপাঁচেক বেলনের সূতো, মাথায় ঐ বলডানসেই কেনা রঙ-বেরঙের ফুল্‌স্‌ ক্যাপ, গাধার টুপি ইত্যাদি। গেলী ছবি তোলালে এমন কায়দায় যেন মনে হয় ফাঁসির আসামীকে তার দুই জগ্নাদ তাকে ফাঁসি-কাঠে নিয়ে যাবার সময় প্রেস ফোটোগ্রাফার যে ভাবে ছবি তোলে।

হফমান বিরক্তির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটোর সময় হিটলারের গচ্ছিত মহামূল্যবান গেলীকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা সাড়ম্বরে ‘সরকারী’ কামদায় গেলী ফোটোগ্রাফখানা মামাকে উপহার দিলেন। হিটলার এ সব নাচ এককালে বিস্তর না হোক অল্প-বিস্তর নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাঁর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল।

বৈমাগ্রেয় মামা হলেও গেলী পেয়েছিল হিটলারের একটি মহৎ গুণ ; সে তার পেটের কথা কাউকে বলতো না। যে-পুংসি হান্ফ্‌স্টেঙেল তাঁর পুস্তকে হিটলার ও গেলীর বিরুদ্ধে প্রচুরতম বিষোৎসার করেছেন তিনি সে সময়ে নিত্য নিত্য হিটলারের বাড়িতে আসতেন, এবং গেলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তৎসঙ্গেও তিনি তাঁর পুস্তকে গেলীকে দিয়ে রামগঙ্গা কিছই বলাতে পারেননি। শুধু একবার নাকি তিনজনা যখন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হিটলার কি একটা রুঢ় মন্তব্য করলে, পুংসি শুনতে পেলেন, গেলী দাঁতে দাঁত চেপে অশ্রুট কণ্ঠে বললে, “ব্লুট”—পশু !

গেলীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল হফ্‌মান পরিবারের প্রতি এবং সমস্ত মুনিক শহরে ঐ পরিবারের কঠী এন’ হফ্‌মানের সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত আগাপাশুলা কিছই বুঝে উঠতে পারেননি, স্বামীকেও বোঝাতে পারেননি। পুংসি তাঁর বিষোৎসারের সময় গেলীর যত নিশ্চাই করে থাকুন না কেন, এন’ পাঁচজনকে যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি, এন’ নিজে আর্টিস্ট ছিলেন বলে শুধু যে গেলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মজে-ছিলেন তাই নয়, তার মানসিক ও চারিত্রিক একাধিক বিরল সংগুণ তাঁকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। এমন যে বয়স্কা বাস্‌ম্ববী যার কাছে সামান্য পাওয়া যায়, বিপদে আপদে উপদেশ পথনির্দেশ চাওয়া যায় পাওয়া যায় তাঁর কাছেও গেলী তার সুখ-দুঃখের কথা বলত না। শুধু একদিন মাত্র, কেমন যেন আত্মহারা হয়ে সে স্বীকার করে যে, সে যখন ভিয়েনায় ছিল তখন কোনো একজনকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। সামান্য এই, এতটুকু বলার পর সে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সন্নিহিতে ফিরে এসে বুঝতে পারল, বস্তু বেশি বলা হয়ে গিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, ‘আর যা আছে, সেটা আছেই। আপনিও কিছ করতে পারবেন না, আমিও কিছ করতে পারবো না। অতএব অন্য কথা পারি।’ এন’ দৃষ্টিখনি গেলীকে অনেক সামান্য দিলেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন—এন’ বাস্তবিকই দৃঢ় চরিত্রের রমণী ছিলেন, অনেকের জন্য অনেক কিছ করেছিলেন, নার্সি পার্টিতে যোগ দেননি, এবং যদিও হিটলারকে সমীহ করে চলতেন তবুও অন্যান্য বাবদে দু একবার তাঁকেও খাঁটি অপ্রিয় সত্য কথা শোনাতে কসুর করেননি—কিন্তু গেলী তার শামুকের খোল থেকে বেরুতে রাজী হল না। পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়, সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, সে যা চায় হিটলার তার ঘোরতর বিরোধী এবং এই নিরীহ হফ্‌মান দম্পতি এখনও হিটলারের স্বরূপ চেনে না, হিটলার তাঁর মর্জিমাফিক যে সব সম্ভব-অসম্ভব কার্য করতে ও করাতে পারেন সে সম্বন্ধে এঁদের কণামাত্র ধারণা নেই—হিটলারের যে-‘স্বরূপ’ সে তার প্রতিদিনের সামিধ্যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল।

সেদিন এন'এ শব্দ এইটুকু জানতে পেরেছিল যে গেলী ভিয়েনায় একজন আর্টিস্টকে ভালবাসে, কিন্তু সে কে, তাদের দুজনার মধ্যে কি আদান-প্রদান হয়েছে গেলী যদি তার ভালবাসার প্রতিদান পেয়ে থাকে তবে উভয়ের বিবাহের প্রতিবন্ধকই বা কি—এ-সব হফ্‌মানরা জানতে পারেননি, পরে অন্য কেউও জানতে পারেনি।

এদিকে গেলীর মূখ সধা প্রফুল্ল, মামার বড়-বড় প্রাচীন দিনের পার্টি-সদস্যরা তার উপর বড়ই প্রসন্ন, মামার বানানো সেই কাঁটাঝালের ভিতরও তার বিধিদ্ভুত সরসতা লোপ পায়নি। পুৎসি এটাকেই ঘৃণা করে বলেছেন ‘ককেটরি’—এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? চলাচলপনা? কি জানি! হফ্‌মান বলেন, তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে এটা ছিল তার বাহিরের মূখোশ। এই প্রাণবন্ত, প্রকৃতিদ্ভুত সদাচঞ্চলা, আনন্দে হাসিতে যে কোন মূহুর্তে কারণে অকারণে শতধা হয়ে ফেটে যাওয়া যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তার চতুর্দিকে বিধিনিষেধের কাঁটার জাল! মূর্খানকের মত স্বাধীন শহরে—যেখানে নর-নারী কি রকম অবাধে মেলামেশা করে সেটা এদেশে বসে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—গেলী কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না মামার অজান্তে, কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারবে না মামার পরিস্কার অনুমতি ভিন্ন, এমন কি ঐ বয়সের আর পাঁচটা মেয়ে যে সামাজিকতা করে থাকে, যে লোকাচারসম্মত ভদ্রতা-সৌজন্য করে পাঁচজনের সাহচর্য সঙ্গসুখ পায়—এর কোন একটা সে করতে পারে না, মামাকে না জানিয়ে, মামার অনুমতি ছাড়া।

সেই ‘ডালকুস্তা’—শব্দটা হফ্‌মান তিক্ততার সঙ্গে নিজেই ব্যবহার করেছেন—দুটিকে নিয়ে ডানসে যাওয়ার ফাসের পরের দিন হফ্‌মান আর সহ্য না করতে পেরে হিটলারকে বললেন, ‘আপনি গেলীর চতুর্দিকে যে পাঁচল খাড়া করে তুলেছেন তার ভিতর মেয়েটার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে নাচে কাল রাতে তার ফুর্তি করার কথা ছিল, সেটা শব্দ তার অপরূপ জীবনের তিক্ততা তিক্ততর করে তুলেছিল।’

হিটলার উত্তরে বললেন, ‘আপনি জানেন, হফ্‌মান, গেলীর ভবিষ্যৎ আমার কাছে এমনই প্রিয়, এমনই মূল্যবান যে তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ-কথা খুবই সত্য আমি গেলীকে ভালবাসি এবং আমি তাকে বিয়েও করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার মতামত কি আপনি ভালো করেই জানেন, এবং আমি যে কদাপি বিয়ে করবো না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত বেরেছি সে-কথাও আপনি জানেন। তাই আমি এটাকে আপন ন্যায়সম্মত অধিকার বলে ধরে নিয়েছি যে যতদিন না গেলীর উপযুক্ত বর এসে উদয় হয় ততদিন পর্যন্ত সে যার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় এবং যারা তার পরিচিত তাদের উপর কড়া নজর রাখা। আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আত্মজনের সূচিসূচিত সতর্কতা। আমি মনে মনে দৃঢ়তম সংকল্প বেরেছি গেলী যেন জোচ্ছোরের হাতে না পড়ে বা এমন লোকের পাল্লায় না পড়ে যে গেলীকে দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ গুঁছিয়ে নেবার

অ্যাডভেঞ্চারের তালে আছে।’

হফ্‌মান এখানে যোগ দিচ্ছেন, হিটলার অবশ্য জানতেন না, যে গেলী গোপনে গোপনে ভিয়েনাবাসী এক তরুণকে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর ভালবাসে।

হিটলার গিয়েছিলেন ম্যুনিখের বাইরে—গেলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাছে—আবার যাবেন দূর হামবুর্গে, মাঝপথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ম্যুনিখকে খামবেন এবং গেলীকে গ্রাম থেকে আনিয়েছেন। হামবুর্গের দীর্ঘ সময়ের সহযাত্রী হওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই হফ্‌মানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখানে হফ্‌মানের বিবরণী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ম্যুনিখ সমাজে হিটলার গেলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার চার বৎসর পর—কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গেলীকে ম্যুনিখ সমাজে উপস্থিত করেন, তাহলে হবে সাত বৎসর পর, কিন্তু এ বাবদে আমি হফ্‌মানকেই বিশ্বাস করি, এবং এসব ঐতিহাসিকদের বই বেরিয়েছে হফ্‌মানের বই বেরুবার পূর্বেই) হফ্‌মান এলেন হিটলারের বাড়িতে। গেলী মায়েরই মতো ভালো ঘরকন্না করতে জানত, তাই সে তখন হিটলারের স্ন্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। হিটলার সখাসহ যখন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামছেন, তখন উপরের তলার রেলিঙের উপর ভর করে, নিচের দিকে ঝুঁকে গেলী বলতে লাগল, ‘ও রেভোয়া মামা অ্যাডল্‌ফ, ও রেভোয়া, হ্যার হফ্‌মান!’ হিটলার দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চললেন। হফ্‌মান বাইরে এসে পেভমেন্টে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হিটলার এলে পর মোটরে উঠে দুজনা চললেন উত্তর দিকে ন্যূরনবের্গ পানে। শহর থেকে বেরুবার সময় হিটলার বন্ধু হফ্‌মানকে বললেন, ‘কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।’

হফ্‌মান বিবেচক লোক। তিনি নিজেই ঠাট্টা করে বলেছেন, ‘অনেকেই আমাকে আড়ালে হিটলারের কোর্টজেন্সার (গোপালভাঁড়) বলত, এবং হয়তো সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।’ তিনি সাস্কনা দিয়ে বললেন, ‘এ সময়কার দখিণা “ফ্যান” বাতাসটা সঙ্কলেরই বৃকের উপর চেপে বসে সবাইকে মনমরা করে দেয়।’ কিন্তু হিটলার চুপ করে রইলেন, এবং দীর্ঘ ন্যূরনবের্গের রাস্তা জ্বাইভ করার পর সেখানকার পার্টি-মেম্বারদের প্যারা হোটেলে উঠলেন।

পরের দিন ন্যূরনবের্গ শহর ছেড়ে যখন তাঁরা বায়রট শহরের দিকে এগুচ্ছেন তখন হিটলার জ্বাইভিং সীটের সামনের ছোট আয়নাটিতে লক্ষ্য করলেন, আরেকখানা মোটর দ্রুততর বেগে ক্রমশই তাঁদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তার জন্য হিটলারের হুকুম ছিল কোনো গাড়ি যেন তাঁর গাড়ি ওভারটেক না করতে পায়, কারণ ঐ সময় দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলে বলে অন্য গাড়ি থেকে হিটলারের উপর গুলি চালানো কঠিন নয়। হিটলার সোফার প্রেক্‌কে সেই আদেশ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনিই লক্ষ্য করলেন, যে-গাড়ি পশ্চাৎদিক করছে সেটা ট্যান্ডি এবং জ্বাইভারের পাশে

হোটেলের উদ্দেশ্যে একাধিক ছোকরা স্কিপের ন্যায় দৃঢ় হাত নাড়িয়ে তাঁদের থামবার জন্য সংকেত করেছে। শ্রেক্ গাড়ি দাঁড় করালে ছেলোট উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ‘হ্যার হেস (ইনি তখন এবং ১৯৪১-এ যখন অ্যারোপ্লেনে করে সশস্ত্র প্রস্থাব নিয়ে লন্ডন যান তখনও হিটলারের পরেই তাঁর স্থান ছিল) মুনিক থেকে ট্রান্সকল করে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ফোনে না পে’লেনো পর্যন্ত হেস লাইন ছাড়বেন না।’ দুই বশ্চ মোটর ঘুরিয়ে উদ্দেশ্যে চললেন ন্যূনবেগ পানে।

গাড়ি ভাল করে থামতে না থামতেই হিটলার লাফ দিয়ে মোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকলেন হোটেলের ভিতর এবং তারপর টেলিফোনের বাক্সে (বুথে) —বুথের দরজা পর্যন্ত তিনি বশ্চ করেননি। পিছনে পিছনে ছুটে এসেছেন হফ্‌মান এবং টেলিফোন বুথের দরজা খোলা বলে হিটলারের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেলেন।

‘এখানে হিটলার—কি হয়েছে?’ উত্তেজনায় হিটলারের গলা খসখসে ককর্শ হয়ে গিয়েছে। ‘হে ভগবান! এ কী ভয়ংকর!’ অপর প্রান্ত থেকে কি একটা খবর শুনেন তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বর পরিপূর্ণ হতাশা। তারপর দৃঢ়তর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এবং সে কণ্ঠস্বর শেষটায় প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পৌঁছল, ‘হেস! আমাকে উত্তর দাও—হাঁ কিংবা না—যেয়েটা এখনো বেঁচে আছে তো?...হেস, তুমি অফিসার, সেই অফিসারের নামে দ্বিবি দিচ্ছি—আমাকে সত্য করে বলো—যেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?...হেস!...হেস!’ এবারে হিটলার তীব্রতম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল তিনি অপর প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। হয় লাইন কেটে গেছে, নয় হেস উত্তর দেবার দৃঢ়পাক এড়াবার জন্য রিসীভার হুকে রেখে দিয়েছেন। হিটলার টেলিফোন বুথ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চুল নেমে এসে কপাল ঢেকে ফেলেছে (এ কথাটা তাঁর খাস চাকর লিঙে একাধিকবার বলেছে, যে, হিটলার তাঁর মাথার চুল কিছুতেই বাগে রাখতে পারতেন না—অস্পষ্টেই সেটা কপাল ঢেকে ফেলত), তাঁর চাউনি ছমের মত, তাঁর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

শ্রেকের দিকে মূখ্য করে বললেন, ‘গেলীর কি যেন একটা কি ঘটেছে। আমরা মুনিক ফিরে যাচ্ছি। গাড়ির যা জোর আছে তার শেষ আউন্স পর্যন্ত কাজে লাগাও। গেলীকে জীবিত অবস্থায় আবার আমাকে দেখতেই হবে।’

‘টেলিফোনের বুথ থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো যে সব কথা ভেসে এসেছিল তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, গেলীর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক কি সেটা বুঝতে পারিনি, এবং হিটলারকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও আমার ছিল না।’—বলছেন স্বয়ং হফ্‌মান।

হিটলারের উদ্দেশ্য উত্তেজনা যেন সংক্রামক। শ্রেক্ চেপে ধরেছে।

অ্যাকসিলীরেটর। মোটরের মেঝে পর্যন্ত তার গাড়ি তাঁর আত'নাদ করে ছুটে চলেছে ম্যানিকের দিকে। হফ'মান মাঝে মাঝে মোটরের ছোট্ট আর্শিতে দেখছেন হিটলারের চেহারা—ঠে'ট দ্রুত চেপে তিনি উই'ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সম্মুখপানে তাকিয়েও যেন কিছু দেখছেন না। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য বিনিময় হল না—যে যার বিমর্ষ চিন্তা নিয়ে ভুবে আছে আপন মনের গহনে।

অবশেষে আমরা তাঁর বাড়িতে পে'ছলুম এবং সেই ভয়ংকর দুঃসংবাদ জানতে পেলুম। চব্বিশ ঘণ্টা আগে গেলী মারা গিয়েছে। সে তার মামার অস্ত্রশা'ভার থেকে একটি ৬:৩৫ পিস্তল নিয়ে স্ত্রীপিস্তের কাছাকাছি জায়গায় গুলি করেছে। ডাক্তারদের মতে যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হত তবে হয়তো তাকে বাঁচানো অসম্ভব হত না। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কেউ সে শব্দ শুনতে পারেনি এবং ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টে'ম, করোনারের তদন্ত সব কিছু হয়ে গিয়েছে এবং পদূলিস মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল, হিটলারের বিদায়ের অঙ্গ পেরেই গেলী আত্মহত্যা করে। সে দেহ এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসজ্জিত করে কবরস্থানে রাখা হয়েছে—তিন দিন পর গোর হবে—এ সময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মৃতকে শেষবারের মত দেখে নেন এবং আত্মার সঙ্গতির জন্য আপন আপন প্রার্থনা জানান।

গেলীর মা ইতিমধ্যে বেষ্টে'শগাডেন থেকে এসে গেছেন। পার্টির মদ্রু'স্বীদের একাধিকজন ও হিটলার-ভবনের বন্ধু প্রাচীন দিনের 'গৃহরক্ষণী' ফ্রাউ ভিন্টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গেলীর মা নির্বাক অশ্রুধারে স্তব্ধ হ'চ্ছিলেন।

*

*

*

'গৃহরক্ষণী' ফ্রাউ ভিন্টার যা বললেন তার সারমর্ম এই, হিটলার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলায় উঠেছিলেন—এর বর্ণনা আমরা হফ'মান মারফৎ আগেই দিয়েছি—গেলীকে আরেকটু আদর করার জন্য, কারণ তিনি সেদিনই ম্যানিক ফিরেছিলেন এবং সেদিনই আবার ন্যূর'নবে'র্গ হয়ে হামবু'র্গ চলে যাচ্ছিলেন বলে গেলীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে পারেননি। সেই অনিচ্ছাকৃত অবহেলাটা যেন খানিকটা দূর করার জন্য তিনি উঠে গেলীর গালের উপর হাত দিয়ে আদর করতে করতে কানে কানে সোহাগের কথা কইছিলেন কিন্তু গেলী যেন কোনো সামন্তনা মানতে চায়নি, তার রাগও পড়েনি।

দু'জনার চলে যাওয়ার পর গেলী ফ্রাউ ভিন্টারকে বলে, 'সত্যি বলছি, আমার ও মামার মধ্যে কোনো জায়গায় মিল নেই (নাথিং ইন্' কমন্')।'

ফ্রাউ ভিন্টার কিন্তু একথা বললেন না, হফ'মানও নীরব, যে সেদিনই হিটলারে গেলীতে তুমূল কথা-কাটাকাটি হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে অস্বাভাবিক রুটিপাত নাহলে—এবং সেদিন আদৌ হয়নি—অনেকেরই জানলা খোলা থাকে

বলে একাধিক প্রতিবেশী সে কলহের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। শাইরার প্রভূতি ঐতিহাসিকেরা বলেন, (Shirar : The Rise & Fall of the Third Reich ; Aufstieg und Fall des dritten Reiches 1960/61) যে, গেলী ভিয়েনা গিয়ে গলা সাধবার জন্য আবার অনুমতি চাইছিল, এবং হিটলার পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে অসম্মতি জানাচ্ছিলেন।

এই ব্যাথাটা অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ গেলীর মৃত্যুর পর তার ঘরে ভিয়েনার গুরুতর উদ্বেগে তার লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। যেটোতে সে গুরুত্বকে জানাচ্ছে, সে আবার ভিয়েনায় এসে তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে চায়।

ফ্রাউ ভিন্টার আরো বললেন যে, মিত্রসহ হিটলার চলে যাওয়ার পর গেলী তাঁকে বলে যে সে এক বান্ধব (বা বান্ধবীর) সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, এবং তার জন্য যেন রাত্রে কোনো খাবার তৈরী করা না হয়। সে রাত্রে তিনি তাই গেলীকে আবার দেখতে না পেয়ে বিস্ময়মাত্র দৃষ্টিস্তা করেননি। গেলী রেকফাস্ট খেতে ভোরেই, এবং সে যখন তার অভ্যাসমত ঐ সময়ে রেকফাস্ট করতে এল না, তখন ফ্রাউ ভিন্টার তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাবার চেষ্টা দিলেন, কিন্তু চাবি ফুটোতে লাগানো এবং ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে ডাকেন। তিনি দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য। গেলী এক ডোবা রঙে পড়ে শূন্যে আছে, তার পিস্তলটা সোফার এক কোণে। ফ্রাউ ভিন্টার তৎক্ষণাৎ গেলীর মাকে খবর দেন, এবং হেস্ ও পার্টির কোষাধ্যক্ষ স্বাৎসকে জানান।

অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হফম্যানের আত্মচিন্তা এস্থলে বিশেষ মূল্য ধরে। তিনি বলছেন, “হিটলার কি গেলীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতেন? তিনি যে শহর ছাড়ার সময় বলেছিলেন, “কেন জানি নে, আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে” সেটা কি ইন্দ্ৰিয়তীত কোনো অনুভূতিসম্পন্ন অস্বস্তিবোধ, অথবা কি গেলীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় এমন কিছুর একটা ছিল যেটা তাঁর দৃষ্টিস্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?”

তার চেয়ে যে জর্নিস হফম্যানের কাছে একবারেই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেটা এই : ফ্রাউ ভিন্টার বলেন, হিটলার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর গেলী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নয়ে পড়ে। এ তথ্যটা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না, কিন্তু তারপর ফ্রাউ ভিন্টার যা বললেন সেটা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে দিল একদম ঘুরিয়ে। ফ্রাউ ভিন্টার বার বার জোর দিয়ে বললেন, গেলী হিটলার—একমাত্র হিটলারকেই ভালোবাসতো ; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, গেলীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুঁক-টাকি মন্তব্য ফ্রাউ ভিন্টারকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছিল হিটলারকেই গেলী ভালবাসে। হফম্যান বলছেন, “কিন্তু আমার বতদূর জানা এবং ভালো করেই জানা—গেলী ভালোবাসতো অন্য একজনকে।”

এর সঙ্গে তাহলে আরেকটি তথ্য জড়তে হয়, হফম্যানের ফোটো কমিশনালয়.

তার কিছুদিন পূর্বে হিটলার প্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন^{১২}, যে এফাকে তিনি মৃত্যুর অল্প পূর্বে বিয়ে করেন, এবং হফম্যানের মতে তাঁদের বন্ধুত্ব নির্বিড়তর হয় বেশ কিছুকাল পরে এবং গেলী মামাকে লেখা এফার একখানা চিঠি দৈবযোগে মামার কোটের পকেটে পেয়ে যায়। তাহলে বলতে হবে, ফ্লাউ ভিনটারের রহস্য সমাধান হয়তো সম্ভব্ধ ভুল নাও হতে পারে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেটা পরের এবং অনেক দিন ধরে চলছিল। গেলীর মা এমনিতেই এফা ব্রাউনকে পছন্দ করতেন না, এবং গেলীর মৃত্যুর পর সে অপছন্দটা পরিপূর্ণ ঘৃণায় গিয়ে পৌঁছিল। হফম্যান এবং অন্যান্যরা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করতেন তিনি ততই অকুণ্ঠ ভাষায় জোর দিয়ে বলতেন, তাঁর মনে কণামাত্র বিধা নেই যে, তাঁর মেয়ে হিটলারকেই ভালোবাসতো এবং ঐ এফা ব্রাউনের অস্তিত্ব ও হিটলারের উপর তার প্রভাব গেলীকে গভীরতর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করে দেয়, এবং এইটাই গেলীর অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধানতম কারণ।

*

*

*

এদেশের জোরালো গোটা দু'স্তিন দল তাদের বেসরোয়া আপন আপন দৈনিক নেই বলে বহু কলেসকারি-কেছা অনায়াসে চাপা পড়ে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকারের। বিশেষতঃ ভাইমার রিপাবলিক যুগে—এই খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে, হিটলার চ্যানসেলার না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩) জর্মনির খবরের কাগজে কাগজে নরক ছিল গুলজার, বিশেষত জর্মনির যখন ইংরেজী খবরওলাদের 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' 'থীভ্‌স্ এগ্রীমেণ্টে' আদৌ বিশ্বাস করে না। তাই মর্দানিকের খবরের কাগজগুলোর অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন মোচাকের উপর ঢিলের মত হয়ে এসে পড়ল। আর কাফে কাফে বারেতে বারেতে গুজোবগুজরণের তো কথাই নেই। এমন কি ন্যাৎসি পার্টির ভিতরও নানা মর্দনি নানা মত দিতে লাগলেন। যারা সরাসরি দৃশ্যমন তাদের একদল বেশ জোর গলায় বললে, 'ন্যাৎসি পার্টি' তার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অটপসি আদৌ করাতে দেয়নি, করোনোরের সামনে যাকিছু ঘটেছে তার সমস্তটাই আগাগোড়া থাড়ে কেলাসী থিয়েডারের ফার্স, এবং এক দল বললে, 'তাই হবে, কারণ এটা আত্মহত্যা নয়, আসলে খুন, এবং খুনি স্বয়ং হিটলার। তিনি হামবুর্গ পানে রওয়ানা হয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেটা ছিল ফাঁদ পাতার মত। সম্ভ্যার সময় ফের বাড়ি ফিরে আসেন, এবং গেলীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন অবস্থায় পান যে তখন হিটলারের মত হিংস্র প্রাণীর মাথায় যে খুনচাপবে তাতে আর বিচিট কি?' অন্য দলের বক্তব্য, 'না, পরপুরুষ ছিল না, শুধু গেলীর ভিয়েনা যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে কথা-কাটাকাটি এমনই চরমে পৌঁছয় যে হিটলার আত্মকর্ত্ত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এবং উদ্ভাদাবস্থায়

১২ শাইরার বলেন, হিটলার ও ব্রাউনের পরিচয় হয় গেলীর মৃত্যুর এক বা দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ বিষয়ে হফম্যানের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাস্য।

গেলীকে খুন করেন।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'না, খুন করেছেন হিমলার। পার্টি'র মদ্রুস্বীরা যখন দেখলেন যে হিটলারের খোলাখুলি বেলেজাপনার ঠেলায় পার্টি'র ইঞ্জিন যায়-যায় (যদিও আমি যতদূর জানি জনসমাজে গেলীর সঙ্গে হিটলারের আচরণ ছিল ভদ্র, সংযত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'করেক্ট'; অন্যপক্ষের বক্তব্য আমরা যদি মিনিমাম্‌টাও নিই সেটাও যথেষ্ট খারাপ, কারণ একথা তো আর মিথ্যে নয় যে, 'তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো এবং তাকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করো, আর তার মাকে রেখেছ দূরে গায়ের বাড়িতে যখন তুমি তাঁকেও অনায়াসে এখানেই রাখতে পারতে—'), ওদিকে হিটলার ছাড়া যে পার্টি' দৃষ্টদৈর্ঘ্যই কাত হয়ে যাবে সেটাও অবিসংবাদিত সত্য, তখন তাঁরা পার্টি' বাঁচাবার জন্য হিমলারের উপর গেলীকে সরাবার ভার দিলেন। কমিটি করেছেন হয় স্বয়ং তিনি বা তাঁর কোনো গুডাকে দিয়ে (পার্টি'তে যে গুডার অভাব ছিল না সে তথ্যটি সবাই জানতেন, এবং না থাকলে নাৎসি পার্টি' যে রাস্তায় কমিউনিস্টদের ঠেলায় একদিনও টিকতে পারতো না সেটা আরো সত্য)। ইত্যাকার নানাপ্রকারের গজোবে তখন জর্মনি ম-ম করছে, কারণ গেলীর মৃত্যুর পূর্বেই নাৎসি পার্টি' এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে রাস্তার উপর কারণে অকারণে যাকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং কমিউনিস্টদের কাউকে একা পেলে তাকে পেটাতেও কসদ্বর করে না; প্রতিদিন আবার কানে আসছে, এই বৃদ্ধি প্রেসিডেন্ট হিউডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিটলারকে ডেকে পাঠাবেন, হয় আপন মন্থিসভা গড়ে প্রধানমন্ত্রী—চ্যানসেলর হতে, কিংবা কোয়ালিশন সরকার নির্মাণ করতে।

আমি তখন ম্যুনিখে বাস না করলেও জর্মনিতে, এবং প্রতিদিন লাণ্ড-টেবিলে বন্ধুদের আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শ্রবণই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের রীডিং রুম ম্যুনিখ তথা জর্মনির সব বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ রাখতো, তদুপরি আমাদের কেউ না কেউ ম্যুনিখ আসা-যাওয়া করছে, আর একজন তো খাস ম্যুনিখবাসী—সে শহরের বিরাট ম্যাপ খুলে হিটলারের বাড়ি, তিনি যে যে কাফেতে যান, সবগুলো পিন্‌ডাউন করতে পারতো। কাজেই আমাদের লাণ্ড-টেবিলে গুজবেরও অনটন ছিল না। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে এতদিন পরে আজ আমি তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। তবে, ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পর থেকে যখন হিটলার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পদ্যস্তক বেরুতে আরম্ভ করলো (গেলী আত্মহত্যা করে ১৯৩১-এ; হিউডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠান তার তিন সপ্তাহ পরে এবং আলাপচারী যে নিশ্ফল হয় তার একমাত্র কারণ স্বরূপ নাৎসিরা বলেন, হিটলার গেলীর মৃত্যুশোক তখনো সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি বলে সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্রীকৃষ্টে ব্যবহার করতে পারেননি—ঘন ঘন আনমনা হচ্ছিলেন; ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে হিটলার চ্যানসেলর হন, ১৯৩৯-এ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন);

খৃষ্টাব্দে, এবং অধুনা ১৯৬১—প্রকাশিত শাইরারের ১১৭৪ পৃষ্ঠায় যে বিরাট বই বাজারে নাম করেছে তাতে কোনো মৌলিকতা নেই এবং আমার মনে হয় তিনি হফ্‌মানের বইখানা হয় পড়েননি, নয় একপেশে বলে খারিজ করেছেন। বলা বাহুল্য বদলক, শাইরার এবং শতকরা ৯০ খানা বই রাজনৈতিক তথা যুদ্ধবিদ্ হিটলারকে নিয়ে আলোচনা করে বলে তার মধ্যে প্রেম অল্প স্থানই পায়, এবং তারও অধিকাংশ পান এফা ব্রাউন, গেলী সত্যিই এখনো ‘কাবোর উপেক্ষিতা’!) তখন দেখে বড় আশ্চর্য বোধ হল যে তখনকার দিনে যেসব গুজোব আমরা সেফ্‌ গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তার অনেকগুলোই এসব পুস্তকে রীতিমতো সম্মানের আসন পেয়েছে, এবং যেগুলোকে আমরা সত্য বা সত্যের নিকটতম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম সেগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই !

অবশ্য এ-কথা উঠতে পারে যে, হফ্‌মানের মতে হিটলার গেলীর আত্মহত্যার জন্য নিতান্ত পরোক্ষভাবে দায়ী, আদৌ যদি তাকে দায়ী করা হয়, তিনি গেলীকে কড়া শাসনে রাখতেন (হিটলারের সাফাই ‘আজ গেলী যেটাকে বন্দন বলে মনে করছে সেটা বিচক্ষণ আত্মজনের সূচিস্থিত সতর্কতা’) আবার ওঁকে বলেছেন, ‘গেলী ছিল হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত সবাই আত্মহত্যার জন্য মূর্খিয়ে থাকা টাইপের একদম খাঁটি উল্টোটি। তার প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া, জীবনের মূখোমূখি হত সে প্রতিদিন নিত্য নতুন সূহৃদ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—এসব ভাবলে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে আপন জীবন আপন হাতে নিতে নিজেকে বাধ্য অনুভব করলো।’

হফ্‌মান কৃত তাঁর সখা হিটলারের জীবনী হয়তো অনেকেই সম্প্রদেহের চোখে দেখবেন, ভাববেন, রাজনৈতিক এবং গ্যাস-চেম্বারের প্রবর্তন ও সফলীকরণ-কর্তা হিটলারকে তিনি সমর্থন করতে না পেরে—অবশ্য এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে আর্ট ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তিনি অতি বৈবেসেবে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং আরো সত্য যে হিটলার, বিশেষ করে গ্যোবলসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ডাঙরতম সরকারী চাকরি বা পার্টি’ডে কোনো গণ্যমান্য আসন নিতে নারাজের চেয়ে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন, অতএব রাজনৈতিক হিটলারকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করার হাত থেকে তিনি (সানশ্বে) অব্যাহতি পেয়েছেন—তিনি ‘মানুষ হিটলার’কে অথবা অপবাদ থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-নৈমকহালালী প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কর্ম করতে গিয়ে তিনি কতখানি সত্যবাচন করেছেন সেটা অনেকের মনে সম্প্রদেহের সৃষ্টি করবে।

আমি তাঁকে মোটামুটি বিশ্বাস করেছি, এবং দৈনন্দিন জীবনে হিটলার যেখানে ‘ছোট লোক’ সেখানে পুংসি হান্‌ফ্‌স্টেভেলের—হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর বহুস্থলে অহেতুক বিবোধগার সত্ত্বেও—অনেক কথা মেনে নিয়েছি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমার মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয়, হিটলার জানতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে গেলী ভিয়েনার এক আর্টিস্টকে গভীর ভাবে ভালোবাসতো (আমার মনে হয়, হফ্‌মান যে বলেছেন, হিটলার সে-

খরগিট জ্ঞানতেন না, এটা তাঁর ভুল এবং গেলীর ভিয়েনা যাবার জন্য উৎসাহ এবং মামাকে পীড়াপীড়ি সেখানে যাবার অনুমতির জন্য)। এ বিষয়ে কোনো ঝিমত নেই যে গেলী বরাবরই মর্দানিকের রাজসিক বাসভবন, অর্থাৎ সাধারণ মেয়ের জন্য সমাজে সর্বোচ্চ আসন, মর্দানিকের সর্বজন সম্মানিত মামার ‘গরবে গরবিনী’ হওয়া, সেই গ্রেট মামার প্রেমনিবেদন তারই পদপ্রান্তে, সে মামা আবার তার কথায় কথায় ওঠ-বস করেন, সর্বোত্তম থিয়েটার অপেরায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসনাধিকার, এক কথায় বলতে গেলে মর্দানিকের মত সুখৈশ্বর্য, সর্বপ্রকারের বিলাস, চিত্তহারিণী আমোদ-প্রমোদ দিতে সক্ষম—এসব ছেড়ে ভিয়েনাতে তাকে থাকতে হত সাধারণ—অবশ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃশালিনী—ছাত্রীর মত। এ দুয়ের আশমান জমীন ফারাক। শৃঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিনী হওয়ার জন্য এত বড় সুখসম্মান বিসর্জন? আমার বিশ্বাস হয় না। পূর্বসি যখন কটুবাক্য ব্যবহার করে বলেন, ‘মেয়েটা পয়লা নম্বরের ক্ষুধার্ত বাজ ফাট’, কণ্ঠসঙ্গীত উচ্চতম পঙ্খতিতে আয়ত্ত করতে হলে যে অধ্যবসায় ও ফুর্তি ফার্তি বিসর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-দুটো গেলীর ছিল কোথায়?’ তখন আমার মনে হয় গেলীর মন পড়ে থাকতো ভিয়েনায়, যেখানে সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেওয়াজ করবে ও সম্মুখ পাবে তার আর্টিস্ট দায়িত্বের কাছে অনুপ্রেরণা, যদি সেখানে দৈন্যেও বাস করতে হয়, সেটা সে ভাগাভাগি করবে তারই সঙ্গে; তার তুলনায় মর্দানিকে মামার সঙ্গে বাস করে, মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে উৎকৃষ্টতম বিলাসভোগ শতগুণে নিকৃষ্ট। ভিয়েনার ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সম্মিলিত আনন্দোন্মত্তা নিশ্চয়ই মর্দানিকের বন্দীশালা এবং প্রতি সম্মুখ কাফেতে মামা এবং তার বড়োহাবড়া ভারি-ভারি রাজনৈতিক পার্টি-মেম্বারদের সঙ্গে বসে প্রসন্নতা এমন কি উল্লাসের ভান করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়, কিন্তু সেইটাই তব্বকথা নয়—তব্বকথা ঐ দায়িত্বের সঙ্গ-সুখ। সঙ্গীতই যদি বড় কথা হবে তবে মর্দানিক কি অজ্ঞ পাড়ারগী? মর্দানিকে ঠিক সে সময়ে হয়তো কোনো ‘মেস্তো’ ‘ওস্তাদের ওস্তাদ’ ছিলেন না, কিন্তু গেলী যে ভিয়েনাতে কোনো মেস্তোর কাছে সঙ্গীতাদ্যয়ন করেছিল এ-কথা তো কেউ বলেনি। না, সঙ্গীত তার শেষ বচসার এবং সবশেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কারণ নয়।

হফমান বুঝতে পারেননি, কিংবা বলতে ভুলে গেছেন—সেটা পরবর্তী যুগের সহচরগণ বার বার উল্লেখ করেছেন—হিটলার ঝাণ্ডা ঝাণ্ডু সুপুরুষ রাজনৈতিক-দের পেটের কথা টেনে বের করার কোশলটিতে সুপটু ছিলেন। আর এ তো চিরিড়ি ভাগিনী! হয়তো মামা তাঁর প্রেম নিবেদন করার পূর্বেই আবেগ-বিহ্বল তরুণী মামার সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাবার আশায় পূর্বাভাসেই সব কিছু বলে বসে আছে। কিংবা হয়তো হিটলার যখন লক্ষ্য করলেন, গেলী তাঁর প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে না তখন সেটা চেপে দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বের করলেন গেলীর পেটের কথা—বরং বলা উচিত হৃদয়ের ব্যথা। এবং তারই বা কী প্রয়োজন? সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর পার্টির অসংখ্য স্পাই ছিল সৈন্যদ মজুতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৭

ভিয়েনায়—যে নগরে তিনি নিজের যৌবনের একাংশ রাস্তায় রাস্তায় স্বহস্তে অঙ্কিত পিকচার পোস্টকার্ড ফেরি করেছেন—নইলে ১৯৩৪এ, এ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি তাঁর পার্টির লোকের দ্বারা ভিয়েনা শহরের জন-সমাগমে পরিপূর্ণ দফতরে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী ডলফুসকে খুন করলেন কি প্রকারে ? এবং তার চার বৎসর পরে একটিমাত্র গুলি না চালিয়ে ভিয়েনা দখল করলেন কি কৌশলে ? তার তুলনায় একটি সাধামাটা ছাত্রী ভিয়েনাতে কি ভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেটা বের করা তো অতি সহজ । ভিয়েনাতে সে-যুগে বিস্তর প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল ।

আমার মনে হয়—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিমতী গেলী তার স্বামীর চরিত্রের একটা দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল তখনই, যেটি বিশ্বমানব আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হ'ল পুরো পনেরোটি বৎসর পরে, এবং তাও সম্ভব হ'ত না, যদি যুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হ'তেন এবং ফলে গ্যাস চেম্বার ইত্যাদি আবিষ্কৃত না হ'ত । সে তথ্যটি—হিটলার কী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দানব !—এই তথ্যটি গেলী আবিষ্কার করে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হ'ল । হিটলার যে কোনো মূহুর্তে, কারো সুখদুঃখের কথা মূহুর্তমাত্র চিন্তা না করে তার দয়িতকে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে খুন করাতে পারেন । আজ যদি কেউ বলে, এই ভয় দেখিয়েই ব্ল্যাকমেল করে হিটলার গেলীকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁর মূর্খানকের বাড়িতে—আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু বস্তৃত পরাধীনতার চেয়েও পরাধীন ভাবে—আটকে রেখেছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত মনে হবে কেন ? এবং হয়তো ঐ চার বৎসর ধরে তাকে বাধ্য হয়ে 'রক্ষিতার লীলাখেলা'ও খেলতে হয়েছিল । হফম্যান বলেছেন, গেলীর চরিত্রবল ছিল দৃঢ় এবং সে ছিল 'স্পিরিটেড গাল' । মূর্খানক থেকে অস্ট্রিয়ার পথ কতখানি ? আর বের্ষটেশ-গাভেনের বাড়ি থেকে তো অস্ট্রিয়ান সীমান্ত আরো কাছে । পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায় । বস্তৃত হিটলার সেই কারণেই বেছে বেছে ঐ জায়গাটিতেই বাড়ি কিনেছিলেন । এপারে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণ বড় বেশী উষ্ণ হয়ে পড়লে, কাউকে না জানিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে অক্লেশে ওপারে যেতে পারবেন বলে—অশ্লীলতাও অস্বাভাবিক নির্জন এবং ঐ যুগে পাসপোর্টের কড়াকড়ি তো ছিল না, এসব জায়গায় দ্বারা নিত্য নিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এপার-ওপার করতো তাদের তো পাসপোর্ট আদৌ থাকতো না ।

এমন অবস্থায়ও 'স্পিরিটেড' গেলী গ্রামে থাকাকালীন ওপারে চলে গিয়ে ভিয়েনা যেতে পারলো না ?—সেখান থেকে ভিয়েনাও তো রেলের মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ । না, তা নয় । অমতে যাওয়ার মানেই হ'ত, দয়িতের অবশ্য-মৃত্যু । এবং পরে সে নিজেও হয়তো কিডন্যাপটে হতে পারতো । তাই সে জ্ঞাপন কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল, হফম্যানের শ্রীকে : "Well that's that ! And there's nothing you or I can do about it. So let's talk about something else." এ কথোপকথনের উল্লেখ আমি পুর্বেই করেছি ।

হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু আমার মনে হয় গেলী দিনের পর দিন অভিনয় করে গেছে (যেটা হফ্‌মান ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু পদার্থ বদ্ব্যপ্ত না পেরে ‘টল্যাটল’ বলেছেন), যদি শেষ পর্যন্ত আমার মন গলানো যায়। যখন দেখল কোনো ভরসাই নেই তখন করেছিল শ্মশান-চিকিৎসা—পদরোপদরি ঝগড়া, যেটা একাধিক প্রতিবেশী শুনতে পেরেছিল, এবং হয়তো বা—হয়তো বা আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়েছিল এবং হয়তো তার চোখে-মুখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠেছিল যে চতুর—শঠ—হিটলার বদ্ব্যপ্ত ছিলেন, এ ভয় দেখানোটা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নয়, এটা আর পাঁচটা হিস্টেরিক (এবং হফ্‌মান বলেছেন, গেলী আদর্শেই হিস্টেরিক ছিল না) মেয়ের মত নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ নয়। তাই বোধ হয় মর্দানিক শহর থেকে বেরোবার সময় সখাকে বলেছিলেন, ‘কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে, ‘I don’t know why, but I have a most uneasy feeling’ তাই তাঁর পরবর্তী বিষমতা। পথিমধ্যে টেলিফোনের কথা শুনাই যেন বদ্ব্যপ্ত পেরেছিলেন, এ টেলিফোনে থাকবে গেলী-সম্বন্ধে দৃঃসংবাদ।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গেলী যে ভয় দেখিয়েছিল সেটা শূন্যগর্ভ, ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সেটা কাজে পরিণত করেছিল প্রথমতম সুযোগেই।

গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক

হিটলারের চরিত্রবল ছিল অসাধারণ এবং তাঁর ভেঙে পড়াটাও ছিল অসাধারণ। তবে যে দৃটো ভেঙে পড়ার কারণ ইতিহাসের জানা আছে, তার শেষটা আত্মহত্যা করার কয়েক দিন আগের থেকে—তাঁর খাসচাকর (ভ্যালো) লিঙে সেটির কিছটা বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আর একটা, গেলীর মৃত্যুর পর। দৃটো প্রায় একই প্রকারের।

প্রথম দুদিনের খবর কেউ ভালো করে লেখেননি, তবে তখনকার দিনের অন্যতম প্রধান নাৎসী নেতা গ্রেগর স্ট্রাসার পরে বলেন যে, এ দুদিন তিনি এক মূহূর্ত হিটলারের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, পাছে তিনিও আত্মহত্যা করেন।^{১৩}

এরপর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, একমাত্র সাক্ষীরূপে, আমাদের পূর্বপরিচিত হফ্‌মান। এবার তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ভিন্ন গতান্তর নেই। এটা সত্যই ওয়ান ম্যান’স স্টোরি। তিনি বলছেন, মর্দানিকে ফেরার পর দুদিন পর্যন্ত

১৩ বোধহয় তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্ট্রাসারকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন ‘জোলাপের’ (এটার উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি) সমস্ত মেরে ফেলা হয়।

হিটলারকে আমি আশী দেখতে পাইনি। তাঁর স্বভাব আমি ভালো করেই জানতুম এবং বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমি উত্তমরূপেই স্বায়ত্ত্ব করছিলাম যে, তিনি হয়তো নিজনে একা একা থাকারটাই বেশী পছন্দ করবেন—আমিও তাই তাঁর পাশে যেঁষিনি। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। নিদ্রাজড়িত অবস্থায় আমি গেলুম উত্তর দিতে।

হিটলারের গলা। ‘হফ্‌মান, এখনো জেগে আছ কি? কয়েক মিনিটের তরে আমার এখানে আসতে পারো কি?’ হিটলারেরই গলা বটে কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা। সে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত আর সর্ব অনদ্ভূতি গ্রহণে জড়প্তে চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। পনরো মিনিট পরেই আমি তাঁর কাছে পৌঁছিলাম।

দরজা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। অভ্যর্থনাসূচক কোনো কথা না বলে নীরবে তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন—তাকে দেখাচ্ছে বিরস, যেন সর্ব আত্মজন-বিবর্জিত। বললেন, ‘হফ্‌মান, আমাকে তুমি সত্যিকার একটি মেহের-বানি করবে কি? আমি এ বাড়িতে আর টিকতে পারছি নে, যেখানে আমার গেলী মরে গেছে, ম্যালার টেগার্নজে হ্রদের উপর তার সেন্ট কুইরীনের বাড়ি আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছে; তুমি আমার সঙ্গে আসবে? গেলীর কবর না হওয়া পর্যন্ত সে কটা দিন আমি সেখানেই থাকতে চাই। ম্যালার কথা দিয়েছে, সে ও-বাড়ির চাকর-বাকর সব কটাকে ছুটি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র তুমিই সেখানে থাকবে আমার সঙ্গে। আমাকে এ অনগ্রহটা তুমি করবে কি?’ তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সনিবন্ধ মিনতির অনুনয়; বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালুম।

সেন্ট কুইরীন বাড়ির প্রধান ভৃত্য বাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিল। বিস্ময় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে শোকাঘাতে ভেঙে-পড়া হিটলারের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। সোফার শ্রেক আমার ঘরে সে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তাকেও ফেরত পাঠানো হল। চলে যাওয়ার আগে সে কোনো গতিক সন্ধান করে আমাকে কানে কানে বলে গেল, সে হিটলারের রিভলবার সরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার ভয় পাছে নৈরাশ্যের চরমে পৌঁছে তাঁর আত্মহত্যা করার প্রলোভন হয়। এবারে রইলুম সন্ধ্যা মাত্র আমরা দুজন—আর একটিমাত্র জনপ্রাণী নেই। হিটলার উপরের ঘরে আর আমি ঠিক তার নীচের ঘরটায়।

সে-বাড়িতে হিটলার আর আমি—মাত্র এই দুজন। আমি তাঁকে তাঁর ঘর দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তিনি দু’হাত পিছনে নিয়ে এক হাতে আরেক হাত ধরে পাইচারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর খেতে ইচ্ছে করছে কিনা। একটিমাত্র শব্দ না বলে তিনি শব্দ মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। আমি তবু এক গেলাস দুধ আর কিছু বিস্কুট উপরে নিয়ে তাঁর ঘরে রেখে এলাম।

আমি আপন কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম উপরের পাইচারির তালে তালে ওঠা ভারী শব্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো সেই পাইচারি,—এক-

বারও ক্ষান্ত দিল না, একবারও জিরুলো না। রাত্রির অশ্ধকার ঘনিষে এল—আমি তখনো শুনছি তাঁর একটানা পাইচারি, ঘরের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত, ফের ঐ প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত। সেই একটানা শব্দের মোহে আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ কি যেন আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিল। পাইচারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর যেন মৃত্যুর নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তবে কি করছেন হিটলার এখন...? অতি সন্তপণে এবং মৃদু পদক্ষেপে আমি যেন লুকিয়ে উপরের তলায় গেলুম। ওঠবার সময় কাঠের সিঁড়ি অল্প অল্প কাঁচ কাঁচ শব্দ করলো। আমি দরজায় পেঁছতেই—দৈবরক্কে ধন্যবাদ, আবার পাইচারিটা আরম্ভ হল। বৃকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল; আমি চুপিসাড়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

এবং এইভাবে চললো সমস্ত দীর্ঘরাত ধরে সেই পাইচারি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অস্তহীন দীর্ঘ ঘণ্টা। আমার মন চলে গেল আমাদের বিগত একাধিকবার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ টেগেন'জে হৃদের কোলে লালিত বাড়িতে আসার স্মরণে। তখন সব কিছু কতই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল!

গেলীর মৃত্যু আমার বন্ধুর গভীরতম সন্তাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে। তবে কি তিনি নিজেকে তার জন্য দায়ী অনুভব করছিলেন? তিনি কি অন্ততপ্ত আত্ম-অভিযোগ দিয়ে আপন সন্তাকে কঠোরতম যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন? তিনি এখন করবেনই বা কি? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না একটারও উত্তর।

উষার প্রথম আবির্ভাব অশ্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তুলছিল, এবং আমি আমার জীবনে উষাগমনের জন্য হৃদের ভিতর কখনো এতখানি কৃতজ্ঞ অনুভব করিনি। আমি আবার উপরে গিয়ে তাঁর দরজায় মৃদু করাঘাত করলুম। কোনো উত্তর এল না। আমি ভিতরে গেলুম কিন্তু হিটলার আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে আমাকে লক্ষ্যমাত্র করলেন না। দেহের পিছনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে, সূর্যের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কোনো জিনিস না দেখে, তিনি তাঁর অস্তহীন পাইচারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখের রঙ পাঁশুটে, ক্লান্তিতে সেটা ঝুলে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারাটাকে করে দিয়েছে বিসদৃশ, চোখ দুটো ভুবে গিয়েছে কোটরের গভীরে, সেগুলোর নিচের অংশ কালো ছায়ায় ক্ಷমসীলিপ্ত, আর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটাকে চেপে ধরে একেছে যেন তিস্ত অভিশপ্ত একটি রেখা। দুধ আর বিস্কুট স্পর্শ করা হয়নি।

চেষ্টা করেও সামান্য একটা কিছু খাবেন না তিনি, প্রীজ? আমি শূন্যবাক। আবার কোনো উত্তর এল না, শুধু সামান্য একটু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, অন্তত অল্প কিছু একটা ও'কে খেতেই হবে, নইলে তিনি যে হুঁমড়ি খেয়ে ভিরমি যাবেন। আমি ম্যুনিখে আমার বাড়িতে ফোন

করে শূধালুম, স্নাগোস্তি^{১৪} কি করে রাঁধতে হয় ? হিটলারের অন্যতম প্রিয় খাদ্য এটি। সেখান থেকে পাকপ্রণালীর যে দিকনির্দেশ পেলাম বর্ণে বর্ণে সেই অনুযায়ী আমি রন্ধনকলায় আমার নৈপুণ্য আছে কিনা সেই পরীক্ষাতে প্রবেশ করলাম। আমার নিজের মতে ফলটা ভালোই ওঠারলো। কিন্তু আবার আমার ভাগ্য বাম। যদিও এই ধরনের স্নাগোস্তি তাঁর প্রিয় খাদ্য, যদিও আমি আমার রন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসা-প্রশংসায় সন্তুষ্ট স্বর্গ অবধি তুলে দিয়ে তাকে অনুন্নয়-বিনয় করলাম, চেষ্টা দিয়েও অতি অল্প একটুখানি মূখে দিতে—আমার মনে হল আমি যা কিছু বলছি, সে তাঁর দৃপাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি তার এক বর্ণও শোনেননি।

ধীরে মধুরে দিনটা তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর এল আরেকটা রাত্রি, সেটা আগেরটার চেয়েও বিভীষিকাময়। আমি আমার সহ্যশক্তি, আত্মকর্তৃত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছি। জেগে থাকা আমার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে; ওঁদিকে উপরে সেই পাইচারি চলেছে তো চলেছে অবিরাম, আর তার শব্দ যেন কেউ তুরপূন দিয়ে আমার খালি ফুটো ক'রে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। যেন এক ভয়াবহ উত্তেজনা তাঁকে তাঁর পায়ের ওপর রেখে চলেছে এবং কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তারপর এল আরেকটা দিন। আমি নিজেই তখন যে কোনো মহত্ব আপন সম্পর্গ অনিচ্ছায় জড়িন্দ্রায় অভিভূত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারি। আমার নড়াচড়া আমার কাজকর্ম করা সব কিছু যন্ত্রচালিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অশ্রুশক্তির প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মাথার উপর পদধ্বনি কক্‌খনো থাকেনি।

সন্ধ্যা ঘনানোর পর আমরা শুনলুম, গেলীর গোর হয়ে গিয়েছে, এবং হিটলারের সে-গোরের দিকে তীর্থযাত্রারস্ত্র করতে কোনো অন্তরায় নেই। সেই রাতেই আমরা রওনা দিলুম। নিঃশব্দে হিটলার ড্রাইভার শ্রেকের পাশে বসলেন। আমার উপরে যে অসহ্য চাপ আমাকে ধরে রেখেছিল সেটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে দূ-টুকরো হয়ে গেল আর আমি গাড়ির ভিতর সেই অবসাদজনিত অঘোর নিদ্রায় ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে নিলুম। ভোরের দিকে আমরা ভিয়েনা পৌঁছলুম, কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘ চলার পথে হিটলার একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরা সোজা নগরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে পৌঁছলুম। এখানে এসে হিটলার একা গোরের দিকে গেলেন। সেখানে পোলেন তাঁর নিজস্ব দুই এডিকং স্মার্টস এবং শাউব—তারা সেখানে তাঁর জন্য

১৪ ইতালিয়নের স্টেপলফুড—আমাদের ভারতের মত নিত্য খাদ্য। মাছা-রনী, স্নাগোস্তি, ভেরমিচেল্লি ইত্যাদি। সবই ময়দার তৈরী, অনেকটা মুসলমানদের সেওঁইয়ের মত। রান্না করা হয় নানা পদ্ধতিতে, তার শত শত রেসিপি (পাকপ্রণালী) আছে।

অপেক্ষা করছিলেন। আশ্চর্য্যের ভিতরই তিনি ফিরে এলেন এবং গাড়ি ওবেরজাল্‌ৎস্‌বেগে চালিয়ে নিতে হুকুম দিলেন।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই তিনি কথা আরম্ভ করলেন। উইন্ডস্ট্রীনের ভিতর দিয়ে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন আত্মচিন্তা করছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে বলে। ‘আচ্ছা! তাই সই!’ বললেন তিনি। ‘আরম্ভ হোক তবে এখন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শিরোপারি কৃতকার্যতার বিজয়মুকুট পরবেই পরবে, পরতে বাধ্য।’ আমরা সকলেই বিধির এক বিরাট আশীর্বাদ-প্রাপ্ত স্বাস্থ্য অনুভব করলুম।...

এরপর হিটলার রাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বক্তৃতাফরে। আজ এখানে কাল সেখানে, এমন কি একই দিনে দু’তিন ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন। সেগুলো আগের চেয়ে যেন শ্রোতাদের করে দেয় অনেক বেশী আত্মহারা, যেন তাদের চিন্তাধারাকে তিনি হুকুম দিয়ে বাধ্য করছেন তারা যাবে কোন্ পথে। এবং শ্রোতাকেও বক্তৃতা দিয়ে আপন মতে টেনে আনার শক্তি যেন তাঁর বেড়ে গেছে শতগুণে। হফ্‌মান বলছেন, এই শহর থেকে শহর ছুটোছুটি, প্রথমে জার্মানির সব চেয়ে শক্তিশালী মোটর মেৎসেডেজে করে, পরে আপন অ্যারোপ্লেনে (অনেকেই বলেন রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার জন্য ইওরো-আমেরিকায় হিটলারই সর্বপ্রথম নিজস্ব হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করেন—এই রিৎস্ প্রোপাগান্ডা যেন পরবর্তী যুগের রিৎস্‌ক্রীগের পূর্বাভাস!); সেখানে বিরাট বিরাট জনসভা, শ্রোতাদের চিংকার করতালি, মিটিঙশেষে উন্মত্ত জনতার প্র্যাটফর্ম আক্রমণ—ফ্যারারকে কাছের থেকে দেখবার জন্য—এসব হট্টগোল ধূমধামারের ভেতর হিটলার যেন গেলীর শোক নিৰ্মাঞ্জিত করে দিতে চাইছিলেন।

এর তিন সপ্তাহ পরে প্রেসিডেন্ট হিঁডেনবুর্গ আলাপ-আলোচনার জন্য হিটলারকে ডেকে পাঠান, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যারা বলেন, সে আলোচনা নিষ্ফল হওয়ার কারণ গেলীর শোকে হিটলার এমনই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর দাবী তিনি যথোপযুক্ত ভাষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বরঞ্চ হফ্‌মান যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, তখনো হিঁডেনবুর্গ তাঁর চিরপরিচিত প্রাচীনপন্থী আপন চক্রের ভিতরকার নেতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি। তখনো হিটলারের ‘সময় হয়নি’।

*

*

*

গেলীর জীবন, তার মৃত্যু, তার স্মৃতি সব কিছু ধর্ম উদাসীন হিটলারকে যেন এক নূতন অনুষ্ঠানবোধিত সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুললো। তিনি স্বহস্তে গেলীর কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হুকুম দিলেন, একমাত্র গৃহরক্ষণী ক্লাউ ভিন্টারেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। বহু বৎসর ধরে তিনি প্রতিদিন গেলীর প্রিয় ফুল তাজা ক্রিসেনথিমাম সে ঘরে রাখতেন। বের্ষটেশ-গাভেনের বাড়িতে এবং পরবর্তী যুগে ফ্যারার যখন দেশের সর্বাধিকারী (তিনি

প্রথমে চ্যানসেলর বা প্রাইম মিনিষ্টার রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং বছর দেড়েক পর প্রেসিডেন্ট গত হলে তিনি সে পদ পূর্ণ না করে নিজেই গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ডিকটের—নিরঙ্কুশ নেতা—ফ্যারার হন। তখন রাজ্যভবনে গেলীর ছবি বিরাজ করতো সর্বত্র। বৎসরে দুই দিন—তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন রুচিসম্মত আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করদের দেওয়া হল গেলীর নানা অবস্থায় তোলা নানাবিধ ফোটোগ্রাফ। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উত্তম উত্তম ওয়েলপেইন্টিং ও মূর্তি নির্মিত হল। জর্মনির অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্পী তখনকার দিনের সর্বোৎকৃষ্টদের একজন—গেলীর একটি অনবদ্য রোনজ্ মূর্তি নির্মাণ করেন। এদের একটা না একটা হিটলারের প্রতি বাসভবনে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখা হত।

এর প্রায় তেরো বৎসর পর এই আর্টিস্টদের অন্যতম, হেন্স ক্লার যখন যুদ্ধে পরাজয় মনোবৃত্তি প্রকাশের ফলে নার্সি গেস্টাপো পদাঙ্গকের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মৃত্যুর আশা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন তখন তিনি যে একদা গেলীর ছবি এঁকেছিলেন (যদিও কারো কারো মতে তিনি আর্টিস্ট হিসাবে ছিলেন অতিশয় মামূলী) সে কথা হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাকে তদুদ্দেশ্যে মৃত্তি দেন।

হফম্যানের বিশ্বাস, গেলীর সঙ্গে হিটলারের যদি পরিণয় হত তবে হিটলারের জীবন এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি পেত না। তাঁর মতে শতধাবিভক্ত জর্মনি কে একান্ত করে তাকে নবজীবনরস দিয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জর্মনির বাইরে যে সব বিবেচনাহীন অভিযানে বেরুলেন সেখানে পারিবারিক শান্তি এবং তৃপ্তি—হিটলার যেটাকে অসীম মূল্য দিতেন—তথা গেলীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হিটলারের উপর তার অসীম প্রভাব তাঁকে সংযত করে নিরস্ত করতো—তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস বীভৎসতাময় পরিবেশে ত্যাগ না করে শাস্তিতেই ফেলতে পারতেন।

হফম্যান বলেন, তারপর যখনই গেলীর কথা উঠেছে, হিটলারের চোখ জলে ভরে যেত। এবং একাধিক পরিচিতজনকে হিটলার স্বয়ং বলেছেন, জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালোবেসেছিলেন।

*

*

*

গেলীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পর, হিটলার, আত্মহত্যা করার প্রায় দেড়দিন পূর্বে, এফা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কোঁতুহল পৃথিবীবাসীর এখনো যায়নি। কিন্তু তার বর্ণনা এর সঙ্গে যায় না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, হিটলারের জীবনে তিনটি দৃষ্টব দেখা যায়। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি প্রায় ভেঙে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেন—পাঠক আদৌ ভাববেন না, গ্যাস-চেম্বার নির্মাতার অন্য কোনো দিকে কোনো প্রকারের স্পর্শ-কাতরতা থাকে না, (তাহলে কসাইয়ের ছেলে মরলে সে কাঁদতো না) এবং এঁরা অসাধারণ জীব বলে যে সব ক্ষেত্রে তাঁদের স্পর্শকাতরতা হয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, তাঁদের বেদনানুভূতি প্রায় অনৈসর্গিক তাঁর—তৃতীয়বারের ঘটনা সকলেই জানেন।

সেবারে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। আত্মহত্যা ছাড়া তখন তাঁর আর অন্য কোনো গতি ছিল না। প্রথম দুর্দৈব তাঁর মাতার মৃত্যু। হিটলার তখন বালক, কিন্তু সেই বালকই তার মাকে যা সেবা করেছে সেটা অবর্ণনীয়, অবিবাস্য—শুধু বলা যেতে পারে, স্বর্গজাত ভক্তি-প্রেমরস যেন ঐ মাত্র একবার পৃথিবীতে হিটলার-জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর বাল্যবন্ধু তখনকার দিনের হিটলার ও মাতার মৃত্যুর পর তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। সেবারে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয় দুর্দৈব—গেলীর আত্মহত্যা।

তৃতীয়বারে—এবং শেষবারের মত—তিনি সুযোগ পেলেন সেই পাইচারি করার।

তাঁর খাস চাকর লিঙে তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু লিঙে দেখেছিলেন কাছে থেকে বলে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা দিতে পেরেছেন, আর হফ্‌মান নিচের তলা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন শুধু।

কিন্তু হায়, তাঁর শেষ পদচারণার পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাঁর শরীরের সম্পূর্ণ বাঁ দিকটা সমস্তক্ষণ কাঁপে (পার্কিনসন ব্যাধি কিংবা সেন্ট ভাইরাসের নৃত্য রোগ), বাঁ হাতটা এত বেশী স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে ঘন ঘন ওঠে নামে যে পাইচারি না করার সময়ও সেটাকে প্রায়ই তিনি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা দিতেন। বাঁ পা-টাকে ঘণ্টে ঘণ্টে টেনে টেনে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, আর দু'চোখের উপর কখনো বা ফিল্মের মত বাম্পাভাস, আর কখনো বা অস্বাভাবিক তীব্র, উজ্জ্বল জ্যোতির মত।

এই বেদনাদায়ক অবস্থায় যখন সাধারণ জন শূন্যে বসেও শান্তি পায় না, তখন হিটলার দু'হাত পিছনে নিয়ে সজোরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে বাঁ পা টেনে টেনে—যেন কোনো জড়পদার্থ তিনি আপন দেহ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—আরম্ভ করলেন সেই প্রাচীন দিনের পাইচারি। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর মূর্ত্যাস্থাত করেন—কারাবাসী-জন যে রকম করে থাকে; তবে কি তিনি শহরের চতুর্দিকে শত্রুসৈন্য ঘেঁষে নিয়ে কারাবন্দীর অনুভূতিই অনুভব করছিলেন?—কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীন জরাজীর্ণ। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পদচারণা করার দৈহিক শক্তি তাঁর আর নেই। তাই মাঝে মাঝে বসেন চেয়ারের উপর—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন দেওয়ালের দিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু এখন আর কি প্রয়োজন পদচারণার?

সেদিন গেলীর মৃত্যুর পর উত্তেজিত হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি করে সে উত্তেজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবারে সে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার! শত্রুর হাতে অসীম যন্ত্রণা, অশেষ অপমানের পর হয়তো ফাঁস। এবারে তোমার আত্মহত্যার পালা।

তব্দ পদচারণ করো, হিটলার !

একদা গেলী চলে যাওয়ার পর করেছিলেন অস্থির পদক্ষেপ, এবার গেলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রাক্কালে অবশ্য বেহ টেনে টেনে !

লক্ষ মার্কের বরমান

সম্প্রতি জার্মান সরকার ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে যার সাহায্যে মার্টিন বরমান নামক লোকটাকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে তাকে এক লক্ষ জার্মান মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে ।

তাই নিয়ে একখানি মাসিক পত্রিকা ফলাও করে উক্ত হ্যার বরমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন । পত্রিকাখানি চোন্দটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শতাধিক দেশে পড়া হয় বলে পত্রিকার কতৃপক্ষ দস্ত করে থাকেন । প্রবন্ধলেখক তাই বলেছেন, হয়তো বা আপনিই বরমানকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, কারণ হিটলারের মৃত্যুর পর বরমান কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন কেউ জানে না । সর্বশেষে প্রবন্ধলেখক বরমানের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে আপনি তাকে অস্পায়াসে বা অনায়াসে চিনে নিতে পারেন ।

আমরা বরমান সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে মনে গভীর সন্দেহ হয়, লেখক বরমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী চললে তাঁকে আদৌ চিনতে পারবেন কিনা,—বরঞ্চ হয়তো তাঁকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে বেশী ।

ইতিমধ্যে আরেকটি কথা বলে রাখি, উক্ত পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বলেছেন, এক লক্ষ জার্মান মার্ক যে আপনি পাবেন তার ভারতীয় মূল্যে এক লক্ষ টাকা । আমরা যতটুকু জানি, তার মূল্য অস্তুত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—সাদা বাজারেই । এই হল প্রবন্ধটির বিসমিল্লাতে গলদ । এর পর অন্য সব গলদে আসছি । তার পূর্বে বরমানটির পরিচয় কিঞ্চিৎ দি ।

হিটলারের জীবনের শেষের দূর বৎসর বরমান ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি । তার পূর্বেই তিনি নার্সিস পার্টির সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন । নার্সিস পার্টিই যে জার্মানি চালাতো সে-কথা সবাই জানেন—অন্য কোনো পার্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত বেআইনী বলে গণ্য হত—এবং হিটলার ছিলেন তার সর্বমুখ্য কর্তা । এবং তার পরেই বরমান ।

আইনত হিটলার হঠাৎ মারা গেলে কিংবা কোনো কারণে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাঁর জায়গায় বসার কথা ছিল গ্যোয়ারঙের । ওঁদিকে নার্সিস পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর (এস্ এস্) বড়কর্তা ছিলেন হিমলার । তিনি আবার ছিলেন দেশের সামরিক বেসামরিক সর্ব রিজার্ভ ফোর্সের অধিপতি এবং সর্ব কনসানট্রেশন ক্যাম্প ছিল সম্পূর্ণ তাঁরই জিম্মায় । শেষের দিকে গ্যোয়ারঙ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণ জানতো, হিটলারের

হঠাৎ কিছ্ একটা হয়ে গেলে হিমলারই বেশের ফ্যারার—লীডার—বা নেতা হবেন। আইসমান যা কিছ্ করেছেন সেসব হিমলারের হুকুমই।

তা ছাড়া ছিলেন গ্যোবেলস। যদিও তিনি প্রোপাগান্ডা মিনিস্টার কিন্তু তিনি হিটলারের বিশেষ প্রিয় আমীর ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনিও হিমলার যদিও হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে বরমানও সেটা ঠেকাতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্যোবেলসকে। বরমান সেটি জানতেন, এবং হিমলারকে যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোণ-ঠাসা করে এনেছিলেন তবে গ্যোবেলসকে ঠেকাতে পারবেন না জেনে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি (ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট—মডুস ডিভিড) করে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনো সম্ভেদ নেই, হিটলারের জীবনের শেষের বছরখানেক বরমান ছিলেন সর্বোত্তম। হিটলারের তাবৎ হুকুম তাঁরই মারফতে বেরুতো। তাঁর ইচ্ছামত তিনিও হিটলারকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খৃষ্টধর্মের এমনই কটর শত্রু ছিলেন যে তাঁরা খৃষ্টানদের দমাবার জন্যে যে-সব ব্যবস্থা করতে চাইতেন তার দ্বারা একটা হিটলারের মত ধর্মদ্রোহীর মনেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল।^১

এ বিষয়ে আর কোনো সম্ভেদ নেই, গ্যোরিঙের পতনের জন্য বরমানই দায়ী। এমন কি হিটলারের বিনানুন্নতিতে তিনি হুকুম পাঠান যেন গ্যোরিঙকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু নাৎসি রাজ্য পতনের দিন আসন্ন দেখে যে-কাপ্তানের উপর সে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটা অমান্য করেন।

হিটলারের মাত্র একটি খাস দোস্ত ছিলেন। চক্রান্ত করে বরমান তাঁকেও প্রায় ছ'মাস ধরে হিটলারের কাছ থেকে দূরে রাখেন। হিটলারকে বলেন, তিনি সংক্রামক টাইফুসে ভুগছেন। হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কোনো গতিকে হিটলারের সাক্ষাৎ পান—শেষ বারের মত। চক্রান্ত ধরা পড়ে। হিটলার কিন্তু বরমানকে কিছ্ই বললেন না। বরঞ্চ দোস্ত হফম্যানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দয়া করে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।^২

১ “অদ্ভুতের নিম্নম পরিহাস” বলতে হবে, নাৎসি সাম্রাজ্য পতনের প্রায় এক বৎসর লুকিয়ে থাকার পর বরমানের স্ত্রী এক ক্যাথলিক পাদ্রির সাহায্য নেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন ভজনখানেক ছেলেমেয়েকে তাঁরই হাতে সঁপে দেন। এবং “নিম্নমত্তম পরিহাস”—তাঁর বড় ছেলে ক্যাথলিক পাদ্রী হয়েছে!

২ এই দোস্ত হফম্যানকেই হিটলার পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, রিবেনট্রপের সঙ্গে, নাৎসি-কম্যুনিষ্ট চুক্তি সই করার সময়—স্থানিন কি রকম লোক সে তৎপর্ববেক্ষণ করার জন্য। হিটলারের মৃত্যুর পর ইনি ‘হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড’ নামক একটি পুস্তক লেখেন। ইনিই হিটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর ফোটোগ্রাফ ল্যাবরেটরির এ্যাসিস্টেণ্ট প্রীমতী এফা রাউনের সঙ্গে। আত্মহত্যা করার চাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে হিটলার এফাকে বিয়ে করেন—পনেরো

এই যে এত শক্তিশালী বরমানকে লোকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? আইবমান তাঁর অনেক নিচের নিচে কর্মচারী ছিলেন। তাঁকেও ইহুদীরা ধরতে পেরেছে। একে পারছে না কেন?

যে বিখ্যাত মাসিকপত্রের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই। যদিও হিটলার-বরমান নিয়ে যারাই আলোচনা করেন তাঁদের সবাই এর উত্তর জানেন।

তার একমাত্র কারণ বরমান পার্লামেন্ট বা খ্যাতি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক্তি, ক্ষমতা—মানুষের জীবনমরণের উপর অধিকার আয়ত্ত করা।

হেস্, গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস, হিমলার, রিবেন্ট্রপ এমন কি হিটলারের আমীর-ওমরাহ চুনোপুটিরাও কাগজে-কাগজে যখন আপন আপন ফোটোগ্রাফ ছাপাচ্ছেন, যত্নতর ভাষণ দিচ্ছেন, বেতারে তরো-বেতরো বক্তৃতা বাড়ছেন, মোকা-বেমোকায় কেতাব ছাপাচ্ছেন, পরট্-পার্টি ডে-তে চোখ-ঝলসানো স্টুনিফর্ম পরছেন, তখন বরমান হিটলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে—তাও বাড়ির বাইরে জনসমাজে না—কলকাঠি নাড়ছেন, দিনের পর দিন আপন শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় জেনারেল সিভিলিয়ানরা যখন ডাঙর ডাঙর মেডেলের জন্য হিটলারের সামনে হুটোপুটি করছেন তখন বরমান তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন—‘এ কী পাগলামি!’^৩

তাই জর্মন-অজর্মন সাধারণজন তাঁকে চিনতো না। তখনকার দিনে এবং আজও তাঁর ফোটোগ্রাফ দৃশ্যপ্রাপ্য ছিল এবং আছে।

হিটলার যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে অর্থাৎ স্থালিনগ্রাদের পরাজয় তখনো তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়নি সে সময় খানাপিনার পর হিটলার ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে গালগল্প করতেন। অবশ্য হিটলারই কথা বলতেন বেশী। বরমান তখন ব্যবস্থা করেন যে দুজন শর্টহ্যান্ড এককোণে বসে সেগুলো

বছরের ‘বন্ধুত্বের পর। এফাও একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। উভয়কে একই চিতায় পোড়ানোর পর একই কবরে গোর দেওয়া হয়। রাশানরা স্কেলিটোনগুলো খুঁড়ে বের করে।

৩ বরমান এতই গোপনে থাকতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কেউই সন্দিগ্ধতার কিছু লিখতে পারেননি। ন্যুরনবেগ মকদ্দমায় সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গানের ঝাল ঝেড়েছেন বটে কিন্তু তথ্য বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। এ ছাড়া আছে : ১) ‘বরমান লেটার্স’—স্ত্রীকে লেখা বরমানের পত্রগুচ্ছ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। ২) ট্রেভার-রোপার লিখিত ‘লাস্ট ডেজ অব হিটলার’। ৩) প্রাগুক্ত হফম্যান লিখিত, ‘হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড’। ৪) গেরহার্ট বল্ট্ কৃত ‘ড লেংসতেন টাগে ড্যার রাইব্ স্কাঙ্কস্লাই’ (অর্থাৎ ‘জর্মন প্রধানবাসের শেষ কটি দিন’)। এই বল্ট্ হিটলার ভবন (মাটির গভীরের এয়ার রেড শেলটার বা ‘বুংকার’) ত্যাগ করেন হিটলারের মৃত্যুর মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে।

যেন লিখে নেন। পরে বরমান সেগুলো কেটেছে টেবল-টাক করে দিতেন। এগুলো হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর 'টেবল-টাক' (table talk) রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত বিশ্ববিখ্যাত মাসিকের প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, বরমান যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল so that he could know and fulfil Hitler's every whim. এ উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু এই টেবল-টাক পড়লেই বোঝা যায় সেটা অত্যন্ত গোপন। আসলে বরমান মনে করতেন হিটলার যা করেন যা বলেন তার চিরন্তন ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পরবর্তী যুগের নাৎসি তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য নিধি। নিধি হোক আর না-ই হোক—একথা সত্য, যারা হিটলারকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে চিনতে চান তাঁদের পক্ষে হিটলারের স্বরচিত 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' পুস্তকের পরেই এর স্থান। এসব ১৯৪১-৪২-এর কথা।

১৯৪৫ সালে হিটলার যখন আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন বরমান হিটলারকে দিয়ে আবার কথা বলিয়ে নেন। একথা সত্য, আত্মহত্যার কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত হিটলার জয়াশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। তবু এই শেষ talk-গুলোতে হিটলার যেন আপন মনে চিন্তা করছেন, কেন তাঁর পরাজয় হল? এবং শুধু তাই নয়, পরাজয় যদি নিতান্তই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি অবস্থা হবে, তখন জার্মান রাজনীতি কোন পন্থা অনুসরণ করবে সে সম্বন্ধেও হিটলার ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আশ্চর্য, তার অনেকগুলোর আজ ফলে যাচ্ছে। চীন যে চিরকাল জড় হয়ে পড়ে থাকবে এটা তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, চীনের কোটি কোটি লোক ঐ দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, চীন আমেরিকাপানে ধাওয়া করবে (তার পূর্বে রুশ-মার্কিনে যুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ছারখার হয়ে যাবে); চীন যে ভারতপানে ধাওয়া করবে সে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেননি।

বলতে গেলে এই টেবল-টাকও বরমানেরই 'অবদান'।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান মদ এবং কফি খেতেন না, পাতলা চা খেতেন এবং কঠিন কখনো মাংস খেতেন (drinking neither alcohol nor coffee, just weak tea, and eating sparingly of meat)'।

অর্থাৎ কাল যদি আপনি কলকাতায় (প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন he could be in Canada or Mexico—even in India), কিংবা কেউ যদি আজেন্টাইনে দেখে একটা লোক ঢাউস গেলাস-ভর্তি বিয়ারের সঙ্গে বিরাট একটা কটলেট খাচ্ছে তবে তার বরমান হবার সম্ভাবনা নেই।

বস্তৃত বরমান মাংস খেতেন প্রচুর। মদের তো কথাই নেই।

তবে প্রবন্ধ-লেখকের এ ভুল ধারণা এল কোথা থেকে?

সকলেই জানেন হিটলার মাছ মাংস মদ খেতেন না। তিনি যখন সান্সোপাঙ্ক

নিয়ে খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে থাকতো নিরামিষ, এবং অন্যদের জন্য মাছ মাংস মদ। অবশ্য কেউ যদি হিটলারের মত নিরামিষ খেতে চাইত তবে তাকে সানস্বে তাই দেওয়া হত।

হিটলার-সখা হফ্‌মান—যাঁর পুস্তকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি— বলছেন, ‘গ্যোরিঙও এসব খানাতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলতেন, “আহারাদির ব্যাপারে প্রভুর সঙ্গে আমার রুচির অমিল।” এবং এসব নিরামিষ অন্য কেউই কখনো খেতে চায়নি। এক বরমান ছাড়া। প্রভুকে খুশী করার জন্য সেই কত’ভজাটা তার সঙ্গে ঐ ‘কছুষে’ই’ খেত। এবং তারপর আপন কামরায় গিয়ে—সেটা কাছেই ছিল—পরমানন্দে শূয়োরের চপ (বিরিট মাংসের টুকরো—এর সঙ্গে আমাদের আলুর চপের কোনো মিল নেই) বা বাছুর মাংসের কটলেট গবগব করে গিলতো।’^৪

প্রাগদুপ্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁদেরই উপর নির্ভর করেছেন যারা বরমানকে শূদ্দ বাইরের থেকে দেখেছেন। তাই কবি বলেছেন, বাহাদুশ্যে ‘ভোলো না রে মন।’

প্রশ্ন উঠতে পারে, হফ্‌মান আর বরমানে ছিল আদ্যম কাঁচকলায়। তাই তিনি দৃশ্যমণী করে এসব নিষেধ রটিয়েছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, যখন হফ্‌মানের বইখানি প্রকাশিত হয় তখন বরমানের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনো, চাকর, প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক ছেলেমেয়ে স্বাধীন ভাবে জর্মনিতে চরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউই কোনো আপত্তি জানাননি।

এবারে মদের ব্যাপার।

হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালো) লিঙে দশ বৎসর রুশদেশে কারাবাস করে, ১৯৫৫ সালে খালাস পেয়ে দেশে ফিরে হিটলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। হিটলার নাকি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, ‘দেখো লিঙে, রাতে আপন ঘরে তুমি যত খুশী মদ খেয়ে যেমন খুশী মাতলামো করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজে সাবধানে থেকো।’ বরমানও তাই সাবধানে মদ খেতেন।

আমার এই প্রবন্ধের তিন নম্বর ফুটনোটে যে চার নম্বরের লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বল্‌ট্‌।

পূর্বেই বলছি হিটলার আত্মহত্যা করার ছাশ্বশ ঘণ্টা পূর্বে তিনি হিটলার আর সাক্ষোপাত্তদের ভূগর্ভ-নিবাস (বুংকার) ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান। এই ভূগর্ভ-নিবাস বহু কামরায় বিভক্ত ছিল। তারই একটাতে থাকতেন তিনি আর তাঁর

৪ “Goering too was a rare guest. Hitler’s culinary confections he declared was not to his taste. But the lick-spittling Borman dutifully consumed raw carrots and leaves in his master’s company,—and, then he would retire to the privacy of his own room and devour with relish his pork chop or a fine Wiener Schnitzel (calf cutlet). Hoffmann, p 202.

সহকর্মী লরিংহফেন্‌। হিটলারের আত্মহত্যার দু'দিন রাত্র পূর্বে ভোরের দিকে তাঁর সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে বলেন, 'কান পেতে শোন, কি সব হচ্ছে।' পাশের কামরায় তিন ইয়ার—বরমান, জেনারেল বৃগ'ডফ্‌ আর জেনারেল ক্রেব'স্‌ ও মদ্যপানের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। রাশানরা তখন বার্লিনে ঢুকে গিয়েছে এবং কয়েকদিনের ভিতর যে তাদের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেবে সেটা জানতে পেরে বিশেষ করে বৃগ'ডফ্‌র আত্মগোপন দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য তিনি প্রধানত নাৎসি পার্টি ও তার কর্তা বরমানকে দায়ী করছিলেন। বরমান আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে বলছেন, 'এস, দোস্ত, আরেক পাস্তুর হয়ে থাক'—বৃগ'ডফ্‌ অধিকাংশ সময়ই মস্তাবস্থায় থাকতেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বল্ট্‌ তার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

দু'পূর্বের দিকে বল্ট্‌ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গেলেন মিলিটারি কনফারেন্স রুমে—বৃগ'ডফ্‌র ক্ষুদ্র-পারিসর কামরাগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল সব চেয়ে প্রশস্ত। সেখানে গিয়ে দেখেন, হিটলার, এফা এবং গ্যোবেলস বসে আছেন, আর সামনের তিনখানা সোফাতে হিটলারের তিন ওমরাহ—বরমান, বৃগ'ডফ্‌, ক্রেব'স্‌—লম্বা হয়ে, পা ফাঁক করে সর্বাস্থে কম্বল জড়িয়ে, সোফার ফাঁকা জায়গাগুলো কুশন (তাকিয়া-বালিশ) দিয়ে ভর্তি করে ঘড়ঘড় করে প্রচুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পূর্বরাত্রির এবং সেই সকালের অত্যধিক সন্নিবিষ্ট ট্রান্সক্রিপশন পানের ধকল কাটিয়ে তখনো তাঁরা জেগে উঠতে পারেননি। মদ্যপানশেষে তিন ইয়ার এক-সঙ্গে শোবার জন্য এই বড় ঘরটাই বেছে নিয়েছিলেন। বল্ট্‌ বলছেন, 'গ্যোবেলস তাঁর দিকে এগুতে গিয়ে এঁদের নিদ্রাভঙ্গ না করার জন্যে প্রায় সার্কাস থেলোয়াদের মত তাঁদের পা বাঁচিয়ে এক রকম ডিঙিয়ে এলেন। তাই দেখে এফা একটু মৃদু হাস্য করলেন।' (পৃ ৮১, ৮২)

এর পরও যদি প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন বরমান মদ খেতেন না তাহলে আমরা সত্যিই নিরুপায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে বরমান যতক্ষণ না হিটলার ঘুমিয়ে পড়েন ততক্ষণ সচরাচর মদ খেতেন না। পাছে হিটলার ডেকে পাঠান। এমন কি স্বয়ং বরমানই তাঁর শ্রীকে লিখছেন (ফেব্রুয়ারি মাসে—হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০

৫ অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, হিটলারের মৃত্যুর দু'দিন পরে যখন বৃগ'ডফ্‌র রাশান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয় তখন বৃগ'ডফ্‌ এবং ক্রেব'স্‌ আত্মহত্যা করেন। বরমান পালান। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে পলায়মান যারা পরে বন্দী হন তাঁরা বলেন, বরমান রাশান দ্বারা নিহত হন। পরে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিল। তাই আজ জার্মান সরকার এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পলায়ন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাঠক পাবেন, ট্রেভার-রোপার লিখিত পুস্তকে, পৃ. ২২১।

এপ্রিল ১৯৪৫, অপরাহ্ন সাড়ে তিনটেয় ; হিটলারের ভাষে—খাস চাকর—লিঙের মতে ৩'৫০), 'ভাগ্যিস কাল রাতে এফার জন্মদিন পরবে আমি মদ্যপান করিনি, কারণ রাত সাড়ে তিনটেয় হিটলার আমাকে ডেকে পাঠালেন ; আমি তাই সাদা চোখেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারলাম ।'

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান হাঙ্কা চা খেতেন ।'

সেও সব'জন সমক্ষে, হিটলারকে খুশী করার জন্য যেমন তিনি 'কচুয়ে'চু' খেতেন তেঁয়ি । কারণ, আর-সবাই যখন মদ্যপান করতেন তখন হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঙ্কা চা খেতেন,—চীনারা, রুশোরা, কাবুলীরা যে রকম করে থাকে ।

বরমান যে মদ্যপান করেন সে-কথা হিটলারের অজানা ছিল না । বস্তুত বন্ধুকারের অনেকেই শেষের দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে সন্ধ্যাতে দৃষ্টিস্তা ভোলবার চেষ্টা করছিলেন । সখা হফ্মান যখন হিটলারকে এপ্রিলের মাঝামাঝি শেষবারের মত দেখতে আসেন তখন তাঁর জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে হিটলার এই মন্তব্য করেন ।

*

*

*

এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে বরমানকে ধরিয়া দিতে সাহায্য করা । তদুপরি বরমানের এই বঙ্গদেশে আগমন অসম্ভব । ধরা পড়লে ভারত সরকার তাঁকে পয়লা পেনেই জর্মনি পাঠিয়ে দিতে কোনো আপত্তি করবেন না । তিনি থাকবেন ঐ সব দেশেই যে সব দেশ আসামী বদলের চুক্তি জর্মনির সঙ্গে করেনি—অর্থাৎ নাৎসিদের প্রতি এখনো যাদের কিছুটা দরদ আছে । অবশ্য বরমান তাঁর প্রাপ্য শাস্তি থেকে নিষ্কর্ত পান সেটাও আমার উদ্দেশ্য নয় ।

আমার উদ্দেশ্য, এই সব চোদ্দ আর বাইশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন কাগজ-গদুলোকে যেন বঙ্গসন্তান চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস না করেন । বিশেষ করে যখন তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা প্রকারের উপদেশ দেয় ।

কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার

চার্চিল নারিক একদা বলেছিলেন, বিসমারকের পরবর্তী যুগে জর্মনিতে মাত্র একটি রাষ্ট্রবিদ (স্টেটসম্যান, রাষ্ট্রনির্মাতা) জন্মেছেন—তিনি কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার ।

এ প্রশস্তি আডেনাওয়ারের পক্ষে অবশ্যই আনন্দদায়িনী (এবং আমরাও চার্চিলের সঙ্গে একমত), যদিও এ তথ্যটি সর্বজনবিদিত যে স্বয়ং আডেনাওয়ার ইংরেজ জাভটাকে আদৌ নেকনজরে দেখতেন না ।

চার্চিলের মন্তব্যে কিন্তু একটা শ্বেলাঙ্গুলির রুঢ় ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে ।

তিনি বলতে চান, বিসমার্ক এবং আডেনাওয়ারের মাঝখানে রাজনীতির (স্টেটসম্যানশিপের) শস্যশ্যামল ভূখণ্ড নেই, আছে সাহারার মরুভূমি ।

অর্থাৎ বহু বহু বৎসর ধরে জার্মান দেশে রাষ্ট্রনির্মাতার বড়ই অভাব। বিসমার্কের জন্ম ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৮৯৮। যদি ধরা হয়, তিনি রাজনীতি সংগ্রামে নামেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তা হলে বলতে হয় প্রায় একশ' বছর ধরে জার্মানিতে একমাত্র রাষ্ট্রপিতা ছিলেন বিসমার্কই। জার্মানির মত চিন্তাশীল তথা শক্তিশালী দেশের পক্ষে এক শতাব্দীতে মাত্র একজন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা—এ যেন অবিশ্বাস্য। জার্মানি না কান্ট, হেগেল, কার্ল মার্কসের দেশ! তাদের পরিকল্পনা কেউই বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না?

এবং হিটলার?

এর উত্তর সুদীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষেপে সারি। যেরিউকটেটারের মৃত্যুকালে তাঁর দেশের অধিকাংশ ভঙ্গমস্তুপে পরিণত, যার সংগ্রামনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশেবিদেশে নিহত হয়েছে; যুদ্ধে বোম্বার্ড আক্রমণে আরো লক্ষ লক্ষ আহত রক্তাক্ত নরনারী চিৎকার করছে—তাকে নিশ্চয়ই অতিমানব, নরদানব সবই বলা যেতে পারে; শুধু বলা যায় না—রাষ্ট্রনির্মাতা, পতন-অভ্যুদয় বশ্চর্য পঙ্খর যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীর 'চিরসারথি' তাঁকে কিছুতেই বলা যায় না।

বিনষ্ট রাষ্ট্রের ভঙ্গমস্তুপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তাকে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রনির্মাতা বলা চলে না।

এমন কি কোনো রাষ্ট্রদর্শীও তিনি রেখে যেতে পারেননি যেটা ভবিষ্যৎ-শীঘ্রই মস্ময় করে তুলতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রদর্শীঃ—পররাজ্য জয় করে সে দেশের 'বর্বর' (উন্টেরমেন্‌স্) জনসাধারণকে দাসত্ব দাস রূপে পরিণত করে—যে সুপরিকল্পিত পৈশাচিক শোষণ-সংহার পদ্ধতি দর্শনে আনকল্ টম পর্যন্ত গোরশয্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হবেন—আপন দেশের বিলাসবাসনের জন্য অধিকতর শুল্করমাংস, সূক্ষ্মতর চীনাংশুক, অগণিত স্বতচ্চলশকট সংগ্রহ—সাঁতশয় বস্তুতান্ত্রিক জড়ত্বের চরম আরাধনা।

এ-প্রসঙ্গে তাই বলে নিতে পারি যদিও এটা সর্বশেষের কথা, হিটলার বারো বৎসরে যে জার্মানিকে বিনাশ করেন, আডেনাওয়ার তাঁর ১৯৪৯ ব্যাপী 'রাজত্ব'কালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। শুধু পুনর্নির্মাণ নয় এবং চৌদ্দ বৎসরও নয়, আডেনাওয়ার দশ বৎসরেই জার্মানিতে যে সুখসমৃদ্ধি গড়ে তুললেন সেটা হিটলারের ভঙ্গমস্তুপে দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে বাতুলতম আশাবাদীও কল্পনা করতে পারেনি। এবং বলতে কি, এই বাহ্য, তিনি দিলেন এমন ধন মার উল্লেখ করে খৃষ্ট একদা বলেছিলেন—শুধু রুটি খেয়েই মানুষ জীবনধারণ করে না। সে-কথা পরে হবে, আগেই বলেছি।

*

*

*

কলন^১ শহরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। আর কিছু না হোক পৃথিবীর সর্বত্রই

১ এখানে রোমান জাত একটা কলনি স্থাপন করে ও নেরোর (যিনি রোম পুড়িয়েছিলেন) মা, মহারানী (Colonia) Claudia Ara Agrippinensis-সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৮

Eau de Cologne জিনিসটি পাওয়া যায়, এবং আজকের দিনে ও দ্য কলন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্মিত হয়। কলন শহর যে 'কলন-জল'ের (Eau = Water, de = of, Colojne = Coloyne = Koeln) আবিষ্কারক তাও নয়, কিন্তু কলনের ও দ্য কলনই এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কলন-জল।

কলন জার্মানির অন্যতম বৃহৎ নগর। এর গির্জাটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। গম্বীর এবং মধুর উভয় রস এই বিরাট গির্জাতে সন্মিলিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত হতে গির্জার শিখরবয় পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নগরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার ওয়ারব্দগারমাইস্টার বা প্রধান লর্ড মেয়ার। কলন শহরের উপর তাঁর প্রভাব অসীম। বস্তুত তাঁকে কলনের 'রাজা' বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ভাইমারের পূর্ববর্তী যুগে কলনের লর্ড মেয়ার প্রতি পয়সে কাইজার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আডেনাওয়ারের জন্ম এই কলন শহরে। আইন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ শহরের লর্ড মেয়ারের দফতরে ঢোকেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ওয়ারব্দগারমাইস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে তাঁর আপন শহরের সেবা করেন। এ-রকম একাগ্র সেবা তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো মেয়ারই করেননি। ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেই তাঁকে সরাসরি ডিসমিস করে দেন।

আডেনাওয়ারের দীর্ঘ একানব্বই বৎসরের জীবনকে যদি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় তবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।

জার্মানি, হিটলার তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁদেরই কোতুহল আছে তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগবে, হিটলার এঁকে ডিসমিস করলেন কেন? নার্সিস আদোলফ যখন ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তখন আডেনাওয়ার তার উপর কি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি?

জীবনের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৩৩ অবধি আডেনাওয়ার প্রকৃত পলি-টিশিয়ান বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। লর্ড মেয়ারের পদ ছাড়াও তিনি কাইজারের রাজত্বে ও পরবর্তী ভাইমার রিপাবলিকে একাধিক সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কখনো রাইসটাগ বা জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য জনসমাজের সম্মুখে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। তিনি ক্যাথলিক সেন্টার পারটির সদস্য ছিলেন এবং সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর কিন্তু সেটা প্রধানত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে ও প্রখ্যাত কলন শহরের লর্ড মেয়ারের পদমহিমায়। এবং ক্যাথলিক সেন্টার পারটির প্রতি হিটলারের ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা।

এর Colony (Colonia) নাম দেয়। এই Colonia থেকে ফরাসী ইংরিজ Cologne, জার্মানে Koeln.

কিন্তু ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩ অবধি ক্ষমতালাভের জন্য যখন নার্সিস পার্টি শহরে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানে লড়াই চালাচ্ছে তখন যে-সব নার্সিসবিরোধী রাজনৈতিকদের নাম শোনা যায়, যেমন ফন পাপেন, হুগেনবুর্গ, ব্লাইয়ার, ব্রুনিঙ, ট্যালমান, টরগ্‌লার, শ্রোডার—এদের ভিতর আডেনাওয়ারের নাম নেই। ১৯৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীযুক্ত শাইরার ‘নার্সিস আন্দোলনের উদ্ভাস্ত’ সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন তাতে আডেনাওয়ারের নাম নেই।

অথচ আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু লোক—হিটলার যে ধর্মমাত্রকেই এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্মকে, জর্মনি টিউটন চরিত্রের সর্বনাশা শত্রুরূপে ঘৃণা করতেন সে তত্ত্ব তিনি কখনো গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।^২ হিটলারের করাল ছায়া যে ক্যাথলিক গির্জা ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে সেটা আডেনাওয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু, শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিক।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কলন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে; নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যখন ফরাসী সেনা জর্মনিতে ঢুকলো তখন সারা জর্মনির শিক্ষাদীক্ষার উপর নামলো দুর্ভিক্ষের অশ্বকার। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলন বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, লর্ড মেয়ারের সর্ব প্রভাব সর্ব কৃষ্ণ বিস্তার করে কন্-রাট আডেনাওয়ার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০ বৎসর পরে।

বন্ শহর কলনের অতি কাছে। বন্-এর বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। আডেনাওয়ার বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বন্-কলনের পথে রোনডরুফে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। এখান থেকেই তারো পরবর্তীকালে—হিটলারের পতনের পর—তিনি মোটরে করে রাজধানী বন্-এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য সমাধান করতে যেতেন।

সেই ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে, বস্তুত প্রায় ষাট বছর ধরে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।^৩ বন্-এর এত কাছে একটি

২ হিটলারের বিশ্বাস ছিল, ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নিবর্ণীয়া কাপুরুষের আশ্রয়স্থল খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপের সর্বনাশ করেছে, এবং এ ধর্ম ইয়োরোপে ছড়ানোর পিছনে রয়েছে ইহুদীদেরই (!) এক অভিনব কৌশল। আবার হিটলার মনে করতেন খৃষ্টজন্মের পূর্বে যে সব রোমান সৈন্য প্যালেস্টাইনে মোতায়েন ছিল খৃষ্ট তাদেরই কোনো একজনের জারজ সন্তান।

৩ ঐ সময়ে আমি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ও আডেনাওয়ারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সতীর্থদের কাছ থেকে বহু প্রশস্তিশ্রবণতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ খবরের কাগজে ও লোকমুখে এসে পেঁছত সেগুলো ১৯৩৩ পর্বন্ত ঘাচাই করে নেওয়া যেত। ঐ বছরে হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলাতে বন্-এর কিছুমাত্র দৃষ্টিস্তা হয়নি, কারণ বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আডেনাওয়ারের সখ্য ছিল অবিচল। বস্তুত উত্তর রাইন অঞ্চলের (বন্-কলন-ড্রাসেল্‌ডর্ফ) প্রায় সব রকমের কৃষি আন্দোলন তথা ক্যাথলিক ধর্মজীবন এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আডেনাওয়ার তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিটলারের জন্মভূমি যদিও অস্ট্রিয়ায়, তবু তিনি বেভেরিয়ায় ম্যুনিখ শহর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে। সেখানে বিরাট বিরাট মিটিঙে হিটলার লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তেন, রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থা করাতেন, এমন কি গদম্ খুন করাতেও তাঁর বাধতো না এসব পাঠক মানুই জানেন।

বেভেরিয়া প্রদেশের পরেই হিটলারের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তর রাইনের কয়লা ও লোহা ব্যবসার জায়গা রুর অঞ্চলে—এবং কলনের পাশে এই উত্তর রাইনের ড্রাসেল্‌ডর্ফ শহরে বিশ্বপ্রপাগান্ডা সরদার ডক্টর গ্যোব্লসের জন্ম। রুরের গা ঘেষে কলন শহর এবং এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নগর। গ্যোব্লস্‌ স্বভাবতই চাইতেন তাঁর বাড়ির পাশের কলন শহর যেন প্রভু হিটলারকে উৎকৃষ্ট আসন তৈরী করে দিতে পারেন—হিটলারের কাশী যদি হয় ম্যুনিখ তবে কলন হবে বৃন্দাবন।

কিন্তু বাদ সাধতেন আডেনাওয়ার। পূর্বেই বলছি, ওবার্‌বুল্‌গার-মাইস্টারের ক্ষমতা অসীম। তাই নামমাত্র আইন বাঁচিয়ে তিনি কলন অঞ্চলে এমন সব কলাকৌশল করে রাখতেন যে হিটলার এমন কি রাইনের ছেলে স্বয়ং গ্যোব্লস্‌ও সেখানে সন্নিবিধে করে উঠতে পারতেন না।

নাৎসি পার্টির ক্ষমতা সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সফল করতে বাধা দিয়েছিল প্রধানত দুইটি সংঘ : ক্যাথলিক এবং দ্বিতীয়ত প্রটেস্ট্যান্ট যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রটেস্ট্যান্টদের তুলনায় শতগুণে সংঘবদ্ধ এবং পোপকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। হিটলারও বার বার তাঁর সান্সোপাক্সকে বলেছেন, 'ঐ ক্যাথলিকদের সম্মুখে চলো—প্রটেস্ট্যান্টরা এমনি-তেই টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের খানখান করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়।'

প্রেসের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার-বৈরীদের সম্বন্ধে কোনো পাকা খবর পাওয়া যেত না। যুদ্ধের পর শ্রীযুত ভাইমার আডেনাওয়ার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। সেখানা যোগাড় করতে পারিনি বলে আমার জানা তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই করে নিতে পারিছি নে। বিশেষ করে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত আডেনাওয়ার গোপনে নাৎসিদের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলেন সে-সব খবর নিশ্চয়ই এই বইয়ে আছে। আডেনাওয়ারের মৃত্যুর পর থেকে কলন রেডিয়ো মাঝে মাঝে ঐ বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। এ প্রবন্ধ আমি তার সাহায্য নিয়েছি।

কলন শহরে পোপের অন্যতম আর্চবিশপের বিরাট প্রতিষ্ঠান। আডেনা-ওয়ার সেখানে সুপ্রিম লর্ড মেয়ার। ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব—যদিও, পূর্বেই বলেছি, তিনি সে রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে ভোটমারে কখনো নামেননি। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে ম্যুনিচসিপাল বা কর্পোরেশন পলিটিক্সে। ক্যাথলিক সংগঠনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি নাৎসিদের প্রচারকর্মে বাধা দিলেন কলন তথা উত্তর রাইনের সর্বত্র। অথচ হিটলার তাঁরে ধরা-ছোঁওয়াতে পান না, কারণ তিনি রাজনৈতিক কোনো দলের নেতা, এমন কি চারআননী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় কোনো মেম্বারও নন। তিনি যদি ভোটমারে নামতেন তবে তাঁকে ভোটে হারিয়ে বিপর্যস্ত অপদম্ব করা যেত। নাৎসি ডন কুইক্সট তলওয়ার হানবার মত ড্র্যাগন খুঁজে পায় না—পায় উইন্ডমিল!

গ্যোবল্‌স্‌-এর প্রচারকর্মের একটা প্রধান উর্বরা জমি ছিল ইশ্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি। কলনের অধিকাংশ শুল্ক ক্যাথলিকদের তাঁবুতে—সেকুলার ভাইমার রিপাবলিক জর্মনির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করে তুলতে পারেনি কিংবা হয়ত সত্য সত্য তা করতে চায়নি—সেখানে আডেনাওয়ারের ধর্মবল অর্থবল দুইই রয়েছে। আর যুনিভারসিটির তো কথাই নেই। সোয়াশ' বছরের হারানো মানিক তার বিশ্ববিদ্যালয় ফের ফিরে পেয়েছে—আডেনাওয়ারের তপস্যায়, তখনো পুরো দশ বছর হয়নি। এটাকে কলনবাসী বাঁচিয়ে রাখবে সর্বপ্রকার কটুরপছীর র‍্যাডিকাল ছোঁয়াচ থেকে। গ্যোবল্‌স্‌ কলনের কলেজে কক্ষে পেতেন না।

ওদিকে বেকার সমস্যা দিন দিন তার চরম সংকটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে—এবং সব চেয়ে বেশী মার খাচ্ছেন রুর কয়লাখনির শ্রমিক দল। তাই দেখা যায়—হিটলারের খাস পাইলট তার পুস্তকে এর বর্ণনা দিয়েছেন—৪ হিটলার প্রচারকর্মের জন্য প্লেনে উড়ে যাচ্ছেন রুরের এসেন শহরে। পাশেই বিরাট কলন। কিন্তু তিনি সেটি বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বন্-এর কাছে তাঁর প্রিয় গোডেসবের্গে নামক গণ্ডগ্রামে (এখন শহর এবং এখানেই পরবর্তী যুগে হিটলার প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন চেম্বারলেনের সঙ্গে—চেকোস্লোভাকিয়ার সুভেটেন বাবদে)। নিশ্চয়ই হিটলারের এই কলন বজ্রনে প্রতিবারই গ্যোবল্‌স লজ্জায় মাথা নিচু করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্য এইটুকু—এসেন তথা রুর তাঁর প্রতিবেশী, সেখানে তিনি প্রতিবারেই হিটলারকে রাজাসনে বসাতেন।

*

*

*

হিটলার চ্যান্সেলার হয়েই আডেনাওয়ারকে ডিসমিস করলেন। এটা হবে আমরা জানতুম। কারণ নাৎসিরা বহুদিন ধরে তাঁর নিম্না-কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার একটা : ‘আডেনাওয়ার তনখা টানেন বিরাট (রীজে) ! তাঁর মাইনে ঢের ঢের কম হওয়া উচিত।’ এবং সব চেয়ে মজার কথা, হিটলার

যাঁকে লড' মেয়ার করলেন তিনি তাঁর মাইনে এক পাই তক না কমিয়ে টানতে লাগলেন আডেনাওয়ার যে তনখা নিতেন সেইটেই। এই মহাশয়ের নাম ছিল 'রীজে' (বাঙলায় আমরা বলব 'বিরাট' বাবু)। তখন কলন-বন্-এ একটা শিবরামীয় পান্ চালু হল—'আডেনাওয়ার নিতেন বিরাট তনখা ; এখন (মিস্টার) বিরাট নিচ্ছেন আডেনাওয়ার-তনখা !'

*

*

*

হিটলার কি ভাবে জর্মণিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল যে দেশের সর্বনাশ, সে সত্য আডেনাওয়ার দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন কিন্তু শাস্ত-সমাহিত স্বভাব-ও আচরণ সম্পন্ন আডেনাওয়ার জানতেন, চীনা ঋষি লাওৎসের মতই জানতেন, জর্মণ-নিয়তি রহস্যাবৃত তারই কোনো এক মানববুদ্ধির অগম্য 'কারণে'। জর্মণির উপর দিয়ে যে টরনাডো বঙ্গামুক্ত করেছেন, সে যেন

“লক্ষ লক্ষ উম্মাদ পরাগ বিহগত বন্দীশালা হতে

মহাবল্ক সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে”

তার সামনে দাঁড়ালে সেটাকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তিনিও মহাশুন্যে বিলীন হবেন। এটা ফরাসী সম্রাটের 'আপ্রে মোয়া ল্য দেলুজ' ('আমি মরে যাওয়ার পর বন্য') নয়, এটা 'দেলুজ পূর শাকা আ ল্যাসত' ('বন্য এখনই, এবং সবাইকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, কহাঁ কহাঁ মল্লুক' !)।

বরষ বন্যার পর ফের-ঘরবাড়ি তুলতে হবে, খেতখামার করতে হবে—শিবের তাণ্ডব শেষ হলে অম্পর্গের আবাহন।

পরাজয় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় হিটলার ততই অবিচারে, নির্বিচারে—শত্রুজন, নিরপেক্ষজন, এমন কি মিত্রজনকেও 'মরণ-থানায়' (কনসান্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠাতে লাগলেন—হ্যাঁ, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে, আগামেমন্‌ তাঁর প্রিয় কন্যা এফিগেনিয়াকে দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিলেন—কিন্তু আডেনাওয়ারের অদৃষ্টে 'মরণ-থানার' দুর্দৈব লেখা ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে কিছুদিন কারাগারে, পরে তাঁর আপন গৃহে নজরবন্দী করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তিনি শত্রুমিত্রনির্বিণ্ণে এতই অসংখ্য জনের উপকার করেছিলেন যে তাঁরা কলাকৌশলে ছলে (হিটলারকে) বলে আডেনাওয়ারকে কারামুক্ত করেন।

“সাক্স হয়েছে রণ,

অনেক যুদ্ধিয়া অনেক খুঁজিয়া শেষ হল আয়োজন”

“The fight is ended !

Cries of loss bewilder the sky”

১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্মণি 'বে-এক্সয়ার' আত্মসমর্পণ করলো। ঐ বছরেই জুলাই মাসে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্টিভেন স্পেন্ডারকে ব্রিটিশ সরকার পাঠালে জর্মণিতে, সেখানকার ঝড়তিপড়তি ইনটেলেকচুয়েলদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে খবর নিতে। সে-কর্ম সমাধান করে তারই বিবরণী তিনি

প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপীয়ান উইটনেস' নামক পুস্তকে।*

বীভৎস বই। কলনের রাস্তার পর রাস্তা, দৃষ্টিকে একটি মাত্র বাড়ি নেই—
খব্দসমুদ্র, ভগ্নসমুদ্র। তার তলায় এখনো হাজার হাজার মড়া পচছে গলছে।
শহর-জোড়া দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একরকম ক্ষুদ্রে সবুজ পোকা
এই সব হাজা-পচা লাশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং শহরময় এমনই ঘন স্তরে ছেয়ে
আছে যেন মনে হয় লন্ডনের ধূয়াশা। হাত দিয়ে মূখের সামনে থেকে তাড়াতে
গেলে মুখে লেগে গিয়ে পিছলে আঠার মত চোখেমুখে সেঁটে যায়।

লড়াইয়ের শুরুরূপে কলনে বাস করতো প্রায় আট লক্ষ লোক। তারা ক'
হাজার বাড়ি, ভিলা ক্যাটে বাস করতো তার হিসেব স্পেন্ডার দেননি। শূন্য
বলেছেন, মাত্র তিনশ খানা (!) তখনো বাসের উপযোগী। "Actually there
are a few habitable buildings left in Cologne, three hundred
in all (!)"

এ শহর তথা গোটা দেশের আর আর শহর গড়ে তুলবে কে, কারা ?

দৃষ্ট হোক শিষ্ট হোক যে-সব নার্সি একদা নরওয়ে থেকে ইটালি, আত-
লাস্তিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত অধিকার করেছিল তারা কৃতিবদ্য, করিৎকর্মা,
অভিজ্ঞ—নির্মাণ-ধ্বংস উভয় কর্মেই সিঁধহস্ত। তাদের কিছু মারা গেছে,
অধিকাংশ মিত্রশক্তির শিবিরে শিবিরে বন্দী, কিছু পলাতক, অনেক আন্ডার-
গ্রাউন্ড।

হিটলারের বৈরীপক্ষের অধিকাংশ অন্যলোকে। হিটলার তার ব্যবস্থা করে
গিয়েছিলেন। আডেনাওয়ার গোত্রের নির্মাণতৎপর নেতা অতিশয় বিরল,—
মুন্স্টমেয়।

আডেনাওয়ার ভগ্নসমুদ্রের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একদা চার্চিল যেরকম
লন্ডনের ভাঙাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন—যদিও সে বিনাশ কলনের
সহস্রাংশও ছিল না।

এখানে আমাকে একটি দীর্ঘ উদ্ঘৃতি দিতে হবে। এটিপড়ে নিলে আডেনা-
ওয়ারের চরিত্রগুণটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট রেখায় ধরা দেবে। বিশেষত স্পেন্ডারের
মত লোক যখন এ ছবিটি এঁকেছেন।

দুর্দৈর্ঘ্য অন্তর্বাদ করে লাভ নেই, এবং বিবেচনা করি এ প্রবন্ধের পাঠক অন্তত
আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানেন।

এটা যুদ্ধবিরতির দু'তিন মাস পরের কথা। স্পেন্ডার বলছেন :—

Adenauer is a prominent Catholic in the Rheinland, who
was Mayor of Cologne before Hitler came to power. It is

৫ Stephen Spender, European Witness, 1946. মাসথানেক
পূর্বে যখন কেলস্কারি-কেজা বেরলো যে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ "Encou-
nter" কাগজকে গোপনে অর্থসাহায্য করে, তখন তিনি কাগজের সম্পাদকপদ
ত্যাগ করেন।

now with a special personal emotion that he takes up the restoration of that Cologne which was a broken trayload of crockery when it was taken out of his hands. When he was last Lord Mayor he was in his fifties, he is now a man of seventy. He has an energetic, though some what insignificant appearance; a long lean oval face, almost no hair, small blue active eyes, little button-nose and a reddish complexion. He looks remarkably young and he has the quietly confident manner of a successful and attentive young man.

‘There are two aspects of reconstruction which we consider of equal importance,’ he said, ‘one, the material rebuilding of the city. But just as important is the creation of a new spiritual life. You can’t have failed to notice that the Nazis have laid German culture just as flat as the ruins of the Rheinland and the Ruhr. Fifteen years of Nazi rule have left Germany a spiritual desert, and perhaps it is more necessary to draw attention to this than to the physical ruins, for the spiritual devastation is not so apparent. There is hunger and thirst now for spiritual values in Germany. This is especially true of Cologne because here, in the past, we have had such a significant spiritual life and activity. Here it is possible to-day to do a great deal. Only the best should be our aim. We should have in Cologne the best education, the best books, the best newspapers, the best music.’

The point that Adenauer came back to again and again—his whole position rested on it—was that the Germans were really starving spiritually, and that it was therefore of the utmost importance to give their minds and souls some food.

এ বই যখন আমি পড়ি তখনো আমরা স্বাধীনতা পাইনি ।

সে দুর্দিনে কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, দশ-বারো বৎসর যেতে না যেতেই তিনি কলন তথা সারা জার্মানিতে এমন সুখ-স্বচ্ছন্দা, শিশুপান্নতি, আত্মচর্চা, ধর্মজীবনে নব জাগরণ এনে দেবেন, যে হিটলার তাঁর গোরবের মধ্যগগনেও সুস্বাদু সাংসারিক দিক দিয়েও এতখানি উন্নতি করতে পারেননি ?

কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এ তত্ত্বটা আডেনাউয়ার জানতেন বলেই স্পেন্ডারকে বিদায় দেবার বেলা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ‘The imagination

has to be provided for.

কবিগুরুর কথা মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বার বার বলেছেন, ‘আম্বার দিকটা অবহেলা করো না।’ অধিকাংশ রাজনৈতিকরা তখন মূঢ়চকি হেসে বলতেন, ‘আগে তো ইংরেজকে খেদাই।’

ইংরেজ তো বহুকাল হল গেছে। তবে ?

আসলে আমাদের ‘imagination,’ চিরন্তন, আত্মা দেউলে।

এর পরের ঘটনাবলী হালে কাগজে কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে সারি।

যুদ্ধশেষের পরই মার্কিন সেনাপতি আডেনাওয়ারকে কলনের লর্ড মেয়ার করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা কলন ইংরেজের হাতে দিয়ে সরে পড়ল। যে-ইংরেজ সেনাপতির হাতে কলনের ভার পড়লো তিনি ছিলেন একটি আন্তর্গতমুখ গাড়ে। আডেনাওয়ারকে নগর পুনর্নির্মাণ বাবদে এমন সব সর্বনেশে আবাস্তব জঙ্গীলাটী অর্ডার দিতে লাগলেন যে পরাজিত জর্মনির নগণ্য সরদার আডেনাওয়ার বিজয়মদে মত্ত ‘প্রভুর’ আদেশ পালন করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এই নয়া হিটলার তখন তাঁকে শ্রেফ ডিসমিস করে দিলেন। বিবেচনা করি সিপাহী বিদ্রোহের আমল হলে তাঁকে বাহাদুর শাহের মত বাকী জীবন জেলে কাটাতে হত !

অনেকের বিশ্বাস, সেই যে আডেনাওয়ার ইংরেজের উপর চটে গেলেন, তার পর তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মার্কিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে ‘কাট্‌হিম্‌ডেড’,—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে, তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনাওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে স্বীকার করবে ?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃত্বাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বন্ধু গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দৃষ্ট দ্য গল আলিঙ্গন করলেন বন্ধু আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মম্বাহত হল। জর্মনি ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু’দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মনি জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ-দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্ভ্রান্ত—অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জার্মানি থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জার্মানির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনো লক্ষ্মীছাড়া দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘৃণ্ড-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্বেচ্ছা তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াস্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জার্মান ইতিহাসে বলা হয়, ‘আডেনাওয়ার এ্যারা’—‘আডেনাওয়ার যুগ’।

এবং এ যুগের এখনো শেষ হয়নি। বিস্ময়কে বিভাণ্ডিত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন; ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মদর্শন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ড লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী কীজিংগার আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, ‘কয়েক দিন পূর্বেও রোনডারফ্ গ্রামে যান, “বৃদ্ধের” কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।’^৭ এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জার্মানি সম্বন্ধে দৃঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, ‘আজ যে ধূলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।’

*

*

*

৬ জার্মানগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় ‘ড্যার আলটে (ওল্ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যান্সেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয়, ‘ড্যার ডিকে’ (ফ্যাট ম্যান)।

৭ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫:৫১ মিনিটে। যে জার্মান বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অব্যাহত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬:৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সম্ভ্রম কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বৃষ্টি হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যাবকে, গার্স্টেনমায়ার তথা চ্যান্সেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোয়ের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে :—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মীকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ক্রাস্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্ষাদ্বার সঙ্গে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি :—

দ্বিখণ্ডিত জর্মীকে একত্র করতে পারেননি।

*

*

*

এস্থলে আমি শূদ্ধ দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো :—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের ‘কুপায়’।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, ‘আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মীনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরো বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনো তাঁর ভুল হত না।’

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বর্ণিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বর্ণিত করেননি।

যে উচ্চাকাংক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনোই কোনো প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাংক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবীর মূল্যও দিতে জানেন। ‘রাজকাষ’, ‘সমাজসেবা’, ‘রাষ্ট্রের আহ্বান’—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা শিশু, বৃদ্ধ, আতুর-অকর্মণ্য জনকে অবহেলা করে তাদের আদর্শবাদ-এর অস্থিমজ্জা তাদের আপন স্বার্থপরতার উচ্চাকাংক্ষা দিয়ে গঠিত।

শিষ্যসম্ভাব্য হয়ে প্রভু যীশু ইহজীবনের উচ্চতম আদর্শ, পরজীবনের চরম কাম্য নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, তখনো তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে শিশুরা তাঁর কাছে আসতে চায়। আদেশ দিলেন—‘শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।’

শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “Who is the greatest in the Kingdom of heaven?”

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

*

*

*

হিটলারের আত্মহত্যার কাহিনী আমি অন্যত্র লিখেছি। তাঁর আত্মহত্যার পর কি হয়েছিল সেটা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়জনক বা কোতূহলোদ্দীপক নয়, বিশেষত নরদানব মারিটিন বরমান তার সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন এবং এখানেও আমি মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো যেটুকু আডেনাওয়ারের ব্যক্তিগত হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

হিটলার যে সময়ে আত্মহত্যা করেন (বেলা ১৫/৩০।৪৫, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫), সে সময়ে রুশবাহিনী মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে বৃহৎ নির্মাণ করেছে। এ বৃহৎ ভেদ করে মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছবার চেষ্টা করেন তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সান্সোপাস এবং কর্মচারীবৃন্দ যারা শেষ মূহুর্তে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ত্যাগ করেননি। এদের ভিতর ছিলেন সেক্রেটারি বরমান, দুই মহিলা স্টেনো, পাচিকা, খাসচাকর লিঙে, দেহরক্ষী-দল, সার্জন, শোফার ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের অন্যতম হিটলারের খাস পাইলট বাওর—সৈন্যবাহিনীতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল জেনারেলের। ইনি পালাবার সময় শুধু যে ধরা পড়েন তাই নয়, মেশিনগানের গুলিতে একথানা পা এমনই জখম হয় যে পরে সেটা কেটে ফেলতে হয়।

দীর্ঘ দশটি বৎসর রাশার খ্যাত কুখ্যাত বহু প্রকারের জেল, সেল, বন্দী-শিবিরে অবর্ণনীয় কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করার পর ইনি মদুস্তি পান। পূর্বেই বলেছি দেশে ফিরে একথানা বই লেখেন যার নাম, “হিটলার’জ পাইলট”। পূর্ণ দশটি বৎসর বাওর এবং অন্যান্য জর্মেন বন্দীরা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে সক্ষম হন তার বর্ণনা দেবার মত কম্পনাশক্তি, স্পর্শকাতরতা, কলমের জোর আমার কিছুই নেই। যে নিপীড়নে মানুষ হাঙারস্ট্রাইক করে, ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যার চেষ্টা দেয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বাওর। আমার কাছে যেটা নিদারুণতম বলে মনে হয় সেটা—পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের তমিষ্র অন্তহীন রজনী—“এ বন্দীদশা থেকে ইহজন্মে আমার মদুস্তি নেই”।

এবং আমার মনে হয়, তার চেয়েও ‘কণ্টের বিকৃত ভান ট্রাসের বিকট ভঙ্গি’ যদি কিছু থাকে তবে সেটা ঐ ‘অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা’! কি সে ছলনা? মাঝে মাঝে খবর গুজব রটে বন্দীদের হয়তো বা মদুস্তি দেওয়া হবে। আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে ক্ষণভরে—আবার আবার সেই সুদীর্ঘ নিরস্ত্র অমানিশা।

জর্মেনিতে চিরকালই দুটি দল। একদল পূর্বপন্থী—রাশার সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে। আডেনাওয়ার পশ্চিমপন্থী, রুশবৈরী। বিশেষত যে রুশ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী জর্মেনদের দশ বৎসর পরেও কিছুতেই মদুস্তি দেবে না।

রুশ ‘ঘোড়া-বিক্রয়ী’র ব্যবসা করতে চায়। যুদ্ধবন্দী বাওর ইত্যাদি ‘ঘোড়া’র বদলে সে চায় আডেনাওয়ার কতক রুশকে রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃতিদান,

এবং পূর্বে জর্মণিকেও সে পশ্চিম জর্মণির সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে দেবে না। হয়তো এটা অন্যায্য নয়। হিটলার রুশ দেশে যা করে গেছেন তার বদলে এ তো সামান্যই। কিন্তু আডেনাওয়ার তো আর হিটলারের প্রিয়পাত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস রূপে পিতার সিংহাসনে বসেননি যে হিটলারের সর্ব অপকর্মের জন্য তার 'মূল্য' দেবেন। বরং হিটলার তাকে করেছিলেন লাঞ্ছিত, অপমানিত কারারুদ্ধ।

এবং তার চেয়েও বড় পরিহাস—যে নাৎসি পারটির মারফৎ তিনি আডেনাওয়ারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন সেই পারটিরই বহু গণ্যমান্য সদস্য, জাঁদরেল, অ্যাডমিরাল, হিটলারের আপন বয়স্যসখা রয়েছেন এই যুদ্ধবন্দীদের ভিতর। আডেনাওয়ারকে নতিস্বীকার করতে হবে এদেরও মৃত্তির জন্য! এবারে শুনুন বাণের কি বলছেন: “But the-then the much-abused (অর্থাৎ নাৎসি কর্তৃক অপমানিত—লেখক) Adenauer came to Moscow, and our camp was wild with rumours. Our hopes rooketed from zero to feverpoint—and then fell back again This Latter was when Bulganin publicly proclaimed that we were the scum of the earth, and that our crimes had robbed us of all human semblance We cautiously but closely followed the course of Adenauer's hard-fought negotiations, and we could sense that even the Russians respected the determination and integrity of the old man,” (‘বৃদ্ধ’ সাদরে বলা হল—লেখক)

সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কে? একদিন সত্য সত্যই খবর এল বাণেরাদি অনেকেই মৃত্তিলাভ করবেন। একদল বন্দী যাবেন মস্কো থেকে পশ্চিম জর্মণির ম্যানিক—যেখানে বাণেরের মা-বউ আছেন। এ মৃত্তি-যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাণের বলছেন, ‘the memory of that journey is like a film that keeps breaking off.’ প্রতিটি জর্মণ গ্রামের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় উল্লাসে উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে ট্রেনের দিকে, বাচ্চাদের হাতে রঙিন ফান্সের জ্বলন্ত মোমবাতি, গির্জায় গির্জায় চলেছে অবিরত হর্ষোল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি। নাস'রা ছুটে আসছে খাবার নিয়ে—

থাক্। আমার কলম অতি সাধারণ; এসবের সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন যাদের লেখনী অসাধারণ, কিংবা বাণেরের মত লোক যারা লেখক নন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা আছে।

এবং এর করুণ দিকটা বাণের চেপে গেছেন। যেসব পিতা মাতা জায়া এসেছিল আপন আপন আত্মজনের প্রত্যাশায়—যদিও তাদের বলা হয়েছে যে, সেসব আত্মজনের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, কিংবা মিসিং, কিংবা মৃত্তি পাবে কিনা স্থির নেই—এবং যারা ফিরেছে তাদের নাম উচ্চকণ্ঠে পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন বুকুলো তাদের আত্মজন ফেরেনি, তখন—।

আডেনাওয়ারের কীর্তিকলাপ একদিন হয়তো বিশ্বজন ভুলে যাবে, কিন্তু বহু বহু জর্মন পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় স্মৃখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে ? যার অবশ্যম্ভাবী গোয় ছিল স্মৃদুর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারান্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মূছে দিল জননীজায়ার আঁখিবারি !

জুন, ১৯৬৭ ॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ করতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে ‘২’ অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম । তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওঁদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমা-বিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অশ্ববিশ্বাস, ভাস্কর্যের কুমড়া গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ । তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছশ্মবেশ । নজরুল ইসলাম তখন সবে ধুমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন । বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনাবিচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বানাবতার । তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ’র প্রতি আসক্ত । এখানে আরো একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন । বারনারড শ’ ছিলেন প্রতিমা-বিনাশী । তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওল্ড টেসটামেন্টের দেবতাগুলিকে তার ডান্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাস্বত ভগবানকে ।

প্রমথনাথ তাঁর ডান্ডা—নবকেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে । শাস্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না ।

এটা এল কোথা থেকে !

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অশ্বস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কতাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর ‘উষ্মা’ । এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায় । এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদরস্ত—কঁধে ক্যামেরা ঝোলানো ।

এদেরই মূখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে :

‘মতভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে

কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে !’

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল ; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

‘আমি একটা উচ্চ কবি, এমনিধারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়্যাগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ !’

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দ্বারে থাক্ । তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত । বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা । আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন ।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অশ্বস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন । এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দৃর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গদ্যগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অথবা কটুবাক্য শুনতে হল । ইরাণী কবি তাই বলেছেন :

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শূকপত্রে, আদ্রপত্রে তফাৎ কিছ্ না করে ।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান । আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সেন-সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

কিস্তি এহ বাহ্য । অশ্বস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি । কারণ এদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফেতারা, শ’র ভাষায় উয়েল শেভ’ড্ এ্যাণ্ড উয়েল সোপ’ড্, আসতেন আমাদের মত ডিমিটারিবাসী নিরবীহদের উপর ফপরদালালী করতে । তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসম্ভবন দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বাসিত হয় সে রসে তাঁরা বিমগ্ন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সদর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সম্ভবনজনিত রসসৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত । এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্রাফমাষ্টার । তিনি যে অশ্বস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, “পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই ‘মরি মরি’টা কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না ।” আমি বিস্ময়ে নিবাক । অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নতুন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরাঙ্গি-মাকার্ গ্র্যাডুয়েট জানে না ? আমার তো মনে হত, এস্থলে ‘মরি মরি’ ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না ।

কিস্তি বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড় । আগ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না । তাঁকে স্বপ্নের সম্মুখীন হতে হত আগ্রমের ভিতরকার অশ্বস্তাবকদের নিয়ে । বিশেষ করে বিচার-সভায় অর্থাৎ আগ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে ।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত ? একুশ-বাইশের মত । এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না । বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট । একবার ভেবে দেখলেই হয়, আগ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ একই পর্বেজিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শূনে কর্তৃপক্ষ সম্মুখ, ব্রাহ্মণ

শিষ্য এই অগ্রাঙ্কণ গুরুদ্বার পবধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা ! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পেঁছলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে । ইতি-মধ্যে মোলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অগ্রাঙ্কণ রাত্রে সকলের সঙ্গে একই পণ্ডীকিতে ভোজন করে গেছেন ।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সম্মানে । সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, ‘এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত — এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না’ ; তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক । মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল তা নয়, সেও ইনোভেশনকে ভরায় এবং তাকে বলে ‘বিদ্যা’ ও, কিন্তু ইসলাম মাত্র ১৩০০ বছর পুরনো বলে অতখানি লোকাচার দেশাচারের দোহাই দেয় না ।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন এই ট্র্যাডিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির দৃশ্যমন । বিচার সভা তথা অন্যান্য স্থলে তিনি প্রিসীডেন্সের দোহাই শুনতে চাইতেন না । তাঁর বক্তব্য—এবং সেটা সব সময়ই উত্তোজিত কণ্ঠে, পঞ্চমে, তবুপরি তাঁর কণ্ঠ-স্বরটি ঠিক আশ্চর্য করণীয় খানের মত নয়—শুনুন আমার মনে হত, তাঁর নীতি ;—নূতন সমস্যা যখন এসেছে তখন তার নূতন সমাধান খুঁজতে হবে—এবং যুক্তিবাদী প্রয়োগ করে—পূর্বে হয়নি, তাই এখন হবে না। এটা কোনো কাজের কথা নয় । অবশ্য তিনি যে সব সময় ‘রেশনালিটি এবাভ্ অল’ সচেতন ভাবে ভলভেরের মত নীতিরূপে গ্রহণ করতেন তা নাও হতে পারে । এমন কি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতাও তিনি করেছেন । এই নিয়ে বোধ হয় গুরুদ্বীপে মনোমালিন্যও হয়েছে । তবে নিশ্চয় চিরস্থায়ী তো নয়ই, দীর্ঘস্থায়ীও নয় ।

প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক । শাস্তিনিকেতনে যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলেজ স্থাপিত হল—সাধারণ জন একেই বিশ্বভারতী বলে, যেন গোড়ার ইন্সকুলটি বিশ্বভারতীর সোপান নয়—তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বাচার্যদের । তাঁরা এসে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইণ্ডলজি)—চীনা, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না, এবং লাতিন, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা চর্চা । সবাই সেই দয়ে মজলেন । বাঘা বাঘা পিণ্ডিত যেমন বিধু শাস্ত্রী, ক্ষিতী শাস্ত্রী, সাহিত্যিক অমিয় চক্র, এস্তেক ক্ষিতীমোহনের সহধর্মিণী ‘ঠানদি’—কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ চীনা, কেউ বা তিব্বতী শিখছেন মাথায় গামছা বেঁধে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নোটবই হাতে নিয়ে লেভির ক্লাসে শিখছেন একাক্ষরপারমিতার ঠিকুজি আর অহিবদ্বনিয় সংহিতার কুলজি ।

শুধু গ্রীপ্রমথ নিশ্চল নির্বিকার । তিনি বেঙ্গলি লিতেরাতোর পার একসেল্লাস (litterateur par excellence) বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক । তাঁর ‘কোন প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন’ ? এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘাঁটতেও তিনি নারাজ । হরিবাবু ইন্সকুলে যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন তারই প্রসাদাৎ তিনি কালিদাস শব্দক পড়ে নেবেন খন । শুনেনিহি লক্ষ্মীয়ার খানদানী ঘরের ছেলেকে

উদ্‌ ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বলতে দেওয়া হয় না—পাছে বিজাতীয় ভাষা বলতে গিয়ে উদ্‌র তরে বিধিনির্মিত তার মূখের ডোল অন্য ধর্মের খাতিরে এডজাসটেড হয়ে বিকৃত হয়ে যায় !

বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে (কলেজকে) এহেন নিরুৎসাহ বয়কট করার পিছনে বিশদীকার গ্রন্থ-কন্দরে সেই ‘বিদ্রোহ’ ভাব ছিল কিনা হলফ করে বলতে পারবো না ।

কিন্তু বি. এ. এম. এ. তো পাস করতে হয় ; নইলে গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি প্রকারে ?

অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি কলকাতার কলেজে ঢুকলেন । তাঁর কলেজ-জীবন সম্বন্ধে আমি বিশদবিসর্গ পর্যন্ত জানি নে । এই মর্মান্তিক অধ্যায় তিনি বোধ হয় তাঁর জীবন-পর্ধি থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন । তবে আমি নিঃসন্দেহ, প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠান-প্রসাদাৎ তিনি তাঁর কলেজ-জীবনের ন’সিকে কাটিয়েছেন চায়ের দোকানে, মেসের রকে এবং ইহলোক পরলোকের সর্ববিশ্ববিদ্যালয়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্য অভিসম্পাত অনবরত দিতে দিতে । এবং আমি তার চেয়েও নিঃসন্দেহ, এম. এ. পাস করার পর তিনি বঙ্গভাষাসাহিত্য ও তর্জিত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ার্জিত—সাতিশয় বিতৃষ্ণা ও চরম জুগুৎপাসহ অর্জিত—‘জ্ঞানগম্য’ শেষনাগের মত, প্রাগুক্ত অহিবর্ধনয় সর্গহতায় অহির বাৎসরিক স্বকবর্জনন্যায় অক্লেশে পরম পরিতোষ সহকারে ত্যাগ করেছেন—চিরকালের তরে । লোকে যখন শূদ্রোয়, কালচার কি—উত্তরে গুণীজন বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়লব্ধ ‘জ্ঞানগম্য’ বিস্মৃত হওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই কালচার । কিন্তু, প্রমথনাথের কালচার অত্যন্ত কনসানট্রেন্টেড—নির্ধাসেরও নির্ধাস । মাত্র একবার, তাও অস্বস্তি ডেসটিল করা গোড়ী (rum) বা মধবী (mead, meth) খেয়েই মানুষ হয় গড়াগড়ি দেয় নয় ল্যাম্পপোস্ট ধরে চুমো খায়—যেন লঙ লস্ট ব্রাদার । রাজা জহানগির খেতেন ‘ডবল ডেসটিলড্‌ এরেক’ । প্রমথনাথের রুয়োরিতে পাক বড় কড়া—শতগুণে কড়া ।

কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কি হয় ?

শ’র ‘কৃষ্ণা’ও একদিন হৃদয়ঙ্গম করলো, ‘এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি ধূপস-ধাপস মারাতে’ কোনো তত্ত্ব নেই । নিছক ‘বর্বরস্য শক্তিকর’ । প্রমথ তাই প্রমথেশের মত ধ্যানতান্ডবে সম্মেলন করেছেন ।

কিন্তু বিদ্রোহী থাকবেই ।

কেন ?

প্রমথর প্রিয় কবি গেলি । তাঁর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড । তিনি দেবাদিদেব দ্যোঃ পিতর, জুর্পিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বর্গলোক হতে অগ্নি নিয়ে এসে মানবসন্তানকে উপহার দেন—যার জন্য তাবৎ সভ্যতাসংস্কৃতির সৃষ্টি । প্রমথগণ ধূর্জটির অনুচর বা ‘ইয়েস-মেন’ বটেন কিন্তু প্রমথগণ অগ্নিবাহ রূপেও পরিচিত—এঁরা মরীচির পত্ন ও সন্ত পিতৃগণের প্রমথ । তাই প্রমথ অগ্নির পত্ন । অপরাধগ্রীক পদ্রাণে আছে প্রমিথিয়ুস

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—১৯

নলের (reed,—এবং স্যাকরারা এখনও নল ব্যবহার করে, তথা অগ্ন্যস্ত্র অর্থে নালাস্ত্র, নালিকও ব্যবহৃত হয়) মাধ্যমে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন। এবং আমাদের কাহিনীতে আছে, নলরাজ ইশ্বন প্রজ্ঞালাভে সূচত্বর ছিলেন।^১ এবং এই নলের বিরুদ্ধে দেবতার। যে-রকম লেগেছিলেন (প্রমিথিয়ুসের বিরুদ্ধে জুপিটার) অন্য কারো বিরুদ্ধে না; আমার পুরাণাদির জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই শপথ দিতে পারছি না, অন্য কোনো মানবীর স্বয়ংবরে স্বয়ং দেবতার। সপত্নরূপে অবতরণ করেছিলেন কিনা—দময়ন্তীর বেলা যে রকম করেছিলেন। এবং নলের অন্য নাম প্রমথ।^২

প্রাচীন গ্রীকেরা প্রমিথিউস শব্দের অর্থ করতেন : পূর্বে (প্র)+মতি, চিন্তাকারী (methe), কিন্তু অধ্যাপককুল প্রমিথিয়ুস নিয়েছেন সংস্কৃত ‘প্রমথ’ = অরণি বা সমিধ অর্থে; যে দণ্ড মছন, ঘর্ষণ করে অগ্নি জ্বালালো হয়। বিভীয়টিই শব্দ। কারণ—metheus থেকে মথ, মছ। নইলে th=থ-এর অর্থ হয় না।

প্রমিথিয়ুস, নল—প্রমথ কখনো বিদ্রোহ করেন, কখনো বশ্যতা স্বীকার করেন। আমাদের প্রমথ শেষ পর্যন্ত কি করেন তার জন্য অত্যধিক অসহিষ্ণু না হয়ে বলি।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

প্রোটকল

শ্রীল শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
মহাশয়,

স্বভাবতই সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে, উপরিম্ভ পদ্ধতিতে আপনাকে সম্বোধন করার হস্ত আমার আছে কিনা? অর্থাৎ এটিকেটে বাধে কিনা? আরো সরল আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলবো, আমার এ আচরণ ‘প্রোটকল’-সম্মত কিনা।

ভয় নেই। আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথা ফাটোফাটি করবো না। সামান্যতম ষেটুকু নিতান্তই না হলে চলে না তারই দিকে আপনার তথা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ভোজন্যরন্তে তিস্তবস্তুর ন্যায় যৎসামান্য।

কোনো কোনো শব্দের পরিধি পরিব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে যায়—কোনোট। আবার কমে। এই ধরন না, ‘কনটাক্ট’ শব্দটি। একদা বোঝাত নিতান্ত

১ ‘তিনি (নল) এক মৃশ্টি তুণ গ্রহণপূর্বক সর্ষদেবকে ধ্যান করিবারাত্র ঐ তুণে সহসা হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।’ দময়ন্তী সকাশে সৈরিশ্বদী কেশিনীর প্রতিবেদন। বনপর্ব।

২ এ তর্কটি আমার গুরু আমাকে বলেন, কিন্তু আমি এটি কোথাও পাইনি। কেউ জানাতে পারলে বাধিত হব।

স্থূল ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সে আমলে যদি কেউ লিখত ‘উপমন্ত্রী সুশীলাবালা দাসী গত রাতে শ্রীযুক্ত নটবর নায়ককে কনটাক্ট করেছেন’ তবে সেটা প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে যেত। আজ স্বচ্ছন্দে বলি, ‘প্রাচীর নব্যন্যায় অধুনা প্রতীচীর এপিষ্টেমলজির কনটাক্টে আসাতে উভয়ই উপকৃত হয়েছেন।’ অবশ্য তার অর্থ কি, আল্লায় মালুম।

প্রোটকল শব্দটির বেলাও তাই হয়েছে। একদা গ্রীক ভাষাতে বোঝাতো;— যেমন ধরুন, আপনার একথানা টাইম-টেবিল আছে। ইঠাৎ ইন্সটিশানে পেয়ে গেলেন, হ্যান্ড-বিল-পারা একথানা নোটিশ। তাতে ট্রেনের সময় পরিবর্তনের নবীন ফিরিস্তি রয়েছে। আপনি সেটি আপনার টাইম-টেবিলের যথাস্থলে গদ্ব দিয়ে সেটে দিলেন। তখন এ কাগজের টুকরোটি পেয়ে গেলেন পৈতে। হয়ে গেলেন প্রোটকল। গেরেমভারী নাম। এ-পাড়ার মেধা হয়ে গেলেন ভিন্-পাড়ার মধুসূদন।

সরকারি না-হক ট্যাকশো যে রকম বাড়তে বাড়তে পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায় এ শব্দটিও আড়াই হাজার বছর ধরে বাড়তে বাড়তে তার ‘তনু’টিকে অদ্যকার ‘বপু’ করে তুলেছে। বেশ এক যুগ পূর্বে এটিকেটের মহানগরী প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগ বা ফরেন আপিসে একটি ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার নাম ‘প্রোটকল বিভাগ’। একটা পুরো পাক্সা আস্ত ডিপার্টমেন্ট।

রাজ্যচালনার কোন গুরুভার এঁদের ক্ষেপে সমর্পিত হয়েছে?

বহুবিধ। এমন কি আমার মত লোক না পারলেও আপনি এদের সাহায্য তলব করতে পারেন। অবশ্য কলকাতাতে এরকম পুরো-পাক্সা প্রোটকল বিভাগ আছে কিনা, আমি সঠিক জানি নে। ধরুন আছে। আরো ধরুন, আপনি, সম্পাদক মশাই, কোনো পারটিতে নর্থ পোলার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তিনি ভারতীয় ফিল্মে বড়ই ইন্টারেস্টেড। পরিচয় নিবিড়তর হল। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটি খাসা ডিনারও খাইয়ে দিয়েছেন। সেটি রিটার্ন করতে হয়। কনসাল বিপত্নীক। একটি অবিবাহিত মেয়ের বয়স একুশ—অর্থাৎ ‘সোসাইটি করা’র বয়স হয়েছে। অন্য মেয়েটি পক্টনের কেপটেনকে বিয়ে করেছেন। তিনি একা এসেছেন কলকাতায়, বাপের কর্মস্থলে। ওদিকে আপনি সাউথ পোলার কনসুলেট জেনারেল শার্জে দাফেরকেও ঐ দিনই নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ভামিনী ও এক কন্যাও সঙ্গে আসছেন। কন্যাটির স্বামী ছিলেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সেপারেশন নিয়ে পিতার সঙ্গে বাস করেন। ডিনারে আরো ইনি উনি তিনি আসবেন।

এইবারে আমরা আসছি—ইংরিজিতে যাকে বলে—থিক্ অব্ দ্য বেট্‌ল-এ। অর্থাৎ মূল সমস্যায়। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন প্রিসাইডেনস বস্ত্রটি সাংঘাতিক। আপনার ড্রইংরুমে ককটেলোদি পান করার শেষের দিকে যখন বাটলার এসে আপনার স্ত্রীর সামনে বাণ্ড করবে তখন তিনি মূর্চক হাসবেন

প্রধান অতিথির দিকে। সেই মসিয়ো ল্য কন্স্যাল জেনরেল যেন পবনে ভর করে আপনার স্ত্রীকে এসে দান করবেন তার দক্ষিণ বাহু। তারই উপর ‘নিউ’র করে দৃজনাতে এগোবেন খানা-কামরার দিকে। এরপর যাবেন আপনি। কিন্তু দক্ষিণ বাহু দান করবেন কাকে? সাউথ পোলের শার্জে দাফেরের স্ত্রীকে, না নর্থ পোলের অবিবাহিতা কন্যাকে, না কেপটেনের স্ত্রীকে, না কর্নেলের তালাক-প্রাপ্ত মহিলাকে? ..এবং তারপর আসবেন কোন্ জোড়া, তারপর, ইত্যাদি।

তাই আপনি সুবুদ্ধিমানের মত পূর্বাহ্নেই ফোন করেছেন, শ্যাফ্ দ্য প্রোটকলকে—অর্থাৎ প্রোটকলের বড় কর্তাকে। অতি অমায়িক লোক। তদুপরি আপনি সম্মানিত কাগজের তারই মত শ্যাফ্, বড় কর্তা। কে কতখানি সম্মান পাবেন, তাদের দফতর ফিণ্ট দিলে আপনার প্রিসাইডেনস কি—অর্থাৎ কার আগে কার পরে আপনি খানা-কামরায় ঢুকবেন—তার প্রোটকলে আপনার নাম উঁচুর দিকে। অতএব একগাল হেসে বলবেন,—‘সে কি মসিয়ো—(ভুললে চলবে না, আন্তর্জাতিক প্রোটকলের ভাষা এখনো ফরাসিস্!)—আপনি অতখানি আঁবায়াসে (এমবারাস্ট্) হচ্ছেন কেন? এ যে একেবারে ডিমের খোসায় কালবোশেখী। আপনি তো আর অফিশিয়াট ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিচ্ছেন না। কি বললেন? না, না, না—পারদৌ, আমি আপনার ব্যান-কুয়েটটাকে মোটেই হেনস্তা করছি নে। তবু বলছি, ওটা তো—’

ঐ আনন্দেই থাকুন, সম্পাদক মশাই, ওঁকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন।

যতই ‘ঘরোয়া’ ‘বাড়ির ব্যাপার’ ‘ফেমিলি ওয়ে’ বলে নেমন্ত্রণ করুন না কেন, —এবারে খাঁটি দিশী তুলনা দিচ্ছি—সেখানে যদি মাছের মূড়োটা আপনার দ্বিদির শ্বশুরকে না দিয়ে দেওয়া হয় আপনার ভাগ্নের শ্যালাকে, তদুপরি উনি কুলীনস্য কুলীন, আর কালো ছোকরা মৌলিকস্য মৌলিক, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? আমি বলছি না, শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরে এ্যাট হিজ আরলিএস্ট কর্নাভিনিয়েন্স্ আপনার দ্বিদির পিঠে—ছি, ছি, তিনি আবার বোমা—দু ঘা, না না, তা বলছি নে।

প্রোটকলের শ্যাফ্ সবিশেষ অবগত আছেন যে আপনি তার স্তোকবাক্য সিরিয়সলি নেননি। তিনিই বলবেন।

‘সে তো হল। কিন্তু ঐ যে বললেন সাউথ পোলের ডিভোর্স কন্যা—স্বামী ছিলেন কর্নেল—তিনি এখন কি নামে পরিচয় দেন? ঠিক ডিভোর্স তো হয় নি—হয়েছে সেপারেশন।’

‘সেটা কি ইমপরটেন্ট?’

‘ভেরি, ভেরি। মহিলাটি যদি স্বামীর নাম ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর মেডেন (কুমারী) নাম, অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি পাবেন সেই পরিবারের র্যাংক, নইলে পাবেন কর্নেলের বিবাহিতা স্ত্রীর র্যাংক। তার পর দেখতে হবে—’

ততক্ষণে আপনার মাথাটি তাশ্জম মাশ্জম করছে। ভাবছেন, এবারে আর ডিমের খোসাতে টর্ণাডো নয়, আপনার কানের টিম্পেনোমে চলেছে মহা-

বেগে যদুম্ন রুশমাকিন নির্মিত স্পোর্টনিক।

আম্মো ভাবছি আজ যদি ডাচেস অব উইনজর তৃতীয় বারের মত যদি, মানে, ইয়ে হয়ে যান তবে তাঁর নাম কি হবে? শুনছি, হালে নাকি তিনি লন্ডনে 'জলচল' হয়ে গেছেন। ড্রাককে বিয়ের পূর্বে মিসেস সিমসন অবস্থাতে তিনি রাজবাড়িতে দাওয়াৎ খেয়েছেন—যদ্যপি রাজমাতা মেরি সে দাওয়াৎ বর্জন করেন। তাঁর সে 'বামনাই' নাকি প্রোটকল-নিষিদ্ধত অপকর্ম হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ডাচেস যদি আরেকটা ডিভোর্স নেন তবে তিনি লন্ডনে সাধনোচিত ধাম পাবেন কিনা, অর্থাৎ বকিংহাম ধামে নিমন্ত্রিত হবেন কি না?

হাসছেন? হাসবার জিনিস মোটেই নয়। চাকরি যেতে পারে। রুটি মারা যেতে পারে।

নিন্ হিটলারের যে কোনো প্রামাণিক জীবনী। পড়ুন ঘটনাটা। হিটলার গেছেন ইতালি—স্টেট ভিজিটে। সঙ্গে গেছেন ফরেন আফিসের শ্যাফ্ দ্য প্রোটকল। শ্যাফ্টি সাতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে। পোষা বেরালটাকে আগে দুধ দিতে হয়, না কুকুরটাকে হাড্ডি—সে প্রোটকল তিনি সাত বছর বয়সেই পারিবারিক কাসলে যুক্তিককসহ সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাজা সর্বাস্তুরণে ঘেন্না করতেন হিটলারকে—অবশ্য অনুভূতিটা ছিল উভয়পক্ষীয়, সাতিশয় 'বরাবরের'! রাজা পাতলেন ফাঁদ, হিটলারকে অপদস্থ করার জন্য। শেষ মূহুর্তে কি একটা হয়ে গেল রদবদল। যার ফলে হিটলার উপস্থিত হলেন কি এক পরবে সিভিল ড্রেস পরে, যেখানে আর সবাই রুনিফর্মে! কিংবা উক্টোটা!

বিশ্বসংসার জানে হিটলার ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী লোক—যদিও একথাও সত্য যে মিষ্টি ব্যবহার করতে চাইলে তিনি পারমিট-প্রার্থী মেবার-বাসীকে তিন লেনখে হারাতে পারতেন—দৃষ্টলোকে বলে, তিনি তখন মেঝেতে শুয়ে পড়ে কারপেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাকে নাকি বলা হত The Carpet-Eater!

প্রোটকল শ্যাফ্ বরখাস্ত হয়ে প্রথমতম ট্রেনে নাক বরাবর আপন গিয়ে। হিটলার তাঁর মূখদর্শন পর্যন্ত করেননি।

অবশ্য এর সরস দিক নিয়েও একাধিক কাহিনী আছে। বাল্যকালে হিটলার যে অস্ট্রিয়ার নগণ্য প্রজা ছিলেন সেই বিরাট অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির মহিমামিশ্রিত সম্রাট ছিলেন কাইজার ফ্রানৎস যোজেফ। তাঁর 'ভাব-ভালবাসা' ছিল সুন্দরী অভিনেত্রী গ্রীমতী শ্রাটের সঙ্গে। তিনি প্রায়ই কাইজারকে বলতেন, 'আপনি স্টেজের উপর গিরাড'র রসিকতা শুনে হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েন। স্টেজে আবার রসিকতা করার সুযোগ পান গিরাড' কতটুকু? পাব-এ, বার-এ, চায়ের মজলিসে তিনি যা একটার পর একটা ছেড়ে যান তার তুলনায় কেউ কখনো করতে পেরেছেন বলে কোনো কিংবদন্তী পর্যন্ত এই বিরাট ভিয়েনা শহরে নেই।' তাই গিরাড'কে কবি পানে নিমন্ত্রণ করা হল। কাইজার তো এলেন বিরাট

প্রত্যাশা নিয়ে। ওদিকে কী আশ্চর্য! গিরাডি'র কোটের বোতাম ওপরবাগে উঠতে উঠতে যেন তার ঠোঁট দুটোকেও বোতামিত করে দিয়েছে! নিজের থেকে কথা কন না আদৌ, প্রশ্ন শুধুই মহা সসম্মানে যেটুকু বলেন সেটি তার গোঁপের হাঁকনিতেই আটকা পড়ে যায়।

কফি পান খতম হতে চলেছে। শেষটায় থাকতে না পেরে হতাশ কাইজার ক্ষুদ্রকণ্ঠে বললেন, 'মাই ভেরি ডিয়ার গিরাডি'! আপনার মজলিস-জমানো কথার ফুলঝুরি সম্বন্ধে আমি কত মুখে কতই না বেহুন্দ তারিফ শুনছি—আর এ কি?'

রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে একেবামো গ্রাম্য ভাষায় গিরাডি' বললেন, 'হুজুর জাহাপনা! অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির কাইজারের লগে এ্যাগ'বার আপনে কফি খাইতে বহয়া দ্যা'হেন্ না!'

বেচারি গিরাডি' প্রোটকলকে কনসল্ট করে কফি খেতে এসেছিলেন!

তার শেষ বাক্যটি ঠিক প্রোটকলসম্মত কিনা সে নিয়েও আমার মনে ধোঁকা আছে।

একদম হালের ঘটনায় চলে আসি।

এই গত ১৯১০ই জুন তারিখে আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইজরাএল সকলেই যখন অস্ত্রসম্বরণ (সীস ফায়ার) করতে রাজী হয়ে গেছেন তখন রাশা ইউনাইটেড নেশনের সিকুরিটি কৌনসিলের বিশেষ জরুরী সভা ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালে; তার অভিযোগ, ইজরাএল সীস ফায়ার করেনি—কুমাগত সিরিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সীটিং বসলো সকাল ন'টা-দশটায়। এদেশে তখন রাত বারোটা। মিটিঙে বসানো মাইকের মারফত তার প্রত্যেকটি বাক্য ভইস অব আমেরিকার নিউজ রুমে আসছে। সেইটে ফের বেতারিত হয়ে রিলের পর রিলের মারফত ভারতে পেঁচছে। অধর্মের অনিদ্রা ব্যাধি আছে।

এই সিকুরিটি কৌনসিলের কর্মপদ্ধতি অতিশয় ছিমছাম। যে যার বক্তব্য বলে যান সাধারণত অতিশয় শাস্ত-কণ্ঠে। কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আপন কথা বলতে চায় না—অতি দৈবেসেবে কেউ যদি কখনো করে তবে বার বার মাফ চেয়ে, ও বাধাপ্রাপ্ত বক্তাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। চেম্বারচেম্বলি হৈ-হুজোড়ের কথাই ওঠে না।

প্রেসিডেন্ট গান্ধী কণ্ঠে বললেন, 'আমি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার মহামান্য ('ডিস্টিংগুইস্ট্' শব্দটি প্রতিবার প্রতি মেম্বারের উল্লেখ করবার সময় ব্যবহার করাটা প্রোটকলানুযায়ী নির'ক'শ বাধ্যতামূলক) ডেলিগেটকে 'ঘরের দর' ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ তখন ঘরের দর—মেঝেটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলার হুকু সোভিয়েত ডেলিগেটের। অবশ্য তিনি দর গ্রহণ নাও করতে পারেন।

মহামান্য রাশান ডেলিগেট দাঁড়িয়ে বললেন, 'পাসিব'—কিংবা 'রাগোদা-রিরু ভাস'ও বলে থাকতে পারেন। অর্থ একই; 'থ্যাঙ্ক্যু'। অর্থাৎ তিনি দর গ্রহণ করলেন।

তারপর এখন যে বিবৃতি নিবেদন করছি সেটা স্মৃতিশক্তি উপর নির্ভর

করে। 'সন্দেশপিচেশ' পাঠক আমার অত্যন্তপই। তাঁরাও ঐ সময়কার খবরের কাগজ পড়ে চেক্-অপ্ করে নিতে পারবেন, তাঁদের হাত দিয়ে আমি দা-কাটা তামাক অর্থাৎ সাত্তিশ হুঁল ভুল—খেয়েছি কিনা। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে সারছি।

রুশ : 'থ্যাঙ্ক্স, মিঃ প্রেসিডেন্ট ! আমি বলতে চাই, এই সম্মানিত কৌনসিল আরব এবং ইজরাএল উভয়কে আদেশ দিয়েছে সীস-ফায়ার মেনে নিতে। সিরিয়ার মহামান্য ডেলিগেট বলেছেন, সীস-ফায়ার মেনে নেওয়া সঙ্গেও ইজরাএল সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, ট্যাংক সাজোয়া গাড়িসহ ক্রমাগত রাজধানী দিমিশকের (ডিমেস্কাস্, দামা, ডামাস্কাস) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বোমারু বিমান অনবরত রাজধানীর উপর বোমাবর্ষণ করছে ! আমি প্রস্তাব করি, কৌনসিল সবসম্মতিক্রমে ইজরায়েলের এ আচরণের নিষেধা করুক। ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট !'

(বক্তৃতা শেষ করে কোন কোন সদস্য ভবিষ্যতে তাঁর বক্তৃতার কি ভাষা হবে না হবে সে বাবদে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী জানান। পক্ষান্তরে বক্তব্য স্পষ্ট 'হ্যাঁ', 'না' বা নিতান্ত দ্ব্যর্থহীন হলে সে অধিকার যে রাখছেন না, সে-কথাও বলে দেন। এটার প্রয়োজন এই কারণে যে কৌনসিলের বাহ্যিক রঙের নানান চাঁড়িয়া নানান বুলি কপচান। অনুবাদ নিয়ে পরে তাই নানা হস্ত না-হস্ত তর্ক ওঠে)।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি এখন ইজরাএলের মহামান্য ডেলিগেটকে ফর ছেড়ে দিচ্ছি !'

ইজরাএল ডেলিগেট : 'আমার মহামান্য সরকার যখন সীস-ফায়ারে স্বীকৃতি দেন তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমরা সীস-ফায়ার মানবো, কিন্তু শত (অন কন্ডিশন) যে আরবরাও তাই মানবে।" অতএব সীস-ফায়ারটা ম্যুচুয়াল করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মহামান্য সরকার তাঁর সেনাবাহিনীতে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন।'

এ উক্তবে সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বা রুশ ডেলিগেট নিশ্বাসচক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন। সে-সম্ভাবনা দেখে প্রেসিডেন্ট ফের রুশকে ফর দিলেন।

রুশ : (অতি সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে) 'মিঃ প্রেসিডেন্ট ! এ তো বড় তাজবকী বাত ! এই "ম্যুচুয়াল সীস-ফায়ার" রহস্যটা কি ? মহামান্য ইজরাএল ডেলিগেট কি বলতে চান, প্রথমে, পয়লা, সিরিয়া সিস-ফায়ার করবে, তবে ইজরাএল অস্ত্রসংবরণ করবেন ? তদুপর, মিঃ প্রেসিডেন্ট, 'ম্যুচুয়াল' শব্দটাই আমাদের অনুশাসনে নেই। এবং আসল তত্ত্ব, ইজরাএলই আক্রমণ করেছে প্রথম। সীস-ফায়ার করতে হবে তাকেই প্রথম। আচমকা ঐ ম্যুচুয়াল শব্দ আমদানি করে ইজরাএল কথার মারপ্যাঁচ (কজিস্ট্রি) আরম্ভ করে মূল সত্য এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ? (তারপর অতি সামান্য ব্যঙ্গের সুরে—লেখক) এরপর বৃদ্ধি সফিস্ট্রি আরম্ভ হবে ! (কথার প্যাঁচে সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণের ভিন্ন নাম সফিস্ট্রি—রুশ সদস্য ফেদেরেনকো 'কজিস্ট্রি' ও 'সফিস্ট্রি'

দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে — কারণ ইজরাএল সদস্য যে সত্যিসত্যিই পাকাল ঘাছের গা মোচড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছেন সেটা ততক্ষণ শত্রুমিত্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—লেখক)। মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি আদৌ অবিশ্বাস করছি নে যে, ইজরাএল সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মহামান্য ইজরাএল সদস্য বলুন, তারা সেটা মেনে নিয়েছে কিনা, তিনি বলুন, তারা সিরিয়ার ক্রমাগত আরো অনুপ্রবেশ করছে কিনা? থ্যাঙ্ক্যু মিঃ প্রেসিডেন্ট।’

প্রেসিডেন্ট : ‘আমি মহামান্য ইজরাএলের ডেলিগেটকে ধর দিচ্ছি।’

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল ফের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর : ‘আমি মহামান্য বুলগেরিয়ার ডেলিগেটকে ধর দিচ্ছি।’ স্পষ্ট বোঝা গেল মহামান্য ইজরাএল ‘ধর গ্রহণ’ করলেন না। প্রোটকলানুযায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে হুকুম দিতে পারেন না।

বুলগেরিয়া (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে—বস্তুত একমাত্র ইনিই কিংবদন্তি উত্তেজনা দেখান—যদিও সর্বভদ্রতা বজায় রেখে। ইজরাএল কথা বলেছে স্বভাবতই বিজয়ীর গর্বিত কণ্ঠে, সিরিয়া করুণ ফরিয়াদভরা সুরে—আর ইজরাএলের জয়ে খুশীতে ডগমগ মার্কিন তথা তার ফেউ ইংরেজ করেছে, ‘হে’-‘হে’-‘হে’-‘হে’): ‘মিঃ প্রেসিডেন্ট! ইজরাএল উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি শুধু জানতে চাই, ইজরাইলি বাহিনী এখন কোথায়? সিরিয়াতে? “হ্যাঁ” কি “না” তিনি স্পষ্ট বলুন! তিনি যদি কথা বলেন তবে আমাদের যা বলার বলবো, তিনি যদি না বলেন তবে আমরা ভেবে নিয়ে জেনে যাবো।’ (ডিলেমাটি সুন্দর “If Israel speaks, we shall speak; if Israel does not speak we shall know,”—লেখক)

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ইজরাএলকে ধর দিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রেসিডেন্টের গলা : ‘আমি মালির মহামান্য ডেলিগেটকে ধর দিচ্ছি।’

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইজরাএল ধর গ্রহণ করেননি, করতে চানও না। এরপর বোধ হয় কর্মসূচীতে মালি রাষ্ট্রের নাম ছিল।

মালি : ‘মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সবাই এখানকার সদস্য। এক সদস্য যদি অন্য সদস্যের কাছে কিছু জানতে চান তবে আপনি তাঁকে সেটা শ্রদ্ধোচ্ছেন না কোন্‌ বিধি অনুসারে? থ্যাঙ্ক্যু!’ (বা ঐ ধরনের)

প্রেসিডেন্ট : ‘আমি সম্মানিত মালি সদস্যের কাছে জানতে চাই, আমি যে সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে সম্মানিত রুশের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তা কোন্‌ বিধি অনুযায়ী?’ মালি কোন উত্তর দিতে চান কিনা ঠাহর হল না। কারণ ইতিমধ্যে রুশ সদস্য ধর চাইলেন। প্রেসিডেন্ট সসম্মানে তাই দিলেন।

রুশ : ‘মিঃ প্রেসিডেন্ট! সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য আমরা ওয়াকিং এরেক্‌মেন্ট মেনে নিয়ে থাকি। সেই অনুযায়ী যে কোনো সদস্য যে কোনো খবর যে কোনো সদস্যের কাছে চাইতে পারেন। এই তো আমরা

সভার সদস্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থাসকে অনুরোধ করলুম সিরিয়া থেকে তাজা খবর আনিয়ে দিতে। তিনি দিলেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎসঙ্গেও প্রেসিডেন্ট সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে প্রশংসা শুধোলেন না। তিনি কিন্তু একাধিক বার তাঁকে সম্মানে ফর ছেড়ে দিলেন। ইজরাএল ফর গ্রহণ করলেন না।

তবেই বন্ধু, সম্পাদক মশাই, প্রোটকলের ঠেলা কী চীজ !

কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন : প্রেসিডেন্ট—থুড়ি—সম্পাদক মশাই (ক্ষণতরে ভাবছিলুম, আমি বুঝি সেকুরিটিকোনসিলে পে'ছি গেয়েছি !) এটা কিছ্ নতুন তথ্য নয়। আমি প্রাচীনপন্থী যদি পিসির অপজিট পুংলিঙ্গ। যা নাই ভারতে—! থুলে বলি।

সেকুরিটি কোনসিলের কার্যকলাপ যখন আমি সরাসরি বেতাবে শুনছি তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল এই রকমই একটি ধুশ্ধুমার যেন আমি শরীর কোথাও দেখছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধুশ্ধুমার কথাটাই সব মনে করিয়ে দিল। যে মধুকৈটভ-নিধন শ্রীবিষ্ণুকে আর্ঘ্যভদ্রগণ সায়ংপ্রাতঃ স্মরণ করেন সেই বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেবাদিকে প্রচণ্ড নিপাড়ন আরম্ভ করে মধুকৈটভের পুত্র ধুশ্ধুমার এবং অবশেষে নৃপতি কুবলাশ্ব কতৃক নিহত হয়। মহাভারতের আপ্তবাক্যমধ্যে সেটি লিপিবদ্ধ আছে।

ধুশ্ধুমার স্মরণ করিয়ে দিলে সেই সভা, যেখানে দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। আমি জাতিস্মর। আমি সে-সভায় উপস্থিত ছিলাম তখনকার দিনের পি-টি-আই চীফ রিপোর্টার মূলগায়েন সঞ্জয়ের দোহার রূপে।

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তি যেভাবে আত্মসমর্থন করেছেন তার তুলনা আজো ইহসংসারে অলভ। ঐতিহাসিক যুগে সোক্রে-তেস, তার বহু পূর্বে দ্রৌপদী।

কিন্তু অবিস্মরণীয় তত্ত্বাব্য :—সোক্রেতেস জাত দার্শনিক, পাড়ি তাকিক। তিনি যে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শানিত শানিত তর্কবাণে অ্যাথিন্স নগরীর নভোমন্ডল দিবাভাগে তমসাচ্ছন্ন করে দেবেন তাতে আর বিচিৎ কি ? সেকুরিটি কোনসিল প্রসঙ্গে পূর্বেই নিবেদন করেছি রুশ প্রতিনিধি ফেদেরেনকো ইজরা-এলকে 'সফিস্ট'- আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। সোক্রেতেস এই সব সফিস্ট-দেরই নগরীর মস্ত হট্টে বাক্যতর্কে নিত্য নিত্য অম্লতরু পান করাতেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যশ্চর্য অবিস্মরণীয় হলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু একবস্থা যাক্সেনী আত্মসমর্থন হেতু দুর্বোধনের সভামধ্যে যে যুক্তি-জাল বিস্তার করে কতিপয় সুচ্যগ্র ভীক্ষু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্মুখে তদানীন্তন ভারতের গুনীজ্ঞাণী শুরবীর সম্মিলিত সর্ববৃহৎ সভা নিরক্ষুর নিরুত্তর। অসুখ্যপশ্যা কুষা যে আইনকানুন প্রোটকল সম্বন্ধে কতখানি অনাভিজ্ঞা ছিলেন তা তাঁর সভামধ্যে রোমনের সময়ই ধরা পড়েছে : 'হায়, আমি স্বল্পবয়সকালে রক্তমধ্যে ক্রমাগত ভুপালগণের নেত্রপথে একবার নিপাতিত হইয়া-ছিলাম, ইতিপূর্বে বাহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই

সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে পূর্বে বান্দু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখিতে পান নাই...’ (আমরা বলি) তিনি যে সোক্রাতেসের মত সেকালের কোন প্রটো-আকার্ডেমির সদস্য ছিলেন না অথবা ডক্টরেট অব জ্যুরিসপ্রুডেন্স পাস করেননি সে বাবদে আমরা স্থিরনিশ্চয়, দৃঢ়প্রত্যয়। তাই পাণ্ডালীর ডিফেন্স আমাদের কাছে ‘ধৃত-লবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্দ্রনয়নসমস্যাহীন কলিকাতা মহানগরীর’ মত সম্পূর্ণ অবিবাস্য বলে মনে হয়।

এ যেন সেকুরিটি কৌনসিলের ঠিক উল্টো পিঠ। হেথায় তাবৎ সভা কা কা রবে চিংকার করছে কিন্তু ডিসটিংগুইশ্ট্ ইজরাএল প্রতিনিধি নিশ্চূপ, নীরব। অথচ তাঁর জিভে ফোঁকা পড়েনি, তাঁর টনসিলে বাত হয়নি। সভায় ৯৫ নয়াপয়সা মেম্বর কোনো প্রোটকল খুঁজে পাচ্ছেন না যেটা গজাংকুশের মত প্রয়োগ করে ইজরাএলের দাঁতকপাটি খুলতে পারেন।

আর হেথায় দ্রুপদতনয়া বারংবার একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, ধর্মরাজ দ্যুতক্রীড়ায় ‘অগ্রে আমাকে কি নিজেকে বিসর্জন করেছেন?’ (ইজরাএলকেও মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ‘ইজরাএলি বাহিনী এখন কোথায়?’)। যুক্তিটি অতি সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ যদি নিজেকে স্টেক করে আগেভাগেই খুঁইয়ে ফেলে দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যেহেতু দাসের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না অতএব ‘দাস’ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে স্টেক করতে পারেন না (দাস হবার পূর্বেও তিনি মাত্র ২০% মালিক—কিন্তু এ ল’পইনট্ বোধ হয় তখন ওঠেনি)।^{১১}

তা সে যা-ই হোক, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাচ্ছেন না। এবং হা অদৃষ্ট! কোনো প্রোটকলও খুঁজে পাচ্ছেন না যার চাপে তিনি সভাসদদের মৃগ খোলাতে পারেন। বরং ভীষ্ম যে প্রোটকল উত্থাপিত করলেন তার মোহা : ডিসটিংগুইশ্ট্ দ্রুপদতনয়া তাঁদের প্রশ্ন শূন্যিয়েছেন (ইংরিজিতে এম্বলে বলে ‘বার্কিং আপ দি রং ট্রী’)। তাঁর উচিত তাঁর স্বামী ধর্মরাজকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। তিনিই বলতে পারেন, কৃষ্ণা ‘জিতা বা অজিতা’।

কিন্তু বিদূর যে জিনিসের আশ্রয় নিলেন, সেটাকে প্রাইসিডেনস, নজীর বা হাদিস বলা যেতে পারে, ঠিক প্রোটকল নয়। তাঁর মতে মহর্ষি কশ্যপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে অনুশাসন দেন ‘হে প্রহ্লাদ, যে ব্যক্তি জানিয়া শূন্যিয়াও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে তাহার সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা বন্ধন পায়।’^{১২} অর্থাৎ silence সর্বাবস্থায় golden নয় (অবশ্য এম্বলে gold is silent, কারণ সভাসদদের আয় সকলেই দুর্যোধনের

১ ইসলামে দাস যেমন আইনত পূর্ণ নাগরিক নয় (সেখানেও সে কোনো কিছু স্টেক করতে পারে না) ঠিক তেমনি সে কোনো আইনভঙ্গ করলে (চুরি, ডাকাতি) তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় না। খেসারতি দিতে হয় মুনবকে।

২ জর-জদালাদি রোগকেও ‘পাশ’ বলে ধারণা করা হত বলে অধর্ষবেদে ঋষি পাশমুক্তির জন্য বরুণদেবকে আহ্বান জানাতেন।

gold পেয়ে silent !) ।

কিন্তু এ নজীর ধোপে টিকল না। মহাভারতকার বলছেন, বিদুরের বাক্য কণ্ঠগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না !!!

কিন্তু এ সব চুলচেরা বাগ্‌বিতস্তার মূলে কে ?

দ্রৌপদী যে প্রশ্ন শূন্যেছিলেন সেটা তো কেউ সেকেন্ড করবে। নইলে সেটা উল্টো ভিরেস, নাকচ।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সেকেন্ড করে বসল দুর্যোধনের ছোট ভাই চ্যাণ্ডা অর্বাচীন বিকর্ণ ! তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, ‘যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন কুরূবংশ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ই’হারা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন।’ তারপর তিনি যখন দেখলেন ‘সভাসদবর্গের কোনো ব্যক্তিই সাধু অসাধু কিছুই কহিলেন না’ তখন ‘হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিম্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন’, অর্থাৎ অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে রায় দিলেন, ‘এইসকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।’

সর্বনাশ ! আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে এ যেন নিতান্ত চ্যাণ্ডা ঘানা বা মালি রাষ্ট্র সেকুরিটি কৌনসিলে বলে বসল, ‘এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে (অর্থাৎ যেহেতু ইজরাএলই প্রথম আক্রমণ করেছে) সাইনাইকে ইজরাএলের (প্রাচীন দিনের ভাষায় দুর্যোধনের) জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।’

ধুমধুমার লেগে গেল সভায়, মহাভারতের ভাষায় ‘সঙ্কুলরবে’ (একসুরে) ‘তুমুল নিনাদ’ উঠলো সভাস্থলে। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদুরাদি কেউ কিছু বলার পূর্বেই বিকর্ণ আপন রায় দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, প্রবীণরা নীরবতা দিয়ে দ্রুপদনিন্দনীর প্রশ্নটি পিষে ফেলবেন— ‘নীরবতা’ যে শূন্য মাত্র ‘হিরন্ময়’ তাই নয়, সরব প্রশ্নকে নিধন করার মারণাস্ত্রও বটে।

অনেকেই বিকর্ণের পক্ষে সায় দিচ্ছেন দেখে কণ্ঠ ‘ফুর’ গ্রহণ করলেন। বললেন, ‘হে বিকর্ণ এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে—’

আমরাও বলি, ‘সেই কথাই কও।’ ‘বিকৃতি’ মানে প্রোটকল-সম্মত নয় !

কণ্ঠ বললেন, ‘তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য হইয়া স্ববিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, পর্ব বিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই—’

এইবারে কণ্ঠ মারলেন পেরেকটার ঠিক মাথার উপর মোক্ষম ঘা। এই পর্ব বস্তুটি কি ? কারণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে নিঘণ্ট আছে তার প্রথমটার মতে বিকর্ণের নম্বর আট, দ্বিতীয়টার মতে উনিশ।

আর ‘পর্ব’ অর্থই হচ্ছে ‘নির্দিষ্ট’—আমাদের ‘পূর্ব’ মাত্রই হয় নির্দিষ্ট দিন ক্ষ্যাণে। তাই ‘পর্ব’ই হচ্ছে প্রোটকল। যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যার থেকে নড়চড় নেই। বিকর্ণ সেই প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর ও

দ্রোপদীর কার্ষোন্মহার অংশত হয়ে গেছে। ওদিকে আবার কণ্ স্বয়ং করে বসেছেন প্রোটকলে গলদ!

কারণ সভারশ্বেই মিঃ প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন প্রোটকল ধার্য করে দিয়েছেন—কণ্ যাকে ‘পর্ব’ বলেছেন—যে, ‘কৌরবগণ দ্রোপদীর সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।’ অর্থাৎ তিনি স্র দিচ্ছেন কুরু সদস্যদের। অপিচ কণ্ আইনতঃ (ডে জুরে) রথচালক শ্রেণীর লোক—আজকের ভাষায় ‘শোফার সর্দারজী ক্লাস’ [যদিপি প্রকৃতপক্ষে (ডে ফাক্টো) তিনি কুন্তীনন্দন প্রথম পাণ্ডব; কিন্তু সদস্যগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে এ-বিবেচনা এস্থলে উঠতে পারেনি, কিস্মিনকালে ওঠেওনি। তিনি স্র গ্রহণ করতে পারেন না। তবে বিকণ্ যে প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন সেটা হয়তো তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—কারণ পইন্ট অব্ অরডার সভাসীন যে-কোনো সদস্য যে-কোন সময়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তারপর কণ্ যখন বললেন, ‘দ্রোপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই শকুনি ধর্মতঃ জয় করিয়াছেন’ তখন তিনি বিলকুল আউট অব্ প্রোটকল কারণ প্রেসিডেন্ট রুলিং দিয়েছেন, উত্তর দেবেন কৌরবরা।

অতএব দ্রোণ যে স্র গ্রহণ করেননি সেটাও অতিশয় করেকট্। কারণ তিনি ও অন্যান্য কৌরবেতররা অবগত আছেন ব্যাপারটা বহুলাংশে কুরু-পাণ্ডবের ঘরোয়া ব্যাপার। যে শকুনি সর্বস্ব জয়লাভ করেছেন তিনিও তাঁর হস্তের দাবী করে স্র চাননি।

বস্তুত সভাপতিরূপে ডিস্টিংগুইশ্‌ট্ প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্যোধনের আচরণ অক্ষরে প্রোটকলসম্মত। তিনি কুরুকুলকে স্র দিয়েছেন কিন্তু কী ভীষ্ম কী বিদুর কাউকে কিছু বলার জন্য কোনো চাপ দিচ্ছেন না।

অবশেষে তুমুল বাগ্-বিতণ্ডার পর প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন যখন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে কুরুকুলের কেউই আপন সূচিস্থিত অভিমত দিচ্ছেন না, যাজ্ঞসেনী যে ‘জিতা’ সে রায় দুরে থাক (কণ্‌র রায়ের মূল্য নেই, এবং দুর্যশাসন তখন ‘প্রতিহারী’ বা ‘বেলিফ’ বা সভার ‘মারশাল’; এবং তিনিও সূদ্ধমাত্র দ্রোপদীকে অপমানার্থে ‘দাসী দাসী’ বলে সম্বোধন করছেন, যুক্তিতর্ক দ্বারা শকুনির লিগেল-রাইট্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তখন তিনি যে রুলিং দিলেন সেটাও অতিশয় ন্যায্য। তিনি জানতেন যে যদিও তিনি আইনত প্রেসিডেন্ট, তবুও এ-তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে কুরুবৃন্দ পিতামহ ভীষ্ম কুরুকুলের সর্বোচ্চ আসন ধরেন। তিনি যখন স্পষ্ট বলেছেন, স্বয়ং ধর্মরাজ এর মীমাংসা করুন তখন এ সিদ্ধান্ত এক হিসাবে তাবৎ কুরুবংশের সিদ্ধান্ত। এবং যেহেতু দুর্যোধন সভারশ্বেই বলেছেন কুরুকুল উত্তর দেবেন তখন যুক্তিযুক্তভাবেই শেষ উত্তর দিলেন, কুরুকুলের সিদ্ধান্ত; ধর্মরাজ উত্তর দেবেন। কিন্তু ধর্মরাজ যখন স্র গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি দ্রোপদীকে বললেন, (ধর্মরাজ যখন স্র নিচ্ছেন না তখন প্রোটকলানুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠেরা স্র পাবেন—হুবহু যেরকম অপর পক্ষে বিকণ্ পেয়েছিলেন) ‘হে যাজ্ঞসেনী, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের

মত-ই আমার মত ।’

এবং এঁরাও ফর গ্রহণ করলেন না । অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন না ।

এখানেই সভা শেষ ।

সম্পাদক মহাশয়, যতই চিন্তা করি, পুনরায় মহাভারত অধ্যয়ন করি, পুনরায় চিন্তা করি, তখন দেখি, সেই অতি প্রাচীনকালে আমরা কতখানি ন্যায়-ধর্ম ও প্রোটকল মেনে সভা চালাতুম ! যদি দৃঃশাসনের অনাযাচরণের কথা তোলেন তবে বলবো সেটা অবশ্যই নিশ্চয়, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রোপদীকে ‘উরুমধ্য’ প্রদর্শন অনুরূপ কিন্তু সেগুলো ‘ইনস্ট্রিগেল পার্ট’ অব দি প্রসিডিংস অব দ্য মিটিং নয়, ‘সভার কর্মসূচীর অন্তর্গত অবজর্নীয় অংশ’ নয় । দৃঃশাসন ও দুর্যোধন শব্দ অতিশয় রুঢ় পদ্ধতিতে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মতে দ্রোপদী জিতা । সভার কার্যকলাপে প্রোটকল আদৌ লঙ্ঘিত হননি ।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয়, সে-যুগে ফিল্ম ছিল না, তার মাসিক ছিল না, তস্যা সম্পাদক ছিলেন না । কাজেই তাঁকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় সে-বাবদে কোনো প্রোটকল খুঁজে পেলুম না । তবু খুঁজিছি, কারণ ‘দুঃ’ না পেলেও ‘পিটুলি’ পাবো নিশ্চয়ই !!

পপ্পালের মগডালে

দুই মহা ‘চাণক্যে’ বিশ্রামলাপ হচ্ছিল । নিদাঘের মধ্যরাত্রি আসন্ন । প্রচুর সুরা পান হয়েছে । ফলে সবার দিগে অজস্র স্বেদ ও তর্জনিত বাষ্প বিনির্গত হচ্ছে । এমনতাবস্থায় সেই স্টীম থেকে যে স্পিরিট বের হচ্ছে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামান্যতম স্পর্শ পেলেই দপ করে জ্বলে উঠবে বলে চাণক্যের সিগার ধরাচ্ছেন না ।

ইতিমধ্যে একজন গভীরতম চিন্তায় নিমগ্ন থাকার পর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, “একটা সমস্যা নিয়ে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, ভ্রাতঃ ! ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি নে । মার্শাল থেকে শ্রমপেটর হয়ে কেইনস রবিন্স সবাইকে চেষ্টা করি—বেকার বেকার । তা আপনার কাছে তো কিছুই অজানা নেই—”

“হুম ।”

“এই ডাক-বিভাগটা চলে কি প্রকারে ? অত অটেল টাকা পায় কোথায় ? ভাবুন দ্বিকার্নি, বিরাট বিরাট মাইনের ডাঙর ডাঙর আপিসাররা রয়েছেন, দশাসই সব আপিস দপ্তর, অগুনতি ভ্যান, লম্বা দোড়ের রেলগাড়ি হলেই তার আধখানা জুড়ে ডাকের জন্য খাস ব্যবস্থা—এ তো আর ফোকটেমুফতে হয় না ! হ্যাঁ, মাননীয়, তারা কোটি কোটি টাকার ডাকটিংকট বেচে । কিন্তু ওটাকে তো আর ব্যবসা বলা চলে না । ১০ পয়সার ডাকটিংকট বেচে ১০ পয়সায়, ১৫ পয়সার টিংকট বেচে ১৫ পয়সায়, কুড়ির কুড়ি পয়সায় । এক কানাকাড়িও তো মনোহা নেই ওতে,—যা দর তাতেই বিক্রি ! লাভ রইল

কোথায় ? তা হলে ডাক-বিভাগটা চলে কি করে ?”

“অতি হক কথা কয়েছেন, আমিও সানন্দে স্বীকার করছি, টিকিট বিক্রি করে ডাক-বিভাগের রক্তির মুনাকা হয় না। যে দাম আছে, তাতেই সে বিক্রি করতে বাধ্য। কিন্তু জানেন তো, দাদা, বড় বড় মুনাকার ব্যবসা মাস্ত্রেই লাভের পথটা থাকে লুকানো—যেদিকে সরল জনের নজর যায় না, তার মনে কোনো সন্দেহই হয় না। আচ্ছা ! এইবারে দেখুন সমস্যাখানার রহস্য। পনেরো গ্রাম ওজনের খামের জন্য পোস্টাফিস চায় পনেরো পয়সা টিকিট—নয় কি ? এইবারে আপনাকে আমি শুন্যেই—হক কথা কন। প্রত্যেকখানি চিঠির ওজনই কি টায়-টায় পনেরো গ্রাম ? হাজারখানার ভিতর একখানারও হয় কি না হয়—এ তো কানায়ও দেখতে পায়। একটার ওজন হয়তো বারো গ্রাম, কোনোটার আট, কোনোটার বা তেরো। এইবারে বুঝলেন তো, এই যে তফাতটা—এই যে ফারাকটুকু, এর থেকেই ডাকবিভাগের নিরেট লাভ—ঐ দিয়ে তার দিবা চলে যায়।”

পাঠক ভাবছেন, আমি অর্থশাস্ত্রের জটিলতম সমস্যায় কষ্টকিত এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলুম কেন ? আমিও তাই ভাবছি। বস্তুত আমি মেহতা-চোখুরী-জনসুলভ এই পণ্ডিত্ত কাহিনীটি যখন শ্রবণ করে কৃতকৃতার্থ হই তখন, কিংবা আমার বাতুলতম মূহুর্তেও আমি ওহেন সম্ভাবনার কণামাত্র আভাস পাইনি যে, ইটি একদিন আমার কাজে লাগবে।

লেগেছে। টায়-টায় না হলেও হরেকরে। সর্ব কাহিনী, তাবৎ উপমাই দাঁড়ায় তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে। চার পায়েই যদি দাঁড়ায়, তবে তো সে হুবহু একই বস্তু হয়ে গেল। উপমা রূপক, প্রতীক হতে যাবে কেন ?

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেখি, এক দরদী সম্প্রদায় বিকট চিৎকার করে চিগ্লি দিয়ে কেঁদে উঠেছেন, বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য। হায় হায় হায়, এদের কি হবে ? এরা কোজ্জাবে, মা !

কামার বহর দেখে মনে হল, এঁরা যেন ফুটপাথের পুরনো বই বিক্রীরী-ওলাদের চেয়েও বিকটতর বিপাকে পড়েছেন। এদের দুরাবস্থা (প্রেস ! হ্যাঁ, আমি আকার দিয়ে দুরাবস্থাই লিখছি) দেখে সেই সম্প্রদায় ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছেন।

আম্মো দরদী। কিন্তু এই ডুকরে-ওঠা, চিল-চ্যাচানো মড়া-কামা শব্দে আমার স্বপ্নে ‘মিলক অব হুয়ামেন কাই’ডিনিস’ না বলে লেগে গেল সেথায় অন্য ধুমধুমার। খাঁটি মড়া-কামা আমি বিলক্ষণ চিনি। আমার বসন্ত-বাসা শব্দশানের লাগোয়া।

*

*

*

মহাকবি হাইনারিষ হাইনের মরমিয়া প্রেমের গীতি কবিতা সম্বন্ধে একাধিক বার লেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। ইনি সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। পাঠককে শুন্যেই, ‘সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধন’, ‘তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি’ শব্দে কি তোমার কখনো মনে হয়েছে, এ কবি ‘...চিঠির’ মত

(এ-মাসিকের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই—অসম্মদেশে শত্রু মিত্র উভয় ভাবেই পূজ্য করার পদ্ধতি ঐতিহাসিকসম্মত) কিংবা কংগ্রেস কম্যু-নিস্টের মত কটকটব্য কম্মনকালেও করতে পারে ?

তাই যখন বিপ্লবস্বপ্নাশী, পরগ্ৰীকাতর একপাল (লুমপেন-পাক) ফেউ লাগলো হাইনের পিছনে তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সবাই ভাবলে, যার মূখ দিয়ে সদাই মধু ঝরে সে আবার এসব বেতালা বদখদ বেজমীজী বাতের কীই বা জবাব দেবে। ভুল ভুল ! সম্বাই করলেন ক্ষ-তে গলদ।

একদিন তাঁর হল ধৈর্যচ্যুতি।

কি যেন একটা—আমার ঠিক স্মরণে আসছে না—ভ্রমণ-কাহিনী না কি যেন কিসে মোলায়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে দিতে তিনি বললেন, সবাই জানেন, আমি নাতিশয় সাধারণ কবি, তাই আমার খাঁও অতিশয় সাধারণ। কবি মানুষ, দয়াময় ভগবান যদি নদীপারে আমাকে একখানা কুঁড়েঘর দেন, তা হলেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আর ঘরের তৈরি সাদামাঠা কিণ্ডিং রুটি—শহুরে বান, ক্রোআঁশা^১ কিসসুটি না—আর ঘরেই তৈরি মাষা পরিমাণ মাখম, ব্যাস। তদুপরি দয়াময় ভগবান যদি আমাকে আরো খুশী করতে চান, তবে তিনি যেন ঐ নদীপারে উঁচাসে উঁচা একসারি পপুলার লাগিয়ে দেন। সবশেষে, তাঁর অসীম করুণাবশে যদি দয়াময় আমাকে পরিপূর্ণ কৈবল্যানন্দ দিতে চান, তবে তিনি যেন আমার পিছনে যারা লেগেছে ঐ দুঃশমনদের পপুলারের মগডালে ফাঁস দেন। অস্ত্রবিহীন আনন্দরসে ভরপুর হৃদয় নিয়ে, কুটিরের দাওয়ায় বসে আমি তখন উপরপানে তাকিয়ে দেখব, নাতিশয় মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবো, আহা কী রমণীয় দৃশ্য ! দুঃশমনদের পাগলুলো মৃদুমন্দ পবনে দুলছে—দোদুল দোলায় হিল্লোল লাগিয়ে।^২ হ্যাঁ, আলবৎ প্রভু যীশুখৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন^৩ শত্রুকে ক্ষমা করবে, তাকে প্রেম দেবে। নিশ্চয় করব, নিশ্চয়ই দেব—আমার সর্বসত্তা উজাড় করে, কিন্তু ঐ যে বললুম, ওদের ফাঁস হচ্ছে যাবার পর।”

*

*

*

১ ক্রোআঁশা = ক্রেসেট—অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়মাখমে তৈরি ফিনিস রুটি। তুর্করা ভিয়েনা যুদ্ধে পরাজিত হলে পর, ভিয়েনাবাসী তুর্কদের পতাকা-লাঙ্ঘন অর্ধচন্দ্র আকারে রুটি বানিয়ে তাদের জয় সেলেব্রেট করে। আজ যদি ইস্টবেঙ্গল একটি কেকের উপর মার্শপেনের “বাগান” বানিয়ে সেটা খায়—অনেকটা সেই রকম ! আমি কিন্তু মোহনবাগানী।

২ যারা আর্ট হিস্ট্রির চর্চা করেন, তাঁদের স্মরণে আসবে গোয়ার ছবি, যেখানে গাছে ঝোলানো শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করছেন এক অফিসার—টেবিলে কনুই রেখে হাতে আরামসে মাথা রেখে। বস্তুত এ ছবি বেরোবার (১৮১০—১৩) কয়েক বছর পরই হাইনে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন।

৩ হাইনে ইহুদি। ইহুদিরা খৃষ্টকে স্বীকার করে না।

কিন্তু যে গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেটা গেল কোথায় ?

যাঁরা বিদেশী বই বেচেনেওলাদের তরে ঘটি ঘটি অশ্রু বর্ষণ করছেন তাঁদের একজনের ভাবখানা অনেকটা : পাঁচ শিলিঙের বই যদি তারা তারাই ন্যায্য এক্সচেঞ্জে ভারতীয় টাকায় বেচে, তবে তাদের মনোফা রইল কোথায় ? এক ডলারের দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা (কথার কথা কইছি, আমি সঠিক ভাণ্ডার জানি নে), যদি সাত টাকা পঞ্চাশেই বেচে, তবে লাভ রইল কোথায়—ঐ সেই ডাকটিকিট বিক্রির মত !

তিনি তারপর আরেক ঘটি একস্ট্রা চোখের জল ফেলে বলছেন, তাদের কত খর্চা ! চিঠি লিখতে হয় (মরে যাই !), ডাকমাশুল দিতে হয় (ও বাছারে !) এবং তারপর আর কি সব ধানাইপানাই করেছেন আমার মনে নেই । কিন্তু এইবারে অসহিষ্ণু পাঠক, ক্ষণতরে মেহেরবানী করে তুমি নিচের মোক্ষম তথ্যটি মনোযোগ সহকারে পড়ো ।

উপরের উল্লিখিত ঐ একজনই না, যাঁদের হাত দিয়ে বিলিতি বইওলারা তামাক খাচ্ছেন তাঁদের কেউই তো বলছেন না (কিংবা আমার হয়তো চোখে পড়নি)—অন্তত সেই সরল বিপ্রসস্তান (ইনি পণ্ডিত তথা বিপ্র—এ দুয়ের সংযোগে মানুষ বড় সরল, নেই হয়) বলেননি—

বিলিতি বইওলারা কত কমিশন পায় ?

আমানউল্লাহ মাতা রাণীমার আদেশে তাঁর বন্দী চাচা নসরউল্লাকে খুন করা হয় । স্বর্গত খবর রটলো, কফি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।

সংবাদদাতা বিলকুল ভুলে গেলেন মাত্র একটি সামান্যতম তথ্য পরিবেশন করতে । কফিতে ছিল সেই কো বিষ ।

এনারা এই কো বিষ অর্থাৎ কমিশনটির বাৎ বেবাক ভুলে যাচ্ছেন ।

কত কমিশন পায় ? জানি নে । তবে বঙ্গসস্তানদের ধারণা ২৫% ৩০%-এর বেশী হবে না, কারণ বাঙলা পুস্তক বিক্রেতা সচরাচর এর বেশী পায় না (হালে জনৈক প্রখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুদোম সাফ করার জন্য শতকরা ৪০।৬০ দিচ্ছেন বলে—পাঠক পরম পরিতোষ পাবেন, ওর মধ্যে আমার বইও ছিল—বাঙলা বইয়ের বাজারে ধুন্দুমার লেগে যায় ।) তাই প্রশ্ন, যে-স্থলে বাঙালী প্রকাশক দু' হাজার বই ছাপিয়ে শতকরা ২৫।৩০ কমিশন দেয়, সে স্থলে মার্কিন ইংরেজ এক ঝটকায় পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ছাপিয়ে কত দেয় ? কুইক টার্ন'অভার নামক একটি বস্তুর আছে । শুনছি এরা ষাট পারসেন্ট পর্যন্ত দেয় । আমি বলতে যাচ্ছিলাম আশী । তা বলবো না কেন ? তোমরা যখন এই জীবনমরণ ভাইটাল তথ্যটি চেপে যাচ্ছে । দেখাও না কাগজপত্র । আমি অবশ্য বিশ্বাস করবো না । তোমরা সব পারো ।

ঈশ্বর সাক্ষী, স্বরাজ লাভের পর থেকে সরকার বিস্তর বিস্তর আইন পাস করেছেন—আমি চাঁদপানা মূখ করে সব সয়েছি, রা-টি কাড়িনি । কিন্তু সরকার যখন এই কমিশন ব্যাপারের গৃহ্য, সম্বন্ধে লুক্কায়িত কমিশন তথ্যটি জানতেন বলে হুকুম দিলেন, “বাপধনরা যখন দশ টাকার বই চার টাকায়

পাছো তখন আর লাভ করতে যেয়ো না, শিলিঙের দাম ১'০৫, এক পাঁচই বেচো, কিনছো তো অষ্ট গুণ্ডা পোহা দিয়ে—” তখন উল্লাসে নৃত্য করে উঠলুম। আহা হা হা হা ! কী আনন্দ, কী আনন্দ !

সস্তায় বই পাবো বলে ? মোটেই না। বই এমনিতে পাবো না, অমনিতেও পাবো না। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেও পাইনি, এখনো পাবো না। শুনবেন, কেন ? বছর দুই ধরে আমি ধন্য দিচ্ছি, কয়েকখানা ফরাসী ও জার্মান বইয়ের জন্য (হিটলারের জীবনীটি সম্পূর্ণ করবো বলে। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাধ দিলে ১৯৩৪ থেকে অবধি আমি এ-বিষয়ে বই কিনেছি—কয়েক হাজার টাকার)। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে এক বাম্‌ছু শ্রী—রায় (ইনি এম-এ, সুশিক্ষিত সুপরিচিত) আমাকে জানালেন, আমি যদি প্রত্যেক বইয়ের—অর্থাৎ একই বইয়ের—পাঁচখানা করে কপি কিনি (!), তবে বিলিতি বইয়ের বুকসেলার আমাকে আমার প্রার্থিত বই আনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর ‘যুক্তি’, একসঙ্গে পাঁচখানা বই না কিনলে বুকসেলার কমিশন পান না !

এ প্রস্তাবটি এমনই উদ্ভাবনের বাতুলতা যে, কোনো পাঠকই এটা বিশ্বাস করবেন না। একই বইয়ের পাঁচখানা করে কপি নিয়ে আমি করবো কি ? পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা দ্রোপদীর পাঁচটি স্বামীই যদি একই রবর স্ট্যাশপের পঞ্চ-লাঞ্ছন, পাঁচ এ্যানকোর হতেন তবে তিনিও যে খুব সন্তুষ্ট হতেন না, অনুমান করা যায়। পাঁচ কেন, দুটো হলেই চিহ্নিত। আমার শোনা মতে এক রমণীর বিয়ে হয়, যমজ ভাইয়ের একজনের সঙ্গে। ভাশুর ভাদ্রবধু উভয়ই সম্ভ্রান্ত। শেষটায় সাবধানী ভাশুর আরম্ভ করলেন টিকিটিতে পূজোর সময় একটি জবা ফুল বেঁধে নিতে। শয্যায় পশ্মনাভকে স্মরণ না করা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে চৈতন-প্রভাস্তে হাত বুলিয়ে চেক অপ করে নিতেন, ফুলটি স্থানচ্যুত হয়নি তো ! কাহিনীটি শুনে ‘ইন্ডিজিং’ শিরামীয় একখান ‘পান’ ছেড়ে মন্তব্য করলেন, “টিকিতে ফুল ! তাহলে স্বামী নিয়ে fooling বন্ধ হল।”

পাঁচখানা বই—একই বই (পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, যে-ব্যবস্থাতে জে আমি হরবকং রাজী)—না কিনলে নাকি বাবুরা কমিশন পান না !

তবে আইস পাঠক, শৃংবস্ত্র বিবে—

কারণ বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে-পড়া একটি মাসিক থেকে (জুলাই, ১৯৬৪) বিজ্ঞাপনটি তুলে দিচ্ছি :

“Published in England at Rupees 105'00 you have the chance of buying them (the book is in six volumes)—under our NO-RISK money-back guarantee for a mere Rs. 72'00—a saving of 30% on the published price.”

অস্য বিগলিতার্থ—সাদামাটা খন্ডের হিসাবেই তুমি ৩০% কমিশন পাবে ; এবে শৃংধোই—অনাথা, অবলা বিলিতি বুকসেলাররা কত পাবেন ? যে দিশী কোম্পানি বোম্বায়ে বসে, বিলেত থেকে প্রাগুক্ত বই আনিয়ে এ-দেশে বিক্রি করছেন, তিনি বৃষ্টি আলা খয়রাতি হাসপাতাল খুলেছেন। তা হলে সাধু !

ঈশ্বর মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২০

সাধু !! সাধু !!!

বিস্ময়ে অধম নিব্বাক ! তবু অতি কষ্টে ক্ষীণ কষ্টে চি' চি' করে বলছি, অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন ন্দ্র মায়া ন্দ্র মতিভ্রম ন্দ্র—আপনাকে গ্রীষ্মের তপস্বী। মাফিক একই বইয়ের পণ্ডগব্য খেতে হবে না,—হল না—পাঁচ ঢালা গোবর খেতে হবে না—একই বইয়ের পাঁচ কাঁপ কিনতে হবে না ।

এস্থলে আরেকটি নিবেদন—বির্লিতি পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত বহুবিধ আক্রোশ আছে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জমে উঠেছে ঘোরতর বিতৃষ্ণা এবং আমি তাই আদৌ নিরপেক্ষ নই, আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রিন্সিপালিটির উভয়ই—দিশী পুস্তক বিক্রেতা ২৫% কমিশন পেয়ে, রোজা টাকা ঢেলে বই কিনে নিয়ে যায় আপন রিস্কে ; সে-বই বিক্রি না হলে তার পদুরোপদুরি সমুচ্চ লোকসান। প্রকাশক বই ফেরত নেবে না। বির্লিতি বাবুদা অর্ডার নিয়ে, কোনো কোনো স্থলে পদুরো দাম বায়না পকেটস্থ করে বইয়ের জন্য বিদেশে অর্ডার দেন। সিকি কানাকাড়ির রিস্ক নেই। এ যে কত বড় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য সে জানে বিক্রেতা ।

*

*

*

এবারে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন ; একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশ্যে—যারা আমার অক্ষম লেখনীপ্রসূত মন্দ-ভালো পড়েন। তাঁরাই বলুন, এই যে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি লিখছি, কখনো দলাদলিতে ঢুকেছি ? কখনো কাউকে আক্রমণ করেছি ? এমন কি আমি যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি ? হ্যাঁ, দু'একবার বাদ-প্রতিবাদে নেমেছি, যখন দেখেছি কোনো নিরীহ, বেকসুর, অখ্যাতি লেখক আক্রান্ত হয়েছেন কোনো 'বুর্লি' দ্বারা, যিনি তাঁর নামের পিছনে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সবকটা ডিগ্রীর ফিরিস্তি যাতে করে সাধারণ পাঠক, প্রাগ্ভূত নিরীহ লেখক এবং সম্পাদক স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং সর্বোপরি আতঙ্কিত হন—সেই নিরীহের পক্ষ সমর্থন করে। তখন সেই ফিরিস্তি-পুচ্ছধারী হামলা করেছেন আমার প্রতি। আমি তন্মুখেই নিরুদ্দেশ, কারণ, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো প্রয়োজনবোধ করিনি, সেকথা পূর্বেই সর্বিনয় নিবেদন করেছি। ইতিমধ্যে সেই নিরীহ কিছুটা সাম্ভ্রনা পেল যে এ-দুনিয়ায় অন্তত আরেকটা মূর্খ আছে, যে তার মতে সায় দেয়।

কেন নাহিনি ? আমার কলমে বিষ নেই ?

কিন্তু এবারে নামতে হল। ১৯২১ সালে যখন সর্বপ্রথম জার্মান ফরাসী পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি, তখন বির্লিতি বই বিক্রি করতো শূন্য বির্লিতিরা, এবং তারা কান পাকড়কে নিয়েছে ঢালাও হিসেবে এক শিলিঙের জন্য এক টাকা। তখন বোধ হয় শিলিঙের দাম ছিল দশ আনা। এটা নিশ্চয়ই 'দুনীতি' নয়। সেই সবল বিপ্রসন্তান বলেছেন, 'এতদিন পর্যন্ত বই এর ব্যবসার মধ্যে দুনীতি ছিল না বললেই হয়।' মোক্ষম তত্ত্ব এবং তথ্য। কারণ সে যুগে, এবং এই পশুর্দিন তক সরকার পুস্তকের ব্যাপারে কোনো নিরিখ, প্রাইস-শেডুল বা কেনা-বেচার সময় এক শিলিঙের জন্য কত ভারতীয় মূদ্রা নেবে তার কোনো

আইন করে দেননি (controlled price)। কাজেই ‘দুনীতি’র কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত এ নীতিটি মানবে কি? তুলনা দিয়ে শোধাই, আজ মাহের বাজারে আর কন্ট্রোল নেই; মাছওলা যদি কাদা চিংড়ির জন্য ১০ টাকা কিলো চায় তবে তো সেটা ‘দুনীতি’ নয়—মানবে গেরস্ত? দমদমা তো মানছে না। তাদের উপর এ-বৃশ্চের আশীর্বাদ রইল।

তখন কলকাতায়, বিলিতি বইয়ের ব্যবসাতে প্রাক্তন ‘সুনীতিতে’ টেটস্‌বদর টাকার হারিন্‌ট দেখে সে-বাজারে নাবলেন ‘লোটিভ’রা।

কিন্তু সেই ১৯২১ থেকে -র ইতিহাস লিখতে হলে তো এক কিস্তিতে হবে না। তবে লিখব।^৪

এ-সুবাদে সদাশয় সরকারকে আবার বলি তোমার রেশনের চাল অখাদ্য, তুমি ভেজাল কালোবাজার ঠেকাতে পারছো না, বিদেশ গিয়ে দু’মাসের জন্য রিসার্চ করে আমার দু’খানা বই শেষ করার জন্য কুলো দু’হাজার মার্ক চেয়ে-ছিলুম তুমি দাওনি, বিদেশী বই কেনার জন্য তুমি ক্রমাগত একসচেঞ্জ কমাচ্ছে (এবং যা দিচ্ছে সেও ছুতোর-কামারের টেকনিকাল বই আর পাঠ্য পুস্তকের জন্য—আমার কাজে লাগে না), ফলে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তুমি বিদেশী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে অসহনীয় মারছো—আমি রক্তভর প্রতিবাদ করিনি, করছি না, করবোও না। কিন্তু তুমি যে সেই বিদেশী বইয়ের দাম কন্ট্রোল করছো, তার জন্য আমি তোমাকে দু’হাত তুলে আশীর্বাদ করি। শংকর তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ভেবো না আমি স্বার্থপর। আমি বই পাবো না, এমনিতে না, অমনিতেও না। তুমি অটেল হার্ড কারেনন্সি ছেড়ে দিলেও না, না ছেড়ে দিলেও না। কেন, তার ইঙ্গিত বক্ষ্যমানে দিয়েছি। বারাস্তরে সবিস্তর।

হায়! কোথায় সেই কুটির আর সামনের সুদীর্ঘ পপলার গাছ! সরকার না একবার বেলিছিলেন, তাঁরা কালোবাজারীদের ল্যাপপোশ্টে ঝোলাবেন! পপলার গাছ অনেক ভালো। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। যদ্যপি আমি বৃশ্চ এবং শংকর খেদ করেন, ‘বৃশ্চস্তাবৎ চিন্তামগ্ন’ আমি কিন্তু ‘তরুণে আরক্ত’। তাদের প্রতি এই সুবাদে একটি সদুপদেশ দিই; দুষ্টেরা তোমাদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উপদেশ দেবে; সরল কনসাল্টেটগুলো তার জন্য ব্যবস্থা করবে এবং করছে।

৪ এস্থলে নিবেদন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তথা দুর্বলতাবশত আমাকে মাঝে মাঝে পত্রিকায় ‘পঞ্চতন্ত্র’ বৃশ্চ করতে হয়। সাতিশয় প্লাঘা সহকারে স্বীকার করছি তখন কোনো কোনো পাঠক সম্পাদকও আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে কখনো মিঠে কখনো কড়া চিঠি লেখেন। (যে সব বিচক্ষণ জন আমার লেখা অপছন্দ করেন, তাদের সাস্থ্যনাথে বলি, I am a fool; এবং প্রবাদ আছে “One fool raiseth a hundred”)। কাজেই পরের কিস্তির গ্যারান্টি দিতে পারি না বলে আমি সন্তুষ্ট।

কিন্তু অমন কম্বটি কোরো না। বিদেশী বই না কিনতে পারলে বিদেশী ভাষা শিখে তোমার লাভ? এ যেন একগোছা চাঁবি নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সিন্দুক কিন্তু একটাও নেই! এ যেন রশি নিয়ে হাওয়ার কোমর বাঁধার মত বন্দ্যাগমন? এবং পারলে বাঙলাটাও শিখবে না। বলা তো যায় না, সে-বাজারেও কোনদিন কি হয় না হয়! হয়তো একই বই পাঁচ কর্প কেনবার বায়নাঙ্কা বাঙলা পুস্তক বিক্রেতাও করবেন এবং—অথবা পাঁচ টাকার বইয়ের জন্য সাত টাকা চাইবেন। আগের থেকে সাবধান হওয়া বিচক্ষণের কর্ম। কেন, নিরক্ষরদের দিন কাটে না এদেশে? টিপসই দিয়ে চালাবে।

আমি ভালো করেই জানি, এ প্রবন্ধ ইংরিজিতে লিখলে ধুধু-মার লেগে যেত। কারণ, তাহলে হয়তো বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের চাই, বোম্বাইবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত সদানন্দ বিটকল এটি পড়তেন (শুনছি, বোম্বাইওয়ালারা নাকি এ বাবদে কলকাতাকে কষে দেয় না—বড় আনন্দ হল)। যারা বাঙলা জানেন, তাঁরা যদি হুহু-কার সচিৎকার ‘যুদ্ধং দেহি’ রব ছেড়ে আসরে নামেন তবে আমি প্রস্তুত।

শুধু দয়া করে পরের হাত দিয়ে তামাক খাবেন না।^৫

সুপণ্ডিত বিপ্রসন্তানকে ডোবাবেন না। অবশ্য তাঁর যদি ব্যবসাতে শেয়ার থাকে তো আলাদা কথা। আমার বিশ্বাস তাঁর নেই।

আর সরকার যদি শেষটায় কন্ট্রোল তুলে নেন—মাছের বেলা যা হয়েছে—তা হলে আশ্মো শেয়ারের সম্বন্ধে বেরদুৰ। টাকা নিয়ে কথা, মশাই। তার আবার সুদনীতি দুর্নীতি কি?

ঝুলবই না হয় একদিন পপলারের মগডালে। ক্রুশবিন্দু ক্রাইস্টের দুদিকে আরো কে যেন দুজন ক্রুশবিন্দু হয়েছিল।

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রবাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই সদ্যটের বড়ফাটাই নিয়ে সেখানে মস্করা জমে ভালো।

সদ্যট বাবদে একদা মহামুর্শকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষি কুলীন

৫ যেসব ভারতীয় বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি আপ্ত বাক্য প্রযোজ্য। প্রাস্থের নিমন্ত্রণে এসেছেন এক সদ্য বিলেত-ফর্তা—ইভারিং জ্যাকেট, বয়েলড শার্ট পরে। অতি কষ্টে পিঁড়িতে বসতে বসতে বললেন, ‘মুর্শকিল, বাঙলাটা ভুলিয়া গেছি।’ রবিঠাকুর নাকি শুনেন বললেন, ‘সত্যি মুর্শকিল হে ভড়, ইংরিজটাও শিখলে না; বাঙলাটাও ভুলে গেলে!’

সদ্যটের মত ডালভাত—সরি, আই মীন বেকন-আন্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিত্তেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দৃষ্টিতে—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ছেঁঁ মেয়ে শিকার করে ঘর বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিছি গল্পটি অন্য কারো বাবদে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এস্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লাস্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বার বার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী—কার্জনের মুসলমান-প্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভরু-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা ত্যুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃথাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বার করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরী করতে হবে। ইউরোপময় হাহাকাররব উঠেছে, ‘বব’র মুসলমান তুর্ক ‘সুসভা’ খ্রীষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার ‘হককের’ (বে-) দখলী জমি থেকে—নতুন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফ্যাতাক’পি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা ঘাতে চোস্ত-দুরস্ত হয় সেজন্য লজান বৈঠকে পাঠানো হল তামাম ইউরোপের কুটিলস্য কোটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গন্ডা দশেক সদ্যটকেশ ট্রাক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপাশ্বত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাষাটি ভাজা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সস্তপণে নামানো হল একখানি ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-ঘাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটির উপর পা না রেখে দৃ’দৃ’দ বসতে পারেন না। এটে দেখা মাত্রই এক ঠেটি-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপননী কাটলে—“ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!” (Voilà le trone de Damas!) —“ঐ হেরো, দামাস্কাসের সিংহাসন”—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ কার্জনের ‘চলচৌকি, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য। তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবাস্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেনু)।

জোর কনফারেন্স, জোরালো উপ-কনফারেন্স, সাবকমিটি আরো কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজি বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনূবাদ করে দিতে হয়—স্বাভার ততক্ষণে ঠান্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ

পারবেন কেন অরেটর কার্জ'নের সঙ্গে ? তবু চললো লড়াই ।^১

সন্ধ্যাবেলা এ'রা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন । আজ এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডান্স, পরশু জীনিভা হুদে নৈশভ্রমণ ।

এক সন্ধ্যায় কার্জ'নের ভ্যালেরী তাকে ষথারীতি অত্যন্তম ডিনার সন্দেশ পরিবেশ দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, “আজ আর তুমি আমার জন্যে জেগে থেকো না ; ফিরতে অনেক রাত হবে । আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন ।” এ যে কত বিরূপ সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না । এসব লর্ড'রা ভ্যালেরী সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্ট্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না ।

ভ্যালেরী ছিল কার্জ'নের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালেরী সম্প্রদায় । বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড । ১১ সেকেন্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরী, রেডিমেড বো । অন্য লোক এ স্থলে সে সম্ভ্রম এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারচা করে নেয় । খানদানী কার্জ'নের বেলা অবশ্য এ সম্ভ্রম করতে যাবে কে ? বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালেরী লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেন্ডে আসতে পেরেছিলেন । লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা হলে সোল্লাসে বলতেন, “লিঙে, এবার কেবল ফতে করেছ—মাত্র বারো সেকেন্ড !”—উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক ।

কার্জ'ন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে ‘ব্রোন দ্য দামা’ বা ‘দ্বিমিশ্রকের ময়ূর সিংহাসন বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্ভ্রম ইংরেজী এনসাইক্লপীডিয়া, ফরাসী লিড্রে, জার্মান ব্রুকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব । বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন । কিন্তু সে রাতে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জ'ন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন ।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরূপ হল জুড়ে লেগেছে ধূস্রমার নৃত্য—সে রাতে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্যান্স । তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফটে । যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি ? বহুই যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে । উৎকণ্ঠিত শটাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় রুচিসম্মত পশ্চাতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া যুবতীর সঙ্গে ।

সর্বনাশ ! ও গড !! এ যে তাঁরই ভ্যালেরী !! নাচছে তাঁরই ইভলিং

১ কার্জ'ন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন । অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, “না, না, আমার আর কী কীর্তি ! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ ।”

ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সঙ্গদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন ক'ষ্ট যোগ দিয়ে বলবে, আহা, বেচারী ভেবেছিল কস্তার ফিরতে যখন ঘেরি হবে তখন সে-ই বা দৃ'চক্কর নেচে নেয় না কেন ?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই ? কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোন এক পরিচিতির বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামন সেজে পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে টিপটিপ করে পেঁমাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন রস দিয়ে বর্ণণাতে হয় ?

*

*

*

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চা'পিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লন্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালো যেন তন্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ ? আদৌ না। এ তো সবে শুরুর।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শূয়ে শূয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালো ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকোচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী শূধোলেন, “কি হল ?”

কাঁচুমাছু হয়ে বললে, “হুকুমের, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলদুনগুলো গেল কোথায় !”

লক্ষ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো পাতলদুনগুলো গেল কোথায় ? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রাইপ্ট্ অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলদুনগুলো কোথায় ? সেগুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন হুকুমের কনফারেন্সে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুখুল কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াস-কিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবনমরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্দু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্মস-রবার্টসন লন্ডনে—এবং তাঁর সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধূসর রঙের ডোরাকাটা স্ট্রাইপ্ট্ ট্রাউজারজ—তার তো কোন চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ ! এখন উপায় ?

গইয়া পাঠক—যতই ধানাইপানাই করি না কেন, আশ্মো এখনো তাই—তুমি বলবে, কেন অন্য পাতলদুন পরে গেলে হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কম্পিন, উপরে দশালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমন্ডলু নিয়ে আধুনিকদের বদ্যে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে ? সে কথা থাক।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালোর চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোর্ট-ওয়েসকিট

ম্যাচিং-টাই-কলার পেটে-ট-লেদার জুতো মায় প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন ?
এস্টেক ডাইমন্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে । উ'হু, তা নয় । নিশ্চয়ই সুখমাগ
ভাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য ।

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ । পাক্‌ডো রাসকেলকো ক'হী ভী হোয় টেরেন্ মে—
চাহে প্যারিস, চাহে লনদন !

সে না-হয় হল । কার্জ'নের রোআবে বাঘের দূধের অর্ডার আকছারই যায়
টেলিগ্রামে ।

কিন্তু স্ট্রাইপট্ ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীর দুধও নয় ।
আপাতক সে বস্তু মেলে কোথা ? ওদিকে প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে
আসছে । হে ভগবান ! প্রতি মূহূর্তের এ কী গম্বয়শ্রুণা !

* * *

এমন সময় করিডোরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিংকার হই-হুল্লোড় ।

পাওয়া গেছে ! পাওয়া গেছে ! কোথায় ? কোথায় ?

যে মেয়েটি ভ্যালো, চাকরবাকরদের কুটুরিগুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়ে-
ঝেড়ে দেয়, সে কার্জ'নের ভ্যালোর তোশক ঝাড়তে গিয়ে দেখে তার নিচে পরি-
পাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপট্ পাতলদুন । আমরা,
গরীব দুঃখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমাঝে স্ল্যাট পরতে হয়, তারা জানি,
পাতলদুনের ক্রীজ দূরস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মৃষ্টিযোগ নেই ।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জ'নের সৌদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল ॥^২

ভূতের মুখে রাম নাম

বে-কোনো ভদ্রসন্তান শ্রান্ত হবে । প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঝাড়া দশটি মিনিট গা-গা
রব ছাড়বে । অপেক্ষাকৃত রোগাপটকা ভিরমি যাবে । খবরটা এমনই অবিশ্বাস্য ।

মানুষের তৈরী বেঙ্গল ফ্যামিনের সময় এক অজানা কবি রচেন,

দেখো না আজব হয়,

এ হেন ভূতের পায়

স্বস্তিবাচন

করা নিবেদন ।

এ যেন প্রেতের গায়

উম্মা উম্মা আতর মাখানো ভূরভূরে খুশবাস ।

এ যেন দুখিনী মায়

Ameryর কাছে শিশুটির তরে

ভিক্ষার চাল চায় ।

২ কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রাইচই ন্যাকি
ইটি সঙ্কলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন । আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনছি ।

খবরটা এর চেয়েও বিংকুটে।

ক্লান্সের বিখ্যাত উপন্যাসিক ফ্লোবেরের^১ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদাম বভারি ক্লান্সে এখন থেকে ছাপা যাবে, বেচা যাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া শুধা বইয়ের দোকানে পেটি রেখে খশের আকৃষ্ট করা বেআইনি !

কেন ?

বইখানা অ্যামরাল, ইমরাল (immoral) অর্থাৎ দুনীতিপূর্ণ, এক কথায় অশ্লীল। বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের লেগেছিল পূর্ণ চারটি বৎসর—কিঞ্চিৎ অধিক—১৮৫২ থেকে ১৮৫৬। প্রটটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার পূর্বে তিনটি বৎসর। এই ছোট বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের এতখানি সময় লাগলো কেন ? তার প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মাত্রাধিক পির্টিপটে পারফেকশনিস্ট। বাস্তব জগতের পরিবেশ যেমন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, (অন্য উপন্যাসে একটি রোমান ভোজের নিখুঁত বর্ণনা দেবার জন্য তিনি নাকি প্রাচীন ক্লাসিক্স ঘাঁটেন—কেউ বলে ছ'মাস, কেউ বলে দু'বছর)^২ ঠিক তেমনি তার স্বপ্নলোক কাগজকলমে ম'ময় করার সময় তিনি চাইতেন সেটা যেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হয়, এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি সেন্‌টেন্স যতক্ষণ না তার নিখুঁত ভারসাম্য পায়, তার প্রত্যেকটি শব্দ অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে যতক্ষণ না উন্নয়নাতীত হয়, নিটোল স্‌ডোল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরের সেন্‌টেন্সে যেতেন না, কিংবা বলবো, যেতে পারতেন না, যেন আগের সেন্‌টেন্স তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধরে বলছে, 'আমাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিয়ে তবে তুমি এগোও।'

এমন দিন বহুবার গেছে, যে দিন ফ্লোবের মাত্র একটি ছরের বেশী লিখতে পারেননি ! এটা কিংবদন্তী নয়। নইলে চারশ' পাতার বই লিখতে চারটি বৎসর লাগবার কথা নয়। এবং স্মরণ রাখা উচিত, 'ফ্লোবের যখন কোনো বই লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন সেইটে নিয়েই অক্লান্ত মেতে থাকতেন। পেটের ধাম্বা তাঁর ছিল না, তাঁর শ্বেখভাল করার জন্য লোকের অভাব ছিল না, তিনি চিরকুমার, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখার টেবিলে বসতেন, বাড়ি ছেড়ে পারতপক্ষে রাস্তায় পর্যন্ত নামতেন না, অথচ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লিখেছেন মাত্র খান-আটেক বই।

১ উচ্চারণ ফ্লো, তার পর ব্যার। ফ্লোব্যার লিখলে সাধারণ বাঙালী ফ্লোব্যার পড়ে বসতে পারে ; সেটা হবে ভুল। এটে বাঁচাবার জন্য পূর্ব-সুরিগণ লিখতেন ফ্লোবেরার বা ফ্লোবের।

২ এদেশের উপন্যাসে প্রায়ই পড়ি, বিলিতি বড়সাহেব বা বিলেতফের্তা ন'সিকে এটিকেট-দরস্ত সাহেব 'জুতো মস্ মস্ করে চলে গেলেন।' জুতো জোড়া মস্ মস্ করলে এদেশের টাশিসাহেবও সেটা ভেজাছালার উপর রাতভর পেতে রাখে। সামান্যতম মস্ করলেও বশুদ্বন্দ্ব মস্করা করে বলে, 'দাম দাওনি বদ্বি ! বেচারী যে চিংকার করে করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'।

মোটামুটি ভালো বই হলেই আমরা সেটাকে বলি ‘রসোত্তীর্ণ’, খেয়াল না করেই বলি ‘পাঁস অব আর্ট’, কিন্তু সত্য সত্য যদি কোনো একখানি বইকে শব্দার্থে ‘পাঁস অব আর্ট’ বলতে হয় তবে সে মাদাম বভারি। এর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি লিখেছেন ফ্লোবেরের পুত্রপ্রতিম প্রিয়শিষ্য মোপাসাঁ। তাঁর ভুবন-বিখ্যাত ‘নেকলেস’ গল্পে পাঠক ফ্লোবেরের প্রভাব দেখতে পাবেন। বস্তুত বভারি বেরুবার পর সে-যুগের ফরাসী কৃতী লেখকদের বড় কেউই এর প্রভাব থেকে নিষ্ফ্রতি পাননি। একমাত্র এরকম বইকেই ‘পাঁস অব আর্ট’ বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে এই ‘কাব্য’ প্রকাশিত হয়—আজো নবীন লেখক নবীন পাঠক এ-পুস্তকের শরণ নেন।

মোপাসাঁ তাঁর গুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টি প্রবন্ধ লিখেছেন। আজো যারা ফ্লোবের নিয়ে আলোচনা করেন তারা এ দৃষ্টি প্রবন্ধের বরাত না দিয়ে পারেন না।^৩

৩ প্রবন্ধ দৃষ্টি বেরোয় মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটির (করেস্পন্ড্যান্স) সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে। এ-পুস্তকে পাঠক পাবেন মোপাসাঁর অন্যান্য রচনা সংগ্রহ। গল্প-লেখক মোপাসাঁর খ্যাতি ‘ব্যাল ল্যাংগিস্’ (‘রম্যরচনা’ তথ্য প্রবন্ধ-লেখক) মোপাসাঁকে এমনই গ্লান করে দিয়েছে যে, ফ্রান্সের বাইরে কেউ মোপাসাঁর এসব লেখার সম্বন্ধান বড় একটা করে না। এ পুস্তকে পাঠক পাবেন, বালজাক, জোলা, তুর্গেনিফ (একাধিক), সুইনবার্ন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় প্রামাণিক প্রবন্ধ। এবং সব চেয়ে কৌতুহল-উদ্দীপক—পাঠক এতে পাবেন, মোপাসাঁ কোন্ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন। জোলায় গ্রামের বাড়িতে একদিন গল্প বলার আর্ট, এবং সে আর্টের রাজা তুর্গেনিফ ও মেরিমে (চারু বাড়িঘরে এঁর বই ‘কলবা’ ‘আগুনের ফুলকি’ নাম দিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর হল অনুবাদ করেন,) সম্প্রদায় কথা উঠলে জোলা প্রস্তাব করেন, সে-মজলিশের সবাইকে একটি একটি করে গল্প বলতে হবে। গল্প বলেন জোলা, হ্যোমান্স সেআর, এনিক এবং সব চেয়ে বড় কথা মোপাসাঁ স্বয়ং। সেই তাঁর প্রথম গল্প। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহের সঙ্গে। যেহেতু জোলায় বাড়ি মেদাঁতে গল্পগুলো বলা হয়, চর্যনিকার নাম হয় ‘মেদাঁর সোয়ারে’। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি মোপাসাঁ ফ্রান্সে বিখ্যাত হয়ে যান। ফ্লোবের তখনো বেঁচে। আন্তরিক অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন তরুণ লেখককে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জোলায় চাপে না পড়লে কি হত! কারণ এর পূর্বে মোপাসাঁ নিজেই জানতেন না, কথাসাহিত্যে তিনি কী অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটি ও প্রবন্ধাবলীর পরিচয় আমি অন্যত্র অতি সংক্ষেপে দিয়েছি। এ বাবদে দৃষ্টি সংকলন আছে এবং যেহেতু এ-দৃষ্টির ইংরিজি অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, তাই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি :

* 1. Rene Dumesnil, chroniques, Etudes, Correspondance de Guy de Maupassant, publiees pour la premiere fois

এ ছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে ফ্রান্সের মৃত্যুর পর তাঁর হয়ে একাধিক লড়াই দিয়েছেন। এসব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আইস, পাঠক, প্যারিস যাই।

কিন্তু প্যারিসের বর্ণনা দেবার মত কোথায় আমার বীর্ঘবল, কীই বা অধিকার! তাই আমার যেটুকু দরকার সেটুকু নিবেদন করি।

সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্যারিস যত না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশী চেঁচিয়ে দুনিয়া ফাটিয়েছে, লিবারতে (liberty), লিবারতে, তুজদর (চিরন্তন) লা লিবারতে। সে চিংকারে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন গোটে থেকে শত্রুর করে মিশর-ইন্ডিয়া পেরিয়ে চীন দেশের সুন ইয়াট সেন পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার বিকৃত রূপ দেখা দিল তার সামাজিক জীবনে তার আমোদ-আহ্লাদে। পুরুরী নুলিয়ারা যে বহাডুরের পরিপূর্ণ বহাভরণ পরিধান করে সমুদ্রে নামে, কিংবা আমাদের জেলেরা মাছ ধরার সময়, সেই পরে মেয়েরা প্যারিসে নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। এবং শুধু যে আপন-ভোলা নটরাজের জটার বাঁধন খুলে যায় তাই নয়, দিব্য সচেতন অবস্থায়—যাক্ গে, পূর্বেই বলছি, যতখানি ‘জাতাস্বাদো বিপুল-জঘনাং’ হলে পর প্যারিস বর্ণনের শাস্ত্রাধিকার জন্মে, আমার ততখানি নেই।

এই বাতাবরণের মাঝখানে ফ্রান্সের এতই সংযত সমাহিত যে, আজকের দিনের ‘মডার্ন’রা তাঁকে রীতিমত চেঁচিয়ে গালাগাল দেবেন, কাপুর্স তোমার সহস নেই (কাপুর্স! তোমার সাহস নেই—পাঠক ‘সামবাজারের সসীবাবুর’ মত ‘স’-গুলো উচ্চারণ করবেন!)।

বইখানা পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়ে পুস্তকাকারে ছাপা হবে এমন সময় ঘটলো বিপর্যয়।

আল্ফ্রয় মালুম কোন শত্রুদেব ঠাকুরের সুপরামর্শে—তখনো তো দ্য গল জর্মান নি—ফরাসী সরকার লাগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ—মিনিষ্ট্র অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন, ওই সময় থেকেই বোধ হয় প্যারিসের যদো-মেধো ওর নাম দেয়, মিনিষ্ট্র অব পাবলিক ডিসট্রাকশন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বভারি পুস্তকের মাধ্যমে দেশের দেশের নীতিধর্মের সর্বনাশ করছেন! সোজা বাংলায় তাঁর বইখানা অশ্লীল, কদম্ব!!

‘অশ্লীল’ শব্দটা একথা শুনে হেসে উঠলো না তো?

সেই যে-রকম ঢাকাতে সোয়ারি কম ভাড়া হাঁকলে রসিক কুটি কোচম্যান ফিসফিস করে বলে, ‘আন্তে কন, কস্তা, ঘোড়ায় হাসবো!’

এবং কার মূখে এই অভিযোগ?

avec de nombreux documents inedits, Gruend, Paris, 1938.

2. Artine Artinian & Edouard Maynial, Correspondance inedite de Guy de Maupassant Wapler, Paris, 1951.

প্যারিসের মদুখে ! তাজ্জব, তাজ্জব ! গজ্জব, গজ্জব !!
 প্যারিসিনীর পরনে তখন কি ? A la নুদলিয়া নয় তো ?
 তাই বলছিলাম,

এ যেন প্রেতের গায়
 শানেল আর উ (h) বিগাঁ মাখানো
 ভুরভুরে খুশবায় !
 কিংবা রাষ্ট্রভাষায় :

আরে তেরা লড়কেকা
 আজব তরেহ্ কা খেল
 ছুচ্ছুন্দর কা সিরপর
 চামেলী কা তেল !

(“তোর ছেলেটার আজব কীর্তি ! ছুঁচোর গায়ে মাখিয়েছে চামেলির তেল ।”
 কি রকম চামেলি ? ‘বাদল শেষে করুণ হেসে, যেন চামেলি কলিয়া !’)

পাঠক ভাবছেন, আমি রগড় দেখে, the utter absurdity of it ভুতের
 মদুখে রামনাম শুনেন বে-এস্তেয়ার হয়ে উচ্ছ্বসিত গঞ্জিকা বিলাস করছি ?

আদৌ না । আর করলেও আমি আছি সংসঙ্গে, ইন গুড কামপনি !

মোপাসাঁ মোকদ্দমার সাতাশ বৎসর পরে মস্করা করে বলেন, “সরকারী
 পক্ষের উকীল যে-ভাবে ফ্লোবেরকে আক্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষ ‘বস্তিমে’ ঝাড়েন,
 একমাত্র সেই কারণেই তাঁর নাম মার্কা-মারা (marque) হয়ে থাকবে ।
 কিন্তু প্রশ্ন, উকীল মিসিয়োট মোকদ্দমা আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর নাম —
 Pinard-টি—বদলালেন না কেন ?”^৪

পিনার এক রকম মদ ।

মোপাসাঁর বস্তু্য : বস্তিমে ঝাড়বি ঝাড় । হামলা করবি, কর । কিন্তু
 দোহাই ধর্মের, সাদা চোখে কর । পিনার—হুঃ—শুঁড়ি এলেন শ্রীলতা বাঁচাতে ।
 এ যে দঃশাসন এল নুদলিয়াকে জোশ্ব পরাতে ।

এর পরও মোপাসাঁ আরেকথানা সরেস মাল ছেড়েছেন । কিন্তু হায়, সেটা
 তুলে দিলে লালবাজার চোখ লাল করেই ক্রান্ত হবে না !! যে উইল বি আফটার
 মাই রেড্ ব্লাড !!!

৪ ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর জর্জ সান্ড্ (George Sand)-কে লিখিত
 তাঁর প্গাবলীর ভূমিকারূপে মোপাসাঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ; উদ্ধৃতিটি
 সেই প্রবন্ধ থেকে ।

সান্ড্, সাঁড, সাঁদ—এ তিনটেই শাস্ত্রসম্মত । কিন্তু দিল্লীবাসীর সবস্ত-
 প্রদত্ত ফতোয়া যে ইটি স্যান্ড্—কোথাও নেই । সাদামাটা “এ” হরফটির
 উচ্চারণ একমাত্র ইংরিজী ছাড়া কোনো ভাষাতেই এ্যা হয় না । অবশ্য ai, au,
 ae বা a-র উপর দুটি ফুটক থাকলে (উমলাউট) ভিন্ন কথা ।

“শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়”

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছ্বলতা নাম দিন, প্যারিস একটি সংগৃহের জন্য বিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জার্মান কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বেই বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তার স্মরণে প্রতিবাদ জানায়।^১

এ শতকে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব-কথা ছিল এই যে, যেসব কুপমন্ডুক দেশ কোনো বিশেষ ধরনের বই ছাপতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদবাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরাজী পড়নেস্তালা টুরিস্ট গিলত গোত্রাসে। তখনকার দিনে রোজা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিভী বই বিক্রী করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার বাবা (আশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না)। ‘গ্লান সিনার রেইজেৎ এ হানড্রেড’—‘এক পাপীকে দেখে এক’ জন পাপ পথে যায়’ আমিও তাই তাদেরই অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রিন্সিপিটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাস্বক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কষ্টম কর্মচারী সে-যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাকের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপমালা। স্লেচ্ছ মসলমানদের খৃষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এস্তোর।

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডকে উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগলমে^২। অভিযোগ! তিনি “ইমরাল” (দুর্নীতি প্রচারকারী), অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গিটের ছ পণ খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রীকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটিমাত্র কুয়ো আছে, তাতে সে লাশগুলো ফেলে

১ সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেলার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পদলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনি আসামী ভেবে পদলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পদলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভুরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনো হেতু নেই। ..এ সব কিংতু আমার শোনা কথা।

দিয়ে জল বিষয়ে দিলেও বৃষ্টি ক্রোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, “ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনারেল পিনার! (শর্দি মশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন “শর্দির শালা চামার!”)। ক্রাস্‌মের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে রইলে!”

ক্রোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শব্দ ক্রাস্‌স নয়, ক্রাস্‌মের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাপ্‌ল্যা জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কবার হয়েছে সেটা আঙুলে গুনে বলা চলে। গুণীরা বললেন, “যা বলো, যা কও, বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভার, মাস্টারপীস।”

মোপাসাঁ অতিশয় সন্নিয় লিখলেন, “সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ? বেরলুম সেই চীজের সম্বন্ধে যারা মহামানব, যারা সাহিত্যচর্চা তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেন্স, প্লাউটস, আপুল্লিয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়ার, রাবলে, বক্‌কাচুচো, লা ফঁতেন, স্যাতামাঁ, ডলভের, জ্যাঁ জ্যাক রুসো, দিনেরো, মিরবো, গোতিয়ে, ম্যুসেঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলাম না এঁদের কাছে।”

ফিরিস্তা উচ্চাঙ্গের সম্ভেদ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং ফরাসিস—মহারথীর এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনো মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেন্টের কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনো কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ্‌এর “জর্নাল” বা রোজনামচাখানা ফের উল্টে-পাল্টে দেখিছিলাম, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।^৩

২ Aristophanes, Terence. Plautus, Apleus, Ovid, Virgil, Shakespeare, Rabelais, Boccacio, La Fontaine, Saint-Amant, Voltaire, J. J Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Musset etc. etc.

ফরাসি জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে “আপনাতো” জানে ॥

৩ অধুনা এদেশে নাকি “তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা” পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন। এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ্‌, দ্বিতীয়জন জার্মান—হ্যুগার (স্ট্রালুগেন) এবং তৃতীয়জন সুইস—ফ্রিশ (টাগেবুখ)—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূল Weltanschauung যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।... পাঠক সবিম্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ফরাসী

পুস্তকাস্তের নিঘণ্টুতে দেখি, জিহ্ব প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যপ্রণীতা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধু-মিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিহ্বই “গীতাঞ্জলি” অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহাণ্ডবদের কথা হচ্ছে না; ম্যাক্সমুলার, লেভি, উইনটারনিংস, সাষাও (অল-বীরুনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা সাহিত্য-রস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তু জন্ম অস্ত্রাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যাটে রোলী (তিনিও সৃষ্টির চেয়ে সত্যের সম্মান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনো খবরই পাবো না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

মূল কথায় ফিরে যাই : মোপাসাঁ লিখছেন, “রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে “নীতি” “সাধুতার” দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লোবের) নিজেই বলেছেন, ‘যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্বমহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্রীতদের ‘সদুপদেশের’ (উদ্দেশ্য চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।’

(“Depuis qu'existe l'humanité, disait-il, tous les grands écrivains ont protesté par leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants”)^৪

গুরুদত্ত এই আপত্তিটুকু সম্মান উদ্ভূত করে মোপাসাঁ বলছেন, “সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোন সম্পর্ক নেই। উপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সদুপবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা

জিহ্ব কী মৈত্রীর চোখে জার্মানদের এবং জার্মান যাদুগার ফরাসীদের প্রস্থার চোখে দেখেছেন! এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজি বই ভিন্ন বাদবাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তকবিক্রেতাদের ‘কেরপায়’ পাইনি। ঈশ্বরব্রাহ্মে যারা পপলার গাছ পোতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাক গে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদের শূদ্রোই—আমার বাস মফস্বলে—আচ্ছা আজ যদি কোনো বস্তু বা হটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি একসঙ্গে জন্ম পুস্তকদের পায়ে তেল দিতে হয়? বোধ হয় না। কারণ তারা যে বর্ষর। আর আমরা সভ্য। “মহা-মানবের তীরে” বাস করি।

কিংবা অভিসংপাত দেওয়া, অথবা তথ্যতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচারকর্মের ‘মিশনারি’ সে নয়) । এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনো গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না ।

তৎসঙ্গেও কোনো সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা ‘malgre l’auteur’ ‘inspite of the author’, সেটা লেখকের ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেই সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে ।”

অর্থাৎ ‘আনকল টেম’স্ ক্যাবিন’ যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে, যদি এমিল জোন্সার ‘জাঁ ক্যুজ’ (‘আই এক্যুজ’=‘আমি ফরিয়াদ জানাই’) ৫ মিলিটারি স্বেবর্তনকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকটির অনাড়ম্বর সঞ্চারে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে ।

মোপাসাঁ বিশদ্রুপ আর্ট, আর্টে প্রীলতা-অপ্রীলতা নিয়ে আরো অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক ।

ছুঁৎবাই রোগে আক্রান্ত ‘পাদি পিসি’ সব দেশেই আছেন—তবে ফ্রোবের-মোকন্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পাদি পিসির বড়ই মুষড়ে যান । বস্তৃত ফ্রোবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেঁতুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে । ফ্রান্সের যে মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্রোবেরের বিরুদ্ধে মোকন্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিস্ট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না । সে খবর শ্রুতে পেয়ে কটর জাত-নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, “এ আবার কি রকমের লিবাটি—যে লিবাটি মানুসকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না ?”

বভারি মোকন্দমার একশ’ বছর পর আবার পেঁতুলাম অন্য প্রান্তে গেছে । টপ্লেস ডাইনি পোড়বার জন্য ফ্রান্সেই এখন সব চেয়ে পুঁলিসের দাপট, নাইটক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই । আমাদের অবশ্য তাতে কিছুটা বলবার নেই ।

কিন্তু একশ’ বছর পূর্বে যে বভারির বিরুদ্ধে মোকন্দমা করে মার খেল

৫ বইখানা অবশ্য মোপাসাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে শূন্য ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে । আমি বিশেষ করে এ-বইখানা যে উল্লেখ করলুম তার কারণ, প্রবাদে আছে “পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড” “লেখনীর তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী”—এবং এই বইখানি তৎকালীন ফ্রান্সী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমস্ততাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে । আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ ।

ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বভারির সর্বাস্থে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবন্ধ করতে ! হিটলার যখন ‘পবিত্র’ জার্মান ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, “জার্মানী-পুটস দি ব্লক ব্যাক !” ফ্রান্সে যে তারই পুনরাবৃত্তি ! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ ।

দ্য গল লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয় । যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দৃষ্ট দৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হতেন । প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দম্মার মত তিনি এমনই অতি অস্পষ্টে ঠোঁট ফোলাতেন, গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠান্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কি না মস্টার মত দেখাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ্য করে লেখেন “We felt that his qualities were marred by hypersensitive-ness and an extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed the heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others.”^৭

মোগল পাঠান হৃদয় হল ফার্সী পড়ে তাঁতী । চিত্রে বাঘের চিত্তির মূহুর্তে লেগে গেছেন ম’সিয়ো ল্য জেনেরাল শার্ল দ্য গল । না হলেই তো ‘চিত্তির’ ! তবে শূন্যেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাত ছায়া আছে । তিনি নাকি মাদাম । তিনিই নাকি ফ্রান্সের নব জোয়ান অব আর্ক পদ পিসি ।

এ-সুবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোয়ার্ডও নাকি কয়েকটি পদ পিসি দোস্ত ছিলেন । তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, “ভাই, তুমি লেখো ভালো ; কিন্তু তোমার কোন বই-ই নিঃসংকেচে পুস্তকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না । একথানা ‘ক্লীন’ বই লেখো না কেন ?”

জোলা ঢোক গিললেন ।

সে বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রান্স বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শূরারটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেসফুল (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধু-জনের অনুরোধে পাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বগগোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই “এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি” দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মূশকিল হয়—হি ডাজ ইট মোস্ট গ্রেস্‌লেস্‌লি । তারপর তিনি বলেন, আই

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে “আপ্যায়িত” করেন তার নাম ‘বদোআর’ । শব্দটির বদ্যৎপাতি নিয়ে সম্বন্ধ আছে । অনেকেই মনে করেন এই “বদ্যৎপাতি” = “to Sulk” = “অভিমান করা” থেকে এসেছে ।

৭ ফ্রুসেড ইন্ ইউরোপ, পৃ. ৪৫৬ ।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২১

প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালোইং ইন মাদ্—মসিয়ো জোলার নব্বমাতে হুটো-পুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশী ॥৮

*

*

*

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে—ইয়াল্লা !!

‘অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়’

অভিজ্ঞতাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোন কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়মঃ মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে ষাওয়ার পর চিরদুর্নি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেনঃ বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড় করার জন্য, হাস, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুদ্ধলব্ধ, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতাস্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখাঃ বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু’একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন?—কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এস্তের অটেল। অল ইন্ডিয়া রেডিও তো দিব্যারান্তির গান গাইছে। মৃশকিল শব্দ, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দু’খানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদৃশপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাবের সামনে সমস্যা, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে—কি করে বলি, কলকাতার কোনো কোনো লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের শরণা-পন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতা বাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

- উপস্থিত বেতার খুললেই শট্‌ওয়েভে পাবেন, গাঁক গাঁক করে আপন পরি-চিতি জানাচ্ছেন চীন। চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায়

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন; দুনিয়ার কুলে বই—তা আমার জরুর যত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, কারো প্রীতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাটি সোনার মোহর, উদ্ভৃতির চাপে ব্যাকাটাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

হরবকং, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যন্তই), রুশ, আমেরিকা (VOA – Voice of America), ব্রিটেন (BBC), এবং অস্ট্রেলিয়া। দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ষেগুলো ধরকার, যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহায্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পূরণে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু'একটি কথা অবতারণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরোয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাবে। যে গ্রামে পঁচাত্তর বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনো সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনো লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে (“খট্টী আর”=রীটিং, রাইটিং, রেকর্ডিং)। বাদ-বাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশই পুনরায় নিরক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগান্ডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলাম; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—যা ফলশ্রুতি কদাচন মন্ত শ্রবণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জার্মান বা রুশ ভাষায় সার্টিফিকেট পেয়েছ সেটা উত্তম কর্ম, কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পড়ুয়ার মত পুস্তকভাবে। তাই বলছিলাম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট তথ্যকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনো বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুম অ্যারিয়েল শর্ট ওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছে, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকে তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোন্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযোজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এম্বলে বলে রাখা ভালো, তিন-চারশ' টাকা সেট+আউটসাইড ব্যামবু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট+রুম অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে যে রকম ধর্মানকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছেমত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও+দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। “আমার সেট আরো দামী হলে আরো ভালো রিসেপশন হত” এটা ভুল ধারণা। যে-কোনো দিন সকাল সাড়ে আটটা গোছ সময় ১৩ মিটার ব্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া শব্দে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নিরক্ষর) অন্য বাড়িতে দামী

সেট শব্দে এসে—দেখবে তফাৎ নেই। পুনরায় সম্মুখ ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজীর প্রোগ্রাম খানিকটা শব্দে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার, ওটা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম শব্দ হয়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুব্লা স্টেশন, তবুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তার স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যান্ড, আরো কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরেজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা করা না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিরুশ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা কোনো সেটেই, শহর মফস্বল কোনো জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটামুটি জানো, তারা অ্যাডভান্স কোর্সটি শব্দে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরেজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাত্বে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরেজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শব্দিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৪'৩০ থেকে ১৯'০০ অবধি (আমি সব'ত্রই ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরেজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শব্দে নেবে। তারপর সেই সংবাদই ফরাসীতে শব্দেতে পাবে ১৯.০০ থেকে ১৯.৩০-এর ভিতর কোনো এক সময়। ইংরেজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পূর্জি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিল সেটা যথেষ্ট নয়। দুপদ্যেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইন্ডোচায়নার জন্য। তবে রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইজারল্যান্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ ফর ফার দিস্ট অ্যান্ড সাউথ দিস্ট এশিয়া) তাদের স্টেশন খোলে ১৬'৩০ ও ১৩ মিটার ব্যান্ডেই। ওরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করে (১) জার্মান, (২) সুইস জার্মান, (৩) ফরাসী, (৪) ইতালীয়, (৫) ইংরেজী এবং কোনো কোনো দিন এস্পেরান্তোতেও। প্যারিসের বেলা যে প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছি এখানেও সেটি প্রযোজ্য। তোমাকে শুধু তাকে তাকে থাকতে হবে, কখন কোন ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে,

* সব স্টেশনই কোনো না কোনো সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায় চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী চিঠি পাঠাবইও পাঠায়, কোনো কোনো স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তর বর্ণন পাওয়া যায় World Radio Handbook, Lindorffs, Allee 1, Hellerup, Denmark

(বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনো কখনো পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশ্যে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জার্মানের বেলাও তাই) ।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইন্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা । রাত ঘনিয়ে এলে ও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয় । এটা শোনার সুবিধা এই, রিসেপশন মোটামুটি ভালো, কি কি খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কথিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে । এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য “যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর” । এম্বলে উল্লেখ করি, যারা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজেকে অভ্যস্ত করতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন । এদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট । কিছুদিন আগেও মস্কার এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউনসার ছিলেন ।...

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পাবেন । ...রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটারিয়াল আফ্রিকার ব্রাজিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এদেশে পাওয়া যায় । শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেরারস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায় । এবং রাত দশটা এগারোটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মস্তে কালোঁ—ফরাসীতে । শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (= ১৪৬৬ কি. সা) ব্যান্ডে । আমার জানামতে এটিই ইয়োরোপের সব চেয়ে জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন । এর জোর ৪০০ কি ও । ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে শীতকালে অনিদ্রায় এর প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে শোনা যায় । তবে কমাশিয়াল বলে উৎপাতও আছে ।...ওয়েস্ট বার্লিনও ৩০০ কি. ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি নে একে বড় জ্যাম করে ।

জার্মানির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচশে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln-Cologne যেখান থেকে অডিওকলোন আসে) । ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮'২০ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জার্মান ভাষায় । তবে ইংরেজী, হিন্দী উর্দু এবং ফের ইংরেজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮'৩০ থেকে ৯'১০ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ক্রান্ত দ্বিজে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায় । এরই যে কোনো একটা শুনেন নিয়ে জার্মান প্রোগ্রাম শুনেন নিলে ভালো হয় । কিছুদিন পূর্বে একটি তাম্বুজ খবর পেলুম । জার্মান মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে ১'৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃতে ব্রডকাস্ট করবে ! তবে

বইয়ে । দাম পাঁচ টাকার মত । এবং সঙ্কল্প নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখবেন না । আমি অসুস্থ । সেক্রেটারি নেই ।

ওয়েড লেন্থটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজে-পেতে পেয়ে যাবো।... বর্ষাকালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরষ ১২'১৫ থেকে ১৫'০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মনি শেখাতো—এখনও শেখায় কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইজারল্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মানে রডকাস্ট করে। এককালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দু'পূর্ববেলা জাপানও উত্তম জর্মানে (১৯ মি) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মানে রডকাস্ট করে। এদের সকলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মনি ভাষার বড় কেন্দ্র—এখনো এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসল্‌স্‌ আমি কখনো পাইনি। মস্কো একদা অতি সমৃদ্ধ রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী, ফার্সীতে যাদের দিল্‌চস্পী, তাঁরা অনায়াসে বাগদাদ, কাইরো এবং তেহেরান খুঁজে পাবেন। কবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায় এবং বিদেশী ভাষা-জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

“—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—”

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পৌঁছল, সেটা দফে দফে বৃদ্ধিয়ে বলা শস্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যার মারফৎ এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের বিকটতম উন্মাদিক এক দজীর “দোকানে” কাজ করেন। সে দোকান নারিক রাজ-পরিবারের বাইরে কারো জন্য অর্ডার নেয় না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বার্কিংহাম প্যালাস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপ্‌স্টাইন (না রোডেনস্টাইন, ঠিক জানি নে) ও চার্চিল সাহেব। আমি সেথায় আগ্রহ পেলাম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়ে-

ছিলেন হল্যান্ডে। সেখানকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ের বেশভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়, দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম। বাস্ ! হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লন্ডন নিয়ে এলেন। তদ-বধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সপ্তারশ্রে সহাস্যে নিতেন। পাছে আমি লক্ষিত হই, আমি মৃফতে আছি।

আমি বললাম, “কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।”

পাগলামিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে ডাক্তার প্রণব রায়ের মত লোক হ্যাণ্ডল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, “বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শ্রুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ ‘রুচি’র কথা শ্রুধিয়েছিলেন-?”

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরন্তর থাকতে হল।

“আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরষ আপন রুচিমায়িক জীবনানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপোর্টেন্ট। নইলে কণ্ড, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকলাম কি প্রকারে? অতএব বদ্বিষ্মে কই।”

গভীর দম দিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন বললেন, “উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অস্তিম্ব নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোন বৎস, তব্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিঙহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্বপবর্ণ— অর্থাৎ নুন-হলধে না, একই বর্ণ না, একই বর্ণনা করা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুরুত্বম-টপমোস্ট-সীকারিট সভা বসে আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যেদো-মেদো সেই রঙের স্যুট পরে যত্রতত্র ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ড্যাক অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাঙ্গামা কম, প্রশ্ন শ্রুধু ওয়েসকিট নিয়ে—”

আমি বাধা দিয়ে বললাম, “ওয়েসকিট কি?”

“চ্যাণ্ডারা হালফিল থাকে ওয়েসকিট বলে।”

আমি চূপ করে ভাবলাম, আমাদের দর্জীর যখন ‘ওয়াসকিট’ বলে, তখন মোটামুটি শ্রুধু উচ্চারণই করে, এবং ‘লাট্-সাহেব’র ‘লাট্’ উচ্চারণের মতই প্রাচীন শ্রুধু উচ্চারণ। বললাম, তা “ওয়েসকিট নিয়ে দর্ভাবনা কিসের?”

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “তোমার ব্রাইন্ড স্পটগুলো যে খোদায়

কোথায় কোথায় রেখেছেন বলা শক্ত। এদিকে শেক্সপীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্যদিকে মনিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানানো না।”

আমি একগাল হেসে বললুম, “টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ক্রাস্‌সের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, ‘তাজব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মিলিয়ের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদ্য বদে’। ব্দুগ’ননের ‘বুকে’র (bouquet) তফাত ধরতে পারেন না!’ তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলাম!”

“হঁ, আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক না, রঙের শেডের উপর ন্যায়সি-এর উপর কৃপা করবেন সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো ঠিক করা হবে।”

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, ‘গুলো মানে? কটা?’

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনো খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ড্রাক অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, “তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।”

এর পর আর শংকার কোনো কথা ওঠে না। আমি বললুম, “যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত ল’ডনে, একটা ন্যাতিভদ্র লাইনজ স্যুটের কেমৎ নিদেন—£50/-, আড্ডালোরেম, আমাধের দিশী টাকায় প্রায় আটশ—”

বাধা দিয়ে বললেন, “পাগোল! একটা সুদৃশ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £120/-,—”

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি স্যার হন) হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্রাণ্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ও—ও—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হোঁজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনো কিছ্‌র বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, “আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকি নে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পশ্চাদ্ধীনই ড্রাক অব কে—”

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, “তা হলে আমার এই দিশী কোড-পাংলুন বশ্বক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?”

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “প্যাট কেম দি রিপ্লাই, খোলা বাজারে না, কিস্‌সুদীটি পাবে না। তবে হ’্যা, আলবত, ব্রিটিশ মর্দাজিয়াম পুন’ সব আরকিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অজ্‌ননের পোটেবল অ্যাটম বম, দৌপদীর প্রেসারকুকার-কম্‌-ফ্রিজ—। কিস্তু তুমি ভয় পাচ্ছে কেন? আচ্ছা বল তো, পশ্চাদ্ধীন রোদার যে মূর্তিটি বিজিরি হল, তার পাথরের দাম কত? ব্দুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? পেন মেটেরেলের দাম?”

আমি মিনিমিনিয়ে বললুম, “পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।”

গুস্তাদ সোৎসায়ে বললেন, “ইয়েহ্ ! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £50,000/- । এইবারে একটু চিন্তা করো । তোমাকে যে ডজন দুই স্মৃট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌন্ড । কিন্তু মেটেরেলের দাম ? প্রেফ উলের দাম কত হবে ? বট্টীয়াহ সে বট্টীয়াহ ? £50/- ? £100/- অর্থাৎ ১৪০০ টাকা ? আমি আরটিস্ট, আমি রৌদা ।”

একটুখানি ভরসা পেয়ে বললুম, “তা, তা, ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো স্মৃটের কি সত্যি দরকার ?”

* * *

এর পর গুস্তাদ অত্যন্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই । অতএব এখন যদি তাঁর ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না ।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

“মনিং স্মৃট—স্ট্রাইপ্ট্ ট্রাউজারস—অরিজিনাল ওয়েসকিট—তার টপ্-এন্ডে সাদা সিলকের পাইপিং দেব কি ?—টাইয়ের উপরে ডাইমন্ড পিন্ না পার্ল দেবো ?—কোণভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোমপানি উত্তম ? স্প্যাটার ডেজেজ !

“তার পর দেমি । পাতলদুন যথা পূর্বং । কিন্তু কোটটা টেল নয় ।

“সে না হয় হল । দুপরের লাউন্জ্ স্মৃটটি কি প্রকারের হবে ?

“সম্ভেয় ? ডিনার জ্যাকেট ? টেলস্ ?

“ইতিমধ্যে যদি গল্ফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে ?

“কিংবা সাতার কাটতে ?

“কিংবা খেঁকশিয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড্-পদুরী ?

“কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গ্রাউন্ড কি হবে ?”

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, “এই যে তুমি এখন লাউন্জ স্মৃট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত । এর উপর তার কি ধরনের ক’টা স্মৃট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত । সে থাক । উপস্থিত তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক । আচ্ছা বল তো স্মক্ কাকে বলে ?”

“জানি নে ।”

“তাহলে বানান করছি, s m o k i n g ?”

“এ রকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন ?”

“ফরাসীরা তাই করে । অবশ্য যারা অল্পস্বল্প দুর্নিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্মকিন্ ! তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেলজ্ না । আবার ইংরাজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস । অসকার ওয়াইল্ডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিনিস ওয়েসকিট—”

আমি বাধা দিয়ে বললুম, “ওয়াইল্ডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি ।

কিন্তু তোমার এই বাহ্যিক রকমের সন্ধ্যার স্নবারিক দেখাক আমার আর বরদাস্ত হচ্চে না।”

সিরিল বললেন, “বট্টো? তুমি যখন পাঁচ রকম ‘ওচে’ (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে স্নবারির চুড়ান্তে পেঁাছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্‌টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন আমি বাধা দিই? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল) —”

* * *

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মন্ত।

রাস্তা দিয়ে নাগা সম্মাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শূধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান ‘ড্রেস’ !!

‘ল্যাটে’

“রদাগং কাকে বলে জানো?”

“এক রকমের ফরাসি লম্বা কোট। প্রায় ফ্রককোটের কাছাকাছি। এর বেশী কিছু জানি নে, কখনো দেখিনি।”

“শব্দটা—রাদার, সমাসটা—কোথেকে এসেছে?”

আমার ইংরেজ বন্ধু সিরিল বেশভূষা বাবদে পয়লা নম্বর, কিন্তু শব্দ, ভাষা এসব বাবদে তাঁর অগ্ন্যমাত্র ইন্ট্রেস্ট নেই। তাই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, “কোথেকে?”

“চেনবার জো”টি নেই। ইংরেজী ‘রাইডিং কোটের’ এই হল ফরাসি উচ্চারণ। শূধু তাই নয়, এতে আরো মজা। সেই রদাগং যখন ফের বিলেতে এল তখন তার ইংরেজী উচ্চারণ হয়ে গেল রেডিংগট এবং ফ্রান্সে নবজন্মপ্রাপ্ত এ-পোশাক এদেশে আবার এক নবজন্ম লাভ করে হয়ে গেল মেয়েদের পোশাক—পূরুষ আর এটি এদেশে পরে না, অন্তত এ নামে পরিচিত পোশাকটি পরে না। কিন্তু রদাগং এখনো ফ্রান্সের ভারি স্ত্রী পোশাক। তোমারও তো বয়স হতে চললো, আর যাচ্ছেও ফ্রান্সে—”

আমি বললুম, “থাক, আমার সাদামাটা লাউনজ সন্ধ্যাটাই চলবে।”

* * *

ফ্রান্সের একটি জায়গা দেখার আমার অনেককালের বাসনা।

বহু বৎসর পূর্বে আমরা একবার মার্সেলস বন্দরে নামি। সঙ্গে ছিলেন দেশনেতা স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পুত্র ডঃ অজিত বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মায়ী দেবী।

বড়ই ধূধের বিষয় এই গুণী, জ্ঞানী কর্মবীর অজিত বসু সম্বন্ধে কেউ কিছু লেখেননি। আসলে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানসাম্রাজ্য যে

কী বিরাট বিস্তীর্ণ ছিল সেটা আমি আমার অতি সীমিত জ্ঞানের শিকল দিয়ে জরিপ করে উঠতে পারিনি।

তার কথা আরেক দিন হবে।

তখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিনীভা যাওয়া। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম, সম্প্রদায় আগে তার জন্য কোন থ্রে ট্রেন নেই।

গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। এবং বিখ্যাত শহর হলেই তিনি ইয়োরোপের ইতিহাসে সে শহর কি গুরুত্ব ধরে ধাপে ধাপে বলে যেতে পারতেন, কারণ তার মত ‘পুস্তক কীট’ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

বললেন, “তার আর কি হয়েছে! চলুন, ততক্ষণে এ্যাক্স্ হয়ে আসি। মাইল আঠারো পথ।”

আমি বললাম, “সে কি? এ্যাক্স্-লে ব্যা তো অনেক দূরে।”

তিনি হেসে বললেন, “আমার জানা মতে তিনটে এ্যাক্স্ আছে। উপস্থিত যেটাতে যেতে চাইছি সেটা আগা খানের প্যারা জায়গা এ্যাক্স্-লে-ব্যা নয়—এটার পুরো নাম এ্যাক্স্ আ-প্রভাস!”

আমি বললাম, “প্রভাস? তাহলে এ জায়গাতেই তো আমার প্রিয় লেখক আলফ’স দোদে তার ‘লেটারজ্ ফ্রম মাই মিল’ লিখেছিলেন, এখানকারই তো কবি মিস্ত্রাল যিনি নোবেল প্রাইজ পান—”

ডঃ বোস বললেন, “পূর্ব বাঙলার যে লোকসাহিত্য আছে সেটা প্রভাসের আপন ফরাসি উপভাষায় রচিত সাহিত্যের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। অথচ দেখুন, মিস্ত্রাল যে রকম একটা উপভাষা—একটা ডায়লেকটে, অবশ্য আজ এটাকে ডায়লেকট বলছি—কাব্য রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হলেন, নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক তেমনি পূর্ব বাঙলায় কেউ সেই ভাষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, গর্ব অনুভব করে, মিস্ত্রালেরই মত পরিগ্রহ স্বীকার করে, সেটিকে আপন সাধনার ধন বলে মেনে নিয়ে নতুন সৃষ্টি নির্মাণ করে না কেন? জানেন, আমি বাঙাল?”

ইতিমধ্যে যান এসে গেছে।

এদেশের বর্ণনা আমি কি দেব? এ্যাক্স্ও নাকি দু’হাজার বছরের পুরনো শহর। কই, মেয়েগুলোকে দেখে তো অত পুরনো বলে মনে হল না! তাহলে বলতে হয়, শহরটা দু’হাজার বছরের ‘নতুন’।

পার্কের একটি বোম্বিতে বসে ভাবছিলাম, এই তো কাছেই তারাসক* শহর যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন দোদে তার তারতারী দ্য তারাসক* লিখে।^১ তারই পাশে ছোট জায়গাটি—মাইয়ান্ (জানি নে, প্রভাসালে তার উচ্চারণ কি) যেখানে কবি মিস্ত্রাল তার সমস্ত জীবন কাটালেন। তারই মাইল সাতেক দূরে

১ বছর চার পূর্বে বোধ হয় খগেন দে সরকার এর অনুবাদ “দেশে” প্রকাশ করেন।

বাস করতেন দোদে—ফুঁভিয়েই গ্রামের কাছে। কবি মিস্ত্রালের বর্ণনা লিখে একাধিক ফরাসি লেখক নিজেদের ধন্য মেনেছেন। কিন্তু অপূর্ণ দোদের বর্ণনাটি। —এক রববারের ভোরের ঘুম থেকেই উঠে দেখেন, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। গোটা পৃথিবীটা গুমগুম মূখ করে আছে। সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে একঘেয়েমিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন, তিন লীগ আর কতখানি রাস্তা? সেখানে থাকেন কবির কবি মিস্ত্রাল। গেলেই হয়।

কিন্তু দোদে যেভাবে (তার লেয়'-এ Letters de mon Moulin-এর ইংরিজী অনুবাদ কতবার কত লোক যে করেছেন তার হিসেব নেই, পাঠক অনায়াসে পুরনো বইয়ের দোকানে মূল অনুবাদ যোগাড় করতে পারবেন) ২ সেই জলঝড় ভেঙ্গে পয়দল মিস্ত্রালের গায়ে গিয়ে পেঁছলেন তার বর্ণনা আমি দেব কি করে? দোরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেলেন কবি উঁচু গলায় কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন—কী করা যায়?—নিরুপায়—টুকতেই হবে—

মিস্ত্রাল যেন লাফ দিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন—“এঁয়া! তুই এসেছিস! আর ঠিক আজকেই! কী করে তোর মাথায় সুবুখিটা খেললো, বল দিকিনি।”

তারপর কি হল? বলবো না।

শুধু একটি কথার উল্লেখ করি।

খানিকক্ষণ পরে গির্জা থেকে ফিরে এলেন মিস্ত্রালের মা। বড়ী বড়ী সরলা, রান্নাতে পাকা, কিন্তু হায়, প্রভাসাল ছাড়া কোনো ভাষা বলতে পারেন না। তাই কোনো ‘ফরাসি’ (যেন প্রভাসের লোক ফরাসি নয়!) ছেলের সঙ্গে খেতে বসলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, তিনি রান্নাঘরে না থাকলে তো রসুইয়ের নিখুঁত তদারকি হবে না।

আরেকটি কথা। মিস্ত্রালের শোবার ঘরটি ছিল বড়ই ন্যাড়া। ফরাসি একাডেমি যখন মিস্ত্রালকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দিলে, তখন বড়ী চাইলেন ঘরটিকে একটু ‘ভদ্র’ করতে।

“না, না, সে হয় না”—বললেন মিস্ত্রাল—“এ যে কবিদের কড়ি; এটা ছুঁতে নেই।” ঘরটি ন্যাড়াই থেকে গেল। দোদে বলেছেন, “কিন্তু যতদিন ঐ ‘কবিদের কড়ি’ ফুরোয়নি, ততদিন কেউ তাঁর বাড়ি থেকে রিস্ত হস্তে ফিরে যায়নি!”

বৃষ্টি হচ্ছিল না? না, আমি স্বপ্ন দেখাচ্ছিলাম।

তবে কি আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে বসে? না, সেও স্বপ্ন।

আমি এসেছি মিস্ত্রালের গ্রামে, বহু সংসর পরে, সেই “রদাগৎ” পরে।

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। শুধু একটি দৃষ্টান্ত রয়ে গেল। যাক এখানে আসার খবরটি পিকচার পোস্টকার্ডে জানালে খুশী হতেন তিনি এখন এমন জায়গায় যেখানে এখনো ডাক যায় না।

২ এ লেখক দোদের একটি লেখা সম্প্রতি অনুবাদ করেছে। ‘দু-হারা’ গ্রন্থ পণ্য। কিন্তু আমার অনুবাদ থেকে মূল ষাটাই করতে যাবেন না।

আঁড়ে জিদ

দুনিয়ার লোক হুন্দমুন্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদিরিত্র সকলেই কামনা, কি করে গ্রামাঞ্জে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝে মধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিস্ট দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসি লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন ‘মফস্বলে’। যারা নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে পেরে ওঠেন—যেমন আলফাঁস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্জে, কোনো সখার বাড়িতে।

প্রভাসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার গেছেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্নে বসে আছি, যে-‘ইন্’টিতে উঠেছিলুম (এসব ‘ইন্’ এমনই গইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাংলো, না সরাই, না চাঁট—সব-কটিরই অগ্ন-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানালার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। টেউখেলানো উঁচু-নিচুর টক্রে ভর্তি জনপদ ধীরে ধীরে আরো বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইনকীপার, পাত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম “এ ব্যা, আলর—” এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন “এই যে, হে’হে’ বেষ বেষ—” শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফাসী ভাষাতে যাকে বলে “তাকিয়া-ই-কালাস” অর্থাৎ “কথার তাকিয়া” অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তার পর বললুম, “বসবে না? একটা কিছু খাও।”

বললে, “এ ব্যা, আমি আপনাকে ‘দেরাঁজ’ (‘ডিসএরেজ’ শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসটার্ব বা বদার) করছি না তো?”

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, “পা দ্য তু—বিলকুল না—।”

বললে, “মাসিয়ো, আমি আদৌ ‘নোঁজ’ না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কাল সন্ধ্যায় আমাদের আঙাটি যা জমেছিল! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—”

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনো স্টাক আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্জে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপালভাঁড় ইত্যাদি আমি তাদের শুনিয়েছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে। তাদের কাছে লেগেছে ‘এপাঁতা’ (ভয়ঙ্কর মজাদার) এবং অরি-

জিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লন্ডনেই পেঁছান তখন প্রভাসের ‘পাণ্ডব-বর্জিত’ অঙ্গ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে তাতে আর বিচিتر কি? গোপালের দৃষ্টিতে ‘রিসকে’ (risky আদরসায়ক) গল্প বলতেও ছাড়ানি, এবং তখন গায়ের পান্নি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সব চেয়ে বেশী চোখের ঠার মেয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, “মসিয়ো, আমাদের গ্রামে ক’জন বিনেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের দেশ স্পেন বা ইতালির বাউতুলে—আর আপনি তো এসেছেন কোথায় সেই সন্দেহ ল্যাঁদ (L. Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো?”

আমি বললাম, “ভূমি তো বলেছিলে, তুমি কখনো প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালো-বাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিস্ত্রালের দেশ।...আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিস্ত্রালের জন্মভূমি দেখতে?”

বেশ গর্বভরে বললে, “নিশ্চয়ই, তবে তারা সবাই ফরাসি—”

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহ-ভরে বললে, “ও লা লা। সে এক কাণ্ড।”

“দুই লেখকের লড়াই। সে হল গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমান্ডিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স দখল করে ফেলেছে, ঐ সময় কি কারণে, কি করে যেন দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবাধ কত আনন্দে হইহুগ্লোড় করলাম, এসে বসেছেন, সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাম্বুড়া বড়া গেরেমভারী হ্যাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মদু দেখে আমার গাইয়া খন্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

“ওঁরা গদ্যগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দিইনি। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয়।^১ তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতি-বেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না।^২

“কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জান কী নিয়ে—ছাঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি :—

১ প্রভাসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দ্বোদে—Le Chevre de M. Seguin.

২ এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসি লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা ফরাসিরা ‘পাতি’ (স্বদেশ), ‘পাতি’, ‘লিবেরতে’ ‘লিবেরতে বলে চে’চাই তার মূল্য কতটুকু? তিনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি চাষা যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তবে সে খোড়াই পরোয়া করে দেকাত^৩ আপন জাতভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

“এর নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া! এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলেছেন, কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক একথা বলেছেন তিনি তো জার্মান বা তাদের ‘দোস্ত’ পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, ‘আজ যদি আমাদের ক্লেমাসৌ বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসির দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে পরিস্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শয়্যার মারেন—গর্দূল করে মারতেন’।”

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসৌই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, “তারপর যা হল, মিসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দ্য তেয়াং^৩—নাটকীয় ব্যাপার—, ইতিমধ্যেই যে আমাদের পার্দি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা লক্ষ্যই করিনি।

“তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, “মিসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাজ করতে চাই নে; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাবো। আপনারা শহরে সজ্জন—শুনোছি, আপনারা ব’দিয়োর (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শূদ্ধ বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসৌ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গর্দূল করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা, মিসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মিসিয়ো ক্লেমাসৌর ভাতুপুত্রী—তার বয়স, এখন চুরাশি। তিনি লিখেছেন,—‘শের মিসিয়ো জিদ, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসব বাস করছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনোছি, জমি! জমি!! শূদ্ধ জমি!! আর টাকা। বাস, মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে!’

৩ Coup d’etat’ cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম ‘কু’ (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো শিল্পামীর ‘সু’!) হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

“পাদ্রি সায়েব বললেন, ‘তা সে ষাক ! কিন্তু এটা কি ব’ দিয়োর মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাবো, আজই আপনারা এ আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো— এবং আপনারদের ষম্ভের সমাধান করে দেব !...ও রভোয়া মেসিয়ো ! কাল রববার গিজের্য় দেখা হবে’ ।”

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, “এই যে বিরাট ফ্রান্স-ভূমি—এদেশের কারো বিশ্বাস, প্রভাসের লোক বড় সরল, বিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ, আর কারো বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুশ্বে আকৃষ্ট নিমজ্জিত ।...আপনার কি মনে হয় ? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L’Inde থেকে ।”

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন দিকে বদলে পাবলুম না ॥৪

আড্ডা

কি বললেন স্যার ? বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন ? আমি কিনবো ? আমি ! বাড়ি নিয়ে করবোটা কি আমি ? জন্ম নিলুম হাসপাতালে, পড়াশুনো করলুম হস্টেলে, প্রেম করছি ট্যাঙ্কিতে, বিয়ে হল রেজিস্টারের আপিসে । খাই ক্যানটিনে—কিংবা ঘরে কয় ‘ভোজনং যত্নতঃ’—, সকালটা কাটে কতাদের তেলাতে, তেনাদের তরে বাজার করে দিতে...হাটে-র্যাশনে, দুপুরটা আপিসে, মাঝে মিশেলে সিনেমা হলে—সন্ধ্যটা । পটল তুললে শুইয়ে দেবে নিমতলায় । বাড়ি নিয়ে কি আমি গুলে খাবো ? তার চেয়ে বলি, আসলে আমার দরকার একটি আড্ডার । একটি অত্যাৎক্ষ আড্ডার । তার খবর দিতে পারেন ? তবে বদ্ববো, আপনি একটি তালেবর ব্যস্তি !

কথাটা ন’ সিকে খাঁটি । অত্যাৎক্ষ (‘ক্ষ’ যদি ‘কিষ্ট’ বা ‘কেষ্ট’ হয় তবে ‘উৎক্ষ’ই বা হবে না কেন ?) আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মত ডাইয়িং ইনডাস্ট্রি—মৃতপ্রায় ।

এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ বিনামেঘে পদ্পাঘাত ! দিল্লী থেকে খবর এসেছে সদ্যভূমিস্ত শিক্কামন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঙালীকে তিনি ‘আড্ডাবাজ’ করে ছাড়বেন !

দিল্লী থেকে আসা খবরের সঙ্গে আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ি না—বয়স হয়েছে । খবরটা ফলাও করে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেম্যান্সি (dementi) বেরবে, ফের তস্য দেম্যান্সি বেরবে দলিলপত্রসহ, চোপরা-ভাটিয়া আফটার এডিট লিখবেন, পারলিমেণ্টে গোটা তিনেক মন্ত্রী নাকুনি-চুবুনি খাবেন, ঐ নিয়ে খানদানী আড্ডায় (আমাদের যৌবনে) তর্কাতর্কির ফলে গোটা তিনেক ‘পেয়ারে’ মদ্ব দেখাদেখি বন্ধ হবে—তবে আমি ব্যাপারটার মোটামুটি

আবছা-আবছা ধূয়াশাপারা একটা ‘উন্মান’ (‘অন্মান’ নয়, তার আউটলাইন বহু ধারালো) করে নিই যে, ব্যাপারটা কি হয়ে থাকতে পারে। গোলন্দাজদের কায়দা-করীনা নাকি এই দসতুরেই হয়। প্রথম বোমা তাগ করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, পরেরটা কাছে, তার পর দ্বুটোতে যোগ দিয়ে হাফাহাফি করে মোক্ষম মধ্যখানে।

কিন্তু এ সংবাদখণ্ডটি নিয়ে কিণ্ডিনমাত্র দেমার্তি ডুয়েল হয়নি। দিল্লীর লালাজী, মিয়াসাহেবরা খবরটা পরিবেশন করা সঙ্গেও ব্যাপারটির গুরুত্ব ‘এম্মীয়ৎ’ সম্বন্ধে বিলকুল বে-খবর। ‘আড্ডা’? সো ক্যা বলা? মজলিস, মহফিল, মদুশাএরা, জলসা, বয়েৎ-বাজী—আলবৎ—লেকিন ‘আড্ডা’? সো ক্যা আফৎ, গজব? ওদের আড্ডা ভিন্ন বাথানের গোরদু—ওদের ভাষায় ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া—যেমন ওদের গোলাব জামদুন আর আমাদের গোলাপ জাম।

তা সে যাই হোক যাই থাক, খবরটা যদি গুজোরব বা ‘আফওয়া’ না হয় (হলে আগের থেকেই কলমে খৎ দিচ্ছি!) তবে বড় দ্বুঃখের সঙ্গে শ্রীযুত ত্রিগুণা স্যানকে তাঁরই দ্যাশ করিমগঞ্জের একটি পদাবলী বেঁধা লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেব :—

‘দেখা হইল না রে, শ্যাম

আমার এই নতুন বয়সের কালে—’

রসরাজের স্মরণে শ্রীমতী বলছেন, ঠাকুর! তুমি নিদয় নও; আমাদের সাক্ষাৎ একদিন না একদিন হবেই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই নতুন (নতুন) বয়সে যে দেখা হল না, সে-ই আমার মর্মবেদনা।’

‘ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক

তাহার তরে বৃথাই করা শোক

কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত

তখন শোনায় তিতো।’

খানদানী আড্ডা এখন জীবন্মৃত। তার নতুন বয়স বহু কাল হল গেছে। এখন আর তার “‘কোন গুণ আছে’, ‘তিন-গুণী’?”

আড্ডা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বহুবার বহু স্থলে নিবেদন করেছি। বহু সিন্দূর পেরিয়ে বহু দেশ ঘুরেছি আড্ডার সম্বন্ধে—পাপ মুখে কি করে বলি, গিয়েছিলুম লবজো কপচাতে; আখেরে সর্বত্র সর্ব পরীক্ষাতে নাগাড়ে ফেল মেরে মেরে বিলক্ষণ বুঝে গেলুম, আমার যদি জ্ঞানগম্যি কখনো হয়—তা সে বুটাই হোক আর সাচ্চাই হোক—সেটা হবে ‘আড্ডাতে’—শিক্ষা-মন্ত্রী যে তর্কটি কনফারম করলেন এই অ্যান্ডিন পরে।...ফের বহু সিন্দূর পেরিয়ে দেশে এসে দেখি, সেই আড্ডার ‘বিশ্বদুটি’ খরতাপে বাষ্পপ্রায়।

খানদানী আড্ডা যে জীবন্মৃত সে তথ্য তর্কাতীত। এই যে কলকাতা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে পান্তলা দন্তলা হামে হাল উঠছে তো উঠছেই এর কটাতে রক থাকে, বৈঠকখানা আছে? রক উঠেছেন ডাক-এ, আর বৈঠকখানার বদলে ড্রইংরুম। এদিকে ক্ষুদ্রে একটি পেগটোবলের উপর অতি পাতলা ডিমের খোলস-

ঐয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২২

পর পরসেলেনের প্লেটে শ্যাক, অন্য দিকে ফঙ্গবেনে টিপয়ের উপর বেলজিয়াম কাঁচের ঢাউস ক্লাওয়ার 'ভাজ'। সোফাতে আরামসে হেলানও দিতে পারবেন না, পাছে মাথার তেল লেগে সোফাভরণ চিটচিটে হয়ে যায়। বত্রিশটি দাঁতের মধ্যখানে বেচারী জিভকে যে রকম অতিশয় সন্তর্পণে 'হাফিজ, খবরদার' হয়ে নড়াচড়া করতে হয় আপনাকেও করতে হবে তাই। তবে সাম্ভ্রনা, ভুগন্ত বাড়ীর মালিকেরই সব চেয়ে বেশী। পাছে মহামূল্যবান কোনো জোড়াবাধা বস্তুর একটি ভেঙে যায়! বিলিতি মাল—এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

গালগল্প যে একেবারেই হয় না, সে-কথা বলা যায় না। তাকে সোয়ারে, মার্জিনে (ম্যাটিন) কনভেরজাৎসিয়োনে^১ যা খুশি নাম দিতে পারেন, এমন কি আজকের দিনের ভাষায় সেমিনার বললেও দোষ নেই—কিন্তু একে আড্ডা নাম দিলে আমাদের নকিষ্য কুলীন আড্ডার মেম্বারগণ একবাক্যে বলবেন, ক'হা আসমানকা তারা, আর ক'হা পিঠকা (আসলে ভদ্রসমাজে মূল শব্দটা অচল। পাঁচড়া!)

গঙ্গাশ্রান কমে যাচ্ছে কেন? পুণ্যবানরা নতুন নতুন ঘাট বানাচ্ছেন না তাই।

আড্ডা কমে গেল কেন? মডারনরা রক বানান না বলে। পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ বা প্রাচীন দিনের অগোছালো বৈঠকখানাকে জ্বইংরুমেস সাত চাপের কারবন কর্পি বানাচ্ছেন—দিল্লীতে বলে 'বুড়ো ঘোড়ার গোলাপী ন্যাজ' কিংবা 'বুড়ী দাদীমার হাতে বাহারে মেহাঁদ'।

কিন্তু এহ নিরতিশয় বাহ্য।

গৃহ্য সমস্যা অপিচ সরলতম প্রশ্ন : এই যে আমাদের মস্তিষ্ক তরুণদের আড্ডাবাজ করে তুলবেন বলে যমুনা পুর্লিনে দাশরথির শপথ গ্রহণ করলেন সেটা কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিংবা প্রকৃত আড্ডাবাজের ন্যায় 'ধ্যন্তর ত্তোর অগ্রপশ্চাৎ' হুঁকার ছেড়ে?

ঝাড়া আঠারোটি দিন আমাদের আড্ডাটি এই নিয়ে কুস্তি করেছে। নানা প্রশ্ন, বহুবিধ সপুল্লিমেন্টারি, ততোধিক এফিডেভিট—সর্বশেষে এস্টের 'বুল্দ পিরিণ্ট' (আমাদের মস্তিষ্ক মশাই এ বস্তুটি বিলক্ষণ চেনেন) ডাই ডাই তৈরি হল, অবশ্য আড্ডাধারী মাত্রই জানেন, আমাদের হাইজাম্প লঙ-জাম্প মূখে মুখে।

১ প্রথম দুটো শব্দ ফরাসী, তৃতীয়টি ইতালীয়। অর্থাৎ রসালোপ করার তত্ত্বটি বরণ লাতিন জাত কিছুটা জানে। শূন্যে, অ্যাংলো সেকশনের এমন ক্লাবও নাকি আছে যেখানে কোনো মেম্বার কথাটি বলা মাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদা একজন মেম্বার নাকি আগুন লাগা মাত্রই 'আগুন আগুন' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে ক্লাববাড়ি রক্ষা পায়। তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর (অবশ্য লিখিতভাবে) খাতা থেকে তাঁর নামটি কিন্তু কেটে দেওয়া হয়।

প্রতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পাশটা প্রস্তাব উঠেছিল ; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন ।

যদ্যপি মন্ত্রী মহাশয় এলেমদার ব্যক্তি তথাপি এ-হেন কঠিন গুরুভার তিনি যেন ভিক্ষুগণীর অধম সুদ্রপ্রয়াসের মত এজমালি বা বারো-ইয়ারী পশ্চতিতে উত্তোলন করেন । ‘বিগলিতার্থ’ ;—তিনি যেন

১। একটি কমিশন নিয়োগ করেন ।

এ-স্থলে আমার অতিশয় গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, হাই-কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গরূপে চিনি, যিনি একবার একটি আচ্ছাবাজ ছোকরাকে অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করে জনৈক ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে হুটু হুটু হয়েছিলেন । তিনি যখন জিভ কেটে বললেন, ‘ছোকরা পাড়ি আচ্ছাবাজ’ তখন তিনি জরডন জলে ধোয়া তুলসী পাতাপানা মদ্য করে ‘নাদ্রফ’ উত্তর দিয়েছিলেন ‘ঐ তো তার আসল এলেম ।’

এক কমিশনের চ্যারম্যান করতে পারলে সর্বরক্ষা—সকলং হস্ততলং !

২। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরেকটি বিষয়ে আমাদের ‘দশদিশি নিরঙ্কুশ’—প্রকৃত আচ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাট্যা ফালাইলেও সে কোনো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবে না । হরহামেশা হাজমাং করছি আমরা উইলসন জনসনের, আর আমরা যাবো কমিশনের সম্মুখে !

আচ্ছাষজের আমরা অভিশপ্ত (পদত, ঘাই বলুন) ভিক্ষু । আমরা যেতে পারবো না, নীলকণ্ঠের চড়াই উতরাই পেরিয়ে জটোর ভিতর গঙ্গার সম্মানে ।

তিনিই আসতেন । আমি যার প্রতি দৃঢ় লহমা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি তিনিই আসবেন, স্বেচ্ছায় সানন্দে । শ্যামবাজার থেকে শব্দ করে আচ্ছা মেরে মেরে তিনি হেসেখেলে পেশীছে যাবেন টালিগঞ্জে । রিপোর্ট যা লিখবেন সে এক অভিনব মেঘদূত ! শ্যামবাজার-রামগিরি থেকে টালি-অলকা !

কিন্তু আমরা কমিশনকে বিভ্রান্ত বা প্রেজুডিস করতে চাই নে বলে অত্যধিক বাগবিস্তার থেকে নিরস্ত হচ্ছি । তবে একটি বিষয়ে তাৎগোড়ভূমি যখন বিলক্ষণ সচেতন, সেটি যেন কমিশন বিস্মৃত না হন ।

আচ্ছা জীবন্ত কিনা, যদি হয় তবে তার অমরতাজন সঞ্জীবনী সুধা কি, সে নিয়ে তো কমিশন চিন্তা করবেনই—যথেষ্ট সুযোগ পাবেন, আজকাল প্রায়ই বিজলি ভ্রষ্টা রমণীর মত সাঁঝের ঝোঁকে চোখ মারতে মারতে আঁধারে গায়েব হয়ে যান, তখন আত্ম-অবেষণী, বিশ্বভাবনা ভিন্ন গতি কি ?—কিন্তু আমরা আগে-ভাগেই বলে রাখছি ;—

বঙ্গসন্তান চাহে না অর্থ, চাহে না মান, চাহে না জ্ঞান—সে চায় ডিগ্রী !

আচ্ছাবাজরূপে সে যদি স্বীকৃতি পায় এবং উদ্দেশ্য মাত্রই জানেন—খানদানী আচ্ছাতে সীট পাওয়াটাই কী কঠিন কর্ম—তবে সে ডিগ্রী না নিয়ে ছাড়বে না !

এবং ঐ সব বস্তাপচা পি-এচ ডি, ডিফিল, হনোরিস কাউজা, সদ্‌ম্মা কুম

লাউডে, দকতোর অ্যাস লেংর, ফাজিল-অল-মুহম্মদিসীন, শমশীর-ই-জমশীদই আলিমান, সাংখ্যবেদান্তক'চুগু—এসব উপাধি-খেতাব-ডিগ্রী বিলকুল না-পাশ।

তাহলে সে ডিগ্রীর নাম কি হবে ?

এ-বাবদে ইহসৎসারে সর্ব'ভিজ্ঞ মহাজনকে আমরা চিঠি লিখেছি।

ইনি স্ট্রাসবুরগ্ শহরের সরকারী উপাধিদাতা।

শহরের সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেন এক অশ্বারোহী—ইয়া মোছ, ইয়া তলওয়ার।

সামনেই সদররাস্তা-বুলভার জোড়া একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে স্বক-কোট, টপ-হ্যাট, আতশী-কাঁচের চশমা পরা এক—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সরকারী কর্মচারী। আমাদের আই এ এস গোছ।

হুক্মকারিলেন, 'তিষ্ঠ !'

'? ? ?'

'আপনি ডক্টরেট উপাধি ধরেন ?'

অশ্বারোহী অবতরণ পূর্বক সন্নিয় : 'আজ্ঞে না।'

গম্ভীর নিনাদ : 'এ শহরে ডক্টরেট না থাকলে "প্রবেশ নিষেধ"।'

কাতর রোদন : 'তাহলে উপায় ?'

মোলায়েম সান্সানা : 'উপায় আছে বই কি। এই তো হেথায় টেবিলের উপর রয়েছে সর্ব'গোত্রের উপাধিপত্র। আপনার দেশ ?'

আশাভরা কণ্ঠ : 'এজ্ঞে, লুক্‌সেম-বুরগ্।'

নুড়ি-চাপা ভিন্ন ভিন্ন ডাই থেকে একথানা করকরে কাগজ তুলে নিয়ে : 'আ-ন-সুন, আসুন, স্যর (বিত্তে শ্যোন, প্রীজ !)। দক্ষিণা : পঞ্চাশৎমুদ্রা।'

বিগলিত আপ্যায়িত কণ্ঠ : 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ (ডাংকে শ্যোন, মেরিন থ্যাংকস)। এই যে।'

অশ্বারোহী নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করতে করতে ভাবলে, 'আমার এই অশ্বিনীটি আমার বিস্তর সেবা করেছে। এর জন্য একটা হনোরিস কাউজা ডক্টরেট আনলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে উপাধিদাতার কাছে এসে তার সদিচ্ছা জানালে। আই এ এস দঃখ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভেরি ভেরি সরি, হের ডক্টর ! এ শহরে ডক্টরেট দেওয়া হয় শুধু গাধাদের। ঘোড়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।'

আমরা এ'রই উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। আমেন !

পাসপোর্ট

গণগণটি পূর্ব বাঙলার বিশেষ একটি জেলা সম্বন্ধে। মনে করুন তার নাম 'লোহাভরা'।

পূর্ব বাঙলার সাধারণ জন মাগেরই দৃঢ়তম বিশ্বাস 'লোহাভরা' জেলার লোকমাত্রই অতিশয় ধুরন্ধর। এদের কেউ একা বা দল বেঁধে ঢাকা স্টেশনে নামলে বিদগ্ধ, হাজির-জবাব কুটি পর্যন্ত সম্ভব হয়ে এদের রীতিমত সম্মে চলে। সর্বশেষে বলা হয়, ঐ জেলাতে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে স্বয়ং শয়তান সে-জেলার যে প্রধান প্রতিভূ সে পর্যন্ত মাছি ধরে ধরে খায়—কারো গোলায় হাত দিতে হিম্মৎ পায় না।

তামাম পূর্ব বাঙলার চাণক্য-মাকিয়াভেলি যে এদের সম্মুখীন হলে হুঁশিয়ারির খাতিরে তদন্তেই তাঁদের কানাকড়িটি পর্যন্ত স্টেট ব্যাংকে জমা দিয়ে আসেন সে তত্ত্বটি লোহাভরাবাসী বিলক্ষণ অবগত আছে বলে তারা সহজে আপন বাসভূমির খবর দেয় না; লোহাভরার পাম্ব'বতী' কোনো এক জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়।

*

*

*

পারটিশনের ফলে কলকাতা এবং ঢাকাতেও নানা নয়া নয়া সমস্যা দেখা দিল।

ঢাকা সেকরেটারিয়েটে খবর এল আমেরিকা থেকে—ভারতের বিস্তর জানোয়ার-দরদী মহাজনরা বাধা দিচ্ছেন, বাঁদর যেন মারকিন মল্লুকে চালান না দেওয়া হয়, মারকিনরা নাকি ডাক্তারী এক্সপেরিমেন্টের অছিলায় এদের উপর পাশবিক অত্যাচার (ভিভিসেকশন) করে। মারকিন ডাক্তাররা তাই ঢাকাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায্যাধিক মূল্যেও মর্কট সরবরাহ করেন। পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার মর্কটে মর্কটে নাকি রক্তির ফারাক নেই এবং এরা কোনো প্রকারের মাইগ্রেশন সারটিফিকেট নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে বলে জানা যায়নি!

সংশ্লিষ্ট সেকরেটারি মহোদয়—তিনিই আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটি কীতন করেন—তাঁর দফতরের ঝানু-ঝাঙ্কু এসিসটেন্ট তস্য এসিসটেন্টের এস্তেলা দিয়ে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ফরেন ইক্সপেন্জের সাতিশয় গুরুতর ব্যাপার!'

দফতর ভূগুণ্ডরা এক বাক্যে উত্তর দিলেন : 'বাঁদর ধরার কৈশল অতিশয় প্যাঁচাল। এর স্পেশালিস্ট ছিলেন হি'দু'রা। তাঁরা ইণ্ডিয়া চলে গেছেন।'

অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল জেলায় জেলায় খবরের কাগজে যেন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফলাও করে ছাপানো হয় ;

বাঁদর !

বাঁদর !!

বাঁদর !!!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মারকিন-মল্লুকের অন-

রোধে এই দেশ হইতে জীবন্ত বান্দর আমেরিকায় রফতানী করা হইবে। তৎজন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর সেকরেটারি
সবুজপুরা, ঢাকা-১১।

আমি সচিব মহোদয়কে শুধালাম, ‘উক্তম ব্যবস্থা। তারাপর?’

বললেন, ‘যেই না বিজ্ঞাপনটি লোহাভরা জেলায় বেরিয়েছে অমনি দেখা গেল, তাবৎ জেলার লোক লুপ্তি ফেলে ফেলে গুয়া গাছের ডগায় চড়ে বসে আছে। সবাই মারকিন মুল্লুকে যাবে। মর্শাকিল! জানেন তো, লোহাভরার লোকের যা কান্টিকের মত চেহারা, তাতে কোন্টা বান্দর কোন্টা মানদুষ ঠিক ঠাহর করা—’

*

*

*

ইতিহাস-দার্শনিক শ্রীযুক্ত টইনবি বলেছেন, দেশকালপাত্রের যোগাযোগের ফলে নিত্য নিত্য প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো আকছারই প্রাচীন প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তফাত ডীটেলে।

অন্তএব, যখন সবিশেষ অবগত আছি, উভয় বাঙলার দেশকালপাঠে ফারাক যৎসামান্য তবে পূর্বোন্নিখিত পূর্ববঙ্গীয় প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাসিত হবে না কেন? আমরা কিসে কম?

অবশ্য স্বীকার করছি ডীটেলে উনিশ-বিশ হওয়া বিচিত্র নয়।

এবং তাই হয়েওছে।

কারণে, কিংবা অকারণে, অথবা বলতে পারেন, কিসমতের মারে এদেশে পাশপোর্ট-যোগাড় করাটা ক্রমশ কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগলো, স্বরাজ পাওয়ার অস্প কিছুকালের মধ্যেই। শেষটায় হাল এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তখন কেউ আর নিতান্ত বিপদে না পড়লে ঐ সাপের পায়ের সম্মানে বেরুতো না। অবশ্য লক্ষপতি, কালোবাজারী, বিদেশে যার আচার-করা ফরেন কারেন্সি আছে তাদের কথা আলাদা। এসব কাহিনী দফে দফে বয়ান করার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজে অনেক খবর বেরোয় সাদা কালিতে ছাপা। সেগুলো পড়ার জন্য একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন—ইংরিজীতে থাকে বলে টু রীড বিটুইন দ্য লাইনজ। যাঁদের সেটা আছে—আমার নেই—তারা আপনাকে অনায়াসে দুকলম শেখাতে পারেন। সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

লোকটার নিশ্চয়ই কোমরের জোর, কাঁড়র ওজন ও বুকের পাটা আছে, নইলে সরকারের সঙ্গে লড়তে যাবে কেন? কটা আদালতে হারার পর লোকটি সুপারীম কোর্টে পৌঁছল জানি নে। সেখানে প্রধান বিচারপতি (তৎকালীন) শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও যা রায় দিলেন তার বিগলিতার্থ, কোনো ভারতীয় যদি আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় তবে তাকে ঠেকাবার এখত্তয়ার ভারত সরকারের নেই। সেটা হবে সংবিধান-বিরুদ্ধ।

বাস্। আর যাবে কোথা।

আমাগো দ্যাশে কয়, একে তো ছিল নাচিয়ে বড়ী তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল ।

পূব বাঙলার প্যাটার্‌নে এস্থলে প্রাণের খুঁকি নিয়ে গাছের মগডালে না চড়ে মেয়েমন্দে আশ্চর্য্যে ধাওয়া করলে পাসপোর্ট ফরমের জন্য । বীদরের জন্য ও-বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাকে খাঁচায় পুরে পেনে ঢুকিয়ে দিলেই হল । মানুষের বেলা জাহাজের কাপতান, পেনের টিকিট বেচেনওয়াল, ভূপৃষ্ঠে বর্ডারের উভয়পক্ষের পলিস শ্রুত, অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায় ?

ইতিমধ্যে নাকি আরো দুজন জজ সাহেবের রায় বেরলো : আইনত নাকি পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজনই নেই । এটা আমি বুদ্ধিতে পারিনি, কাজেই এটি নিয়ে তীর্ঘর্ষি আলোচনা করা আমার শোভা পায় না ।^১ পরলা তো কামেলাটা বুঝে নিই ।

উপস্থিত একটি কথা বলে রাখি ।

আইন অবশ্যই সর্বজনমান্য । কিন্তু কার্যত কি হয় ?

আইনত (ডেজুরে) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তার নাগরিককে অবাধ চলাফেরা করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু কার্যত (ডে ফ্যাকটো) কোনো দেশ দেয় বলে জানি নে ।

এই তো হালের কথা । মার্কিন দেশে যে জোর গণতন্ত্রের রাজত্ব সে-কথা আমরা সবাই জানি । অন্তত সেই নিয়ে তাদের বড়-ফাটাইয়ের অন্ত নেই । দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম সর্বত্রই তাঁরা যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্ববাসীকে অহরহ শোনাচ্ছেন । সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে, কিংবা হয়তো মার্কিনগণ নিজেদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন । এবারে সেই হালের কথাতেই আসি ।

দার্শনিক বারট্রান্ড রাসল্‌ কিছুদিন হল স্থির করলেন, একটা বেসরকারী আদালত বসিয়ে সেখানে ভিয়েতনামে ‘মার্কিন পাপাচারের’ বিচার করা হবে । খোলা আদালতে যে রকম যে-কোনো মানুষ, হয় আসামী নয় ফরিয়াদি পক্ষে দাঁড়াতে পারে বা আদালতের দোস্ত (আমিকুস কুরিএ) হিসেবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার হক ধরে—রাসলের বেসরকারী বে-আইনী (বা অ-আইনীও বলতে পারেন) আদালতেও সেই ব্যবস্থা থাকবে ।

এ আদালতে হাওয়া কোন দিকে বইবে সেটা ঠাহর করার জন্য হ্যামলেট নাটকের ভূতের প্রয়োজন হয়নি । তৎসঙ্গেও মার্কিন জুজুর ভয়ে সব রাষ্ট্রই মৃদুে কাঁথা চাপলেন । অর্থাৎ সে আদালতের জন্য আসন দিতে (ভেন্দু) রাজী হন না—‘তোমার আসন পাতবো কোথায়’ হে অতিথি—অবশ্য ভিন্নাথে ।

১ কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে : “Giving their reasons the minority said that there was no compulsion of law that a passport must be obtained before leaving India.” আমারই মত জনৈক সম্পাদক ব্যাপারটা বুদ্ধিতে পারেননি এবং ঐ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন ।

শেষটায় সরল সুইডেন লাজুক কনেটির মত কবুল পড়লো—এবং আথেরে পস্তালো, কিন্তু সে কথা থাক।

সেই ‘উয়োর ক্রাইমস ট্রিবিউনালে’ সাক্ষ্য দিলেন এই মে তারিখে এক ভদ্রলোক—এঁর নাম রাল্ফ্ শ্যোমান। মার্কিন নাগরিক, এবং রাসলের খাস নায়েব (পারসনাল সেকরেটারি)। ভিয়েৎনামে মার্কিনদের ‘পাশবিক অত্যাচারে’র দফে দফে বয়ান দিয়ে—যার সঙ্গে এ রচনার কোনো সম্পর্ক নেই—তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হানায় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করেন, যেহেতু তিনি ঐ জায়গায় মার্কিন সরকারের বিনানুন্নীতগণ গিয়েছিলেন তাই সে-সরকার এক্ষণে তাঁর পাসপোর্ট রদ করবে (অর্থাৎ বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে নেবে)।

যদি করে তবে সেটা আইনসঙ্গত কিনা, সেটা বিচার করার মত আইন জ্ঞান আমার কেন, বহু ধূরন্ধরেরও নেই।

(১) এই দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার পাসপোর্ট বাবদে যে আইন এতদিন মেনে চলতেন তারও একটা রেজোঁ দেংর্ (raison d'être) নিধেন একটা ভিত ছিল (২) তিনজন মহামান্য জজ সেটা অস্বীকার করলেন (৩) অন্য দু'জন মহামান্য জজ ঐ তিনজনের সঙ্গে একমত হলেন না। এদিকে পাসপোর্ট দরখাস্তের বন্যায় হিল্লী দিল্লী যায়-যায়। সেটা ঠেকাবার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে জারী করতে হয়েছে, (৪) অরডনন্স্—সাময়িক আইন। এ আইনের আয়ুর্কাল মেরে কেটে ছ'মাস। ইতিমধ্যে সরকার এই অরডনন্স্টি মেজে ঘষে (৫) বিল রূপে পরিবর্তন করে পেশ করবেন পারলিমেন্টের সমুখে। তখন লাগবে ধূরন্ধর, ইংরিজীতে যাকে বলে দ্য ফ্যাট উইল বি ইন দ্য ফায়ার। উপরের প্যারায় আমি পাঁচ রকমের দৃষ্টিবিন্দু পরিবেশন করেছিলাম—এবারে পারলিমেন্টে জুটবে এসে আরো পাঁচশ!

আমার ঘাড়ে কি ৫০৬টি মাথা যে আমি রা'টি কাড়বো!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পারলিমেন্টে বিস্তর বেদরদ ধোলাইরের পর ইন্সটি হয়ে বেরবেন বিলটি তখন আইনরূপে।

আমরা শঙ্খ বাজাবো হুর্লুধর্নি দেব।

কিন্তু হায়, এ পোড়ার সংসারে শাস্তি কোথায়? এই নয়া তুলতুলে তুলোয়-ভরা তাকিয়া-পারা আইনটার উপর ভর করে যে দু'দু'জিঁরিয়ে নেবেন তারই বা মোকাম্ফরসং কোথায়?

আবার এক ‘পাশ্চ’ হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সে আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়াবে।

এবং এবারও যদি মহামান্য বিচারপতি...?

তা হলে শূরুসে, ফিন্‌সে, সেই গুড পম্‌থিততে :—

ক-রে কমললোচন শ্রীহারি,

খ-রে থগ-আসনে মুরারি

গ-রে...!

আড্ডা—পাসপরট্

‘এত ঘোরিতে যে?’

শোনো কথা! আড্ডাতেও আসতে হবে পাণ্ডুয়ালাল?

‘হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাণ্ডুয়ালাল অন-পাণ্ডুয়ালাল।’

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকস্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী প্রেমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্ডার্ড চড়াকসে এমনি সুপরি গাছের ডগায় উঠে যাবে যে অর পাঁচজন লেখক সে মগ্‌ডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রস্তের সম্বন্ধ, হয়ে গেছেন ম্যানফেটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কি প্রকারে! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনো সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় ‘ট্রামেবাসে’, ‘সুন্দর জারনল’ এবং ‘পণ্ডিত’ সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এক কথায় সৈয়দ সুন্দর করে কি হাল হবে? পচা ডিম ছুঁড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুণ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যাঙ্ক রচনার মূল্য অকস্মিকের কতৃপক্ষ বন্ধু আর নাই বন্ধু—এটা কিন্তু ভুলে চলে না তারা ইংবেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন ‘নেশন অব শপ-কীপারজ’—এখন বলা হয় ‘নেশন অব শপলিফটারজ’ (ভদ্রবেশী ‘দোকান-লুটেরা’)। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার ‘লা-জবাব’ প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সিবিনয়, সকাতির ফেরত পাঠায়—ছাপালে তারা, তাদের আন্ডাবাচ্চারা বেবাক-আন্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কি?

১ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন : আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না শুনলে যে-সব বে-আন্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোরের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তারা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয়, যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

‘শপ-লিফটারজ’ কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক ‘সাকী’।

কথিত আছে, একদা লন্ডনে এসে মার্কিন হেনরি ফোরড দাবড়ে জ্বড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জর্জ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ‘কিস কি মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন “ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি”, তবে রোলস চড়েন কেন?’ ফোরড বাও করে বললেন, ‘আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়; সে খন্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খন্দের মোর ইমপারটেন্ট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর, বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেন্ড বেস্ট মোটর—রোলস—কিনেছি।’

গণপতি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মরুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসরিজ ক্রেমাসিকের পরেই সেকেন্ড বেস্ট কাগজ ‘দেশ’।

সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুলো। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবলোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আভা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

অতএব কাইরোর কাফে-আভার সবিস্তর বর্ণনা নতুন করে দেব না। শ্রদ্ধা এইটুকু বলবো কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আভা, ইংরেজের ক্লাব, জরমানের পাব, কাবুলির চা খানা, ফরাসীর বিস্ংরো—এস্টেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুটির ঘোড়ার মত—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা একপ্রকারঃ—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে=৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে=১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা কাফে=৭ ঘণ্টা। ১২টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনো বাজেনি।

কাইরো সঞ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকং লেগেই আছে—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তথ্যে ফিরে যাই :—বাড়ি নিয়ে কি গুলে খাবো, পারেন তো দিন একটি নন-স্টপ-আল্‌টার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোক বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশীকে বদ্বিষ্যে বলে, প্রাচীন যুগে তারা আদৌ বানাতো না, বানাতো গোবরের জন্য স্ট্রেশ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনো চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে যুগের বাড়ি? বাড়ি বানানোর বদ অভ্যাস বাজে খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজর কাছ থেকে, তার ‘হোম’ নাকি তার কাসল (অ্যান্ড হি ইজ দ্য টাইরেণ্ট ইনসাইড)। আর বাড়ি বানানোটা যদি এমন কিছু জন্মের মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা উচিত, ওর মত নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধরবে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।^৩

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আল্‌টার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাণ্ডুয়ায়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসবো বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাণ্ডুয়ায়ালি... ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন-পাণ্ডুয়ায়ালও বটে!

সেটা কি প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মীটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরুর হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন-পাণ্ডুয়ায়াল পাণ্ডুয়ায়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখন প্রচুর জল আসার ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্কাট চড়ায়, কখন মাত্র কম্পনটুকু সম্বল; কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোঁট নেই—এসবের হদীসাম্বেষীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটর জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়)—ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধূরধর এবং গোঁয়ার। আমাকে শ্রদ্ধা করে কি বাবাজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কম্বিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি!

৩ ভারতের বাইরের বেদে মানুষেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাশুলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায় সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

ব্যাপারটা কি ?’

আমি বললুম, ‘আর কও কেন ? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকেলটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনো হাঁস ধরার চেষ্টা কখনো করেছে ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি ?’

‘বুনো হাঁস ! সে আবার কি ?’

‘নয় তো কি ? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখেছিল সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।’

কাফে অবাক। ‘সে কি ? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙ্গলা না, কি যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছে এদেশে।’

‘সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শ্রদ্ধোই, বিদেশে-বিভূইয়ে কেউ কখনো পাসপোর্ট হারিয়েছে ?’ সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারো কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে আল্লারসুলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বন্ধিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি,—শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সব কটাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দৃষ্টান্ত—বিদেশে পাসপোর্ট হারানো।

ছোট্ট কনসুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শ্রদ্ধোবে, পাসপোর্টের নম্বর, ইস্যুর তারিখ গম্বরহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনসুলেটে ধম্মা। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কনসুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষার কথা কয় ; তাই বলে তারা ভারতীয় ? ইন্ডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপোর্ট দেব ? বের করুন বার্থ সারটিফিকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারগাড়ার হাবিজাবী হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যতঃ হস্ততঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবন্ড ভ্লাডিভস্টক থেকে আলস্কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে, বাঁ চকচকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইন্ডিয়ান পাসপোর্টের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাং চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওক্ষীক দেখেছিল পৃথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনসুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য অনুর্তিতর (‘ভিজার’) সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোকটাকে জব্দধব্দ হয়ে এক কোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মধ্যে সিলেটি শব্দে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের কিছ্র দুয়ে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনো

গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উল্কাবন্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পড়েছে। পাসপোর্টে তো সাপের মণি—রস্টিভর ডকুমেন্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র ‘সিলট্যা’ ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লো কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালিসটার কথা পাড়লুম। সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, ‘বিলকুল হুম্বগ।’ আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।’

মনে মনে আমাকে বলতে হল, ‘পোরা কপাল আমার।’ সাহেবকে বললুম ‘ওকে একটু ডাকলে হয় না?’ সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, ‘আলবৎ।’

লোকটা আসামগ্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যোর কাঁচা লক্ষা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যে রকম নসিকে ভিলেজ ইন্ডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও—। দাওয়াই ধরলো। কাঁইকুই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দিরয়ার নোনা-জল। মিনিট পাঁচেক চললো ‘রসালাপ’। সায়েব খালাসীকে বললেন, ‘টুম্বাও।’ আমাকে শুধোলেন, ‘এও বাঙলা?’ আমি বললুম, ‘লন্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যান্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাতাইর সঙ্গে তার চেয়েও কম।’

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যাকার ডিপলমেট। বললেন, ‘দু-একটা শব্দ যে একবারই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কি? কোনোবিশুদ্ধ স্ট্যান্ডার্ড ভাষা—যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসী, কিংবা ধরো লন্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজী—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙগেরিয়ান চোস্ত ইংরেজী বলে, খাসা ফরাসী কপচায়—কার সাধ্য বলে কোনটা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেশট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লন্ডনের কটা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?’

সায়েবটি ছিল একটু দুর্দে টাইপ। খালিসটার জন্ম ভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটোপজেমের মূর্ত প্রতীক ‘এনকোয়ারি’ না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একথানা পাসপোর্ট।

নইলে ঐ হতভাগা ক’মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্য দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতো, খেত কি, মাথা গুঁজতো কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনো সমাধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যাশাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরী পলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শব্দতো ‘তুমি তো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর’ (আরবীতে ‘প’ নেই বলে ‘ব’

আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসী থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপোর্ট উচ্চারিত হয় 'বাসবর', বা 'বাসাবর') তাহলে ?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ংকর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা বখশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধনী দেওয়া, তদ্বির করা সেটুকুনই বা করবে কে ? অবশ্য আথেরে এস্থলে তদ্বির করা না করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বগ্রহীত্বীয়-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মতো ক্ষীণ-কায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয় তবে টেসে যেতে কতক্ষণ ? না হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপোর্টে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কৃতব কর্তে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পদ্বীসম্মান আপনাকে চোন্দ-তলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেন্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

*

*

*

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম ভাচ্ছিল্য সহ মাঝে মাঝে বলছিল 'যত সব !' কিংবা 'আদিখেস্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী !

শেষটায় বললে, ছোঃ ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন ?

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক', অধুনা ইসমেৎ ইনেন্দুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, যাঃ ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ !—না। কিনে দিভুম। কী আর এমন ক্ষেপাতার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য ?

আমি অবাক হয়ে শূধোলুম, 'সে কি ? পাসপোর্ট কি হাটের বেসাতি, মেষ—'

গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস ! তুমি আজহর মাদরাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো ; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চারির কায়দা-কেন্দা ।।

‘ঈস্ট ইজ ঈস্ট অ্যান্ড্—’

ইজরাএল (ইসরাইল) নিমিত্ত মাত্র। অর্-রঈস জমাল্ আবদুন নাসিরও নিমিত্ত মাত্র। দুজনের পিছনে রয়েছে দ্বিধা বসুন্ধরা—যাকে আমরা এতদিন প্রাচী তথা প্রতীচী নামে চিনেছি। ইংরেজ ফরাসী গয়রহ বলেছে, অরিনএনট এবং অকসিডেন্ট। জর্ম’নরা এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু খাঁটি জরমানে বলা হয় মরগেন্‌লান্ট (উদয়াচল) ও আবেনট্‌লান্ট (অস্তাচল—অবশ্য লান্ট্ = ভূমি, দেশ) ; আরবরা হুবহু ঐ রকমই মশারিক্ ও মগরিব’ (মগরিব বলতে আবার দক্ষিণ আফ্রিকাকেও বোঝায়) বলে থাকে।

এই দুই ভূখণ্ড নিজেদের ভিতর প্রায় সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছে—যুদ্ধং বোঁহ।

এ-লেখা বেরবার পূর্বেই হয়তো উভয় পক্ষ অস্ত্রসংবরণ করে নেবেন। কিন্তু এর শেষ অতি অবশ্যই এখানে নয়। এ শব্দ দুই আরম্ভ মাত্র।

প্রতীচীর শক্তিশালী যুদ্ধাধান বলতে উপস্থিত বৃষ্টি জনসন, উইলসন? ও দ্য গল। প্রাচীর ভীষ্ম কর্ণ বলতে বৃষ্টি কর্সিগন মাও।

ইজরাএলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন মার্কিন ও ইংরেজ। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পশ্চাতে রুশ ও চীন।

দ্য গল বাতায়। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের মত। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণেরই মত তিনি একটা শান্তিসভার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাবের পশ্চাতে তাঁর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কুট কর্সিগন সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমান করে নিলেন যে ধড়িভাজ মার্কিন ইংরেজ এই সভাটাকেই মৃদুশলে পরিবর্তিত করে আরব বংশ ধ্বংস করতে চাইবে। তাই কর্সিগন যা বললেন, যার ব্যঞ্জনা দিলেন, এবং যা বললেন না কিন্তু মীন করলেন তার সব কটা একুনে দাঁড়ায় : ‘শান্তির প্রস্তাব তো উত্তম প্রস্তাব’, কিন্তু প্রশ্ন, তুমি জনসন, এবং উনি উইলসন যে দুটি আপন আপন খাসা নৌবহর ভূমধ্যসাগরে রৌঁদ মারিয়ে ফেরাচ্ছে,

১ বাঙলা গরিব শব্দ ও মগরিব মূলে একই ধাতু থেকে। গরিব আরবীতে ‘বিচি’ ‘অভূত’ অর্থ ধরে।

২ একদা এ দেশে থাকা হত বাঙালীর জাত মারছে তিন ‘সেন’-এ মিলে। উইলসেন-এর হোটোলে বাঙালী খেত নিষিদ্ধ মাংস, কেশব সেন তাদের করে ফেলত ‘বেশ্মজেনী’, আর ইন্সটিসেনে বাহাম জাত-বেজাতের সঙ্গে মেলা-মেশা এড়ানো যেতো না। এখন পৃথিবীর জাত মারার জন্য এসেছেন অন্য তিন সেন। মার্কিন জনসন, ইংরেজ উইলসন এবং কানাডার পিয়রসেন। তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিটি নিতান্তই চুনোপুটি। কিন্তু স্বয়ং জনসন মদ্যকচ্ছ হয়ে এ’র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ’কে বেজাতে তুলেছেন, কিংবা বলবো এ’র জাভ হেরেছেন।

দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো বাদবাকিগুলোকে নোঙর ভেঙে ফেলে ফুল ইস্তীমে ওদিক-বাগে ধাওয়া করতে হুকুম দিচ্ছে (মদখে যদিও বলছো, 'ওরা তো চলাফেরা করছে কবেকার সেই ঈসু করা প্রাচীন দিনের টাইম-টোবল অনুযায়ী) তারা কি ওখানে আসছে ফেরেশতাদের প্যাটারনে পিঠে ড্যানা গজিয়ে, হাতে হারপ যন্ত্র নিয়ে "হাল্লেলুইয়া" কীর্তন সহ যীশুদন্ত আপ্ত আপ্ত শাস্তি সঙ্গীত গাইতে :

"অগ্নসর হও আজি খৃষ্টসেনাগণ

সবে মিলি আইস—"

থাক না, বাছারা, ওসব সন্-ডে ইস্কুলের মোলায়েম মোলায়েম মধুরসের মোরশ্বা ! আর সেই যদি কইছ, ভূমধ্যসাগরে, ইজরাএলের ধারে ধারে, মিশরের বন্দরে বন্দরে মানওয়ারিদের কোনো প্রকারের ভালোমন্দ মতলব নেই তবে একটা সরল কর্ম করলেই তো হয় । বেচারী খালাসীমাল্লারাও লক্ষ্য-হস্ত তুলে তোমাদের আশীর্বাদ করবে আপন আপন দেশের বন্দরে দারাপত্রপরিবার সহ সম্মিলিত হয়ে—যাক না এরা ফিরে আনকল্ স্যামের সোনার দেশে, ডিফেন্ডার অব ফেং-রুল-রিটানিয়ার অক্ষয় স্বর্গে—আহা ! ন্যু ইয়রক সাউথ্যামটনে ফুল কত না অজস্র, আসব কত না সুন্দর, আর ললনারা কতই না উন্মত্ত হৃদয় (পাঠক, আমি শব্দার্থে বলছি না !—খেয়াল থাকে যেন—লেখক) । শাস্তি সম্মেলনে তো যাবো, ওদিকে যারা তোমাদের দলে নয়, তাদের প্রত্যেকের পিছনে থাকবে ছোরা-হাতে একটি একটি করে মানওয়ারী গন্ডা (হিটলার রাইষটাগে এই ব্যবস্থা করাতেন গোড়ার দিকে, বিপক্ষ দল নির্মল না হওয়া পর্যন্ত) । ঐ আনন্দেই থাক ।"

সরল পাঠক হয়তো এই বলে প্রশ্ন শূধোবেন, আমরা তো জার্মান, রুশরাও ইউরোপীয়, অকসিডেন্টাল, প্রতীচা জাত । আদৌ তা নয় । রুশ কেন, চেক পোল ইত্যাদিকেও অনেকে ইয়োরোপীয় ঈস্টারন বলে থাকে । এই তো সেদিন জার্মানির কনস্টানৎস্ শহরে এক সাহিত্য সম্মেলন হয়—তাতে 'ইস্টে'র প্রতিভু হয়ে আসেন এক চেক, অন্যজনা পোল বা রাশান । আর হিটলার তো যুদ্ধ লড়তে লড়তে বরাবর চিৎকার করে গেছেন, 'এ সংগ্রামে এক পক্ষে সভ্য ঐতিহ্যশীল ইউরোপীয়, অন্যপক্ষে বর্বর ঈস্টারন—রুশ ।' মৃত্যুবরণের পূর্বে বলেন, 'আমি ছিলুম ইউরোপের শেষ আশা । কিন্তু সপ্ৰমাণ হল, প্রাচী আমার চেয়ে শক্তিশালী ।'

সরল পাঠককে বোঝাই, তাঁরই মত সরল-অবশ্য ওদেশে বিরল—ইয়োরোপীয় মান্তই একটি অতি বাস্তব, ধরা-ছোঁওয়ার জিনিস দিয়ে প্রতীচী প্রাচীর তফাত করে । জামার সামনের দিকটা পাতলুনের ভিতর যে গর্জে দেয় সে ইয়োরোপীয়, যে বাইরে ঝুলিয়ে রাখে সে প্রাচ্যদেশীয় । রুশরা যখন তাদের খাঁটি দিশী পোশাক—বাতুশ্কা, স্তালিন যা পরতেন—গায়ে চড়ায় তখন তাদের কারুকার্য-করা শারটটি (ব্লাউজও বলা হয়) পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়, আমরা যে রকম পাজাবির সামনের দিকটা (দামন, অঙ্গল) ধূতির উপরে

ঝুলিয়ে রাখি।^{১৩} এখানে বদশ-শারটের 'রেজৌ দেংর' নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচীন, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যাবো ; তবে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উক্ত বদশ-শারটের দামন ভিতরে গুঁজে টাইপরা যায়, আবার বাইরে ঝুলিয়ে মিন-টাই হওয়াও যায়।

মধ্য-প্রাচ্য উপলক্ষ মাত্র।

এক দিকে জনসন-উইলসন চালিত ইয়োরোপ—লক্ষ্য করেছেন চ্যাংড়া ডেন্ মার্ক তক্ত বাদির নাচ নেচে রুশের কাছে ধমক খেয়েছে?—অন্য দিকে রুশ-চীন চালিত এশিয়া, এবং আফরিকাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ এক দিকে সাধা, অন্যদিকে কালো—বা রঙিন বলতে পারেন। সাধার পাল এখন হাড়ে হাড়ে বন্ধুতে পারছে, ইউরোপের বাইরের সবাইকে কলরুদ্ নাম দিয়ে কী খানডারিং ব্রানডারই না সে করছে! পীলা চীন, কালো নিগ্রো, তাঁবাটে আরব, আধা-পীলা রুশ (ইংরেজাদের দৃঢ় সংস্কার, রুশের গায়ে প্রধানত মনগোল-তাতার রক্ত) হয়েছে এক-জোট-ওঁদিকে মার্কিন নিগ্রো মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) বলছে, মার্কিনের হয়ে লড়তে তার বিবেক-জাত ঘোরতর অধর্মবোধ রয়েছে—পিছনে রঙ-বেরঙের ভারতীয়-পাকিস্তানীও সায় দিয়ে মাথা নাড়ছে; এশ্যক যে, লেবানন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কারণে। আধা খ্রিস্টান আধা মুসলমান—যে কিনা এতদিন সর্বসংঘাতে গা বাঁচিয়ে 'দেহ রক্ষা' করেছে, সেও আশ্চর্য নাহিরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শৃঙ্খল লক্ষ্য করার মত দেশ, জাপান। পশ্চিমের দ্য গলের মত ইঁদুরও এতাবং নিরপেক্ষ। তা, এরকম দু'একটা ব্যত্যয় না থাকলে মাথাভরা চুলের প্রকৃত বাহার মালুম হয় না।

হাজার চার-পাঁচেক বছর পূর্বে ঠিক এই প্যাটার্ন-টিই ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছিল—যার প্রতি ইঙ্গিত, যার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা—প্যাটার্ন-নের তুলনা আমি এই ক্ষুদ্র লেখায় এতক্ষণ দিলুম : বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, নানা বর্ণ^{১৪}—বিশুদ্ধ সংমিশ্রিত—নানা জাতি, নানা সভ্যতার লোক একদা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এক দিকে দুর্যোধনের পশুবল ; অন্য দিকে ধর্মরাজের ধর্মবল।

৩ মধ্য বা পশ্চিম ইয়োরোপে ধর্মিত-পাজাবি পরে বেরুলে একাধিক সম্ভজন আপনার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার! শার্টটা গুঁজতে ভুলে গিয়েছেন।' তাঁর মনে হয়েছে, আপনি শৌচাগারের প্রয়োজনীয় কর্মটি করার পর দামনটি গুঁজতে ভুলে গেছেন—বড়ো অধ্যাপকরা যে রকম ক্ষুদ্রতর কর্মের পর পাতালুনের বোতাম লাগাতে ভুলে যান।

৪ অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণের যদুবংশ ছিল কালো, কৌরবেরা ছিলেন গোরা আর পাণ্ডবরা ছিলেন পাণ্ডু, অর্থাৎ পীলা, হলদে। পাণ্ডবরা নাকি আসলে তিব্বতের মঙ্গোলীয়ান। (Winternitz পশ্য। এ বাদ বা বিবাদে যোগ দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।) মহাভারতের যুদ্ধ নাকি কৃষ্ণ-পাণ্ডু বনাম গোরা-কৌরব।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২০

আজ সেই প্যাটার্নই বোনা হচ্ছে গোটা বিশ্বের নানা রঙের সূতো দিয়ে ।

হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লাগবে না । কিন্তু সে ‘শান্তি’ দীর্ঘস্থায়ী হবে না ।

তেইশ বৎসর পূর্বে— তখন স্বরাজ হয়নি— ‘আনন্দবাজারে’ আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—মার্কিন-ইংরেজের এই বে-আদপী বেতমিজীকে ‘ধ্বলদন্ত’ নাম দিয়ে । ইংরেজ যে-রকম একটা চীনকে ‘পীতাতঙ্ক’ (ইয়েলো পেরিল) নামে ডাকত, আজ বিশ্ব জুড়ে তারই পুনরাবির্ভাব !

হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে হয় মহাভারত ; আজ না-হোক, দুদিন বাদে হবে বিশ্বভারত ।

বিষয়বস্তু

নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে । আমি খবরের কাগজের সম্মানিত রিপোর্টার নই । তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ নৈব্যক্তিক (ইম্পার্সনাল) ভাবে আপন বয়ান পাঠকের সন্মুখে পেশ করা । তৎসঙ্গেও তাঁরা মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনতে পান । পাঠকসাধারণ ভুলে যান, রিপোর্টারও মাটির মানুষ, তারও ধর্মবুদ্ধি আছে, সেও অন্যায় অবিচারের সামনে কখনো-কখনো আত্মসংযম না করতে পেরে উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করে । ফলে কখনো বা কটুবাক্য শুনতে হয়, কখনো বা হাততালিও পেয়ে যায় । প্রকৃত রিপোর্টার অবশ্য কোনোটারই তোয়াক্কা করে না । সে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যদি দেখে যে, সে নিভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে ।

রিপোর্টার হওয়ার মত শক্তি আমার নেই । তদুপরি দৈনন্দিন যে-সব ঘটনা রিপোর্টেড হচ্ছে, তার যদি কোনো ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে, সে যদি আমাকে মানবসমাজের পতন-উত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক না যোগায় তবে সে জিনিসের প্রতি আপনার আমার মত সাধারণজনের চিন্ত আকর্ষিত হয় না ।

যেমন ধরুন আরব-ইজরাএল দ্বন্দ্ব । কথার কথা কইছি, কাল যদি মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ সবাই একজোট হয়ে একটা সমাধান করে দেন—যার চেষ্টা এখন প্রতিদিনই হচ্ছে—তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উভয় পক্ষই যখন শান্ত হয়ে গেছেন তখন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আর পাঁচটা খবরের দিকে নজর বুলাই । আর রিপোর্টারদের তো কথাই নেই । দুই প্রতিবেশী শান্তিতে আছে—এটা খবর নয় । দুই প্রতিবেশীতে খুনোখুনি হচ্ছে সেটা খবর । সংবাদ-সরবরাহ-ভূবনের আপ্তবাক্য—কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর ।

অথচ আমি বিলক্ষণ জানি, আরব-ইজরাএল সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে কি, তার সম্ভান আজও পাওয়া যায়নি । নাসির বলছেন, আমি ইজরাএলকে সমলে উপাটন করবো । ওদিকে ইজরাএল যেটুকু জমির উপর এখন রাজত্ব

করছেন তা নিয়ে যে তিনি একদম সন্তুষ্ট নন, সে কথাও তিনি গোপন রাখেন না। অ্যানটনি ঈডন-এর গোয়ার অভিযানের ফলে যখন ইজরাএল সৈন্য সবলে মিশরের সাইনাই (সিনাই, আরবীতে 'সীনিম, সীনা') অধিকার করে তখন আনন্দে উল্লাসে কম্পিত, ভাবাবেগ দমনে অশক্ত ইজরাএল-প্রধান বেন গুরিয়ন যাজকসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার অর্থ, আমরা আমাদের ন্যায্য ভূমি অধিকার করেছি, এ-ভূমি আমরা আর কখনো পরিত্যাগ করবো না। তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল (এবং আজ সেখানে পুনরায় দুই দল সম্মুখীন হয়েছেন), কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ সাইনাই ইজরাএলের প্রাপ্য, এটা ইজরাএল-দৃষ্টিবিশদ থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) আমলে ইহুদি রাজত্ব কতখানি বিস্তৃত ছিল সেটা পাঠক বাইবেলের পিছনে যে প্রাচীন যুগের ম্যাপ দেওয়া থাকে সেইটে দেখলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। আজ তার বহুং অংশ লেবানন, সীরিয়া, জর্ডন, মিশরের দখলে। কিন্তু হায়, বিশ্বের আদালত ইজরাএলের আড়াই হাজার বছরের তামাদি এ দাবি মানবে না। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পূণ্যভূমি প্যালেসটাইন ত্যাগ করে দলে দলে সেই সদূর রুশ দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইহুদিদের যাজক-সম্প্রদায় কখনোই আপন পূণ্যভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। কারণ, স্বয়ং ইহুদির সম্রাজ্যপ্রভু যাহবে ধর্মগ্রন্থ তোরাত্রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, সেই দুঃখ-মধুর দেশে।' এ-স্বপ্ন বাস্তবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এরই নাম জায়োনিজম এবং এর প্রধান কেন্দ্র ছিল জার্মানিতে। মহাকাবি হাইনে কিছুদিন বারলিনে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে সেটা ত্যাগ করেন; বস্তুত জায়োনিজমের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই একদল শক্তিশালী ইহুদি এ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য ছিল : 'প্যালেসটাইনে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব দূরে থাক, সেখানে ইহুদিদের জন্য কোনো ধরনেরই খাস 'ন্যাশনাল হোম' করা হবে ভুল। কারণ সে দেশ ছেড়েছি আমরা দু'হাজার বছর পূর্বে, এখন (১৯/২০ শতাব্দীতে) সেখানে শতকরা দশজন ইহুদিও বাস করে না বাদবাকি শতকরা ৭০/৮০ মুসলমান, ১৫/২০ খৃষ্টান (হিসেবটা খুবই মোটামুটি, কারণ সে-যুগে এ-অঞ্চলের তুর্কী শাসনকর্তারা আদমসন্মারিতে বিশ্বাস করতেন না) এখানে শত শত বৎসর ধরে বাস করেছে (এবং এ'রা না বললেও আমরা জানি, এই মুসলমান এবং খৃষ্টানদের অনেকেই গোড়াতে ইহুদি ছিল, পরে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান খৃষ্টান হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তার ৯৯% ছিলেন জাত-ইহুদি। পরবর্তী যুগে এ'দের অনেকেই হয়ে যান মুসলমান)। এ'দের

১ ইহুদি আরব উভয়ের কাছেই এ গিরি পুণ্যপবিত্র। কুরানশরীফে আল্লাতাল্লা এর নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। ১৫ সূরা, ২য় ছত্র।

অধিকাংশই চাষা, জেলে। এঁদের ভিটেমাটি কেড়ে না নিয়ে নবাগত ইহুদিদের বসাবে কোথায়? ...তার চেয়ে বহুতর গুণে কাম্য আমরা, ইহুদিরা, যেন যে-সব দেশে বাস করি সেই সব দেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে যাই।' আমার যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লয়েড জরজ ইহুদির জন্য 'ন্যাশনাল হোমের' খসড়া বানাচ্ছেন তখন ভারত-খ্যাত ইহুদি (?) মনটাগু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বার বার বলেন, এতে করে আথেরে ইহুদিকুলের অমঙ্গল হবে।

কিন্তু যুক্তিতর্ক এক জিনিস আর অনাগত যুগের সুখস্বপ্ন দেখা অন্য বিলাস। রাজকুমারী মীরাকে রাজসভার গুণীজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই অত্যন্তমরুপে বদ্বিষয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনের পেভমেন্ট (!) সোনা দিয়ে গড়া নয়, যদিও বর্ষার ঋতু মেঘাগমে তথাকার আকাশ মেঘের হয় অতি অবশ্য, ঘন তমালব্রু-রাজি জনপদভূমিকে শ্যামল করে রাখে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু সেখানে বিষধর সর্পও ঠিক ওই সময়েই গোপগোপীদের প্রাণহরণ করে, তদুপরি—তদুপরি নিশ্চয়ই সভাসদরা বিস্তর অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করেছিলেন যে, ওই সাতিশয় অগাউ-গ্রাম রাজকন্যার বাসভূমি হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি তিনি স্বপন দেখছেন,

চাকর রহস্‌ বাগ লাগাস্‌

নিতি উঠি দরশন্‌ পাস্‌

বৃন্দাবনকে কুঞ্জগলিমে

তেরী লীলা গাস্‌!

পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে-রকম ভূত মারা যায় না, যুক্তিতর্কের খাণ্ডার দিয়েও সুখস্বপ্ন খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না।

স্বপ্ন দিয়ে তেরী আর স্মৃতি দিয়ে গড়া মেলা ঝামেলার ভিতর রিপোর্টার অনুপ্রবেশ করে খামখা হায়রান হতে চান না—তাই বলেছিলুম, আমি রিপোর্টার নই, হবার মত এলেম ও হক্কও আমার নেই।

কিন্তু সেই ১৯২৯ থেকে আমি গাডায় গাডায় ইহুদিদের সংস্পর্শে এসেছি। বোম্বাই অঞ্চলে 'শনিবারের তিলী' নামে পরিচিত এ-দেশে অতি প্রাচীনকালে আগত ইহুদিদের সঙ্গে আমি বাস করেছি (ব্যক্তিগতভাবে আমি এঁদেরই ইহুজগতের সর্বোত্তম ইহুদি বলে মনে করি), দ্বিষজয়ী ইহুদি পাণ্ডিতের কাছে হীরু শেখার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আমি দিয়েছি (দোষ রাশ্বির নয়, আমার), ইহুদির (তথা খৃষ্টান ও মদুসলমানেরও) পুণ্যভূমিতে আমি বাস করেছি, জরডনের পাক পানিতে ওজু করেছি, গ্যালিলিয় হুদের অতিশয় সুস্বাদু মৎস্য আমি দিনের পর দিন দুবেলা পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেছি, বস্তুত প্যালে-স্টাইনের উত্তরতম সীমান্ত থেকে—যেখানে সীরিয়া আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে—দক্ষিণতম সীমান্ত গিজা অবধি, তথা পূর্বতম সীমান্ত (ট্রানস্‌) জরডন থেকে পশ্চিমতম সীমান্তের খাস ইহুদি নগরী তেল আবিব ('বসন্তগিরি') পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করেছি।

পরম পরিতাপের বিষয় উপরের ছত্রের কালি শুকোতে না শুকোতে মর্মাস্তিক দঃসংবাদ এসেছে যে আরবে ইহুদিতে কোনো প্রকারের সমঝুতা সম্ভবপর হ'ল না বলে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ।

এ দঃসংবাদের পর বিমূঢ় মুহাম্মান হয়ে আমার এ অক্ষম লেখনী আর এগোতে চায় না ।

যদি ইজরাএল হারে তবে তার তিনদিকে আরব বেদুইন ও বাস্তুহারা আরব (প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার) যারা জরডন অঞ্চলে কেউ কুড়ি বৎসর ধরে, কেউ বা এগারো বৎসর ধরে তাঁবুতে তাঁবুতে দঃখদৈন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে এই মহালগ্নের অপেক্ষা করছিল তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত ইজরাএলে ছেয়ে পড়ে বালবৃদ্ধনারী কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না । হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবে ।

আর সন্মিলিত আরব জাতিপুঞ্জ যদি হেরে যায় তবে তাদের সে অবমাননা—ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও—তাদের সে অবমাননা, তাদের আত্মসম্মান-বোধের পরিপূর্ণ পদদলিত বিনাশ—তাদের করে তুলবে নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর, সর্বনেশে ভবিষ্যতের প্রতিশোধকামী জিঘাংসু জীবন্ত প্রেতাচার মত ।

মধ্যযুগের সেই নির্মম ক্রুসেডের মত এর প্রস্তুতি চলবে পুনরায় শত বৎসর ধরে, পরিণাম হবে শত শত বর্ষব্যাপী ।

প্রথম লেখনেই আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে, এ তো শুধু অবতরণিকা । মনে মনে দুরাশা করেছিলুম, এই বিষবৃক্ষের চারাটাকে বিশ্বমানবের শূভবৃদ্ধি হয়তো বা উৎপাটিত করে দেবে ; এখন দেখছি, এই শিশু বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠবে একদিন—শত শত বৎসর ধরে এ বিষবৃক্ষ পাবে উত্তপ্তপঙ্কের ক্রোধোন্মত্ত প্রতিশোধ কামনার অপবিত্র শূকররক্তের উর্বরতাদায়ক খাদ্যান্নশর্কর ।

এ বিষবৃক্ষকে তখন আর সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না ।

যদি যায়, কিংবা বিধির আদেশে কোনো দৈবাগত ঝঞ্ঝায় সে ভূপাতিত হয় তবে সে মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সঙ্গে নিয়ে যাবে অসংখ্য নরনারী বালবৃদ্ধকে নিষ্পত্ত করে তাদের প্রাণবায়ু ॥

আরব-ইজরাএল যুদ্ধারম্ভ দিবস ।

“দুঃখ তব যন্ত্রণায়”

আমাদের কৈশোরে রমা রলী ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক । বস্তুত এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাস বলতে রলীর জ্যা ক্রিস্তফই বোঝাত ।

সে-সঙ্গে ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কোনো রূপে রলী আত্মপ্রকাশ করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা কোনো কোতুহল প্রকাশ করিনি ।

অথচ ইয়োরোপের ভাবুকজন মাত্রই রলাঁকে চেয়েন আরো অন্য একটি রূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু আগের থেকেই রলাঁ ইউরোপে ক্রম-বর্ধমান উৎকট জাতীয়তাবাদ (শাভিনিজম) যে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ংকরী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান এবং দেশবাসী ফরাসী তথা জার্মানদের (রলাঁ ছিলেন জার্মান সংগীতের আবাল্য একনিষ্ঠ ভক্ত) এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাবধানবাণী শোনান। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র, সর্বকালে যা হয়ে থাকে, তাই হল। উভয় দেশই তাঁকে আপন আপন শত্রু বলে ধরে নিল।

বিশ্বযুদ্ধ লাগার সময় রলাঁ ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি রেডক্রসে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সমস্ত যুদ্ধকালটা ফ্রান্সের উদগ্র শাভিনিজমের বিরুদ্ধে দৈনিক মাসিকে প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। যুদ্ধশেষের সময় ভগ্নোৎসাহ ক্লান্ত রলাঁ খুঁজলেন শান্তির সম্মান। দু'ব দিলেন তাঁর স্বদেশের শত্রু জার্মান জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতসৃষ্টিকার বেটোফেনের সংগীতের আরও গভীরে। বেটোফেন জার্মান হয়েও জার্মানদের বহু উদ্বেগ - তাঁর সংগীত মানবকে তুলে নিয়ে যায় নভঃলোকে, যেখানে ক্ষুদ্র-নীচ শাভিনিজম পেঁছতে পারে না। একদা তিনি তাঁরই মত মহামানব কর্তৃক গ্যাটেকে বলেছিলেন, ‘আপনি আমি দেবদূতঃ আমাদের কাজ—মাটির মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।’

রলাঁ যে বেটোফেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাকে মডার্ন উল্গাসিক ‘ইস-কেপিজম, পলায়নী-মনোবৃত্তি’ নাম দিয়ে সম্ভায় কিস্তিমাত করবেন। কিস্তি ভুললে চলবে না, রলাঁ অবগাহন করতে নেমেছিলেন সুরগঙ্গায় ক্লান্ত দেহমন স্নিগ্ধ করে নিয়ে পুনরায় তাঁর কর্তব্য-কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য। তিনি গঙ্গা নদীর মীন হয়ে ইস্কেপিজমের নদীগর্ভে বিলীন হতে চাননি।

*

*

*

আঁদ্রে জিঁদ-এর কপালে ছিল নিদারুণতর দুর্দৈব। তিনিও জাতি-ধর্ম-দেশের উদ্বেগে বিরাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রলাঁ যেরকম আশু দূর্ব্যোগের

১ দ্বংসের বিষয়, মূল পাঠটি আমার কাছে নেই। উভয় মহাপুরুষের পরিচয় হয় কারলস বাড-এ (চেক নাম Karlovy Vary)। ছোট গিলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয় জনা দু-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে। গ্যাটে সম্মানে তাঁদের পথ ছেড়ে দেন। বেটোফেন পাগলা ষাঁড়ের মত সোজা চলতে থাকলে রাজপুত্ররা সর্বনয় তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান। গিলির শেষে পেঁছে বেটোফেন প্রতীক্ষা করেন গ্যাটের জন্য। তিনি পেঁছলে পর রাজপুত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁচ্ছল্যের সঙ্গে বলেন, ‘এরা কারা? আপনি আমি দেবদূত—ইত্যাদি।’ সমস্ত ঘটনাটিই হয়তো কিংবদন্তীমূলক। এর একাধিক ‘পাঠ’ (ভারসন) আমি কারলস বাডে বাসকালীন শুনছি। তবে রলাঁও তাঁর বেটোফেন-গ্যাটে সম্বন্ধে পুস্তকে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

পূর্বাভাস স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি পেয়েছিলেন কিস্তীর পূর্বাভাস। যুদ্ধ লাগার পর তাঁকে যখন বেতারে প্রোপাগান্ডা করতে বলা হল, তিনি অসম্মতি জানানেন। দেশকে ভালবাসতেন রলি, জিদ উভয়েই, কিন্তু যে স্থূল পদ্ধতিতে অশ্রাব্য কটু ভাষণে যুদ্ধের সময় এক জাতি অন্য জাতিকে গালাগাল দেয়, স্পর্শকাতর বিশ্ব-নাগরিক এবং সর্বোপরি বিদ্বৎ কলাকার জিদ তার সঙ্গে সুর মেলাবেন কি করে! জিদ তাঁর জুরনালে (রোজনামাচাতে) লিখছেন, গ*। বেসিদেমা, জা ন্য পারলরে পা আ লা রাধিয়ো—‘না, আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি বেতারে বক্তৃতা দেব না। ...খবরের কাগজগুলো এমনিতেই যথেষ্ট দেশপ্রেমের ঘেউ-ঘেউয়ে ভর্তি’। নিজেকে যতই ফরাসী বলে অনুভব করি ততই আমার ঘেন্না করে।’ এর পর জিদ বড় সুন্দর করে বলেছেন; তিনি নিজেকে যেভাবে ফরাসী মনে করে গর্ব অনুভব করেন, এই স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে তো তার কোনো মিল নেই।

জিদের স্মরণে এল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়কার কথা। তখন কিছু লোক এমনই হাস্যকর ‘প্রচারকাষ’ আরম্ভ করে যে, তখনকার দিনের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক লুসিআঁ জাক বলেন, ‘চুপ করে থাকাটা কি তবে এমনই কঠিন?’—‘সে দ*ক্ সি দিফিসিল দ্য স্য ত্যার?’

তারপর জিদ বলছেন, ‘কিন্তু হৃদয় যখন ফেটে পড়তে চায়, তখন নীরব থাকাটা যে বড়ই বেদনাময়।’ এটা স্বীকার করে তিনি শেষ করেছেন এই বলে, ‘কিন্তু আমি তো চাই নে আজ এমন কিছু লিখতে, যার জন্য কাল আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়’!

এই সময় জিদ পড়ছেন জার্মান কবি ও ঔপন্যাসিক আইসেনউরফের বই ‘নিশ্কর্ম’;

অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল জিদের চোখের সম্মুখে। অবিশ্বাস্য মনে হল বিশ্বজনের কাছে যে, নেপোলিয়নের দেশ ফ্রান্স মাত্র পাঁচ-ছয় সপ্তাহের একতরফা যুদ্ধের পর—বশ্তুত ফ্রান্স একবার মাত্রও পুরো জোর হামলা করতে পারেনি!—বিজয়ী জার্মানির পদতলে লুষ্ঠিত হল।

জিদ বলছেন, ‘শত্রু যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তখন তার কাছে পরাজিত হওয়াতে নিশ্চয়ই কোনো লজ্জা নেই; এবং আমিও কোনো লজ্জা অনুভব করি নে। কিন্তু যখন ভাবি আমরা কি-সব স্তোকবাক্যের উপর নির্ভর করে কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করে পরাজয় ডেকে এনেছি—তখন যে গভীর বেদনা অনুভব করি সেটা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারি নে, অস্পষ্ট মূর্খ আদর্শবাদ, প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অপরিচয়, অপরিণামদর্শিতা, মূর্খের মত অর্থহীন এমন সব বাগাড়ম্বর অশ্ববিশ্বাস—যার মূল্য আছে শত্রু অপোগন্ডের কল্পরাজ্যে।’

নিরংকুশ পরাজয়ের পরের দিন জিদ লিখছেন :

‘একমাত্র গ্যোটে’র সঙ্গে কথোপকথনই আমাকে দৃষ্টিস্তার এই মৃত্যু-সম্মুখ থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি এনে দেয়’—

‘Seules les Conversations avec Goethe parviennent a distraire un peu ma pensee de Pangoisse.’

পাঠক লক্ষ্য করবেন, ‘গ্যোটে’র সঙ্গে কথোপকথন ‘Conversation with Goethe’ (মূল জার্মানে Gaspraech mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens)

গ্যোটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক অত্যন্ত ‘জীবিত’ জীবনী লিখেছেন গ্যোটে’র সখা এবং শিষ্য একেরনান (অনেকটা ‘শ্রীম’)। কথোপকথন হয়েছে গ্যোটে এবং একেরনানে। অথচ জিদ ইচ্ছে করে এমনভাবে বাক্যাতি রচনা করেছেন যে মনে হয় তিনি, জিদ-ই, যেন স্বয়ং কথাবার্তা বলছেন জার্মান মহাকাবি ঋষি গ্যোটে’র সঙ্গে, ইঙ্গিত করছেন, তিনি স্পষ্ট শব্দে শব্দে পাচ্ছেন ঋষির বাণী, তাঁর কণ্ঠস্বর। দৃষ্টিভঙ্গির বিভীষিকায় যে-টুকু সাম্ভবনা তিনি আদৌ পাচ্ছেন সেটি তাঁরই কাছ থেকে।

জিদ ঋষি নন—গ্যোটে’র মত। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সের গ্রাঁ ম্যৎ—গ্র্যান্ড্ মাশ্টার—অর্থাৎ ফ্রান্সের পথদ্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট। সেই ফরাসী সম্রাট সঞ্জীবনী সাম্ভবনা নিচ্ছেন—যে জার্মান নিম্নমভাবে ভুলদৃষ্টিত করেছে গরবিনী ফ্রান্সকে, তারই ঋষি কবির কাছ থেকে!

*

*

*

মিশরের আচ্ছা সম্বন্ধে পঞ্চাধিককাল পূর্বে যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এই মিশরই দৃ-পাঁচদিনের ভিতর লেগে যাবে জীবনমরণ সংগ্রামে। সেই আচ্ছাতে যিনি ছিলেন আমাদের ‘কবিসম্রাট’ তাঁর কবিতা পড়লে মনে হত তিনি যেন ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের বেদুইন ভাট। কথায় কথায় ‘বিশাল মরু দিগন্তে বিলীম’, ‘ছুটেছে ঘোড়া উড়ছে বালি’ আর জাত ইহুদি ইব্রাহিমের পুত্র মিশররাজ ইউসুফ ও জোলেখার সাহারার উচ্ছ্বাস-ভরা নীলনদের দুকুল-ভাঙা প্রেম।^২ আলট্রা মডারন কাইরো শহরের শিক্-পশ্ কাফের বাতাবরণে আমাদের কবিরাজ আহমদ ইবন শহরস্থানী অল্-মুকদ্দসী যখন তার সেই ফারাও যুগের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে, তখন আমার মনে হত এ রস রোমান্টিক, ক্লাসিক, এপিক, বৈদিক, প্রাগৈতিহাসিক সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বেআনডারটালে পৌঁছে গেছে। কবিও তাই চাইতেন।

আমাদের মুকদ্দসী কিন্তু আরট্ কি, অলংকার কাকে বলে, আরট্ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনো মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কি না সে নিজে কোনো আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু

২ আমরা যে গ্রন্থকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলি সেইটেই ইহুদিদের ‘তোরা’ ইত্যাদি। সেসব গ্রন্থে বর্ণিত অনেক পরগম্বর কুরানেও বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফ তাঁদেরই একজন। নজরুল ইসলাম হাফিজের অনুবাদ করেছেন :

দুঃখ করো না, হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে।

নতুন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শূন্যে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মৃদুদন্দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনো-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্‌ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মদ্রা, দানতে পেয়েছিলেন বেয়াংরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।

*

*

*

কবি মৃদুদন্দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লালিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, ‘সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিশ হাইনে পড়ো।’

*

*

*

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথাপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বশুস্ত্র লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমানির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু'বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আল'কারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্‌ গ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান ; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ষোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়ের-গারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হাইনুজোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরো কয়েকজন ইয়ার বক্সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাংকার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।^৩ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোন্মত্ততার

৩ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বোহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

লাগাম—বাক্যশ্রোত ছুটেছে তুরদুক সোওয়ারের মত । বিয়ার তাদের টেবিলে দিয়ে এসেছে পাব-এর খাবসদরুত কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে । কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটোটি বিয়ার-খানার আর পাঁচটা বার-গার্লের মত ঢলার্চলির পাঠ্য নয় । রাগে তার বাঁশীর মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকুটুক রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হলুকা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিচািহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন । হাইনে ওটা মশকরা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন—যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না ।৪

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিতে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ । শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল ।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ । ঘাড় তুলে মোরোটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই ।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে । মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে । ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘আমার উপর রাগ করবেন না, স্যার । আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন । আমি আপনার কবিতা পড়েছি । কী সুন্দর ! কী সুন্দর !! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন—কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে ।’

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে । আর হাইনে ?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন ।

একেরমান বলেছেন, ‘লক্ষ্য করলুম (নটবর) বশু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ।’

* * *

হাইনের চোখ দু’টি ভিজ্জে গিয়েছে । মধু কণ্ঠে বললেন, ‘এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনো হ’নি । এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক ।’

* * *

সখা মদুদ-দসী, কবি হওয়া সার্থক !

৪ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটে । কেউ বড় একটা সিঁইয়াসলি নেয় না । চেঁচামোচিটা অনেক ক্ষেত্রেই ‘ন্যাকরা’ বলে ধরা হয় ।

‘সাজ হয়েছে রণ—’

রবীন্দ্রনাথ

এ-রণ সাজ হয়নি। সবে আরম্ভ মাত্র। কত শতাব্দী ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। কিংবা, কত হাজার বছর ধরে। ‘হাজার বছর ধরে’ বলছি ভেবেচিন্তেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জাত আপন রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা হারায়। সেই সময় থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছিঃিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে দশে মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৯/২০ থেকে পুনরায় ইহুদিদের বহু লোক প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে (ইহুদি গণনায় ৫৭০৮ সালে—অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে) ইউনাইটেড নেশনসের অনুশাসনানুসারে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইজরাএল রাষ্ট্র (Erez Jissrael) গঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর লাগলো একটা মৃত রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাই এ রাষ্ট্র যদি আবার লোপ পায় তবে হয়তো লাগবে আরো হাজার দুই তাকে পুনরায় প্রাণ দিতে। তাই গোড়াতেই বলেছি, এ সংগ্রাম হয়তো চলবে আরো কয়েক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন, এ-রাষ্ট্র কি আবার লোপ পেতে পারে? অতি ক্ষুদ্র যে রাষ্ট্র এভগুলো বিরাট বিরাট আরব রাষ্ট্রকে চারদিকের ভিতর চূড়ান্ত পরাজয় দিল (বস্তুত এক ঘণ্টার ভিতরেই আরবশক্তির চোন্দ আনা জঙ্গী বিমান নষ্ট হয়, এবং ফলে আরবরা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেই সামান্যতম সাংখ্যিক আক্রমণ চালাতে পারেনি) সে কি কস্মিনকালেও এদের কাছে পরাজিত হবে? অবিস্বাস্য।

মাত্র একটি যোগাযোগের ফলে এ বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং উপস্থিত আরবরা যে সশ্লিষ্টপন্থেই দস্তখৎ করুক না কেন, তারা সেই মহালগনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

সকলেই জানেন, আরব ইজরাএল দুই পক্ষই লড়েছেন পশ্চিমাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কোনোদিন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় (এবারে আশ্বিন নাসির তাই চেয়েছিলেন কিন্তু রুশ তাকে ডোবাল) তবে ইজরাএলের সর্ব সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কি খাদ্যশস্যও। মিশর ইরাক তখন লড়বে অনেকটা রুশ যে রকম হিটলারের সঙ্গে লড়েছিল। ইরাক জরডন হটে হটে বতদূর খুশি যেতে পারে, মিশরের বেলাও তাই। আরব বাহিনী ইহুদিরা দুই পক্ষের মতই কোনো জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজের কিস্কতেই বিধ্বস্ত হতে হবে না। এবারেও কোনো কোনো আরব রাষ্ট্র মিশরকে এই ট্যাকটিক বরণ করতে বলেছিল। কিন্তু নাসির জানতেন, ইজরাএল কালক্রমে যদি পরাজয়ের সম্মুখীন হয় তবে মার্কিনিংরেজ শেষ মর্মে তার পক্ষে নামবেই। আর ইতিমধ্যে প্লেন, তেল বোমার সাপ্লাই তো চালু থাকবেই। তাই ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু তখনই ইজরাএল আক্রমণ করবে যখন গোড়াতেই দেখবে মার্কিনিংরেজ রুশ বা-

চীনের কিংবা উভয়ের সঙ্গে ‘মরণ-আলিঙ্গনে/ক’ষ্ট পাকড়ি ধরেছে আঁকড়ি/দুইজনা দুইজনে/। তখন ইজরাএলের সাহায্যের জন্য এরা কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে না। ইজরাএল অবশ্যই তার প্রতি-ব্যবস্থা বছরের পর বছর করে যাবে, কিন্তু যুদ্ধবিপর্যায় তথা অর্থনৈতিক বিপ্লবজ্ঞারা বলেন : ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার লোকবল যৎসামান্যেরও কম, যার প্রায় তাবৎ ‘উপার্জন’ বিশ্ব ইহুদি সংঘের দান-খয়রাত থেকে, যার আপন উৎপাদনী শক্তি প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও ঢের ঢের কম তার পক্ষে এহেন অর্থনৈতিক পলিসি আত্মহত্যার সম্মিল। তাই আজ থেকে আরব ঠিক এইটেই কামনা করছে।

আর আরব সম্পূর্ণ নিরাশ হবেই বা কেন? ক্রুসেডের সময় আরবভূমির এক ক্ষুদ্রাংশ তিনশ বছর ধরে লড়েছে পোপের নেতৃত্বে জমায়েত তাবৎ ইয়ো-রোপের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হোলিল্যান্ড ত্যাগ করে ফিরে যান যার যার দেশে—পোপের কাতর ক্রন্দন, তাঁর অভিসম্পাত উপেক্ষা করে। ইহুদি যদি দু’হাজার বছরের মড়া রাষ্ট্রের প্রাণ দিতে পারে, তবে আরবই বা তার মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো রাষ্ট্রশক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না কেন?

তা হলে প্রশ্ন, এ সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই?

আছে হয়তো। কিন্তু যে-সমাধান এক পক্ষ কিছুতেই স্বীকার করবে না সেটাকে সমাধান বলি কি প্রকারে? তবু দেখা যাক।

যুদ্ধবিপর্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই মার্কিনিংয়ের শব্দ একটি চিন্তা : এই যে আরববলদের মড়াটা পড়েছে পায়ের কাছে এর কতটা অংশ পাবো আমি—সিংহ-মান্‌কল-স্যাম, কতটা পাবে জনবল-নেকড়ে, আর কতটা পাবে ইহুদি-ফেউ?—যদিও বেচারী ফেউটাই এম্বলে করেছে লড়াই। কিন্তু সে ফালতো জমিজমা নিয়ে করবে কি? অত ইহুদি পাবে কোথায়? হাতের চেয়ে যে আঁব বড় হয়ে যাবে! আর সে যদি নিতে চায়, নিক! আমরা নেব সীনা, গুর্দা, কলিজা! শাসালো বস্তু। সেগুলো কি, এখনুনি নিবেদন করছি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বি বি সি যুদ্ধবিপর্যয়ের প্রথম খবর দেবার ঠিক আট মিনিট দশ সেকেন্ড পর একটি talk-টিপনীর বেতারিত করলে। বস্তা ইংরেজ ইহুদি কিনা জানি নে; তাকে ইহুদি বলে ধরে নিয়ে আমি ইহুদিজাতকে অপমান করতে চাই নে।

নাকি-নাকি ন্যাকা সুরে নিজের স্বার্থ যতখানি গোপন করা যায় তাই ক’রে—এবং ইংরিজী ভাষা যে ভণ্ডামির জন্য প্রকৃষ্টতম ভাষা সে-কথা যে-হটেনটট্ সাত অবধি গুনতে পারে না সেও জানে—যা বললেন তার বিগলিতার্থ, ‘এ-রকম লড়াই বড়ই খারাপ, বড়ই খারাপ। এরকম ফের হতে দেওয়া উচিত নয় উচিত নয়। এই দেখুন না, এরই ফলে আরব জাত বশ্ব করে দিলে সুয়েজ খাল—বলুন তো আমাদের জাহাজ চলাচল করবে কি করে? আবার কসম খেয়ে বসলো, তেল বেচবে না আমাদের কাছে—ওঃ! আমাদের বাস্-কারখানা তা হলে চলবে কি করে! আর গাল্‌ফ-অব-আকাবা, শরম্-উশ্-শেখ সে তো বটেই বটেই। অতএব এ-হেন অঘটন যাতে পুনরায় না ঘটে

তার জন্য ক) সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক কনট্রলে নিয়ে নাও, খ) তাবৎ আরবভূমির তেলেরও এমন ব্যবস্থা করো যাতে করে আসছে দুর্ঘ্যোগে আরব জাত বস্তুটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে এবং গ)—কিন্তু ‘গ’—অর্থাৎ গাল্ফ অব আকাবা সম্বন্ধে টীকাকারের উৎসাহ কম কারণ সেখানে প্রধান স্বার্থ ইজরাএলের। এর অর্থ কি? সুয়েজ খাল কনট্রলে এলে ইংরেজকে মাসুল বাবদ এক পৌন্ডের জায়গায় দিতে হবে একটি ফাদিং (ও! ফাদিং বৃদ্ধি অধুনা দুর্লভ? তা সেটা দারুণ স্বার্থত্যাগ করে ফের টাঁকশালে বানাতে হবে বই কি! Oh Albion! Consider thy historical self-sacrifice!)। তেল কনট্রলে এলে হয় কোনো রয়েলটিই দেব না, নয় ঐ দু’একটা ফাদিং থেটান টু দি অ্যারাব-বয়!

লড়াই করে ম’লো ইজরাএল আর লুটের বেলা এলবিয়ন। এর ঠিক উষ্টো-টাকে বাঙলায় বলে—হায়, বাঙলা বড়ই নাজিফ শিশুর আধো-আধো ভাষা, ও নিয়ে আধো ভণ্ডামি করা যায় না—‘খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবন্দন!’ এখানে ইজরাএল আগেভাগেই বিকার করে বসে আছে, এবারে দই খাবেন গোবন্দন ইংরেজ মহাজন। তবে এর মধ্যে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ডিন ইংরেজ ‘বিজিনেস’ বা শপ-লিফটিং করেছেন অগা ভারতীয়দের সঙ্গে, শিশু নিগ্রোদের সঙ্গে, ক্যাবলাকান্ত আরবদের সঙ্গে, এবারে চাচা, নয়া ওয়ার, নয়া নয়া খেল। এরা আঁড়া না ভেঙে মাগলেট বানাতে পারে, দেখলে না, নেই নেই তো নেই, সেই নেই নেই থেকে দ্যাখ তো না দ্যাখ একটা নয়া চনমনে সমুচ্ছ রাষ্ট্র ইজরাএল পয়দা করে দিয়ে সপ্ৰমাণ করে ফেললে, তোমাদের আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদার্থবিদ্যা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ something cannot come out of nothing আগাপাস্তলা ভুল, বিলকুল ভণ্ডুল। জানি তোমরা ‘হরস্ ডীল’ বা ‘যোড়া বিক্রি’র জন্য পাঠাবে তোমাদের ঝান্দু ঝান্দু স্কটস্ম্যানদের কিন্তু ওদের খোঁয়াড়েও আছে গন্ডায় গন্ডায় ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু স্কটিশ জুঁ—যারা ক্রমাস্বয়ে চতুর্দশ পুরুষ স্কটল্যান্ডে জন্মমৃত্যু বিবাহ সেরে স্কটস্ম্যানদের চুষেছে এবং চুষে ভর্তি পকেটে হুঁসিল দিতে দিতে পশুদিন এই হেথা ইজরাএলে এসেছে। তোমরা যদি সুয়েজখালে ‘নাও চল কইরা দু পয়সা কামাও তবে ইহুদি গোপাল সেখানে স্ট্রেফ টেউ গুনে দু আঁজ।’

কিন্তু এ সবতে কিছু যায় আসে না। সুয়েজ, শরম্ উশ্-শখ, তেল এ সব নিয়ে আরব লেনদেন করতে হরবকং তৈরি। এশ্রুক—আমার বিশ্বাস—ইজরাএলের চতুর্দিকের জমাজমি নিয়েও সে দরদস্তুর করতে রাজী আছে, কিন্তু তার একটি মাত্র শর্ত মেনে নিতে হবে।

সে শর্তটি : যে-সব আরব চাষা জেলেদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইজরাএল তৈরি করেছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

ইহুদিদের প্যারিস তেল-আভিভ শহর হেসে গড়াগড়ি দেবে। তা.

কখনো হয় !

উত্তরে আরব বলে, ‘কেন হবে না ? তেরশ’ বছর নয়, তারও বহুপূর্বের থেকে আরব ইহুদি পাশাপাশি বাস করেছে। পয়গম্বর হজরৎ মুহাম্মদ ইহুদিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নিউ টেস্টামেন্টে পাই, ইহুদিরা প্রভু খৃষ্টকে ঋণশ্রীকর করে মেরেছে এবং তারই ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানরা তোমাদের অত্যাচার করেছে, এখনও কোনো কোনো দেশে করে—আর হিটলারের কথা তুলবো না, সে তো বিশ্বজন জানে। অথচ কুরান শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রভু শীশু আদৌ ঋণশ্রীকর হয়ে মারা যাননি। যে কলংক থেকে আমাদের নিভুল আপ্তবাক্য কুরান শরীফ তেরশ’ বছর পূর্বে তোমাদের বেকসুর মনুস্তি দিয়েছে, সেই কলংক থেকে খৃষ্টানদের প্রতিভু হিজ হোলিনিস পোপ তোমাদের মনুস্তি দিয়েছেন বছর দুই হয় কি না হয়। গ্রীক অর্থডক্স, কপট, লুথেরিয়ান ইত্যাদি চার্চ এখনো দেয়নি। অর্থ’৭ প্রায় এক হাজার ন’ শ’ ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব খৃষ্টান তোমাদের অপরাধী ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে ঠেঙিয়েছে। তোমাদের নামে কুৎসিত কেলেকারি কেছা রটিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এক বিশেষ পরবের দিনে একটি নিষ্পাপ খৃষ্টান শিশুর গলা কেটে তার রক্তপান করাটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্য বলে স্বীকার করো।’ খৃষ্টানদের এই ইহুদি বিবেকের জন্য বিশেষ ইংরিজী শব্দ ‘এন্টি সেমিটিজম’। এবং এতেও সন্তুর্গ না হয়ে ইংরিজী ভাষা জার্মান থেকে নিয়েছে ‘যুডেনহেৎসে’, সুন্দর রুশ থেকে নিয়েছে ‘পগ্গম’। আরবীতে সে রকম কোনো শব্দ আছে, না আমরা তোমাদের উপর কখনো কোনো অত্যাচার করেছি? বস্তুত আমাদের নবী মদ খাওয়া এবং সুদ নেওয়া বারণ করে দেওয়াতে এ দুটো মুনাব্বার ব্যবসা তোমরা একচেটে চালিয়েছ তেরশ’ বছর ধরে তামাম মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। এই যে ১৯১৯ থেকে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের বার বার তোমাদের হোলি ল্যান্ডে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ তাদের সবাই এসেছে? এই গত যুদ্ধের সময়ও আমরা কোনো কোনো জয়গায় বিশেষ পুঁলিস মোতায়েন করেছি পাছে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধোর করে। আর তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তো

১ দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা বয়ে নিবেদন, চসার বোধ হয় ঐ ধরনের একটি নিষ্পাপ বালকের কাহিনী লিখেছেন। ইহুদিরা নাকি তার গলা পুরোপূরী কেটে ফেলতে পারেনি বলে সে বেঁচে যায় ও তার করুণ কাহিনী খৃষ্টানদের সামনে বর্ণনা করে।

২ আসলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইজরাএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহুদিরা সে রাজ্যের চাষীদের সঙ্গীদের খোঁচায় তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের জমিতে বিদেশাগত জাতভাইদের বসালে তখন ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদিতে (মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম) আরবরা সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদের উপর দাও তুলতে লাগলো। ফলে বাধ্য হয়ে এরা ইজরাএলে চলে যেতে লাগলো।

আমরা জেরুজালেম দখল করিনি। লড়াই হয়েছিল খৃষ্টানদের সঙ্গে। শত্রু যদি আমাদের কেউ থাকে তবে সে খৃষ্টান। অথচ এই খৃষ্টানদের সঙ্গে আমরা সর্মিলিতভাবে অক্সেলে লেবাননে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

‘তোমরাই বা আমাদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে না কেন?’

অসম্ভব! অসম্ভব! ইহুদি জানে সে আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলে যে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্মবন্দ গড়েছে সে-রাজ্য দাউদ (ডেভিড) সুলেমানের রাজ্যের হুবহু ফটোগ্রাফ। সে রাজ্য পুত-পবিত্র। তাতে কোনো বিধর্মী নেই। যারা ছিল তাদের বহু পূর্বেই নিমূল করা হয়েছে। সলমনের গ্লরি তো তার বিধর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্মিত হয়নি। এসব প্রস্তাব শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।^৩

তাই বলেছিলুম, আরব ইহুদি সমস্যার সমাধান কোথায়?

জেরুসলম

আইস, সুশীল পাঠক, যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে যে মেছোহাটার গ্যালাগালি এবং দর কষাকষি হচ্ছে সেগুলো ভুলে গিয়ে পূণ্যভূমি জেরুসলমে তীর্থ করতে যাই।

অতি প্রাচীন নগর জেরুসলম। খৃষ্টের দু’হাজার বছর পূর্বে জেরুসলম মিশরীয়দের অধীনে ছিল। তখন তার নাম ছিল উরুসালিমুদ্ (‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থদুর্গ)। পরবর্তী রোমানযুগে রাজা হার্মিরিয়ান এর নাম দেন অ্যালিয়া কার্ণিপালিনা। খৃষ্টের প্রায় দেড়শ বছর পর থেকে ইহুদিরা দলে দলে, কখনো রোমানদের দাসরূপে কখনো বা স্বেচ্ছায় জেরুসলম ত্যাগ করে।^১ ঐ সময় থেকে সে নগরী আর ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল না। সপ্তম শতাব্দীতে বিতীয় খলীফা ওমরের আমলে যখন মুসলমানদের আরবরা এ নগর

৩ অতীতের কোনো বিশেষ পুত পবিত্র যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা ইহুদিদের একচেটে নয়। মুসলমানদের ওয়াহাবী আন্দোলন এককালে তাই চাইত। অবশ্য তাদের প্রোগ্রামে বিধর্মীদের খেদাবার ব্যবস্থা নেই। কারণ তাহলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য লোক পাবে কোথায়? শুনোছ স্বামী শ্রম্ধানন্দও বৈদিক যুগ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন কিন্তু সেই ধর্মরাজ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ‘শুদ্ধ’ করে নেবার ব্যবস্থা ছিল (‘রাতা’ ব্যবস্থা তুলনীয়)। এটাকেই যখন ‘বিজ্ঞান’সম্মত পদ্ধতিতে পেশ করা হয় তখন তার জিগির “Back to nature!”

১ পূণ্যনগরী জেরুসলম যে ইহুদিদের একদিন ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা এর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহুদি প্রফেটরা বার বার ভবিষ্যদ্বাণী করে ইহুদিদের সাবধান করেছেন; তারা কান দেয়নি; আচার-আচরণ বদলায়নি। এই ‘বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার’ নামই ‘ডিসপারসেল’, গ্রীক ‘দিয়াসপরা’।

দখল করে তখন শহরের ৯৫% বাসিন্দা খৃষ্টান। এবারে প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কাবদীনা ত্যাগ করে যে সব আরব এখানে আসে তাদের সংখ্যা ১%-ও হবে না। যে ৯১% মুসলমান হয়ে যায় তারা যুগ যুগ ধরে জেরুস্লেম তথা প্যালেস্টাইনের (আরবীতে ফলস্তীন) আদিমতম বাসিন্দা (বস্তুত ইহুদিরা বাইরের থেকে এসে এদেশ জয় করে) এবং ইহুদি কর্তৃক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়েও আপন ধর্ম ত্যাগ করেনি, পরবর্তী যুগে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী সেনাপতি ইংরেজ লর্ড অ্যালেনবী যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন তখন সেখানে শতকরা ৮৫ মুসলমান, ১০ খৃষ্টান ও ৫ জন ইহুদি। সে ইহুদিরা ততদিনে ধর্ম ছাড়া সর্ব বাবদে আরব হয়ে গিয়েছে—হিব্রু ভাষা বলতে পারে না, বলে আরবী। একাধিকজন কবিতা লিখে আরবী সাহিত্যে সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজস্ব কায়েম হয়ে ‘ইজরেএল’ (আরবীতে ইসরাঈল) নাম ধরার তেরো বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি এক-দিন কুদ্স (জেরুস্লেমের আরবী নাম) শহরের নগরপ্রাচীরের বাইরে দূর যাত্রীর বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, তোরঙ্গটি মাটিতে রেখে। বাসনা, যাবো ন্যাজরীথ (নাজরেৎ, আরবীতে অর্থাৎ বর্তমান যুগে প্রচলিত নাম ‘অন-নসীরা’—আদি যুগের খৃষ্টানদের ঐ নাম থেকে ‘ন্যাজরীন’ নামে ডাকা হত। মুসলমানরা আজো ওদের ‘নসারা’ নামে পরিচয় দেয়) যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকাল কাটান, মা মেরি (আরবীতে ‘মরিয়ম’) যে কুয়োথেকে জল আনতে যেতেন সেটা নাকি তখনো আছে! আরো নাকি আছে, মা-মেরির বর জোসিফ-এর (আরবীতে ইউসুফ) ছুতোরের কারখানা। ইনি যীশুর পিতা নন। কারণ প্রভুর জন্ম হয়েছিল কুমারী-গর্ভে, পবিত্র আত্মা দ্বারা। নিউ টেসটামেন্ট ও কুরান শরীফ, দুই-ই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা-মেরির বর জোসিফ রাত্রে দিবে কাঠ পরিষ্কার করে কাঠে কাঠে জোড়া দিতেন আর প্রভু যীশু মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে মানুষে মানুষে জোড়া দিতেন। যে

২ ইংরেজ অ্যালেনবী যখন জেরুস্লেমে প্রবেশ করেন তখন সে-খবর একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে দিলে পর সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বলে, ‘তাই তো! প্রভু খৃষ্টের জন্মকালে যে সব মেম্বারলকে দেবদূতসে-সদৃশমাচার জানান, তাদের বংশধরদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলে হয় না যে—ইংরেজ ভেড়ার পালে ঢুকেছে—মতলবটা ভালো নয়।’ ‘শপ-লিফটার’ ইংরেজ ‘শীপ-লিফটিং’ও যে কিছু কম যান না সেতত্ত্ব আউসি বিলক্ষণ জানতো। তার হুঁশিয়ারি কিস্তি পরবর্তী যুগে টায় টায় ফেলেনি। ইংরেজ যখন দেখলে যে সে ‘নেটিভদের’ সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন তাদের পিছনে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর ইহুদি যে শৃঙ্খল ভেড়াগুলো মেরে দিলে তাই নয়, নেটিভদের জর্ডনের ‘হে-পারে’ (আমরা ঘেরকম বলি ‘পশ্চার হে-পারে’) খোঁদিয়ে দিলে :

স্যামারিটানদের প্রভু যীশুর গোষ্ঠী এবং তাঁর কটর ইহুদি সম্প্রদায়ের শিষ্যরা দৃঢ় চক্ষে দেখতে পারে না তিনি করেছেন তাদের প্রশংসা—গুড স্যামারিটান। এই স্যামারিটানরাও ইহুদি, কিন্তু যেসব ইহুদিরা ইজরাএল সৃষ্টি করেছে এদের সঙ্গে স্যামারিটানদের দ্বন্দ্ব চলছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। জেরুস্লেমে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) মন্দির যে ইহুদির পরমেশ্বর য়াহভের (জেহোভা, ইলোহিম) পীঠস্থল একথা স্বীকার করেনি। আজ সেখানে নাবলুস শহর (বাইবেলের ‘শেখেম’) তারই পাশে গেরিজিম পাহাড়ের উপর ছিল তাদের আপন মন্দির।^৩

একদা এই স্যামারিটান জাতি সংখ্যায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে মূল ইজরা-এলিদের চেয়ে কোনো অংশে হীন ছিল না। তাবৎ ইহুদি যখন প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করে তখন শত অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটি কামড়ে ধরে এরা পড়ে থাকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ‘স্বগোষ্ঠে’ বিবাহের ফলে এদের সংখ্যা কমে কমে এখন মাত্র চারশতে এসে দাঁড়িয়েছে।

৩ এ জায়গাটা ছিল জরুডন এলাকায়। হালে ইজরাএল বাহিনী সেখানে পেঁছা গেরিজিম মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর ইজরাএলের জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে স্যামারিটানদের সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম হয়। পরধর্ম বাবদে ইহুদিরা ঈশ্বর অসহিষ্ণু এ তত্ত্বটি ইংরেজ জানতো বলেই ইজরাএল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৪৮) তারা খৃষ্টান মুসলিম গির্জা মসজিদে ভর্তি প্রাচীন জেরুস্লেম (ইহুদিদের বিশেষ কোনো স্থাপত্য এ শহরে আজ আর নেই, কারণ রাজা হাদরিয়ান শব্দার্থে এ নগরের উপর হাল চালিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ই ইহুদিগুলি শেষবারের মত জেরুস্লেম পরিত্যাগ করে বলে পরবর্তী যুগে কিছু নির্মাণ করার সুযোগ পায়নি) ইজরাএলের শত মিনতিভরা কাতর রোদনে কণপাত না করে মুসলমান জরুডনরাজকে দিয়ে দেন। হালের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাএল যখন প্রাচীন জেরুস্লেম অধিকার করে তখন এ-যুদ্ধের ইংরেজ লেবার (অর্থাৎ ঐতিহ্যহীন অনভিজ্ঞ) সরকার কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু স্যামারিটানদের মন্দিরে ইজরাএলের ব্যাভিচারের খবর ইংলণ্ডে পেঁছানো মাত্রই লেবার-বাবুদের কানে জল গেছে। নিরাপত্তা পরিষদে চিৎকার করে ইংরেজের ফরিনমন্ত্রী ব্রাউন একাধিকবার বলেছেন, ইহুদিকে প্রাচীন জেরুস্লেম ছেড়ে দিতেই হবে। এই প্রাচীন নগরের ভিতরে রয়েছে খৃষ্টের বিরাট—সত্যই অতি বিরাট—সমাধি। সৌধ (হোলি সেপালকর), গেৎসিমেনের বাগান যেখানে প্রভু যীশুর দেহ থেকে শ্ববদের পরিবর্তে রক্ত বেরোয়, মাউন্ট অলিভ এবং ভিয়া দলরসা—যে পথ দিয়ে প্রভু ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমিতে পেঁছন। (মুসলমানদের হরমশরীফ, মসজীদ-উল-আকসা বাদ দিচ্ছি—এগুলোর জন্য ইংরেজের কোনো দরদ না থাকাই স্বাভাবিক)। ইজরাএলের ‘সাঁতিশয় বিবেচক করুণ করে’ এগুলো সঁপে দিতে ব্রাউন হিম্মৎ পাচ্ছেন না। কিসের হাতে যেন কি সমর্পণ!

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৩য়) — ২৪

আমি যখন পদ্ম্যভূমিতে যাই তখন দেখি খবরের কাগজে একটা তর্কবিতর্ক চলেছে। যদ্যপি আজ খবর-প্রতিষ্ঠানগুলো বলছেন, স্যামারিটানদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারশ', আমাকে কিন্তু তখন বলা হয়েছিল প্রায় আশী। খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, এই স্যামারিটানদের 'প্রধান রাব্বি'-র (পণ্ডিত পুরোহিতের) একমাত্র জোয়ান ব্যাটা—ইনিই পরে প্রধান রাব্বি হবেন—'সোমন্ত' হয়েছেন, এখন তাঁকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু হায়, কনে কোথায়? মাসীপিসীদের অর্থাৎ অগম্যাদের বাদ দিলে তিনি যে দুটি বধূকে বিয়ে করতে পারেন তাদের একটির বয়স ষাট এবং তিনি তারপরে চিৎকার করে বলছেন—আমাদের আইবুড়ো জাতকুলীন বংশধারা যা বলে থাকেন—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন সাজবো কনে বউ! কী ঘাম্মা। কী ঘাম্মা'। এবং তদুপরি দ্রষ্টব্য, এই বংশধাকে বিয়ে করলে বংশ রক্ষা হবে না, এবং এ স্থলে সেইটেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বধূটি বোবাকালো ইন্ডিয়েট।...স্যামারিটানরা আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলিদের সঙ্গে বিয়েশাদী করেনি। এখনই বা করে কি প্রকারে? এসব গুল-গ্যাশ আমি শুনছি প্রাচীন জেরুসলেমের হেরোদ গেটের কাছে। এখানেই ভারতীয় হুস্পিস—সরাইখানা, চিট্রি যা খুদুশী বলুন—অবস্থিত। কাফে—আম্বাতে। এর শতকরা ৯৯% পাঠক বাদ দিতে পারেন। মোম্বাটুকু শব্দ এইঃ যুবক রাব্বিপুত্রের জন্য বিবাহযোগ্য বধূ সে-কুলে নেই।

অতএব স্থির হল, ঐ জাতশত্রু ইজরাএলি ইহুদিদেরই কোনো মেয়ে বিয়ে করো। হাজার হোক, ওরা তো ইয়াহভে মানে, ধর্মগ্রন্থ পেনটাটয়েশ স্বীকার করে। খৃষ্টান, মুসলমান তো আর বাড়িতে তোলা যায় না।

ন্যার্জরিথ যাবার পথে পড়ে স্যামারিটানদের নাবলুস; নিশ্চয়ই দেখে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে যারা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভিটের মাটি (ওঃ! আর সে কী মাটি, বালি পাথরে ভর্তি!) কামড়ে ধরে পরে আছে, তারা দ্রষ্টব্য বই কি।

*

*

*

সে-আমলে প্যালেস্টাইনে চলতো তিন রকমের বাস্। আরব বাস্ ইহুদি বাস্ আর স্টেট বাস্। কাট্যা ফালাইলেও ইহুদি চড়তো না আরবের বাস্ এবং ভাইস্ ভার্সা। দু'দলেই চড়তো স্টেট বাস্।

আত্মচিন্তায় নিমগন আমার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো একখানা করকরে নতুন ট্যাক্সি। আরব ড্রাইভারের পাশে দেখি গোটা পাঁচেক মেল-ব্যাগ। পিছনের সীটে জাবরা জোবরা পরা ইয়া মানমনোহর গলকম্বল দাড়িওয়া দুই রাব্বি। এক রাব্বি পিছনের দরজা খুলে বার বার বলে যাচ্ছেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো'।

আমি ক্ষণে সালাম জানিয়ে, ক্ষণে জোড়-হাতে নমস্কার করে (এটা ভারতীয়দের পেটেট মাল—বিদেশী মাঠই চেনে!), ক্ষণে ডান হাত বৃকের বাঁ দিকের উপর রেখে 'বুকে বুকে' ক্ষণ কণ্ঠে বললাম, 'ট্যাক্সিতে যাবার মত

কড়ি আমার গ্যাটে নেই। আমি যাবো বাস্-এ।'

দুই রাব্বি যা বলেছিলেন—আহা কী সুন্দর অত্যাৎকৃষ্ট বিদ্বৎ নাগরিক আরবী ভাষাতে—তার তাৎপৰ্য 'কী উৎপাত, কী জ্বালাতন! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমরা কি কানা! দেখতে পাচ্ছি নে, তুমি ভিনদেশী? আমরা তো ট্যাক্সিটার সাকুল্যে পিছন দিকটা ভাড়া নিয়েছি। উঠে পড়ো উঠে পড়ো। কী মশকিল! আচ্ছা বাপ, তুমি বাস্-এ যে ভাড়া দিতে সে-ই না হয় আমাদের দেবে।' এই বেলা বলে নি, পরে, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটা তাঁরা নেননি।)

কিন্তু ইয়া আল্লা, বসি কোথায়! গোটা তিনেক মোরগামুরগী ক্যাক মাক করছে, দু'তিন ঝুড়ি আলু-টমাটো-মটরশুঁটি-কপি, দু'খালুই ডিম, আর কি কি ছিল খোদায় খবর।

রাব্বিরা বরাম্বর বলে যাচ্ছেন, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

এক রাব্বি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, 'ময়ের শব্দর বাড়ি যাচ্ছি। তাই এত সব।'

আমি চোখের তারা কপালে তুলে বললুম, 'বলেন কি মশাই! এই তিনটে আন্ডা, গোটা কয়েক মুরগীতেই আপনাদের দেশের কন্যাপক্ষ খুশী হয়ে যায়! তা'জব! তা'জব!! আমাদের মোশয়, সিনাই পর্বত প্রমাণ মাল নিয়ে গেলেও হালাদের মূখে হাসি ফোটে না।'

আমার জেবে একটা হাতের দাঁতের ডিম্বাকার নস্যর কোটা ছিল। নস্য-ভাবে সেটাতে রাখতুম মিশরীয় সুগন্ধি। সেইটা তুলে ধরলুম তাদের সামনে।

দুই রাব্বি আমাকে জাবড়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন।

বিশ্বর কথাবার্তা হল। নাবলুস, ন্যাজরিথ গম্পের তোড়ে পেরিয়ে গিয়ে তখন পেঁছে গিয়েছি গেলিলিয়ান লেক-এ।

দুই রাব্বি আমার মাথার উপর হাত রেখে বিশ্বর মন্ত পড়ে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদের এক কণাও যদি সফল হয় তবে আমি ভারতবর্ষের রাজা হব।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর

সুইটজারল্যান্ডের রামগড়ল হ্যার পল্ডি নাকি একদা একটা দাঁড়কাক পুষেছিল।

বশ্ব শূদ্রালে, এ কী ব্যাপার! কাক আবার কেউপোষে নাকি? বৈজ্ঞানিক-সুলভ অধর্মদ্রুতনয়নে পল্ডি বললে, 'ঐ যে লোকে বলে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে, সেটা ঠিক কিনা আমি হাতে-নাতে নিজে দেখে নিতে চাই।

মর্চাক হাসলেন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিজেই পল্ডির মতই বটি।

চিন্তা করুন তো এই যে ইহুদি জাত—বিশ্বর ঘোরাঘুরি করে, হাজার দুই

বছর ধরে এ-জাত, ও-জাত সে-জাতের কাছে মার খেয়ে খেয়ে গোলামী করে করে প্রথম আপন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেল খৃষ্টজন্মের হাজারখানেক বছর পূর্বে, রাজা সুলেমানের আমলে। কিন্তু হায়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই ‘গরি’ খানখান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি ইহুদিদের সদাপ্রভু যাহ্‌ভের জন্য যে ‘বিরাট’ মন্দির গড়েছিলেন তার স্মৃতি ইহুদিরা আজও প্রতি শনির স্যাবাৎ পরবে স্মরণ করে।^১

তারপর খেল মার ফের ঝাড়া একটি হাজার বছর ধরে। আর বাবিলনের রাজা তো একবার প্রায় গোটা গোষ্ঠীটাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে মিলেন আপন দেশে। দ্দু পুরুষ সেখানে কাটিয়ে কোনোগতিকে প্রাণ নিয়ে তারা ফিরলো ফের প্যালেস্টাইনে।

সুলেমানের হাজার বছর পর ফের তারা পেল আরেকটা চানস। প্রভু যীশুর জন্মের কয়েক বছর পূর্বে, রাজা হেরডের আমলে (এরই পুত্রের সামনে ‘বিচারের’ জন্য প্রভু যীশুকে পাঠানো হয়), আবার জেরুস্‌লম তথা ইহুদি জাতের মধ্যে হাসি ফুটলো। ধনদৌলত তো বাড়লোই, তদুপরি সুসভ্য বাবিলনে তারা যে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় তারই কাঠামোতে ফেলে আপন প্রাচীন শাস্ত্রাদির নতুন নতুন টীকাটিপনী রচনা করলে। হেরড আবার নতুন করে যাহ্‌ভের মন্দির গড়লেন।

কিন্তু এবারে যে দূর্ভেদ্য এল, তার সঙ্গে পূর্বেকার কোনো অভিজ্ঞতারই তুলনা হয় না।

খৃষ্টজন্মের ৭০ বৎসর পর রোমানরা জেরুস্‌লম আক্রমণ করে শহর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে যাহ্‌ভের মন্দির পুড়িয়ে ছাই করে দিল; এক ইহুদি ঐতিহাসিকের ভাষায় “Amid circumstances of unparalleled horror, Jerusalem fell. The temple was burnt and the Jewish State was no more.”

এই কি শেষ? হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র লোপ পাওয়া সঙ্গেও ইহুদিরা জেরুস্‌লম নগরে বসবাস করতে লাগল। ওদিকে তাদের উপর রোম সম্রাটের কুশাসন ক্রমে ক্রমে এমনই বেড়ে যেতে লাগল যে শেষটায় ১৩২ খৃষ্টাব্দে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো—অবশ্য স্মরণ রাখা কতব্য, ইহুদিদের অনেকেই এ রকম বছরের পর বছর ধরে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে মানা করেছিলেন। আমরা জানি স্বয়ং খৃষ্ট রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা

১ তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই মন্দিরের গুরুকীর্তন করে করে তার পরিধি ও ঐশ্বর্য এমনই বাড়িয়েছে যে বাস্তবের সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিলই নেই। বাইবেল অনুযায়ীই দেখা যাচ্ছে, মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭০-এর একটু বেশী (বাইবেল, কিংজ ১; ৬ অধ্যায়)। এ যেন সেই—‘লোক মরে লক্ষ লক্ষ কাতারে কাতার! গুনিয়া দেখিনু শেষে আড়াই হাজার II’

করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এবারে রোমানরা যা করল তার সঙ্গে ৭০ খৃষ্টাব্দের মন্দির পোড়ানোরও তুলনা হয় না। হাদ্রিয়ানের আদেশে সমস্ত শহর পুড়িয়ে থাক করে দিয়ে তার উপর হাল চালানো হল। খুব সম্ভব হাদ্রিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা দ্বায়ুদের গোর, সুলেমানের মন্দির এমনই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে করে পরবর্তী যুগে ইহুদিরা সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধিসৌধ এবং নতুন মন্দির গড়ে তাদেরই চতুর্দিকে নবীন বিদ্রোহ, নবীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত না করে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হুকুম জারি হল : ইহুদি মাত্রেই হাদ্রিয়ান নির্মিত নবীন জেরুস্লেমে প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ রোমান, খৃষ্টান, আরব, গ্রীক ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায় নানা শৈলীতে তথা মিশরীয়রা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কিন্তু যাহ্‌ভের উপাসকরা সেখানে প্রবেশাধিকারও পাবে না।

এর পরই ইহুদিরা ব্যাপকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লো।

আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ। জেরুস্লেমের উপর হাদ্রিয়ান হাল চালান ১০২ খৃষ্টাব্দে, হেরুদের মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী বীর রূপে যে ইহুদিরা জেরুস্লেমে প্রবেশ করলো সেটা যথাক্রমে আঠারো বা উনিশশ' বছর পর। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের কথা পরে হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজা সুলেমান যে ইহুদি-প্রাণাভিরাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রতিবেশী ফিনিশিয় রাজা টায়ার- (বর্তমান লেবানন অঞ্চল)-অধিপতি রাজা হিরমের সাহায্যে। বস্তুত রাজা সুলেমান স্বাধীন হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হিরমকে তিনি অনেক প্রকারে সেবা করে সে সাহায্য পান। এচ. জি. ওয়েলস তো তাঁর ইতিহাসে তাক্সিলাভের বলছেন, "There is much in all this (অর্থাৎ সুলেমানের সেবা) to remind the reader of the relations of some Central African chief to a European trading concern."

অর্থাৎ অর্ধ' বর্ষ'র নীগ্র চীফ যে রকম শক্তিশালী ইয়োরোপীয়কে কাঁচা মাল সস্তা লেবার যুগিয়ে সভ্য জগতের এটা সেটা পায়, সুলেমানের বেলাও তাই। এবং তার পরই বলছেন, "এবং বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, সুলেমানের রাজ্য was a pawn between (হিরমের) Phoenicia and Egypt." এবং বাইবেলেই আছে সুলেমান তাঁর রাজ্যের উত্তরাধ' হিরমকে দিয়ে দেন বা দিতে বাধ্য হন।^২

২ বাইবেল, কিংজ ১১২১। উত্তর গ্যালিলির এই অঞ্চলেই ইজরয়েল সিরিয়ার হালে সংঘর্ষ হয়। অনূর্ব'র প্রস্তরময় এই ভূমি কিন্তু বড় ঐতিহাসিক মূল্য ধরে। গ্যালিলি হ্রদের এই উত্তর তীরে যীশু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রচারকার্য আরম্ভ করে টিলার উপরে বসে 'সারমন অব দ মাউন্ট' ('ধন্য যাহারা আত্মাতে দীন-হীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই') উপদেশ দেন। এখানেই তিনি সাত-

পূর্বেই বলেছি, “এর হাজার বছর পর দ্বিতীয় চান্স পান রাজা হেরড দা গ্রেট” ।

ইনি আবার সংস্কার করে গড়ে তুললেন নব জেরুসলম । সুদূর নগর প্রাচীর, বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা অট্টালিকা—এবং সব চেয়ে বড় কথা—সুন্দরমানের মন্দির নব মহিমামণ্ডিত করে গড়ে তুললেন । এ ছাড়া প্যালেস্টাইনের সর্বত্র প্রাচীন নগরী সংস্কার ও বহু নতুন নগর স্থাপনা করলেন । বস্তুত ইহুদিদের এ যুগকে দ্বিতীয় সত্যযুগ বলা যেতে পারে ।

কিন্তু ‘রাজা’ হেরড ছিলেন সুন্দরমানের চেয়ে পরমদুঃখাপেক্ষী । তিনি ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের অধীনে পরাধীন রাজা । মিশর রাণী ক্লিওপাত্রা-বল্লভ-রোমশাসক অ্যানটনির কৃপায় তিনি ‘রাজা’ উপাধি পান ও তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের ‘ক্লায়েন্ট প্রিন্স’ হিসাবে প্যালেস্টাইন শাসন করতে হত । অ্যানটনির আত্মহত্যার পর তিনি পানরোম সাম্রাজ্যপ্রধান (কার্যত সীজার) অক্টাভিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় সুন্দরমান তাঁর গ্রন্থ গড়লেন ফিনিশিয় রাজা হিরমের সহায়তায় ; তার এক হাজার বছর পর দ্বিতীয় দফাতে ‘রাজা’ হেরড ইহুদিদের গৌরব বেঁচব পূর্ণ করে তুললেন রোম শাসকের সাহায্যে । পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেটাও বিনষ্ট হল ৭০ বছরের ভিতর ও তারপর কেটে গেল আরও দুই হাজার বৎসর । এবারে তৃতীয় দফাতে, ১৯৬৭-এর জুন মাসে ইহুদি প্রবেশ করল বিজয়ী বাবীর বেশে প্রাচীন জেরুসলম নগরে । পরোভাগে জঙ্গীলাট দায়ান । বিশ্ব ইহুদি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো, ইনিই “মাসীয়াহ্” —মিসায়া (Meesiah), খৃষ্টানের যীশু (খৃষ্ট শব্দের অর্থও ‘মিসায়া’) সুন্দরমানের মসীহ =মহাদী, হিন্দুর কবিক ।

এবারে তৃতীয় দফাতে এ-‘মাসীয়াহ্’ এ-কবিকর পিছনে কে ?

আনক্ল স্যাম—জনসন !

* * *

কিন্তু এবারেও যদি ইহুদিরা ফেল মারে তবে আগের এক হাজার, তারপর দুই হাজার সেই হিসেবে ফোর্থ চান্স পাবে চার হাজার বছর পরে ।

লেখনারস্ত্রের পলিডি হয়ত বা দেড়শ বছর পরমায়ু পেয়ে দাঁড়াকাক একশ বছর বাঁচে কিনা পরখ করে যেতে পারবে, কিন্তু ‘ইওরস অবিডিয়ান্টলি’ এ অধম তো চার হাজার বছর বাঁচবে না ! আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ । আমেন ॥

খানি রুটি ও ছোট্ট কয়েকটি মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে খাওয়ান । এরই কাছে মগদলা গ্রাম, যেখান থেকে নতকী, পরে তাপসী মেরি মগডলীন (অক্সফোর্ডের মডলিন কলেজ । maudlin tears ; কেমব্রিজের মডলিন বানানে পিছনে ০ অক্ষর আছে) যীশুর কাছে আসেন পাঠক যদি অপরাধ না নেন তবে বালি, এখানেই আমি সর্বপ্রথম গ্যালিলি হ্রদের মাছ খাই । তার অপদূর্ব স্বাদ এখনো মনে লেগে আছে । ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে সবিস্তর লেখার বাসনা আছে ।

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাস্তার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজ্ঞানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণ-স্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলী মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছুদিন থাকার পর এটা-ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি ‘গাইয়া’ মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে ‘টুরিজম’ কর্ম না করে।

মোটা, দড়, ভারি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ-পঞ্চাশ গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া-খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজো যেন প্রথম দিনের মত মোক্ষম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনো চত্বর বা বাড়ির বেটন নী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয়তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শ্যাটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে—আরকিটেকচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাস্ত্র লম্বা ভারী কালো জোশ্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুষ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে—এক হাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাত করে রেখে যেন কোনো গীতকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দূর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প কাঁপছে যেন, কেমন মনে হল, মস্তোচ্ছারণ করছেন। কোনো প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনো গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাদিকে মোড় নিয়ে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়শ্চকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোখলির অশ্চকার যেন নেমে আসছে। তবে ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সব চেয়ে চোখে পড়ে আমাদের

কমলানেবু'র তিনগুণ সাইজের জাফা অরেনজ্‌। মধুর মত মিষ্ট রসে টাইটবু'র। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা আর যেন অম্মে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

একটা কিউরিওর দোকান। টুকটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাস, তীর, ধনু, আরো কত কি! কোনোটা নাকি পাঁচগ, কোনোটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯% কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনো-কোনোটাতে এন্টিক সরকারী স্কুদে শীলমারা আছে : সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন যুগের কোনো পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, শীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্ট্‌ ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেগে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খুঁটের সমাধিসোধে অর্থাৎ হোলি সেপাল্কর-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড্—জাল মাল।'

একগাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাস্তার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেন্টেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ' : 'মাস্তার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঘেঁাৎ করে উঠলো, ইহুদিদের কি যেন একটা কী, আমার ও নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর যাহ্‌ভের "নির্ব্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি"—অন্যেরা বলতো, অমর ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা বিশ্বেশ্বরের। হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভূত, প্রলয়ংকরী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে, "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাও :—আমরা, আর্বারা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নরডিকরা ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট জাত।" এবং এইখানেই হিটলার থামলো না; বললো, "এবং ইহুদিরা এ জগতে কাফরী নীগ্রোর মত উন্টের মেন্‌শ (মানব পর্যায়ে নিন্মস্তরের সৃষ্টি)ও নয়। তারা ভার্মিন, নরকের কীট! যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কেঁাদলে নেই।'

*

*

*

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ গ্রেট খৃষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরুসালেমে যে বিরাট বিচিত্র যাহ্‌ভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে-প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেম্পলের

চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।^১ রোমানরা এ মন্দির ৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

‘পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট’ করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করে ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা আরম্ভ করেছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ‘মোলশ’ বছর তো হবে।

প্রতি শতাব্দীর বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্তোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে ধূয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলাছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর ‘কিনোৎ’=ইংরিজি ‘এলিজ’ মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নিষাস ‘আমাদের সব গৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি’।

যত দূর মনে পড়েছে রাব্বি—পুরোহিত সে ‘গৌরব-মহিমার’ কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধূয়াটি বলে। ফের রাব্বি আরো খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধূয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শতাব্দীর বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই ‘কিনোৎ’ বিলাপ করেন। অন্যান্য দিনও যে কোনো সময় দু’একজনকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখেছিলাম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের ‘আব’ মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের স্মারকস্মরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরুসালেমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খৃষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইজরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদি প্রধান সেনাপতি দায়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লৌভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই/আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর ‘বিলাপ প্রাচীর’-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, যে মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে : এশকল্-দায়ান্ এরা কি সেই প্রাচীন দিনের

১ নির্মাণ আরম্ভ খৃঃ পূঃ ২০ ; নির্মাণ শেষ খৃষ্টাব্দ (খৃষ্টের পর) ৬২। কী ট্রাজেডি ! যে মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর, সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের ‘কোষাকুশি’ হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায়ে তৈরি) ৮২ খৃষ্টাও লাগলি ! প্রফেট নোআর (আরবী বাঙলায় নূহ) আরব্ বা নোকা তুলনীয়।

কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নতুন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গৌরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন ‘কিনোৎ’ পরবর্তি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্পকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পূজা বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ বছর ধরে যে মসজিদ!

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন খৃষ্টানদের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরুসালেমে প্রবেশ করেই প্রস্থ করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্নশতৃপ। খলীফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ গড়ার হুকুম দিলেন। কারণ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী মসজিদ কাবার পরই এ স্থানটি দ্বিতীয় পুণ্যভূমি। এরই নাম হরমশরীফ এবং এরই কাছে যেখানে মসজিদ উল্-আকসা^২ সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় বেহেগতে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরবদেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আকসা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যি অতুলনীয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে ‘পুণ্যসৌধ’ বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বা উস্-সখরা (ডোম অব রক)।

এ দৃষ্টি না ভেঙে তো সুলেমানের টেমপ্লে গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরুসালেমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝামড়া ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বাধিকার দাবী করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খৃষ্টান উইলসন শঙ্কিত হননি, এবং খৃষ্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেড়েতে শাইলকে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দায়ান এশকল

২ বছর চার্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অংকটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

সম্প্রদায়ের জাতবৈরী আরেক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেসটাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দায়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরভনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরেও দায়ানরা 'দাবি'র ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সেন্সেলে মাত্র তিন-চারশ' স্যামারিটান বাস করে (তাবত দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পাঁচশ') তবু তারা সাহস করে এ 'গুন্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খৃষ্টজগৎ—মাইনাস জনসন—শঙ্কিত হল।

জেরুস্লেমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গন্ডায় গন্ডায় গির্জা। ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থডক্স, আরমেনিয়ান, কপ্ট, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরো কত জাত-বেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরম শরীফ আর আক্সা)। আজ ঝাণ্ডা ওড়ানি বটে কিন্তু মুসলমানের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মত বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খৃষ্টানগুলোও—?

পোপ শঙ্কিত হন সর্বপ্রথম। তারপর উইলসেন। তিনি হুংকারিলেন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরুস্লেম থেকে।' দায়ান উত্তরিলেন, 'ইয়াদিকি পায় হৈ? যাব না।'

স্নাবড্ উইলসন চুপ-ed !!

অল্পে তুষ্ঠ

॥ ১ ॥

আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্রসন্তান রাত করে বাড়ি ফিরাছিলেন। শরট্ কট্ করার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিব্রাহি চিংকার—যা এ অঞ্চলে রাত-বিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুদ্ধিতে পারলেন, যুগ যুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হুক দিয়েছে এম্বলে সে-কুলেরই জনৈক বস্তু-সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এম্বলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলাধ' কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজ-সেবীটি এ-কালের যারা 'সেবার' নামে মস্তানী করে তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাঁপ ধাক্কা মেরে খুলে হুংকার ছাড়লেন, 'বাস, থামো। এসব কী বেলেগ্নাপনা হচ্ছে!' আমাদের পাব্লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্যে অবশ্যই আশা করেছিলেন সেই অবলা মৃদু পিয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ধরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে স্থিতিশীল করে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ'

(ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্মপ্রসাদাৎ ভগ্নগগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি। কোথায় কি? স্বামী-স্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরো দু-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সর্বিষ্ময়ে লক্ষ্য করলেন ওদেরও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছ্ একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এশ্যক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এ তো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুই পক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সেস্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন জমালি চাঁদমারির টারগেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সেফ্ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সর্বিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুদে-সুপারিশসহ একটা মধাপস্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেস্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে—ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহৎলাঙুল নয়। কারণ ভবিষ্যতেও বহু-বহুবার বহু বাদান্দবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এইভাবেই সরকারী প্রাণ। আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এ জন্মের পরও দুঃখাভাবে, অম্মাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সর্মপিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

*

*

*

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধর্মের যা কিছু বস্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুলে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে (ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি, কেউ কেউ বলেন (খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান একেবারে শঙ্কার্থে নয় (ইহ সংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?), ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু : একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যদিও মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনো স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং

তৎসঙ্গেও সে হিন্দীভাষীদের সামনে কোনো 'বাং প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দীভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এ তো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। (গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি অর্থাৎ মাগ্‌ভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন, না, ইংরিজী, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই, তদুপরি দুটুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরো বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদ্যুতন সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজেকে ভারতীয় বলে কোন মূখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়্দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি, সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদ্যুত ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্রাহিমাচল আর্য-অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেন টটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসঙ্গেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তাব্যক্তিরা এদের সের্ফ অবহেলা করে, just by ignoring এদের hors de combat, রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus। ...এরই পিঠ পিঠ মুসলমানরা বলেন, তাজমহল। কোনো মার্কিন টুরিস্ট যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, 'না মশাই এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়, এটা মোচলমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রুঙ্ক ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা, খেলাল, ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভূরি ভূরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতওলাদের মত এরাও বারোয়ারিতে কতক পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে। ...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এদের ধর্মগ্রন্থ অধঃমাগধীতে। পাসীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পারসীকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে'

মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমিটরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণাঙ্কর : এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ষিক্যে এদেশে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর বার্ষিক্যে বারাগসীর ন্যায়।...এবং আছেন খৃষ্টসম্প্রদায়, যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতে ও নবীমাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে, তথাপি খৃষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ ‘ভুলগাতে’ লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খৃষ্ট পাদারির শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ ‘বিদ্যা’ ষোল আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবজ্ঞানীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কটর ভিন্ন কোনো মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কটর ভিন্ন কোনো মোল্লা তাবল্লোকের কল্লা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওয়ালাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আনি শৃঙ্খল নিষ্পত্তি নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

*

*

*

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্স আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী (সেন-এর বহুবচন সেন্স বা sense)।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটি জীবনমরণ সমস্যা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজী, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা—তিনটিরই সমর্থক আছেন।

এই সন্দেহে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনো সম্মতি যেন আমার মেরামতী করে দেন), পৃথিবীর কোন্‌ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন :—

একশ’ বছরও হয়নি কবি হেম বান্দ্যো লিখেছিলেন—

“চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।”

সেই জাপানেও কি কখনো জাপানী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না, মাত্র কিছুদিন হল ক্যাম্বার রোগের এক স্পেশালিস্ট আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং

ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে ।...কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন ? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত ? দেশটা কি খুবই মডার্ন ? না তো । আমি যখন সে-দেশে পেঁছাই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথম কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব-হব করছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরি । অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্স্ট ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী । কিন্তু বৃথা ব্যাকব্যয় । পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন 'কেন্দ্র ফিনল্যান্ড'ই বলুন আর বলিভিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা ।

*

*

*

এইবারে আমরা পেঁছলাম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে ।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরেজী নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটোফাটি করছেন তাদের শ্রুতধোঁই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায় টায় গলা মিলিয়ে 'পৃথিবীর কোন' সভ্য স্বাধীন দেশের ক'জন উচ্চ-শিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধম রূপেই—জানে ?

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলিছিনে । যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি-এ পাস করেছে, তাদেরই কজন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে, শুনলে বঝতে পারে লিখতে পারে এবং মোটামুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে ? বলা বাহুল্য, যারা কোনো বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না । সের্ব্বলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে আপন আপন মেধা অনুযায়ী ।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না । আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদিও এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরেজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনো মেহনৎ-কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপথেজুরে আলসাই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায় ।) এবং এই দেশেই প্রায় সাতশ' বছর ফারসী ছিল স্টেট ল্যান্‌গুয়েজ—সেইটে একদম পালিশ করে তুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি ।

ফারসী দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেন্ট ইংরেজী বই পড়তে পারে ? বলতে পারে ? এক পারসেন্টও না । মার্কিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল-কলেজে আট বছর ফারসী শিখেছে—ক' পারসেন্ট ফারসী পড়তে বলতে পারে ? ঠিক

১ 'গোঁপথেজুরে'র গল্পটি অতি প্রাচীন ক্লাসিক পর্যায়ের : খেজুর গাছ-তলায় একটা লোক শূয়েছিল । একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল । কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসেবে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মূখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল । দিনশেষে পদধর্নি শূনে বিভ্রিবিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মূখের ভিতর ঠেলে দাও ! থ্যাংকস্ !'

বি-এ পাসের পর ? তার দশ বছর পর ?

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল-কলেজে সেকেন্ড ল্যান্‌গুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্দ্যয় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও ! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুদ্ধি সুবো-শাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগগজ পণ্ডিত বানানো হয় !

তাই বলি, দোভাষী হ্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে একভাষী। এবারে দোভাষী হ্রিভাষীর দল আপসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে এক-জোট হয়ে আমাকে—আমি, একভাষীকে—মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল ?

॥ ২ ॥

ব্যক্তি-বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবেচিন্তে পারলিমেন্টে তর্কাতর্কি করে, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাট বেঁধে একটা প্রোগ্রাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উত্তরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয় ; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানব সমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই ? অশ্ব নিয়তিই সব ? তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাঁকে শূন্যে, ‘তবে কি, হজরৎ, উটগুলোকে আমরা দাঁড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব ?’ হজরৎ বললেন, ‘না, দাঁড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।’ অর্থাৎ আমরা আটঘাট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গাঁড়ির মত ; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টোদিকে চালানো যায় না।

এবং কার্ল মারক্সও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্ন পরিবর্তিত করতে করতে সর্বশেষে প্রলেতারিয়া-রাজ আনবেই

আনবে। মানুষ সম্ভানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দিই :—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষীই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইন্সকুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডিত্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাস করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটাই।

এবারে একটা উদাহরণ নিই।

নরমানরা ইংলণ্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শূদ্ধ যে রাজদরবারেই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদ্যেয়র মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা—সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাভিন। পাকা তিনশটি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনো প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতলা স্বয়ং এমনই মধুর পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সমস্ত তুকারাম তাই বক্তোক্তি করেছিলেন, “সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা?”)। ...পদ্যে তিনশটি বছর পর ইংলন্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরেজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।^২

২ আইন-ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী গিলোকে দূর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতারিত হলে এই বেহেশতী ভারতভূমি যে কোন বোজখে পরিণত হবে তারই কম্পনায় অধুনা শ্রীষ্মদ ছাগলা [ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পদ্যসম্ভান মারা গেলো যে রকম আমরা ‘এককাড়’ ‘ফকির’ ‘নফর’ নাম রাখি গুজরাতীরা তেমনি ‘ছাগলা’ (ছাগল), ম’কাড় (পি’পড়ে, ক্রিকেটার), ঝি’ড়া (জিমা, ছোট) রাখে] করুণ আত’নাশ করে বলেছেন : এই একশ’ বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বতপ্রমাণ) আইনের কেতাবপত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শূদ্ধ বলবো, ‘এবেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!’ এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : ‘তবে কি প্রলম্বাবধি এদেশে

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২৫

ইংরিজী একদিন পব পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী ‘কর্তার ভূত’ কাধ থেকে অত সহজে নামে? ইংলন্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M. Ed রা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপাল্‌সারি সবজেক্টরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপ্‌শনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ ফরাসীকে নিয়ে যতই মশ্‌করা করুক না কেন, জেবে দুটো কাড়ি জমামাত্রই হালিডে করার জন্য ‘পরাণ ভয়ে হরিণের’ মত ছুট লাগায় প্যারিস পানে—মনে আশা সেই সব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন ঘেঁষে করা যায় না—সিম্প্লি নট ডান্। ইংরেজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজে বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিম্ময় শব্দ (অ্যাবস্ট্রাক্ট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী নয় ওরই মারফৎ লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরো কত শত বাবদে আজো ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনো ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন, পরক্, ভীল, ভেন্‌জন্—গরু, ছাগল, শূরোর, বাছুর, হরিণের মাংস—সব কটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদব-কায়দা (R. S. V. P থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্ থেকে শ্যামপেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজো সভ্যতা ভদ্রতার কোন্ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বা আছে?

*

*

*

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লন্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুদ্ধলো, ‘আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বলতে পারেন, কোন্‌দিকে গেলে সব

আইনের বাহন ইংরিজীই থাকবে?’ কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে ‘পর্বততর’ হতে থাকবে! মায়া যে ‘মায়াতর মায়াতম’ হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

৩ এম্বলে বক্ষ্যমান রচনাটি যদি আমাকে কম্পালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে ‘পরাণভয়ে হরিণের ছোটো’টা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—*Ventre a terre*—অর্থাৎ with belly to ground; এমন সামনের দিকে বঁকে প্রাণপণ ছুটেছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বৃক্ষ মাটি ছুঁয়ে কেলেছে! (ফরাসি শব্দভাষিকদের জন্য ‘ভঁবর’ ভেনিট্রলোকুইস্টে, পেট থেকে যে কথা বের করে; ‘তের’ টেরেসটিয়াল=পার্শ্ব বৃত্তনীর)

চেয়ে কাছের ট্রাব স্টেশনে পৌঁছব?’ কথিত আছে, ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বদ্ব্যপ্তে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জন্য বদ্ব্যপ্ত কোনোগতিকে অতি ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরো নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শূন্য করেছেন, তাহলে ঐ ‘পোড়া’র ফরাসী শেখাবার জন্য এদেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা টালার কি প্রয়োজন?

*

*

*

এ বিষয়টি আরো সর্বস্তর আরো উদাহরণ দিয়ে গুঁছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবিজাবি বিস্তর বেহুদা এক্সপেরিমেন্ট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এ-যুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা শক্তি ছিল না।

ইংরাজী তো এদেশে প্রায় একশ’ বছর ধরে কমপালসারী ছিল। ইংরাজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরাজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরাজী শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন কটা লোক অবসর সময় ইংরাজী বই পড়ে, ইংরাজী বই কেনে? এ তো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরাজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কোঁতুল প্রশংসনীয়। ওঁদিকে ইংরাজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরো চোকশ হবার কোনো চাড়া নেই জানে যেটুকু ইংরাজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসারী সংস্কৃত, ফারসী, আরবী (বা পার্সি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি-এ পাসের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনাসুও ছিল। তাদের কজনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফারসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নতুন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—কজন ফারসী অনাসুওলা গ্রাজুয়েট ফারসী ‘আউট-বুক’ পড়ে?

অব্যর্থ যারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনো ওই দুই ভাষায় বই পড়েন।

অগদ্নান্তি দফে প্রশ্ন শূন্যতে হয়েছে, 'ইংরিজীতেই চলবে তো ? অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলবে—না ? কন্টিনেন্টে তো সবাই ইংরিজী বোঝে,—না ?'

হং, বোঝে। খুব বোঝে! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়—যদিও খুব প্যারিসেরই কোনো একটা মন্দির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজীর মারফৎ—তবে এটি পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা ‘ENGLISH SPOKEN’। এটার উদ্দেশ্য মার্কিন ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়। কারণ ফরাসী জাত বিস্তার মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাশুলা বেনেদের হাতি দ্বিগুণ দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেল ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাক গে।...এস্থলে ঢুকেছে এক মার্কিন। খাজা মার্কিন ডল (আড়) সমেত একাধিকবার মার্কিন জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউন্টারের পিছনে ফরাসী দোকানউলী শূদ্ধ মিটমিটিয়ে মোরী হাসি চিবিয়ে—মাল কাড়বার কোনো নিশানাই নেই। মার্কিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বৃদ্ধিতে পারলো, মাদাম তার কথার এক বর্ণও বৃদ্ধিতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবোর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে, ‘তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে? ইংরিজী যখন বোঝো না এক বর্ণও?’ এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফার্স্ আকছারই হয়—একগাল হেসে তার ইংরিজীভাষা ভাণ্ডারের শেষ শব্দটি খরচা করে বললে, ‘উই, উই, ইয়েস ইয়েস, “এঙলিশ স্পোকেন!” সারতেনলি। আওয়ার কস্তুতোমার্স্ স্পীক—উই নং স্পীক—’হ্যাঁ, হ্যাঁ, “ইংরিজী বলা হয়” বই কি! আমাদের খন্দেররা বলেন। আমরা বলি না।’

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনো কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সূত্র-সূত্রবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পীকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজী বলে কি না বলে, সেটা কুইনজ ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাসিনী দোকানউল্লীর নয়!

খোদ প্যারিসের মন্দির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও যামন! আমি কি প্যারিস যাচ্ছি হৃৎলবণতৈলতডুলের জন্য!' এম্বলে আমাকে একটু কথা কাটতে হল। বলতে কি, আমার মনে

হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অসম্ভবশীল সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাকশো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রান্সের মাসেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেলায়—কালো বাজারে—নির্দেশ পঞ্চবিংশতি তুংকা! তা সে যাক্ গে! ইংরেজের সঙ্গে দু-শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পেঁছা কোথায় না স্থান নেবো উঁবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুঁশবাই—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ভাও! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউটারের কেরানী এরা সবাই অস্প-বিস্তর ইংরিজী বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে-সব হোটেল উঠবেন না—গ্যাটে আপনার অত রেস্টো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্টো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্‌ দৃষ্ণে প্যারিস বার্লিনে কে কতখানি ইংরেজী বোঝে না বোঝে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নির্দেশ আধা ডজন কন্টিনেন্টাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে আর দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসী কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বৃডাপেশটে বস্তু দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভার্সিটির সব চেয়ে সেরা ইংরাজীবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্‌ বদকিসমতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অশ্ব খঞ্জ গ্রীধামে পেঁছায় না, কেদার-বদরীর পূণ্যসম্মুখ করে না! ভারতীয় কত কালা বোবা কপর্দকহীন প্রাণ বৎসর মন্ডায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজী জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অস্পবস্প সর্বাধিক হতে পারে। লনডনে যদি শতকে একজন লোক ফরাসী বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজী বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যাগুই কাঁজাম্যা ফ্রান্স দেশের আজব চিড়িয়া। প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শূন্যে 'ওরা ইংরিজী শিখেছিল! কি করতে? মরতে?'

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজীজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদিও ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বস্তুর সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির আপন ভূমির উপর কোনো সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনো বিদেশী সৈন্য সেখানে পদাধিষ্ঠ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জার্মানির এক বৃহৎ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মার্কিনিংরেজ চালিত মিলিটারি শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আঁটাটা তার কপালে নেচেছে। আমার এক জার্মান সতীর্থ ধরা পড়ে মার্কিন দল জার্মান সীমান্তে প্রবেশ করা মান্তই। ইংরেজী বলাতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জার্মান জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরেজী চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জার্মান খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পূর্বনো অভ্যাস ছাড়েনি) মার্কিনরা তাকে ‘প্রপাঠ’ দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃন্দা রুদ্রা শাশুড়ীর ওষুধপত্রের অভাব হয়নি। আর সে ভসভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনো জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেল বারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরুপিসেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝে-মধ্যে এখনো তাকে দু’পাঁচ বার্ভল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জার্মান কসটম্‌স আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জার্মানির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখযোগ্য। মার্কিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সম্বন্ধে ছুটেতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পিড়িমরি হয়ে তখন শিখেছে ইংরিজী। কবে কোন ঠাকুন্দা একবার বেথেয়ালে একখানা ‘গাইডবুক টু ইংলিশ’ কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুন্দা তারই গা থেকে সস্তপর্শে ধূলি বেড়ে এক-পরকলাওলা চশমা নাকে চিড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজী অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইন্সকুল ফের খোলা মান্তই আঁড়াবাচ্চার ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলো, তার তুলনায় আমাদের ঊনবিংশ সালের ইংরিজী শেখার প্রচেষ্টা ধূলির ধূলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মার্কিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বা কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটামুটি একই—ইংরিজী।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি নে ইংরিজী না শিখে গুন্টিসদৃশ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

একথা খুবই সত্য, ইংরিজী নিরক্ষুশ বর্জন করা অনদ্ভিত।

কিন্তু দুদিন্যাসদৃশ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

ভদ্র বনাম কুলীন

ষে-ভাষার প্রশংসায় এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পশ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : ‘হে গভীর-সংকট-সম্মূল-অরণ্যের-পথভ্রাস্ত-পাথক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পে’ছবার পূর্বে হৃষ্যধনি করো না। অধম আশ্রয়কাটি বিস্মরণ করে হৃষ্যোজ্ঞাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতম অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সম্মূলগণ এখন আরো প্রাণশয় লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেখবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনো তর্কাতর্কি না করে তারম্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুদ্ধি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্টিক জানি না, তখন আমরা ধরে নিই, আমরা জানি আর নাই জানি, তেনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্টিকস তো আর মাত্র একটি বা দু’টি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয়ই এস্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের ‘অজ্ঞ’ বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা’ হলে নিশ্চয়ই ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজল

খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।

বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের ধল

বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে ॥

‘বিফলে’ নয় ‘বিফলে’ নয়—আমরা সম্মূল পেয়ে গিয়েছি। এবং ছুপিছুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢঙ্কানিাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সূশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব ‘জৈম’দের জলদস দেখে হতবাক হই (ইংরিজীতে অবশ্য ‘জৈম’ বক্রোক্তিতে ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, ‘এই প্রশাস “জৈম”টি তুমি পেলে কোথায়?’ তখন তার অর্থ

‘এই আকাট পটকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোথেকে?’ আমি কিন্তু, দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শব্দকে কৃতকৃতার্থ হই।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজি ভাষার বৃদ্ধি (গ্ৰোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি)। অবশ্যই হয়! আমরা শব্দধোব, কোন ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয়। কেন বেশী হয়? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করেছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হিব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এশ্বক হিন্দী-বাংলা থেকে। তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্‌স্‌ওয়ার্থ, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বর ভাষা থেকে এশ্বের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উদ্ভূত কবি—এ সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিশ্বর শব্দ নিয়েছে বলে। সাধু প্রস্তাব!...এস্থলে আমরা তাহলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরো থ্রিলিং হবে।

(১) কোনো দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায়। নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিনশ’ বছর অবহেলিত অপাণ্ডস্তেয় ছিল সে কথা পাবেই বলেছি। এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। তাই আজো ইংরেজ সব চেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে। এমন কি, যে সব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোন্দ আনা ফরাসীর মারফৎ।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশে আরব বিজয়ের ফলে। তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিনশ’ বছর ছিল আরবী। সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও (‘কদম’ শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না। হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হিরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফৎ আরবীর।

পঞ্চাশত্রে ফ্রান্স বা জার্মানির উপর কোন বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফরাসী-জার্মানে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এস্তেমার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মর্দুটিমের।

(২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পড়োয়, আফিও গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দর্ভিক সৃষ্টি করে, ড্রাই-আরথ পলিসি এস্তেমার করে, নিরস্ত্র বাগ-আবখ

অসহায় নর-নারীকে যারা পার্শ্বিক হুঁহুংকারবলে গুলি করে মারে, তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সুপম্প্রেট সাইজের মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই ‘বাণিজ্য’ সেই ‘রাজত্ব’ সেই ডাকাত—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক-সম্প্রয়টেশনের চৌকশ সর্বাধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই পরবর্তীকালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরো অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বাল্যাখিল্য। তদুপরি এরা চেয়ে-ছিল প্রধানত রাজত্ব করতে; ‘বাণিজ্য’ করতে নয়। এরা ‘নেশন অব্ শপ্-কী-পারজ’ বা ‘শপ্-লিফ্-টার্জ’ নয়। ‘বাণিকের মানদণ্ড’ যখন পোহালে শবরী দেখা দেয় রাজদণ্ডেরূপে তখন সে ‘রাজদণ্ডের সর্বাত্মক বেনে-দোকানের কালি-ঝুলির চিত্র-বিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দৃগন্ধ’।

শুনছি, কোনো কোনো আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্যা কিন্তু পশ্চিতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্যা—আমি এখানে তর্ক করবো না, কিন্তু তার পশ্চিতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এখানে এটা ক্ষেত্র অবাস্তব তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হবেন, তবেই শব্দ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্ট্রাড থিওলিং-তর নয় কি না?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কাড়ি তথা লুণ্ঠের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতের মোহরও মোহর, পুণ্যশীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন? মধ্যভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলালেবুর জন্য ছৌক ছৌক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-বাওয়ার-মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মাঝে বাজার থেকে রমণী আনতেন। অনুযোগ করাতে বলতেন, ‘হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে কোন দোকান থেকেই আসুক।’ ‘হালওয়া নীক অস্-ত,—আজ্ হর দোকান্ বাশ্-দ’—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বৃষ্টি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি? ফরাসী ভাষা লাতিনসমৃদ্ধতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদম্ভ ‘সায়োব-লোগ’ হন্যে হবে অবিমিশ্রা ফরাসী ভাষার পিছনে পড়িমার করে? আসলে ভঙ্গজ চৌষটি-আঁসলা সর্বগ্রহী কুলীনের জন্য ছৌক ছৌক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা’ হলে হায় কালিদাস! তোমার কি গতি হবে, বাছা? তোমার শকুন্তলা,

রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জ্বান থেকে বিদেশী লবজা বেরুবে না !

হায় হোমার, ইস্কিলস, আরিসতোফানেশ, ইউরিপিদিশ !

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনো প্রতি বৎসর এঁদের কাব্য লক্ষ লক্ষ ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে !)

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষায় কবিকুল, ওল্ড টেস্টামেন্টের সল, দায়ুদ সলমনের ‘সণ্ড অব্ সণ্ডজ’—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দানতের স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস দীর্ঘতর হল। সাম্রাজ্য, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অনু-ওয়েপ্ট, অনু-অনর্ড, অনু-সণ্ড হয়ে রইলেন।

পাপমুখে কি করে আর বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোনটা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরাজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে, ইংরাজী গদ্যে তা নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, ‘ব্রিটিশ-ভাড়া’ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। ‘সিংহের এক বাচ্চাই বাস !’

বী বী সী সম্প্রতি একসবারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, ‘ইংরাজীই এখন পৃথিবীর সব চেয়ে চালু ভাষা।’ অবশ্যই। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে সেটি চালু হল—যার বয়ান এইমাত্র দেওয়া হল—সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অসম্ভব ছিল। তারপর সগর্বে বললেন, ‘হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন—থুঁড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয় ; তার ন’টি ছিল ইংরেজীতে।’

আমি বলি, ‘অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন’টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে’, তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবাস্তব ?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসরুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নিই, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা’ হলে কে কি করতো ? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, ‘ভো ভো গ্লিভুন ! শৃংখলিত বিশ্ব... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে আমাদের ভাষা সে কী নির্মল কী নির্ভেজাল ! সে কোনো ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পুত, পবিত্র—পর্বতনিবর্তনশীল ন্যায় অপারিবেশ্য। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা !’

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, ইচ্ছক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দো-আঁসলা হতে দেখে না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছাঁচোর-কেস্তনওয়া মী লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী ভেজাল আছে বইকি !) ভাঙিয়ে

মার্কিন মন্ত্রকে পরসাইলী শাদী করছেন। প্রত্যয় বাবেন না, এই হালে বী বী সী-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদিও মাতা অধিকাংশ মার্কিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, ‘হী উয়েজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস।’ শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট-হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিংকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ডাক অব্ উইন্জারের মার্কিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যতায়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংকর হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসায় আসমান ফাটাও!

আমরাও হুঙ্কা হুয়া করি। দু-একটা নরস্মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেন।

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়ালে নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।

ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহুসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্টি—ইংরিজী যার একশ’ যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদে-দের, জীপিসদের ভাষা। নরখ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্থ সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তকেরই সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরো ডাঙর ডাঙর শেক্সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—‘অসংখ্য রতন, ডেজার্ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়’—ঘাপটি মেরে আপসে আপসে আবজাব করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেব্লা ফতেহ। আইস ভাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

অর্থমর্থম্

বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যোশা টমাস এড্‌ওয়ার্ড লরেন্স্ (Lawrence) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরব জগতে যে সূচ্যায়িত অর্জন করেন তার কিংবদন্তী আজও সে অঙ্গে স্প্রচলিত। সে-যুদ্ধের সময় তুর্কী রাষ্ট্রের পরাধীন আরব ভূমি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব দেখালে পর তাঁর উপর ভার পড়ে আরবদের গেরিল্লা ও সাবোতাজ্ কর্মে পাকাপোক্ত করে তোলার। ...একদা তুর্কী থেকে বেরিয়ে একখান্না হজ্জাগ্রী ট্রেন মদীনা যাবে। ওটাকে বিস্ফোরক দ্বিগুণে কি করে ওড়াতে হয় তারই তালিম দিচ্ছেন লরেন্স্ আরবদের।

আসলে নিরীহ যাত্রীবাহী গাড়ি চুরমার করতে তাঁর মন মানা ছিল না কিন্তু 'নবগীতা'র নাকি 'সাম্ব্যাসংস্কৃতে' আছে 'রণে চ প্রেমে চ দাক্ষিণ্য নৈব নৈব চ।' এস্তের তোড়জোড় করে লরনস্ তো রেল লাইনের তলায় বিশ্ফারক পোঁতার কায়দাকতো আরবদের শেখালেন বিশেষজ্ঞের গান্ধীর্ষ ও তাজিল্য সহকারে। তারপর সবাই বিশ্ফারকের আওতার বাইরে এসে আশ্রয় নিলেন মরুভূমির একটা বালির ঢিপি়র পিছনে। দেখা গেল, দূর থেকে আসছে খেলনার গাড়ির মত হেলে দুলে মাশ্বাতার আমলের ধাপামার্কি যাত্রীগাড়ী। সঙ্কলের চোখ গাড়িটার উপর ডাকটিংকিটের মত সাঁটা। এই এল—এই এল—এই এসে গেল—বিশ্ফারকের বিসদৃভিয়াসটার উপর—ঐয্যা—কোথায় কি! গাড়িখানা দিব্য ব্যাক ব্যাক করে কাশতে কাশতে ফাঁড়াটা মোলায়েমসে পেরিয়ে গেল। ...আরবরা 'বিশেষজ্ঞের' দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মূর্চক হেসেছিল কিনা বলতে পারব না। লরনস্ বলেছেন, 'দ আরটিসট ইন মি ওয়োজ ফ্যুরিয়স, দ ম্যান ইন মি ওয়োজ হ্যাপি।' ইংরিজীটা আমার হৃদবহু মনে নেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার এখনো যেন কানে বাজছে, ভাষাটি তাঁর ছিল চমৎকার আর বলার ধরনটি সরেসেরও সরেস। ...যেখানে লরনস্ হুন্দুরির মত ফাঁদ পাতছেন সেখানে তিনি আরটিসট 'পার-একসেলস', সেখানে বেবাক বশ্দ্দাবস্ত বরবাদ-ভঙ্গুল হলে ভিতরকার আরটিসট সস্তা তো চটে যাবেই। কিন্তু সেই আরটিসটের পাশেই যে দরদী মাটির মানদুষটি রয়েছে সে তো কতকগুলো নিরীহ বালবৃদ্ধকে খুন করতে চায়নি। সে তখন বগল বাজিয়ে নৃত্য করছে।

ঘটনাটি যে এতখানি ফলিয়ে বললুম তার কারণ, এ ব্যাপারটা একটুখানি ভোল বদলে আমাদের জীবনে নিত্য নিত্য ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি উন্নিদ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তদুপরি শখের বাগান করেছেন বহু বহু বৎসর ধরে। আপনার প্রতিবেশী একটা আশু জানোয়ার—পাড়াটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি একদিন দেখেন, পশ্টকটার প্রাণে শখ জেগেছে, কোণ্কে একটি অতি সুন্দর কামিনীর চারা যোগাড় করে সেটা পুঁততে যাচ্ছে এমনভাবে যে, সম্ভানে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে বেশী ভুল করা যায় না! জায়গাটা বাছাই করেছে ভুল, গর্ত যা করেছে এবং সেটাতে জল আর কাঁচা গোবর যা ঢেলেছে তাতে দিল্লীর মিঞা কুৎবামিনার একবার পা হড়কে পড়ে গেলে কাগজে বেরবে মিঞা কুৎব জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। পুর্বেই বলেছি—না বলিনি?—ফাঁসিডেটার আশু পশু কামনা করে আপনি কালীঘাটে শিনি মানত করেছেন। ...কিন্তু তখন আপনি আর থাকতে পারবেন না। আপনার ভিতরে যে হুনারি, যে আরটিসট ঘুমিয়ে আছে সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে চিৎকার করে বলবে, 'ওরে, ও আহাম্মুখ, কামিনী এ ভাবে পোঁতে?'—তারপর ইনস্পাইট অব ইওর সেল্ফ অর্থাৎ আপনার ভিতরকার হুন্দুরি আপনার ভিতরকার হুশমন মানদুষটাকে পরোয়ানা করে তাকে বাংলা দেবে চারা পোঁতার কায়দাকতো !!!

ভূমিকাটা মাত্রাধিক দীর্ঘ হয়ে গেল; তা হবেই। কথায় বলে

বাইরে যাদের লম্বা কৌচা

ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি ।

খেতে মাখতে তেল জোটে না

কেরোসিনে বাগায় তেঁড়ি ॥

কালোবাজারীকে আমি আমার দৃশমন বলে বিবেচনা করি । কালোবাজারী মাত্রই ক্যাপিটালিস্ট; অবশ্য সর্ব ক্যাপিটালিস্টই কালোবাজারী নয় । কম্যুনিস্টরা আবার সর্ব ক্যাপিটালিস্টকেই দৃশমন সম্বোধন । অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা আমার দৃশমনের দৃশমন । ফারসীতেও বলে,

‘দোসংনীস্ত (নাশ্তি), দৃশমন-ই দৃশমন অসং (অস্তি)’—দোস্ত নয়, কিন্তু আমার দৃশমনের দৃশমন !...

পূর্বেই বয়ান দিয়েছি, মানুষের ভিতরকার আরটিস্ট দৃশমনকেও সাহায্য করে, আর আমি দৃশমনের দৃশমনকে করবো না ? কারণ আমার ভিতরেও একটা আরটিস্ট রয়েছে । আত্মপ্লাঘা ? আদৌ না । কোন মানুষের রক্তে আরটিস্টের ছোঁয়াচ বিলকুল লাগেনি বলতে পারেন ? এমন কি আমরা যাকে অভদ্র ভাষায় মিথ্যুক বলি সেও তো বেচারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ইংরিজীতে যেমন দড়কচা-মারা গাছের বেলা বলে ‘এটার থ্রোং স্টান্টিড্’—ঔপন্যাসিক, কবি, এক কথায় আরটিস্ট । নোট যে লোক জাল করে সেও সুযোগ-থেকে-বঞ্চিত রবিবর্মণ ।

অতএব আমি যখন কম্যুনিস্ট ভাষ্যদের সদৃশপদেশ দিই তখন সেটা দৃষ্ট-জানিত আত্মপ্লাঘা বশত নয় । অবশ্য তারা সেটা নেবেন কিনা, সেটা নিতান্তই তাঁদের বিবেচ্য । এবং আমি মনের কোণে এ-আশাও পোষণ করি যে তথাকথিত ধর্মভীরুজনও এদিকে খেয়াল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না । অর্থনীতিবিদ শুম্পেটার বলেছেন :—মারক্স যখন বিশ্বশ্রমিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন অনুমান করতে পারেননি যে, পৃথিবীর যে-কোনো স্থলে প্রথম ইনকিলাবের ফলস্বরূপ প্রথম প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অন্যান্য দেশের ক্যাপিটালিস্টরা সেটা দেখে তার থেকে লেসন্স জ্ঞ করে নিজেদের সেই অনুযায়ী এড্‌জাস্ট করে নেবে, মানিয়ে নেবে ।’ অর্থাৎ এষাবৎ যে যে বেধড়ক শোষণ নীতি চালিয়েছিল সেটাকে মডিফাই করে প্রলেতারিয়াকে কিছু পরিমাণে ব্যবসাতে হস্ত দিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, পেনশন, বেকারীর সময় ডোল,

১ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গত সপ্তাহে বিড়িওলাদের মিছিল গেল—বিড়ির পূর্জপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে । তারা ইনকিলা । । ব দোহাই পেড়ে বলছিল ‘ইনক্লাব জিন্দা । বাদ ।’ শিক্ষিত লোককেও আমি ‘ইনক্লাব’ উচ্চারণ করতে শুনছি । আসল উচ্চারণ ইনকিলা । । ব্—‘লা’টা যতদূর চান দীর্ঘ করবেন । তারপর জিন্দাটা হ্রস্ব হ্রস্ব সারবেন । তারপর ‘বাদ’টা ব্যাৎ যতদূর শ্রুত দীর্ঘ । অর্থাৎ ইন্ । কি লা । । ব্ ॥ জিন্ । দা । বা । । । । দ্ ॥

চিকিৎসার ব্যবস্থা, নানাবিধ ইনসিওরেন্স দিয়ে এমনই তার স্বার্থ নিজের স্বার্থে জড়িয়ে ফেলবে যে “একদিন সে দেখবে হি হ্যাজ মোর টু লুজ দ্যান মিয়ারালি ফেটারজ” অর্থাৎ ইনকিলাব এনে সে অর্থনৈতিক পায়ের রেডি হাতের ওড়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ইনসিওরেন্সের সুবিধাও হারাবে। নবীন প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র বিনা মেহমতে ফোকটে পয়সা কামানোটা বিলকুল বরদাস্ত করে না। ক্যাপিটালিস্টদের এই এড্‌জাস্ট করে নেওয়াটাকে শূন্যপেটার তুলনা করেছেন রোগের বীজাণুর সঙ্গে; তারা যে রকম প্রাণঘাতী ওষুধের ইনজেকশন খেয়ে খেয়ে কালক্রমে ওষুধের সঙ্গে নিজেদের এড্‌জাস্ট করে নেয় তারপর সহজে নিমর্ল হতে চায় না।

প্রশ্ন উঠবে, আমি কি তবে কম্যুনিস্ট? ভাষাধের লেলিয়ে দিচ্ছি ধর্মের পিছনে, আর ওদিকে ধর্মানুসারগণকে বলছি, ‘সাধু সাবধান!’?

পাঠক যদি অনুমতি দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তরটি আমি উপস্থিত মূলতবী রাখবো। কারণ শূদ্ধ এরই জন্য আমাকে পুরো এক কিশ্তি ‘পণ্ডিত’ লিখতে হবে। উপস্থিত যেটা লিখছি তাতে এর স্থান সংকুলান হবে না।

*

*

*

কম্যুনিস্টরা একটা মোক্ষম তত্ত্ব-কথা বলেন যেটা সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত। বস্তুত এ অধম এ-বাবদে গত ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে, দলিল-দস্তাবেজ সংস্থান করেছে, ফের চিন্তা করেছে, এখনো করছে, উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তারা বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব প্রগতিশীল আন্দোলন—ইনকিলাব—যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখতে পাই তার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ—ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্‌।’^২

সকলেই স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে সাতটি বড় বড় আন্দোলন—পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সাতটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, এবং তার পাঁচটি এখনো পৃথিবীতে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সে-সাতটি সচরাচর ‘ধর্ম’ নামে পরিচিত। ধর্মের নাম শুনে পাঠক অসহিষ্ণু হবেন না। ‘আগে ক’হ’।

তার তিনটির জন্ম এ-দেশে—হিন্দু (সনাতন), বৌদ্ধ, জৈন। এ তিনটি আর্বধর্ম। শেষের জৈনধর্ম এখন পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধধর্মের রঙ্গভূমি বহু যুগ ধরে ভারতের বাইরে।

আর তিনটি আরব-প্যালােস্টাইন নিয়ে যে সেমিতি (সেমিটিক) ভূমি সেখানে : ইহুদি, খ্রিস্টান ও ‘মুসলমান ধর্ম’ (ইসলাম)। এ-তিনটি সেমিতি ধর্ম। ইহুদিধর্মের বিশ্বাসীজন প্রায় দু’হাজার বছর নিষ্কল্য থাকার পর

২ সর্ব ইনকিলাবের পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেটাই বিপ্লবের একমাত্র কারণ কিনা, কিংবা সর্বোপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনা, সে আলোচনা এস্থলে থাক।

অধুনা সগৌরবে রক্তভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, ‘—বিশ্বলোক ভাবিছে বিস্ময়ে,/ বাহার পতাকা/অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে/কোথা ছিল ঢাকা!’।

সপ্তমটির জন্মস্থল ভারত এবং সেমিতি ভূখণ্ডের মাঝখানে। এটিও খাঁটি আৰ্য্যধর্ম। প্রাচীন ইরানে এর জন্ম ও জরথুষ্ট্রী বা জরথুষ্ট্রের ধর্ম নামে পরিচিত। লোকমুখে এরা ‘অগ্নি-উপাসক’ আখ্যায় পরিচিত। ভারতবর্ষে এখন এই পারস্যের—একমাত্র না হলেও—প্রধান নিবাসস্থল। ইহুদিদের সাত শত বৎসর পূর্বে এঁরা রক্তভূমি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু আজ যদি এঁরাও ইহুদিদের মত দুই সেন—মার্কিন জনসেন আর ইংরেজ উইলসেনকে হাত করে প্রাচীন-ইরানে অধুনা আফগানিস্তানে অবতীর্ণ হয়ে বল্খ (সংস্কৃতে হিল) বদখ্শান দখল করে ‘আরিয়ানা’ (আর্য) রাষ্ট্র প্রবর্তন করেন তবে অন্তত আমরা অশ্চর্য হব না। বল্খ অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের এ-পারে—মাঝখানে মাত্র আমুদারিয়া (নদী)—এবং এশিয়ায় বৃকের মধ্যখানে। এখানে মার্কিন-ইংরেজের একটি কলোনী বা ঘাঁটির বড়ই প্রয়োজন!...লাওংসে, কনফুৎসের নীতিবাদ ‘ধর্ম’ নামে পরিচিত হয় না।

যে অর্থনৈতিক বাতাবরণের দরুন নবীন ধর্ম সৃষ্টি হয় তার অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলাম নিয়ে আরম্ভ করাই প্রশস্ততম, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা নবীন এবং ইসলামের পরে আর কোনো বিশ্বধর্ম জন্মগ্রহণ করেনি। তদুপরি আরবরা গোড়ার থেকেই জাত-ঐতিহাসিক। তারা হজরৎ সম্বন্ধে যতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছে তার তুলনায় খৃষ্ট বা বুদ্ধের জীবনী অনেক কাঁচা হাতে মহাপুরুষদের তিরোধানের প্রচুর সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ফলে তাঁদের ছবিগুলো আইডিআলাইজড—আর্টিস্ট কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন বিস্তর।^৩

৩ আমি এখানে বুদ্ধ যীশুর একমাত্র চিন্ময় রূপের মধ্যেই (অর্থাৎ আমরা যে কল্পনার বা আইডিআলাইজড বর্ণনার বুদ্ধ যীশুর ধারণা করি) নিজেকে সীমাবদ্ধ করছি। ওয়েল্‌স্‌ মৃত্যু দিকটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

‘Jesus was a penniless teacher, who wandered about the dusty sun-bit country of Judea, living upon casual gifts of food; yet he is always represented (অর্থাৎ ইয়োহোপীয় চিত্রে ভাস্কর্যে) as clean, combed and sleek in spotless raiment, erect and with something motionless about him as though he was gliding through the air’. এর পর ওয়েল্‌স্‌ দেখাচ্ছেন, এই মৃত্যু ছবির উপরও চিন্ময় ছবির প্রভাব ফেলেছে—

‘This alone has made him unreal and incredible to many people who cannot distinguish the core of the story from the ornamental and unwise additions of the unintelligently devout.’

হজরৎ যখন মস্কার একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মস্কাবাসী সাড়ে তিনশ' দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটি বাড়লে আপত্তিটা কি? আর নামাজ রোজাতেই বা কি? পূজোপাট তারাও করে, আর উপোসটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্তম প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যে-ই তিনি প্রচার করলেন, ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন তিনি গরীবদের, 'হ্যাভনট'দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগলো গন্ডগোল। ওদিকে 'হ্যাভনট'রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকাড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যন্তপই, মস্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খৃষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করোঁছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরীব জেলেদের নিয়ে। অধ্যাত্ম জগৎ তথা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব উপদেশ তিনি দিলেন সেগুলো আজও পূর্ণ জীবন্ত কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন কেউ তোমার জামাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিলে তাকে স্বেচ্ছায় জোশ্বাটিও দিয়ে দিয়ো। এক পুণ্যশীল ধনীকে বলছেন, তোমরা সব-কিছু বেচে ফেলে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

জেরুসালেমের ইহুদি পুঁজিপতির দল তবু এসব গ্রাহ্য করেনি। ইতিমধ্যে সুলেমানমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর রাজা হেরড দ গ্রেট নির্মাণ করেছেন এক বিরাট নবীন ঐশ্বর্যমন্ডিত গ্লাভে-মন্দির। কিন্তু মন্দির হোক আর সিনাগগই হোক জাত-ইহুদি ওটাকে দুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছে। সেখানে চলেছে গরুবলদের কেনাবেচা এবং তার চেয়েও মারাত্মক—সুদখোর ইহুদি মহাজনরা সেখানে চা্লিয়েছে টাকার লেনদেন, সররাফের (ক্ষুদে ক্ষুদে বাণ্কারের) বাট্টা নিয়ে টাকাকাড়ির বদলাবদল। বস্তুত এই সব পুঁজিপতিরাই তখন পুণ্যভূমির অধিকাংশ তাদের টাকার জোরে কস্জায় এনে ফেলেছে।

ইহুদিভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ থেকে সহস্র-সহস্র শিষ্যশিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যীশু সগোরবে প্রবেশ করলেন জেরুসালেমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে। ব্যবসায়ীদের কারবার দেখে তিনি রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁর আচরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি কেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। চতুর্থ সুসমাচার-লেখক সেন্ট জন, বলছেন (St. John) তিনি সুতোর দাঁড়ি পাঁকিয়ে চাবুক বানিয়ে তাদের চাবকাতে চাবকাতে সেখান থেকে তাড়ালেন। টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাণ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, 'শাস্ত্র আছে : আমার ভবনের নাম

বৃন্দেধর সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বাবদে হজরৎ অতিশয় সাবধান ছিলেন।

হবে “উপাসনা ভবন” ; আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস “চোরের আশ্রা” (ডেন্ অব থীভ্জ্) ।’

সেই সময়েই স্থির করলে পদ্মজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজকসম্প্রদায় —
ষাণ্মুকে বিনষ্ট করতে হবে, ক্রুশাবিশ্ব করে মারতে হবে ।

*

*

*

ধনদৌলত-টাকাকড়ি ।

অর্থ‘মনর্থম্’ বলেন গুণগীজন । কিন্তু এও সত্য,—অর্থের সম্বন্ধে বেরুলে
অর্থ (টাকাকড়ি) নাও পেতে পারেন, কিন্তু অর্থ পেয়ে যাবেন অর্থ’ৎ অর্থটা—
মানেটা—বুঝে যাবেন । তাই অর্থ‘মর্থম্’ও বটে ॥

আবার আবার সেই কামান গর্জন !

খুন করার পরই খুনীর প্রধান সমস্যা মড়াটা নিশ্চিহ্ন করবে কি প্রকারে ?
সমস্যাটা মান্ব্যাতার চেয়েও প্রাচীন । আমাদের প্রথম পিতা আদমের বড় ছেলে
কাইন তাঁর ছোট ভাই আবেলকে খুন করেন । তাঁর সামনেও তখন ঐ একই সমস্যা,
মৃতদেহটা নিয়ে করবেন কি ? সাধারণ সাদামাটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সেটাকে
পুঁতে ফেললেন মাটির ভিতর । কিন্তু মাটিকে আমরা মা-টিও বলি ; তিনি
সইবেন কেন এক পুত্রের প্রতি অন্য পুত্রের এ রকম নৃশংসতা । তাই পরমেশ্বর
কাইনকে বললেন, ‘এ তুমি করেছ কি ? মাটির (মা ধরণীর) তলা থেকে তোমার
ভাইয়ের রক্ত যে আমাপানে চিৎকার করছে ।’ অর্থ’ৎ মাটিতে পুঁতেও নিস্তার
নেই । তাই পৃথিবীর একাধিক ভাষাতে এটা যেন প্রবাদ হয়ে গিয়েছে । সন্দেহ-
বশত গোর খুঁড়ে লাস বের করে পোস্ট-মরটমের ফলে যখন ধরা পড়ে লোকটার
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তখন ঐসব ভাষাতে বলা হয়, মৃতের রক্ত বা মা ধরণী
মাটির তলা থেকে চিৎকার করছিল প্রতিশোধের জন্য ।^{১, ২}

১ মূল গল্পের ধারা অনেক ক্ষেত্রে ফুটনোটের আধিক্যবশত বাধা পায় ।
অধম কিন্তু ফুটনোট শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দেয়—অর্থ’ৎ কোনো পাঠক যদি
ফুটনোট আদৌ না পড়েন তবে তিনি মূল গল্পের (টেক্সটের) কোনো
প্রকারের সারবস্তু থেকে বঞ্চিত হবেন না । ফুটনোটে থাকবার কথা মূল
গল্পের—বক্তব্যের—সঙ্গে সম্পর্কিত নানাপ্রকারের আশ-কথা পাশ-কথা,
যেগুলো অত্যধিক কোতুলকী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিৎ ফালতো জ্ঞান
সম্পন্ন হয় কিংবা/এবং যারা বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্-
বাদ দেন না । অন্যদের জন্য মিস্টার্নই যথেষ্ট—অর্থ’ৎ আটপোরে পাঠক
টেক্সট পড়েই সন্তুষ্ট । ফুটনোটে এমন কিছু দেওয়া যেটা না পড়লে মূল
কাহিনী বুঝতে অসুবিধা হয়—লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ ।

২ ভ্রাতৃহত্যার চিরস্বরূপ সদাপ্রভু কাইনের কপালে একটি লাঞ্ছনা এঁকে
দেন । লেখকের ‘প্রেম’ অনব্বাদ দ্রষ্টব্য ।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২৬

খুন-খারাবীর ইতিহাস যারা পড়েছেন তাঁরাই জানেন লাস গায়েব করার জন্য যুগ যুগ ধরে খুনী কত না আজব-তাজব কায়দাকেতা বের করেছে। অবশ্য খুনী যদি ডাক্তার হয় (না পাঠক, ডাক্তার-বিদ্য-হেকিম ‘চিকিৎসা’র অহিলায় যে ‘খুন’ করে তার কথা হচ্ছে না) তবে তার একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। বছর বিশেক পূর্বে বিলাতবাসী এক ‘কাল-আদমী’ সার্জন তার মেম বউকে খুন করে; বাথটাবে লাস ফেলে সেটাকে ডাক্তারি কায়দায় টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রাইংরুমের চিমনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুচহ লাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু ‘পাক প্রশালীতে’ করলো একটা বেথেয়ালির ভুল। তখন ভর গ্রীষ্মকাল—ড্রাইংরুমে আগুন জ্বালাবার কথা নয়। দু’একজন প্রতিবেশী ঐ ঘরের চিমনি দিয়ে যে ধূয়ো উঠছে সেটা লক্ষ্য করলো। ডাক্তারের বউ যে হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, সে যে মাঝে মাঝে ডাইনে-বায়ে ‘সাইড-জাম্প’ দিত, স্বামী-স্ত্রীতে যে ইদানীং আক্কাই বেহুদা ঝগড়া-ফসাদ হত এসব তত্ত্ব পাড়াপড়শীর অজানা ছিল না। পলিস সন্দেহের বশে সার্চ করে চিমনিতে ছোট্ট ছোট্ট হাড় পেল, চানের টাবটা যদিও অতিশয় সযত্নে ধোওয়া-পোছা করা হয়েছিল তবু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে মানুষের রক্তের অশ্রান্ত চিহ্ন পাওয়া গেল। ...মোশা ডাক্তারকে ইহলোক ত্যাগ করার সময় মা ধরণীর সঙ্গে সমান্তরাল (হরাইজন্টাল) না হয়ে লম্বমান (পারপেন্ডিকুলার) হয়েই যেতে হয়েছিল।

অবশ্য ডাক্তারের ফাঁসি হওয়ার পর তার আপন লাস নিয়ে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির কারণ ছিল না—কারোরই। যে সরকারী কর্মচারী—অশ্লীল ভাষায় যাকে বলে ‘হ্যাণ্ডম্যান’—ডাক্তারের গলায় প্রয়োজনাভীত দীর্ঘ প্রয়োজনাধিক দৃঢ় একটি নেকটাই সযত্নে পরিবে ডাক্তারের পায়ের তলার টুলটি হঠাৎ লাথি মেরে ফেলে দেয় সে ঐ ‘অপকম্ম’-টি করেছিল জজসাহেবের আদেশে, সামনে ঐ ডাক্তারেরই পরিচিত আরেক ডাক্তারকে এবং জেলারসাহেবকে সাক্ষী রেখে। শুনেনি, এদেশের সরকারী ফাঁসিডে আসামীর গলায় দড়ি লাগাবার সময় তাকে মৃদু কণ্ঠে বলে, ‘ভাই, আমার কোনো অপরাধ নিয়ো না; যা করছি সরকারের হুকুমে করছি।’ ইউরোপীয় ফাঁসিডেদের এরকম ন্যায়ধর্ম-জাত কোনো সূক্ষ্মানুভূতি নেই। সেখানে ফাঁসিডে তার মজুরির উপর ফাঁসির দড়াটা বর্কশিশ পায় এবং সে সেটা ছোট ছোট টুকরো করে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আক্রাদরে বেচে—ফাঁসির দড়ি নাকি বড্ড পয়সামস্ত।

কিন্তু সরকার, রাজা বা ডিক্টেটর যেখানে বেআইনী খুন করে সেখানে এদের সামনেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। যখন পাইকিরি হিসেবে খুন করা হয় তখন দেখা দেয় আরো দু’টি সমস্যা :

(১) যাদের খুন করা হবে তাদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কি প্রকারে তাদের একজোট করা যায় ?

(২) খুন করার জন্য অল্প খরচে অল্প সময়ে কি প্রকারে বিস্তর লোকের ভবলীলা সাজ করা যায় ?

জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশটি মেয়েছেলের মধ্যে যদি

নম্বুইটি কুমারী হয়, এবং দশটি গভ'বতী হয় তবে তারা টরেন্টো হিসেব করে বলে এই একশটি মেয়ের প্রত্যেকটি নম্বুই পারসেট্ অক্ষতযোনি কুমারী এবং দশ পারসেট্ গভ'বতী ।

হিটলার এই ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করে বললেন, 'নম্বুই পারসেট্ তো ইহুদি—বাদবার্ক দশ পারসেট্ জিপ্সি, পাগল (বসে বসে শৃঙ্খল খায়, লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনো সাহায্যই করে না) ইত্যাদি । ঐ হল !—জিপ্সিও নম্বুই পারসেট্ ইহুদি ।' হিসেবে মিলে গেল ।

দেখা গেল, হিটলারের তাঁবেতে ১৯৪১-৪২ সালে যে-সব রাষ্ট্র এসেছে এবং আসছে তাতে আছে প্রায় আশি লক্ষ ইহুদি—এখানে আমি জিপ্সি, পাগল, হিটলারবৈরী ফরাসী-জরমন-রুশ ইত্যাদিকে বাদ দিচ্ছি । হিটলার ডাকলেন হিমলারকে । ইনি পুন্সিস, সেকুরিটি, ইনটেলিজেন্স, হিটলারের আপন খাস সেনাদল (এরা দেশের সরকারী সৈন্য-বিভাগের অংশ নয়। কালো কবুতী'পরা এস এস এবং আরো বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিকারী 'ফ্যুরার' । হিটলার এঁকেই হুকুম দিলেন 'চালাও, কংল'-ই-আম্ ।' অর্থাৎ পাইকারি কচুকাটা ! নাদির তীমুর যখন দিল্লীতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তখন 'কংল'-ই-আম্'ই করেছিলেন । 'আম্' = সাধারণ (দিওয়ান-ই-আম্ তুলনীয়) আর 'কংল' = কতল । অবশ্য নাদির-তীমুর কংল'-ই-আম্ করেছেন প্রকাশ্যে, হিটলার-হিমলার করলেন অতিশয় সঙ্গোপনে ।^৩ বশুত হিমলার ও তাঁর সাস্ত্রো-পাস্ত্রো যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা যেমন অভিনব এবং কুটিল, তেমনি রুদ্র এবং মোক্ষম । তদুপরি বাইরের থেকে তাবৎ ব্যাপারটা যেন করুণাময়ের স্বহস্তে নির্মিত নিষ্পাপ কবুতরটি ; ভিতরে ছিল শয়তানের সাঙাৎ কালকুটেভরা বেইমান, অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী, কালনাগিনী । এ এক অভিনব সম্বন্ধ : বাইরে কবুতর, অন্তরে বিষধর ।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম সমস্যা : তাবৎ ইহুদি একত্র করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে ? এই মর্মে একটি গোপন সভা আহ্বান করলেন হিমলারের ঠিক নীচের পদের কর্তা হাইডেরিষ বার্লিনের উপকণ্ঠে তাঁর শৌখিন ভিলা ভানজ্জ-

৩ হিটলারের খাস 'ভালে' ছিলেন লিঙে । তিনি এতই বিশ্বাসী ভূত্য ছিলেন যে হিটলার-প্রিয়া (পর-স্ত্রী) এফা ব্রাউনের বিছানা পর্যন্ত করে দিতেন । যুদ্ধ-শেষে দশ বৎসর রুশদেশে বন্দীজীবন কাটিয়ে জার্মানি ফিরে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চিঠি বই লেখেন । 'হিটলারের প্রেম' ও 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রবন্ধে এঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে । লিঙেকে যখন পরবর্তীকালে শৃঙ্খলো হয়, ইহুদি নিধন সম্বন্ধে বহু জার্মান কিছুই জানতো না কেন, তিনি বলেন, হিটলার-হিমলার বহুবার সম্পূর্ণ একলা একলা গোপন সলাপরামর্শ করতেন । সে সময়ে সেখানে লিঙের চা-কফি নিয়ে যাওয়াও মানা ছিল ।

তে। এ-সভায় আইষমানকেও ডাকা হয়, যদিও পদগোরবে তিনি এমন কিছু কিস্তিবণ্টা ছিলেন না। কিন্তু হাইডেরিস ছিলেন সত্যিকার ‘আদম-শনাস’ মানুষের জোরি—তিনি জানতেন আইষমান তালেবর ছোকরা, যতই বুটবামেলার ঝক্কাঝকি ব্যাপার হক না কেন সেটার বিলবাবস্থা করে সব কিছু ফিটফাট করে নিতে সে পয়লা নম্বরী! সেই সুদূর স্থালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল, ওদিকে নরওয়ে থেকে উত্তর আফ্রিকা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইহুদিগোষ্ঠী। আইষমানের উপর ভার পড়লো আড়কাঠি হয়ে এদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড়ো করা।

আইষমান সম্বন্ধে বাঙলাতেও বই বেরিয়েছে; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শূন্য একটি কথা এখানে বলে রাখি; বাঙলা বইয়ে আছে আইষমান পাঁচ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এটা বোধ হয় স্লিপ। পাঁচ লক্ষ নয়, হবে পাঁচ মিলিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ।

শব্দার্থে হলে বলে এবং কৌশলে আইষমান যে-ভাবে ইহুদিদের জড়ো করে ছিলেন সেটা এত সুচারুরূপে আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না এ-কথা তাবৎ নার্গিস, অ-নার্গিস সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এই যে আক্রোশ এর তো তুলনা পাওয়া ভার। এর কারণটা কি?

এর উত্তর দিতে হলে তিনভলুমী কেতাব লিখতে হয়। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় খৃষ্টান কর্তৃক ইহুদি নিপীড়ন (এবং এরাই সর্ব প্রথম নয়—সেই খৃষ্টজন্মের হাজার তিন বছর আগে থেকে পালা করে মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, রোমান সবাই এদের উপর অত্যাচার করেছে)। মধ্যযুগে স্পেনে একবার এক লক্ষ ইহুদিকে খেঁদিয়ে আফ্রিকায় ঠেলে দেওয়া হয়, এবং হাজার হাজার ইহুদিকে স্রেফ ধর্মের নামে খুন করা হয়।

কিন্তু হিটলার তো খৃষ্টান কেন কোনো ধর্মই বিশ্বাস করতেন না। পারলে তিনি এ সংসারে কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব রাখতেন না।

হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাঝে-মিশেলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন কিন্তু সেগুলো আকছারই পরস্পরবিরোধী। একদিকে বলতেন, ইওরো-আমেরিকার অধিকাংশ ক্যাপিটাল ইহুদিদের হাতে—যত বেকার সমস্যা, যত রক্তাক্ত বিপ্লব, যত যুদ্ধ ইওরোপে হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইহুদি পুঁজিপতি। আবার একই নিশ্বাসে বলতেন, যে রুশ-কম্যুনিজম ইওরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি ধনদৌলত সমূলে বিনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার আগাপাশুলা ইহুদি প্ররোচনায়। অর্থাৎ ইহুদি একাধারে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যাপিটালিষ্ট। এবং যারা তাঁর একমাত্র ‘বই ‘মাইন কাম্পফ’ (মাই স্ট্রাগল’—এর ঠিক ঠিক অনুবাদ নয়—‘আমার জীবন সংগ্রাম’ বললে অনুবাদটা মূল জরমনের আরো কাছাকাছি আসে। মোশাদ্দা ‘আমি আমার জীবন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি সর্ব দৃশ্যমনের সঙ্গে যে লড়াইয়ের পর লড়াই যুদ্ধেছি তার ইতিহাস’) পড়েছেন তাঁরা জানেন

তিনি তাঁর সিংহাসন দলিলপত্র পেশ করে কখনো সপ্তমাণ করেননি, করবার চেষ্টা দেননি। এর কারণটি অতিশয় সরল।

ইহুদি যে এ পৃথিবীর সর্ব দুঃখের কারণ এটা হিটলারের কাছে স্বতঃসিদ্ধ টেনেট অব ফ্যেং (অন্যতম 'মৌলিক বিশ্বাস')। খৃষ্টান মনুসলমান যে রকম যুক্তিতর্কের অনুসন্ধান না করে সর্ব সন্তা দিয়ে বিশ্বাস করে ইহুসংসারের সর্ব পাপ সর্ব দুঃখ সর্ব অমঙ্গলের জন্য শয়তানটাই দায়ী, হিন্দু যেমন বিশ্বাস করে মানবজাতির সর্ব যন্ত্রণার জন্য তার পূর্বজন্মকৃত কর্মই দায়ী, ঠিক তেমনি হিটলার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভুবন জোড়া সর্ব অশিষের জন্য ইহুদি জাতিটাই দায়ী—অশু খঞ্জ বংশ অবলা শিশু ইহুদি, সব সব, সবাই দায়ী। তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন ইহুদিকুল ছারপোকা ইহুদের মত প্রাণী (ভারমিন)। ছারপোকা ধ্বংস করার সময় তো কোনো করুণা মৈত্রীর কথা ওঠে না, ইহুদের বেলাও কোনটা খেড়ে কোনটা নেংটি সে প্রশ্নও অবাস্তব।

একথা সত্য আমরা ছারপোকা নির্বংশ করার সময় কোনো রাহবিচার করি নে ; এবং যে কোনো প্রকারের প্রাণী হত্যা করলেই যে এদেশের কোনো কোনো সম্প্রদায় আমাদের 'খুনী' বলে মনে করেন সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। তৎসঙ্গেও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যি কি মানুষে ছারপোকাতে কোনো পার্থক্য নেই ? ওদিকে আবার বহু খৃষ্টান সাধুসংজন ইহুদি ছারপোকাতে পার্থক্য করতেন বটে কিন্তু সেটা সামান্যই। আমি কাইন এবং আবেলের যে-বাইবেল কাহিনী দিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেটিকে রূপকার্থে নিয়ে এসব সাধুসংজন কাইনকে ধরেন ইহুদিদের সিনাগগ (ধর্ম প্রতিষ্ঠান) রূপে এবং আবেলকে খৃষ্ট চার্চরূপে—অর্থাৎ ইহুদি তার আপন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে যেখানে খৃষ্টানকে খৃষ্টধর্মকে পায় সেখানেই তাকে নিধন করে। ইহুদি ভ্রাতৃহত্যা, সে বিশ্বয়। —পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি হিটলারের ইহুদি নিধন সমর্থন করছি। আমি এ প্রবন্ধ লিখছি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এস্থলে আমি শুধু তাঁর বিশ্বাসের পটভূমিটির প্রতি ইঙ্গিত করছি ; তাঁর মত আরো বহু 'বিশ্বাসী' যে পূর্ববর্তী যুগেও ছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করছি।

তা সে যাই হোক, এইসব ইহুদিদের এক জায়গায় জড়ো করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—ছারপোকাতে ইহুদিতে ঐখানেই তফাৎ, ছারপোকা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে তো আধেক মর্শকিল আসান ! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ইহুদি মুরব্বীদের বলা হত, তাবৎ ইহুদি পরিবার যেন এক বিশেষ জায়গায় জড়ো হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কর্নি পস্তন করা ববে। তারপর ট্রেনে মোটরে করে কানসানট্রেনশন ক্যাম্প নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়েই একটা লম্বা নালা খোঁড়ানো হত। তারপর আদেশ হত, নালায় প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। একদল এস্ এস্ ('ব্ল্যাক শার্ট'—হিটলারের খাস সেনাবাহিনী) পিছন থেকে গুলি করতো। অধিকাংশ ইহুদি গুলির শাস্তায় সামনের নালাতে পড়ে যেত। বাকিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে নালাতে ফেলা হত।

সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত তা নয়—সব সময় তাগ অব্যর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ নালা থেকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করতো তারা মরেনি—উদ্ধারলাভের জন্য চিংকারও শোনা যেত। ওঁদিকে দৃকপাত না করে তাদের উপর নালার মাটি ফের নালাতে ফেলা হত এবং সর্বশেষে তার উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে মাটিটা সমতল করা হত।

নালা খোঁড়া, তার উপর ফের মাটি ফেলা এ-সব কাজের জন্য ইহুদিই যোগাড় করার জন্য কোনো বেগ পেতে হয়নি। একদল ইহুদিকে এই নিধন কর্মটি দাঁড় করিয়ে দেখানোর পর বলা হত তারা যদি গুলি করা ছাড়া অন্য সর্ব কার্যে সহায়তা করে তবে তারা নিষ্কৃতি পাবে। বলাই বাহুল্য এরা নিষ্কৃতি পায়নি। আথেরে ওরা ঐ একই পদ্ধতিতে প্রাণ হারায়—সাম্প্রদায়িক ছেড়ে দেওয়া কোনো স্থলেই নিরাপদ নয়।

এইসব নিহতজনের অধিকাংশই বড়োবড়ী, ছেলেমেয়ে, কোলের শিশু এবং রক্ত্র অসমর্থ যুবক-যুবতী। সমর্থদের বন্দীদশায় একাধিক বড় বড় কারখানায় বেগার খাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। আথেরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে, যুদ্ধশেষের কিছুদিন পূর্বে এদেরও মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধপূর্বে জার্মানিতে ছিল ৫,৫০,০০ ইহুদি, যুদ্ধশেষে রইল ৩০,০০০। পোলান্ডের সংখ্যা বীভৎসতর; যুদ্ধপূর্বে সেখানে ছিল তেত্রিশ লক্ষ, যুদ্ধশেষে মাত্র ত্রিশ হাজার। এবং আশ্চর্য এই, ত্রিশ হাজারের চোন্দ্রান্না পরিমাণ লোক আপন দেশ ছেড়ে পূর্ণাভূমি ইহুদি স্বর্গ ইজরায়েলে যেতে রাজী হয়নি। অনেকেই বলে, ‘জার্মানি আমার পিতৃভূমি (ফাটেরলান্ট)’, এদেশ ছেড়ে আমি যাব কেন? যে পিতৃভূমিতে সে তার অধিকাংশ আত্মজন হারালো তার প্রতি এই প্রেম প্রশংসনীয় না কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়েমির চূড়ান্ত—জানেন শূন্য সৃষ্টিকর্তা!

আমি বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারলুম, কারণ ইহুদি নিধনের এটা অবতরণিকা মাত্র—‘চলি চলি পা পা’ মাত্র। যেমন যেমন এস এস-দের নিধনকর্মে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল হননকর্ম তেমন তেমন সুক্ষ্মতর, বিদগ্ধতর ও ব্যাপকতর হতে লাগল।

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পের অধিকর্তা, যারা গুলি মারার আদেশ দিতেন তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধশেষে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ওলেনডরফ্। মিত্রশক্তি কতৃক জার্মানির ন্যূরন্বের্গ শহরে সাক্ষ্যদানকালীন ওলেনডরফ্ আসামীপক্ষের উকিল আমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘আমি এই পদ্ধতির সমর্থন করিনি।’

উকিল আমেন : ‘কেন?’

ওলেনডরফ্ : ‘এ পদ্ধতিতে নিহত ইহুদি এবং যারা গুলি ছুঁড়তো উভয় পক্ষেরই মাত্রাহীন অসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধ হত। ইহুদিদের প্রতি কসাই ওলেনডরফের এই ‘দরদ’ অভিনব, বিচিত্র। এই কুষ্ঠীরাশ্রুর একমাত্র কারণ তিনি তখন নিজেকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন।

কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য, যে-সব এস এস সৈন্য গুলি ছুঁড়তো তাদের অনেকেই এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ফলে হঠাৎ সার্ভিশয় মন-মরা হয়ে যেত, মদ্য-মৈথুন ত্যাগ করতো, অবসর সময়ে সঙ্গীসাথী বজ'ন করে এককোণে বসে বসে শূদ্ধ চিন্তা করতো। হিটলারের আদেশে তাদের গুলি ছুঁড়তে হবে—একথা তাদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই উঠে না—বছরের পর বছর তারা ট্রেন্ড্‌ হয়েছে ‘বশ্যতা’মস্ত্রে—অবিভিয়েন্স্‌ এবাভ অল—ফুরারের আদেশে কোনো ভুল থাকতে পারে না, আপ্তবাক্যের ন্যায় তাঁর আদেশ অশ্রান্ত, ধ্রুব সত্য।

কিন্তু ঐ ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটাও তো নিমর্ম সত্য !

হাল বয়ান করে হিমলার-যমকে জানানো হল। ইম্পাতের তৈরি সাক্ষাৎ যমদত্ত-পারা ক্ৰিচং এস এস-এর নাভাস ব্রেক-ডাউনের খবর পেয়ে তিনি উম্মা প্রকাশ করেছিলেন কিনা সে খবর জানা নেই। তবে একটা ‘কেলেংকারি’র খবর অনেকেই জানতো : ইহুদি নিধন যজ্ঞের গোড়ার দিকে হিমলারের একবার কোতুল হল, ‘ম্যাস-মারডার’—‘পাইকারি কচু-কাটা’ দেখার ! একশ জন ইহুদি নারী-পুরুষকে সার বে'ধে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানো হল। সে দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীমান হিমলার ভিরমি যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। স্বয়ং যম যদি মৃত্যু দেখে চোখে-মুখে পাণ্ডাস মারেন তবে বাল্যখল্য যমদত্তেরা ‘কোজাবে’ মা ? এবং আশ্চর্য ! স্বয়ং হিটলারও চোখের সামনে রক্তপাত সহ্য করতে পারতেন না। এবং প্রাণীহত্যা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না বলে তিনি ছিলেন কড়া নিরামিষভোজী। মাংসাসীদের বলতেন ‘শবাহারী’।

হিমলারের আদেশে দু'খানা বিরাট মোটর ট্রাক তৈরি করা হল। দেখতে এমনি সাধারণ ট্রাকের মত, তবে চতুর্দিক থেকে টাইট ঢাকা এবং বন্দ। শূদ্ধ বাইরের থেকে একটা পাইপ ভিতরে চলে গেছে। মোটর চালানোমাত্র বিষাক্ত গ্যাস ভিতরে যেতে থাকে, এবং দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর অবধারিত মৃত্যু। ততক্ষণ অবধি ভিতর থেকে চাপা চীৎকার আর দরজার উপর ধাক্কা আর ঘুঘির শব্দ শোনা যেত। প্রাচীন পাপী ওলেনডর্ফকে আদালতে শূধানো হল, ‘ওদের তোমরা ট্রাকে তুলতে কি করে ?’

৪ এই একশ' জনের ভিতর এক যুবতীকে দেখে হিমলার রীতিমত বিস্মিত হন। চেহারা, চুল, নাক আদৌ ইহুদির মত নয়। যে নরডিক্‌ (বিশুদ্ধতম আর্ষ'রক্তের জরমন) জাত হিটলার হিমলার আদর্শ বলে ধরতেন তাদেরই মত ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, রিজহীন সোজা নাক ইত্যাদি। হিমলারের ডাকে সে এগিয়ে এলে হিমলার তাকে বললেন, ‘তুমি ইহুদি নও।’ গর্বিত উত্তর : ‘না, আমি ইহুদি।’ ‘তুমি বলো, তুমি ইহুদি নও, আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।’ গর্বিততর কণ্ঠে, ‘না, আমি ইহুদি।’ তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে আপন জায়গায় দাঁড়ালো।

ওলেনডরফ্ : ‘ওদের বলা হত তেমনাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

কিন্তু এ পছাতেও এস এস-দের কেউ কেউ সেই প্রাচীন চিন্তাবসাদে ভুগতে লাগলো। ট্রাক থেকে বের করার সময় দেখা যেত মৃতদেহের মুখ বীভৎস রূপে বিকৃত। গাড়িময় রক্ত মলমূত্র। একে অন্যের শরীরে জামাকাপড়ে পর্যন্ত—। একে অন্যকে এমনই জড়িয়ে ধরে আছে যে লোহার আঁকশ আর ফাঁস দিয়ে ছাড়াতে শরীর যেমে উঠতো, মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত, মগজে ভুতের নৃত্য আর চিন্তাধারায় বিভীষিকা।

অকস্পনীয় এই খুনে গাড়ি দুটোর অভাবনীয় মৌলিক আবিষ্কারক ডক্টর বেকারকে জানানো হল। আসলে ইনি এস এস-দের চিকিৎসক (এবং স্বয়ং এস্ এস্)। ইনি কিন্তু আমাদের সেই ঐহিক ডাক্তারের মত নন। তিনি ‘এক-মেবা’ করেই প্রসন্ন। ইনি ‘ভূমার’ সম্মানে আবিষ্কারক হয়ে গিয়েছিলেন!

ঈশ্বর বিরক্তির সূরে তিনি লিখলেন, ‘আমি যে “ব্যবহার পদ্ধতি” লিখে দিয়েছিলাম (ঠিক যেভাবে তিনি ওষুধের প্রেসক্রিপশনে ‘সেবন পদ্ধতি’ ডাই-রেকশন ফর ইউজ’ লিখে থাকেন!) সেভাবে কাজ করা হয়নি। অপ্রিয় কর্ম তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য গ্যাসময় পরিচালক গ্যাস ছাড়ার হ্যাণ্ডলটা একধাক্কায় সর্বশেষ ধাপে নিয়ে যায়; ফলে ইহুদিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। হ্যাণ্ডল ধীরে ধীরে চালালে এরা আস্তে আস্তে আপন অলক্ষ্যে মৃদুমধুর নিদ্রায় প্রথম ঘুমিয়ে পড়ে, শেষনিদ্রা আস্তে আস্তে এবং এতে করে আরো কম সময়ে এদের মৃত্যু হয়। দরজায় ঘুমি, মলমূত্র ত্যাগ, বিকৃত মুখভঙ্গি, একে অন্য মোক্ষম জড়াজড়ি—এসব কোনো উপপাতাই হয় না’।

অত্যাশ্চর্য প্রস্তাব। কিন্তু তাহলেও তো বিরাট সমস্যার সমাধান কথা পরিমাণও হয় না। কারণ ফি ট্রাকে মাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ জন প্রাণী লাদাই করা যায়। ওঁদিকে হিটলার হিমলার যে বিরাট সংখ্যার দিকে উদ্দেশ্যে তাকিয়ে আছেন, এসব গাড়ি গডায় গডায় বানিয়েও তো সেখানে পৌঁছানো যাবে না। ঐ সময়েই রাশার কিয়েফ শহরের কাছে প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাণীকে—এদের অধিকাংশই ইহুদি—মাত্র দু’দিনের ভিতর খতম করার হুকুম এল, এবং জরমেন কর্মতৎপরতা সে কর্ম সম্পূর্ণ করলোও বটে। গ্যাসভান দিয়ে এত লোক এত অল্পসময়ে নিশ্চরু করা যেত না।

হিটলার হিমলারের আদেশ জরমেনির ভিতরে বাইরে—বিশেষ করে পোলান্ডে অনেকগুলো কনসানট্রেশন ক্যাম্প্ (ক ক) নির্মাণ করা হয়। সর্ব-বৃহৎ ছিল আউশ্ ভিৎস্-এ। তার বড়কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত হেস্! হিমলার তাকে ডেকে বললেন, ‘ফ্যারার (হিটলার) হুকুম দিয়েছেন, ইহুদিদের খতম করতে হবে, প্রথমত—খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত—গোপনতম গোপনে।’ কি পরিমাণ

ও ইনি হিটলারের ডেপুটি রুডল্ফ্ হেস্ (Hess) নন, যিনি সশিখপ্রস্তাব নিয়ে ইংলন্ডে যান। এর নাম Hoess।

ইহুদিকে খতম করতে হবে তার মোটামুটি হিসেব হিমলার দিলেন। ইয়োরোপে তখন এক কোটি ইহুদি; অবশ্য বহু জায়গা হিটলারের তাবতে নয় বলে অসংখ্য ইহুদিকে পাকড়াও করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো দ্ব-চারটি কক-তে ইহুদি নিধন সমস্যার খানিকটো সমাধান হয়ে গিয়েছে। মাঝারি রকমের একটা নিরস্ত্র হলঘরে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয়। দরজা বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয় মনক্সাইড গ্যাস। আধঘণ্টার ভিতর এদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব জায়গায় ছমাসে আশী হাজারের বেশী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তা হলে তো হল না।

হয়েস্ খাঁটি জরমনদের মত পাকা লোক। কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সব কটা কক দেখে নিলেন। (যুদ্ধশেষে হয়েস এক চাষা-বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে ধরা পড়েন। ন্যুরনবেরগ শহরে গ্যোরিঙ, হেস্, রিবেনট্রপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন মিশ্রশক্তি মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তখন হয়েস্ সাক্ষীরূপে যা বলেন তার নির্গলিতার্থ—)

‘আমি কক-গুলো পরিদর্শন করে আদর্শেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। প্রথমত মনক্সাইড গ্যাস যথেষ্ট তেজস্বার গ্যাস নয়, দ্বিতীয় চাবুক মেরে মেরে গ্যাস-ঘরে ঢোকাতে হলে বিস্তারিত লোকের প্রয়োজন, তৃতীয় সেই প্রাচীন সমস্যা লাসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?’

কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেল, গ্যাস-ভর্তি লাস পড়লে তারই ঠেলায় গোরের উপরের মাটি ফুলে ওঠে—কয়েকদিন অপেক্ষা করে তবে স্টীম-রলার চালানো যায়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ লাসের ‘বেশাতি’। অতখানি জায়গা কোথায়? আউশ-ভিৎস জায়গাটি ছিল নিকটতম গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে, নির্জনে এবং কার্ছপটে লোক চলাচলের কোন সদর রাস্তাও তার গা বেঁধে যায়নি। তবু কেউ সৈদিক দিয়ে যাবার সময় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেউড়ির উপরের দিকে তাকালে দেখতে পেত লেখা রয়েছে ‘স্নান প্রতিষ্ঠান’, গেট দিয়ে দেখতে পেত, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের দু’পাশে কাতারে কাতারে শৌখিন মরসুমী ফুলের কেয়ারি। দূর থেকে ‘নৃত্যসম্বলিত’ হাটকা গানের কনসার্ট সঙ্গীত ভেসে আসছে। কে বলবে সেখানে পৃথিবীর অভূতপূর্ব বিরাটতম নরনিধনালয়!

মেন রেল লাইন থেকে একটা সাইড লাইন করিয়ে নিলেন হের হয়েস্ তাঁর কক পরীক্ষা। যেদিনে যে সংখ্যার নরনারী শেষ করা সম্ভব সেই সংখ্যার ইহুদি গরুভেড়ার মালগাড়ির ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পোলান্ড থেকে, হাঙগেরি থেকে সুদের রূশ থেকে। এদের খেতে দেওয়া হয়নি, ট্রাকে পানীয় জলের শৌচের ব্যবস্থা নাই। ট্রাক খোলা হলে দেখা যেত শতকরা আট থেকে দশজন্য—বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে—মরে আড়ন্ত হয়ে আছে। শীতকালে শব্দ জমে গিয়েই এর সংখ্যা দেড়া হয়ে যেত।

এদের নামানো হত রেলকর্মচারীদের বিদেয় দেওয়ার পর।

ইহুদিদের বলা হয়েছে, এখানে এদের বিশেষ ওষুধ মাখানো জলে স্নান করিয়ে গা থেকে উকুন সরানো হবে (ডিলাউজিং)। তারাও দেউড়িতে দেখতে

পেত লেখা রয়েছে ‘শ্রান প্রতিষ্ঠান’। ফুলের কেয়ারি, ঘনসবুজ লন, আর আবহাওয়া উত্তম হলে সেই লনের উপর বসেছে সুবেশী তরুণীদের কনসার্ট। চট্টল নৃত্য-সঙ্গীত শ্রবণে শ্রবণে তারা এগুতো রেসেপশনিস্ট-এর কাছে। ইতিমধ্যে মদুজ্ঞ এস এস ডাক্তার ইঙ্গিত করে বদিয়ে দিচ্ছেন, কারা কর্মক্ষম আর কারা যাবে গ্যাস চেম্বারে। শতকরা পঁচিশ জনের মত কর্মক্ষম যুবক-যুবতীকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত অন্য দিকে। যুবতী মা-দের কেউ কেউ আপন শিশু হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আপন স্কারটের ভিতর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু হয়স বলেছেন, এস এস-দের তারা ফাঁকি দিতে পারতো না। এদিকে যারা গ্যাস চেম্বারে যাবে তাদের বলা হয়েছে তাদের টাকাকড়ি, গয়না ঘড়ি, মণিজুহর—মূল্যবান যাবতীয় বস্তু আলাদা করে রাখতে যাতে করে শ্রানের শেষে যে যার মূল্যবান জিনিস ঠিক ঠিক ফিরে পায়। দেশ থেকে এদের নিয়ে আসার সময় তাদের বলা হয়েছে,—তারা ভিন দেশে নতুন, কলনি [দুঃস্বপ্ন ?] গড়ে তুলবে; আপন দেশে ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই—হীরাজুহর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে। ওদিকে কনসারটে পলকা নৃত্যসঙ্গীত বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। ‘তামাশা’টা পরিপূর্ণ করার জন্য কোনো কোনো দিন এদের ভিতর আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের পিকচার পোস্ট কার্ড দেওয়া হত—আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য। তাতে ছাপা রয়েছে ‘আমরা মোকামে পেঁচোঁছি এবং চাকরি পেয়েছি; এখানে খুব ভালো আছি; তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।’ ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার হস্তদণ্ড হয়ে বলতেন, ‘একটু তাড়াতাড়ি করুন; নইলে পরের ব্যাচকে খামখা বসে থাকতে হবে যে!’ তারপর সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঢুকতো সেই গ্যাস চেম্বারে।

হয়স বলেছেন, ‘ব্যাপারটা যে কি কখনই কেউই বুঝতে পারতো না তা নয়। তখন ধূমধূমার, প্রায় বিদ্রোহের মত লেগে যেত। তখন অন্যান্য ছোটখাটো ক-ক-তে যে-রকম বেধড়ক চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয় তাই করা হত।

একটা হল-এ প্রায় দু’হাজারের মত লোক ঠাসা যেত।

এত লোককে একসঙ্গে শাওয়ার-বাথে ঢোকানো হল—তাই দেখে অস্বস্ত তখন, অনেকেরই মনে বিভীষণ সন্দেহ জাগতো। কিন্তু ততক্ষণে ‘টু লেট।’ ফ্রিজিডের দরজার মত নিরস্ত্র বিরাট দু’পাট দরজা তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের কাছে যারা দাঁড়িয়েছে তারা শাওয়ারের চাঁচ খুলে দেখে জল আসছে না।...এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসতে লাগল অন্য জিনিস... দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর লন-এ উপস্থিত একজনের দিকে ইসারা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে সেই এস এস সেখানে একটা পাইপ খুলে ছেড়ে দিত এক টুকরো নিরেট ক্রিস্টেলাইজড ‘সাইক্লন বী’ গ্যাস। ৬ এই বস্তুটি অস্বস্তিজনক

সংস্পর্শে আসামাত্রই মারাত্মকতম গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত শাওয়ারের ছিদ্র দিয়ে বেরুতে থাকতো। এক নিশ্বাস নেওয়া মাত্রই মানুষ ঝরঝরম্ নেওয়ার মত সংজ্ঞা হারায়। শাখের নাকে তখন গ্যাস ঢোকেনি তারা তখন চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কি করতো বন্ধ দরজার দিকে এগোবার জন্য আর যারা দরজার কাছে, তারা আপ্রাণ ঘৃষি মারতো বন্ধ দরজার উপর। সেই মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণাত্যে উন্মত্ত জনতা দরজার দিকে ঠেলে ঠেলে সেখানে মনুষ্য-পিরামিডের আকার ধারণ করতো।

মোক্ষম পদরু কাঁচের ছোট একটি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে ‘করুণাসাগর’ এস্ এস্-রা (তিন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ—আবহাওয়া ও মৃত্যোৎসর্গিত প্রাণীর উপর নির্ভর করতো সময়ের তারতম্য।) যখন দেখতো অচৈতন্য শরীরগুলো আর থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে না, তখন ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে ভিতরকার গ্যাস শুষে নেওয়া হত। বিরাট দরজা খোলা হত।

গ্যাস মাস্ক (ছিদ্রহীন মুখোশ), রবারের হাটু-ছোঁয়া বড় পরে হাতে হোস পাইপ নিয়ে ঢুকতো একদল ইহুদি—পূর্বেই বলেছি এদের লোভ দেখানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলে এদের মৃত্তি দেওয়া হবে।

দরজা খোলামাত্র লাশের পিরামিড, এমন কি যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরেছে তারাও, মাটিতে পড়ে যেত না। একে অন্যকে তখনো তারা জাবড়ে আঁকড়ে ধরে আছে। নাকমুখ দিয়ে বেরোনো রক্ত, ঋতুপ্রবাহের রক্ত, মলমূত্র সব লাশ ছেঁয়ে আছে, মেঝেতেও তাই। ইহুদিদের প্রথম কাজ হত হোস দিয়ে সব কিছু সাফনুংগের করা। তারপর আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে মৃতদেহগুলো পৃথক পৃথক করা। এরপর লাশগুলোর হাত থেকে আংটি সরানো হত, ডেনটিস্টরা এসে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খুলে সোনার, সোনা বাঁধানো দাঁত—দরকার হলে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে—বের করে নিত। মেয়েদের মাথার চুল দৃঢ়-চারবার কাঁচি চালিয়ে কেটে নিয়ে বস্ত্রায় পোরা হত—পরে কৌচসোফা এই দিয়ে তুলতুলে করা হবে এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজে লাগবে। সবশেষ ইহুদি ‘জমাদাররা’ শ্রী পদরু উভয়ের গোপনস্থলে ‘পরীক্ষা’ করে দেখে নিত হীরকজাতীয় মহা মূল্যবান কোন বস্তু লুকনো আছে কিনা।

অ্যারনবেগ মোক্ষময় বলা হয় যে কোনো কোনো কক্ষে-তে লাসের চর্বি

ধারণা নেই। জার্মান এনসাইক্লপীডিয়া বলেন Zyklon (ৎসাইক্লন) এক প্রকারের অতি মারাত্মক বিষাক্ততম প্রাসিক (হাইড্র সায়েনিক) এসিড। হয়েন্-এর উৎসাহে এক বৈজ্ঞানিক ‘ৎসাইক্লন বা’ Zyklon B আবিষ্কার করেন। এরই অন্য নাম Zyanwasserstoffkristalle; অর্থাৎ Zyankali Cyanide of Potassium, Wasserstoff = hydrogen ॥ মূল তৎসাইক্লন ব্যবহার করা হত খাদ্যশস্যবিনাশকারী কীট পতঙ্গ ইহুদিদের মারার জন্য। নামটা ব্যবসায় ব্যবহৃত।

ছাড়ানো হত সাবান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য, এবং কোনো এক বিশেষ ক-র প্রধান কর্মচারীর শোখিন পত্নী মানুষের চামড়া দিয়ে ল্যাম্প-শেড তৈরী করাতেন। কিন্তু এগুলো সপ্রমাণ হয়নি। অধর্মের নিবেদন, অনাহারে অত্যাচারে রোগব্যাদি তথা অসহ মানসিক ক্লেশে ইহুদিদের দেহে তখন যেটুকু চর্বি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে একটি কবরেজী বড়িও হয় না।

মণিমাণিক্য অলংকারাদি জরমন স্টেট ব্যাংক পাঠানো হত। এ পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাংক কি পরিমাণ মাল পেয়েছিলেন তার হিসাব যুদ্ধশেষে নির্ধারিত করা যায়নি। তবে ব্যাংক বেশীর ভাগ বিক্রি করে দেওয়ার পরও যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়ে যুদ্ধশেষে মার্কিনরা তিনটে বিরাট বিরাট ভলট কাঁঠাল-বোঝাই করেছিল। এবং একথানা চিঠি থেকে কি পরিমাণ মাল যোগাড় করা হয়েছিল তার কিছুটা হৃদয় মেলবে। স্টেট ব্যাংক সরকারী লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে সে চিঠিতে লেখেন, ‘এই দ্বন্দ্বেরা কিস্তিতে আমরা যা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আছে, ১৫৪ সোনার পকেট-ঘড়ি, ১৬০১ সোনার ইয়ারিং, ১৩২ ডায়মন্ড আংটি, ৭৮৪ রপোর পকেট ঘড়ি, ১৬০ বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত সোনার দাঁত, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি দীর্ঘ সে ফিরিস্তি। চিঠি লেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ। এবং ইহুদি নিধন চালু ছিল ‘ফুল-গ্যাস’ স্ট্রিমে ১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত—এবং তারপর মন্দগতিতে। মার্কিনরা এখনো তাই ঠিক ঠিক ‘মোট-জমা’ প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু এসব জিনিস থাক। যে-জিনিসটা জনৈক মার্কিন অফিসারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল (এবং আমাকেও করেছে) সেটা নিবেদন করার পূর্বে বলি, এই অফিসারটি রীতিমত হারড্‌ বয়েন্ড ঝাঙ্ক—বিস্তার লড়াই লড়েছেন, বীভৎস সব বহু বহু দৃশ্য দেখেছেন, গাডায় গাডায় গুপ্তচরকে তাঁর সামনে তাঁরই আদেশে গুলি করে মারা হয়েছে (যুদ্ধের সময় গুপ্তচর নিধন আন্তর্জাতিক আইনে বাধে না); সে-সবের ঠাণ্ডা-মাথা হিমশীতল বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ওসব ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নেকটাইটি পর্যন্ত এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি কিন্তু তার ‘ওয়ারটারলু’ এল যুদ্ধের পর, আউশভিৎস দেখতে গিয়ে, টুরিস্ট্রুপে (এখনো ওটি সে-অবস্থাতেই রাখা আছে—পাঠক নেকস্ট ট্রিপে সেটা দেখে নেবেন। আমি হিম্বৎ করতে পারিনি)। মার্কিন অফিসার গ্যাস চেম্বার পোড়াবার জায়গা, বন্ধ চুল্লি খোলা চুল্লি সব—সব দেখলেন। সর্বশেষে গাইড নিয়ে গেল একটা গুদোম ঘরে যেখানে নিহত ইহুদিদের অপেক্ষাকৃত কম দামী জামা-পাপড়, জুতো-মোজা সারে সারে সাজানো ছিল।

তারই এক অংশে তিনি দেখতে পেলেন চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো। ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে। নিতান্ত কাঁচা-কাঁচি শিশুদের।

এবারে আমরা যে-প্রসঙ্গ নিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে ফিরে যাই। মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিলবার্ট আউশভিৎস ক্যাম্পের কর্তা হয়েসকে আশ্চর্য হয়ে শ্রদ্ধান, ‘এত অসংখ্য লোককে তোমরা মারতে কি করে?’ হয়েস্

বাধা দিয়ে শাস্তকণ্ঠে বললেন, ‘আপনি তাবৎ জিনিসটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মারাটা তো সহজ। মিনিট পনেরো লাগে কি না লাগে, ব্দ’ হাজার লোককে মেরে ফেলতে (হয়েস্ বোধ করি জানতেন না যুদ্ধের শেষের দিকে এক জরমন ডাক্তার ‘চমৎকার’ একটি ইনজেকশন বের করেন, এবং মোন্দা কথা তার দাম ফানিলের চেয়েও কম;—ঘাড়ের কাছে সে ইনজেকশন আনাড়িতেও দিতে পারে, শিকার খতম হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিতর)। কিন্তু আসল সমস্যা লাশগুলো নিশ্চিহ্ন করা যায় কি করে। বিরাট বিরাট ছুল্লি তৈরী করে এবং সেগুলো চম্বশ ঘণ্টা চালু রেখেও আমরা ঐ সময়ের ভিতর দশ হাজারের বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। মনে রাখতে হবে ছুল্লি থেকে মাঝে মাঝে হাড় আর ছাই বের করতে হত। হাড়গুলো মেশিনে গুঁড়ো করে ছাইসুদৃশ পাশের নদীতে ফেলে দেওয়া হত (শুনেছি তো হাড়ের গুঁড়ো আর ছাই উত্তম সার—তবে জরমনরা এটা বরবাদ করতে। কেন?—যেস্থলে চুল পর্যন্ত কাজে লাগানো হচ্ছে—লেখক)। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা আউশাভৎসে ২৭ মাসে ২৪০০০০০ (প্রায় সাড়ে চম্বশ লক্ষ) লোক মেরেছি।’

আইষম্যান গর্ব করে বলেছিলেন, সব কটা ক-তে মিলে সবসুদৃশ পণ্ডাশ লক্ষ প্রাণী খতম করা হয়। হয়েস্ স্বীকার করেছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা গোপন রাখা যায়নি। অর্থাৎ গ্যাস চেম্বারে নিধন কর্মটি গোপন রাখা যায়, কিন্তু মাটিতেই পৌঁতো আর পুড়িয়েই ফেল—সেটা কিন্তু গোপন রাখা যায় না। লাশ-পোড়ানোর তীর উৎকট গন্ধ, আর চিমনির চোঙ্গা থেকে যে ধূঁয়ো বেরচ্ছে তার ছাই ছড়িয়ে পড়তো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকের গ্রামে। তারা বুঝে যেত ঐ নিরীহ “স্নান-প্রতিষ্ঠান” কোন্ ‘বিশ্ব-প্রেমের খয়রাতী রাজকার্যে’ লিপ্ত আছেন এবং শূদ্ধ সর্বাস্তুরণে প্রার্থনা করতো বাতাস যেন তাদের আপন বসত গ্রামের দিকে না যায়! এটা কিছু নতুন নয়। যুদ্ধের গোড়াতেই এই নিধনযজ্ঞ হিটলার আরম্ভ করেন জরমনির পাগলা-গারদগুলো দিয়ে—পাগলদের ভিতর অবশ্য কিছু ইহুদিও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই খাঁটি জরমন। নামকে ওয়াস্তু একটা কমিশন বসলো—এত অপ-সংখ্যক পাগল রেহাই পেল, যদি আদৌ কেউ পেয়ে থাকে, যে সেটার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই—এবং পাগলদের কতকগুলো কেন্দ্রে জড়ো করে গ্যাস মারফৎ মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এটা স্রেফ খুন। জরমন আইনে নিকটতম তিনজন আত্মীয়ের অনুমতি ভিন্ন পাগলকে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরানো পর্যন্ত যায় না—নিধন করার (যাকে ভদ্রভাষায় বলা হয় ‘মার্সি কিলিং’ = ‘অনন্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্য দয়াবশত কাউকে হত্যা করা’ কিংবা ‘অনারোগ্য ক্যানসারের অসহ যন্ত্রণায় রোগী যখন বিষ খেতে চায় তাকে বিষ এনে দেওয়া।’ ডাক্তারি আইনে একে বলা হয়—Euthanasia, গ্রীক সমাস) তো কোন কথাই ওঠে না। পাগলদের মেরে পুড়িয়ে ফেলার প্রধান কেন্দ্র ছিল হাডামার নামক গ্রামে। তারই পাশের লিম্বুর্গ শহর। সেখানকার বিশপ জরমনির আইন-মন্ত্রীকে একথানা চিঠিতে জানান, “ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা

পর্যন্ত সেই বশ্ব বাসগদুলো চেনে, যার ভিতরে করে পাগলদের হাডামারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কোনো একটাকে দেখলেই ছেলেরা বলে ওঠে—এ যাচ্ছে ‘খুনের বাক্স’ = ‘মার্ডার বাক্স’। তাজিল্যভরে কথায় একে অন্যকে বলে, ‘ক্ষেপালি নাকি?—যা’বি নাকি হাডামারের বেকিং বক্সে (যাতে কেক বানানো হয়; এস্থলে লাশ পোড়াবার চুল্লি)?’ হাডামারের চিমনি ছাড়ে ধূয়ো আর সেখানকার অধিবাসীরা are tortured with the ever-present thought of depending on the direction of the wind. তবু এ কথা সত্য এসব খুন-খারাবী লাশ পোড়ানোর খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যারা জানতো, তারা জানতো। অন্য কাউকে বলতে গিয়ে কেউ গেন্ডাপোর (‘গোপন পদ্বলিস’—এদের প্রধানতম কর্ম ছিল রাজনৈতিক, অনেকটা রুশের ‘ওগপদু’র মত—এদের কাহিনী কক-র চেয়েও বাঁভংসতর) হাতে ধরা পড়লে প্রথম তার কপ্পনাভীত নানাঅত্যাচার এবং এতেও যদি সে না মরে তবে সর্বশেষে তাকে কোনো একটা কক-তে সমর্পণ এবং সেখানে গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু। কাজেই হাডামার বা কক-গদুলোতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে মুখ খুলে কেউ রা-টি কাড়তো না। তাই এ আমলে একটা চুটকিলা রসিকতা সৃষ্ট হয়—

‘তুই নাকি, ভাই, ডেনটিস্ট-ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস?’

‘বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। কেউ যে মুখ খুলতে রাজী হয় না।’

লিমবদুরগ-এর বিশপের চিঠি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিটলারের আপন আইন উপদেষ্টার কাছে এ-বাবদে অনুসন্ধান করলেন। আইন-উপদেষ্টা হিটলারের সেই চিঠি দেখালেন। আইনমন্ত্রী বললেন, ‘এটা তো তাঁর নির্দেশ। এটা তো আইন নয়। আপনারা তা হলে এটাকে আইনের রূপ দিন, সেটাকে তারপর দেশে প্রবর্তিত করুন।’...তা হলে তো চিহ্নিত! কারণ, জার্মান পারলিমেন্ট আইন করার সর্বক্ষমতা সর্ব অধিকার হিটলারকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আইন মানাই সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। তারপর এক বছর কেটে গেল, আইনমন্ত্রী কোন উত্তর পেলেন না। ইতিমধ্যে দেশের সব পাগল খতম। সমস্যাটার সূচারু সমাধান হয়ে গেল আপসে আপসে। কোনো কোনো দেশে যে রকম দূর্ভিক্ষের সমস্যা আপসে আপসে সমাধান হয়ে যায় কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মরে যাওয়ার পর।

লাখ তিরিশ বা পঞ্চাশেক ইহুদিকে যে ওপারে পাঠানো হল তার জন্যও কোনো ‘আইন’ বিধিবশ্বভাবে তৈরী করা হয়নি। কিন্তু সে মামেলা নিয়ে কখনো কোনো লেখালোঁখ হয়নি,—ফরিয়াদ করবে কে?—হলেও সেটা লোক-চক্ষু গোচর হয়নি। পবিত্র পিতা পোপের কাছে কোনো নিধনই অজানা ছিল না। তিনি থেকে থেকে বিবজ্ঞন তথা সূক্ষ্মপট ইঙ্গিতে হিটলারের কাছে ‘এপীল’ করতেন ‘ক্রিস্টিয়ান চ্যারিটি’ দেখবার জন্য। এর বেশী তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি। ৭

৭ যুদ্ধের পর হিটলারের প্রতি পোপের আচরণ নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা

হিটলার ক ক-তে কত লক্ষ ইহুদি, রুশ, বেদে ইত্যাদিকে নিহত করেন সেই সংখ্যা নিয়ে যখন ন্যূনবের্গ মোকদ্দমায় তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে তখন আসামীদের একজন ছিলেন ফ্রানক্ । (এঁরই আদেশে অসংখ্য ইহুদিকে আইষমানের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বিচারে ফাঁস হয় । ঐ বিচারে উনিই একমাত্র আসামী যিনি নিজেকে 'দোষী বলে স্বীকার করেন) সেই তর্কাতর্কির ভিতর আসামীদের কাঠগড়ার পিছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল সে শূন্যতে পেল (যে-সব মার্কিন জোয়ান উত্তম জরমন জানতো তাদেরই এ-কাজে নিয়োজিত করা হত এবং এরা ভাবখানা করতো যেন জরমন বিলকুল বোঝে না—ফলে আসামীরা নিজেদের ভিতর এমন সব কথা বলে ফেলত যেগুলো সাম্রাজ্যী ফরিয়াদি পক্ষের মার্কিন উকীলকে জানিয়ে দিত । আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বেআইনী ব্যাপার । কিন্তু মার্কিন 'আইনকানুন' যেন 'শিবঠাকুরের আপন-দেশে/আইন কানুন সব নেশে ।') ফ্রানক্ ফিসফিস করে তাঁর সহ-আসামী হিটলারের অন্যতম মশ্গলী রোজন্‌বের্গকে বলছেন, 'এরা—অর্থাৎ মার্কিনিংরেজসহ মিশ্রশক্তি—চেষ্টা করছে আউশভিৎসে দৈনিক যে দু হাজার ইহুদি মারা হত তার কুলে গুনাহ্ কাল্টেন ব্রুনারের উপর চাপাবার ।' কিন্তু ঐ যে মার্কিনিংরেজের বোমাবর্ষণের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর হামবুর্গ বন্দরে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেল তার কি ? এদের বেশীর ভাগই তো ছিল শিশু এবং অবলা । তার পর ঐ যে জাপানে এটম্‌বম্ ফেলে আশী হাজার লোক মারা হল তার কি ? এই বৃষ্টি ন্যায়, এই বৃষ্টি ইনসাফ্ ?

হয়—তামাম ইওরোপ আমেরিকা জুড়ে । পোপবেরীরা তাঁকে যে পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সেটা সাধারণ রাজনৈতিকের পক্ষে মারাত্মক হত । এঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের চ্যান্সেলর (সর্বাধিকারী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোপ জার্মানিতে আপন রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও তস্য বিশ্বাসীগণকে নার্সি নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে একটি চুক্তি (কনকরডাট্) করেন । এতে করেই বিব্বজন সমাজ মাঝে হিটলারের জল চল হয়ে যায় । তারপর আর সে 'পাগলা জগাই'-কে আর ঠেকায় কে ? এই তাবৎ মামেলা নিয়ে মধ্য ইওরোপে ফিল্ম এবং নাট্যও দেখানো হয় । ক্যাথলিক সমাজ 'স্বভাবতই' অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন । কলকাতাবাসীদের মনে থাকতে পারে, বহু বৎসর পূর্বে অংশতম পোপ-বিরোধী 'মারিটন লুথার' নামক একটি ফিল্ম দেখবার সময় তথাকার ক্যাথলিকগণ ফিল্মটির বিরুদ্ধে রচিত ছাপা হ্যান্ড-বিল বিতরণ করেন, এবং সেটাকে বয়কট করার জন্য অনুরোধ জানান ।

৮ নার্সি রাজ্যে ক্ষমতার ধাপগুলো ছিল : হিটলার—হিমলার—কাল্টেন-ব্রুনার—আইষম্যান্ । হিটলার হিমলার আত্মহত্যা করেন—আইষমান তখন ফেরার । ফলে সব চাপ গিয়ে পড়ে কাল্টেন-ব্রুনারের উপর । এরও ফাঁস হয় । নিষ্ঠুরতায় এর সমকক্ষ লোক পাওয়া কঠিন ।

রোজেনবের্কে হেসে উত্তর দিলেন, আমরা যুদ্ধে হেরেছি যে !১

ইতিপূর্বে যে মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন ডাক্তার গিলবার্টের উল্লেখ করেছি, তিনি এই কথোপকথনের উপর ফোড়ন দিয়ে বলেছেন, 'এ হল গে টি'পিক্যাল নাটস' যুক্তিপূর্ণাতি ।'

বট্টো ? তা সে যাক্ গে—আমরা এম্বলে আউশ্‌ভিৎস হিরোশিমার তুলনামূলক আলোচনা করবো না ।১০ শব্দ একটি সামান্য খবর পাঠককে দিই ।

হিরোশিমায় এটম বম ফাটানো হয় ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে । এর পক্ষাধিক কাল পূর্বে মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় জাপান জয়াশা ত্যাগ করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের মারফৎ যুদ্ধবিরতি কামনা করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় (এর মাসতিনেক পূর্বে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হিমলার তাঁর প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে ঐ সুইডেনের মারফৎই মিত্রশক্তির নিকট সন্ধি-প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু দুই মহাপ্রভুর কেউই খুশের উপদেশ মানতেন না বলে বাম হস্তটি অর্থাৎ হিটলার খবরটা জানতে পান এবং আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিমলারকে পদচ্যুত করেন) কিন্তু মার্কিন তখন হন্যে হয়ে উঠেছে, নবাবিস্কৃত এটম বম্ একটা ঘন-বসতিওয়া শহরে ছাড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানবার জন্য । জাপানদত্ত সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলে তো আর বোমাটার এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায় না—অতএব, চালাও যুদ্ধ আরো কয়েকদিন, বোমা ফাটিয়ে দেখা যাক ক'হাজার লোক প্রেফ পড়ে মরে, শহর কতটা ধ্বংস হয় । বলা নিতান্তই বাহুল্য হিটলারের ক ক-তে গ্যাসে মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন, এটম বমে জাপানীরা জ্বলন্ত জামাকাপড় নিয়ে ছুটোছুটি করে মরেছে বহু সহস্র, এবং অসংখ্য জন মরেছে বোমার ফলে নানাবিধ অজানা অচেনা রোগের যন্ত্রণায় বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত হয়ে ।...এবং কতারা একটা বোমা ফেলেই প্রসন্ন দক্ষিণঃমুখঃ ধারণ করেননি । আমরাও জানি, এক সংখ্যাটাই বড্ডই অপয়া—নিদেন দুটো বাতাস খেতে হয় ।

৯ রোজেনবের্কে নাৎসী দলের 'চিম্ময় নেতা' = 'স্পিরিচুয়াল ফ্যুরার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । তাঁর প্রখ্যাততম গ্রন্থ 'বিশ্ব শতাব্দীর মিথ' গ্রন্থে তিনি উঠে পড়ে লাগেন, আর্ষরাই যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি সেইটে প্রমাণ করার জন্য ।

১০ হিরোশিমার এটম বম্ বর্ষণ বাবদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী চিকিৎসকের একটি বয়ান আমার হাতে এসে পেঁচেছে—in spite of the sharks, popularly and mistakenly known in Calcutta as Foreign Book-seller ।

সুযোগ পেলে সেটি পাঠকের হস্তে সমর্পণ করবো । ডাক্তারটি বোমা পতনের ফলে আহত হয়ে কয়েক বৎসরের ভিতরই অসহ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান ।

‘পশ’কাতর পাঠক এতক্ষণে হয়তো কিঞ্চৎ অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছেন, আমি এসব পদ্রনো কীসদ্দশী ঘাটীছ কেন। তবে কি আমি মডার্ন লেখকদের পাল্লায় পড়ে বীভৎস রসের অবতারণা করে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়তে চাই? ‘ঈশ্বর রক্ষতু!’ আমার সে-রকম কোনো উচ্চাশা নেই। বরঞ্চ বলবো, মডার্নদের এই যে নতুন টেকনিক—আগেভাগে সব কিছু বলে দিয়ে, কোনো প্রকারের সারপ্রাইজ এলিমেন্ট না রেখে পানসে মারা ‘ধূসর’ মারকা প্রট্ বিবর্জিত গল্প লেখা (এদের বক্তব্য; বাস্তব জীবনে সারপ্রাইজ নেই—আছে একঘেন্নেমির ধূসরিমা, পান্তাভাতের পানসেমি, মরা ই’দুরের পাঙাশ-মারা পেট) —এটা আমি রপ্তো করতে পারবো না। আমার যেটা মূল বক্তব্য সেটাতে আসি সর্বশেষে।

এই মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, আজকের ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে গ্রীষ্মত চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়, দুজনাতে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের করকমলে সমর্পণ করেন।

গুণ্ডামি আরম্ভ হয় সেই সময় থেকে। ক ক তার শেষ।

আজ আবার এরা—গণতন্ত্র দেশের লক্ষ্মীছাড়া সব পলিটিশানরা—চেক-প্রভাকদের তাড়াচ্ছে।

অথচ, পাঠক, দেখো, চেক-প্রভাকদের সাহায্য করার র্ত্তিভর ক্ষ্যামতা ওদের নেই।

তাই তারা জর্মনির দুই লক্ষ সৈন্যকে তিন লক্ষ, না পাঁচ লক্ষে ওঠবার অনুমতি দিয়েছেন।

একদা যে রকম গণতন্ত্রের মর্দনিব চেম্বারলেন-দালাদিয় চেক-প্রভাকদের হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি তাদের বংশধররা, চেক-প্রভাকদের তাড়িয়ে দিয়ে, রুশদের হাতে ছেড়ে দেবেন।

আবার শূরু হবে ক ক।

গ্যাস চেম্বার!

শা-লা!

প্রেম

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা খতবোর মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

“একদিন বললে চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।” এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ’বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যান্টরূপে দাঁটারবার কাগজপত্রও দু’রস্ত করে দিতে হয়।

সৈয়দ মজুতবা আলী রচনাবলী (৩য়)—২৭

সুইস্‌ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, “জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টের্ডি—” অর্থাৎ ‘উড়ুন্ধু’ ভাব ধরে।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই কোনো রোমান্টিক ছোকরা পলিস লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এন্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকিফাকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পড়ল। বেশ সফলভাবে কেটেছে দিনগুলো—কোনো সন্দেহ নেই। এবং কোনো সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজ্জাছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাকির দিয়ে বললেন, “এবং খর্চাটা মেয়েটির কণ্ঠে জমানো টাকা থেকে।”

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার চোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল। উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, “দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃস্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গির্জায় যেত। আসামী অন্তঃস্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়।”

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

“আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব-কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দুঃবছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কণ্ঠের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দুঃদুটো মেরে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দুঃদুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক,

আমার ছোট বোন। তার হস্ত বেশী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই।—সে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মৃত্যু কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে ?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। সে যেন একেবারে পাশাপাশি হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, “নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।” তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সূর্যকঠিন, বাচ্চাটা মৃত্যুব্রাহ্মণ জন্মেছিল কি না।”

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মৃদু খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শূন্যধোলে, “বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল ?”

মেয়েটি একবার মৃদু তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, “আমি সত্যি শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।”

আর্চবিশপ, জজ তো নয়-ই, সরকারী উকিল পর্যন্ত কোনো রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারভার নয় ম্যানসলটার—আর মৃত্যুব্রাহ্মণ জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পল্লিসকে জানার্যনি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্স, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শূন্য।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শূন্যধোলে, “আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সম্বন্ধ নিলে না কেন ? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করলে না কেন ?”

কুন্ডলি পাকানো গোথরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, “কী ! সেই কাপদরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো ! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপদরুষের, সেই পশুর নাম !” তারপর দু’হাত দিয়ে মৃদু ঢেকে ফেললে। গোঙানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মৃদুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী ক্ষেপ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মৃদুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু’দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, “ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি ?”

“কি সাজা হল?”

“চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পান্থি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গড়্ কনডাকটের রিপোর্ট দেবার জন্য। আদালত বললেন, “সমস্ত পরিবার যে বদনামের পার্বলিসিটি পেল, সেই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।”

প্রেম যে কী বেশ, কী স্বগার—

— — —